আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ., এল. এল. বি.
স্কটিশ চার্চ কলেজের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব
প্রধান অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের
প্রাক্তন সদস্য

ও

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী, এম. এ.
বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান
অধ্যাপক এবং 'ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞানের
ভূমিকা'র অন্যতম লেখক

তৃতীয় সংস্করণ

ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাসানাল
২৮, বিপ্লবী অনুকুল চন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

প্রকাশক :

ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাসানাল

২৮, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

তৃতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৬১

মুদ্রাকর :

[illegible]—নবাঙ্কুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা-১৬

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিবর্তন

(Rise and Evolution of the State)

[রাষ্ট্র-সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনার বিষয়।

সমাজপ্রবণতা প্রকৃতিদত্ত। মানুষ তাই সমাজ ছাড়া বাস করিতে পারে না। নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা সমাজের আদিম ইতিহাস জানা গিয়াছে। প্রমাণ হইয়াছে যে জীববিবর্তনের ফলে মানুষের আবির্ভাবকাল হইতেই মানুষ কোন না কোনরূপ গোষ্ঠীর আওতায় বাস করিতেছে। মানুষের এই সংঘবদ্ধতা ক্রমে দৃঢ়তর হইয়াছে। সংঘবদ্ধ জীবনের ক্রমবিকাশের প্রাথমিক স্তরে তিনটি তাগিদ বিশেষ কার্যকরী হইতে দেখা যায়: (১) জৈব ও অর্থনৈতিক তাগিদ, (২) ধর্মীয় তাগিদ; ও (৩) আত্মরক্ষার তাগিদ। পরবর্তীকালে মানসিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিকাশের তাগিদও সমাজ বিবর্ধনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজ-বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে রাষ্ট্রের বিবর্তন প্রধানতঃ ঐহিক ও বাস্তব কারণেই ঘটিয়াছে। অর্থাৎ জৈব ও অর্থনৈতিক তাগিদই সমাজ বিবর্তনে বলবত্তর হইয়াছে। আত্মরক্ষার তাগিদ এবং গোষ্ঠী বা সমাজের উপর ক্ষমতা-ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষাও রাষ্ট্রের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

সাধারণভাবে দেখা গিয়াছে যে অর্থনৈতিক দিক হইতে প্রভাবশীল শ্রেণী শেষ পর্যন্ত মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের উপর প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। মোটামুটিভাবে ইহাও সত্য যে ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের অনুকূল আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকাশ সাধারণভাবে শ্রেণী স্বার্থের প্রকাশ বই কিছু নহে। এই নীতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তবে ইহার ভিতরে যে একটি সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

আর একদিক হইতে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মনুষ্যসমাজ ও রাষ্ট্রের বিবর্তন অনেক পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এই অর্থনৈতিক স্তরগুলি লক্ষ্য করা যায়। শিকারের যুগ, পশুপালনের যুগ, কৃষিযুগ ও শিল্পযুগ পর পর আসিয়াছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের বাহ্যিক আকারের ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে চার শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপের সন্ধান পাওয়া যায়? (১) নগর রাষ্ট্র (City State); (২) সাম্রাজ্য (Empire), সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র (Feudal State); (৩) জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State)। ইতিহাস আজ জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিকতার আদর্শের দিকে লইয়া যাইতেছে।]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু খ্রীঃ পূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ মানুষকে সামাজিক জীব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সমাজপ্রবণতা প্রকৃতি-দত্ত। তাই মানুষ সমাজ বা গোষ্ঠী ছাড়া বাস করিতে পারে না। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা দেখা যায় যে, ত্রিশ চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্বেও মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিতেছে। সেই সংঘবদ্ধতা আধুনিক রাষ্ট্রের সংহতির সহিত সমপর্যায়ের নহে সত্য; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক হইতে রাষ্ট্রের যে মৌলিক লক্ষণ অর্থাৎ নিয়মকানুনানুগ একত্রীভূত জীবন ব্যবস্থা, তাহার মূলসূত্র বা বীজ আদিযুগেও বর্তমান ছিল। অর্থাৎ সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ সংঘবদ্ধভাবেই বসবাস করিয়াছে। পূর্বে এই সংঘবদ্ধতা ছিল অত্যন্ত শিথিল ও অপরিণত। ধীরে ধীরে তাহা সংহত আকার ধারণ করিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। নিয়মকানুন সংঘবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। আবার সমাজবদ্ধ জীবনে এই নিয়মকানুনগুলির বিশিষ্ট প্রণেতা থাকাও অপরিহার্য। এক সময়ে মানুষের আদি ইতিহাসের যুগে, এইরূপে সমাজবদ্ধ মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করিয়াছে। কিন্তু অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে ধীরে ধীরে গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসমাজ বিভিন্ন দেশে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে।

আদিম যুগ হইতে সংঘবদ্ধ জীবনের ধারাবাহিকতা।

সমাজবিবর্তনের যে সকল স্তর অতিক্রম করিয়া মানুষ আধুনিক যুগে উপনীত হইয়াছে তাহার ইতিহাস যেমন বিস্ময়কর তেমনি চিত্তাকর্ষক। মনুষ্য সমাজের ইতিহাসকে সংঘবদ্ধ জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি প্রকৃতিজ জৈব আকর্ষণ ও তাহার ফলে বংশবৃদ্ধি ও পরিবার-গোষ্ঠীর সৃষ্টি সমাজ গঠনের অন্যতম মূলভিত্তি। আদিযুগে মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিকার করিয়াছে; একত্রীভূত হইয়া হিংস্র প্রাণী ও ততোধিক হিংস্র বৈরীভাবাপন্ন অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে বা তাদের বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। নিজেদের মঙ্গল কামনায় একেশ্বর বা বহু ঈশ্বরের ভজনা করিয়াছে। গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য নানা বিধিনিষেধ পালন করিয়া গোষ্ঠীকে নিয়মাবদ্ধ ও অধিকতর সংহত করিয়াছে। অসভ্যযুগ অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন সভ্যতার স্তরে উপনীত হইয়াছে, তখন মানুষ ধীরে ধীরে কতকগুলি নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সেইসময়ে মানুষ মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক

সংঘবদ্ধ জীবনের ক্রমবিকাশ।

তাগিদ অনুভব করিয়াছে যাহার ফলে মানবসমাজে নানা পরিবর্ধন ঘটিয়াছে। মনুষ্যসমাজে নানা প্রকারে-র যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠানেরসৃষ্টি হইয়াছে এবং মনুষ্যসমাজ মনন-ধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে ধীরে ধীরে মানব সমাজ বিবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়া রাষ্ট্র গঠন কারয়াছে। আদিমকাল হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত এই বিবর্তন অব্যাহতভাবে চলিয়াছে।

এই দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাসে প্রধানত: তিনটি বিশিষ্ট প্রেরণা কার্যকরী হইয়াছে। প্রথম জৈব ও অর্থনৈতিক প্রেরণা, দ্বিতীয় ধর্মীয় প্রেরণা ও তৃতীয় আত্মরক্ষামূলক সংহতির প্রেরণা। মানবসমাজে এই প্রেরণাগুলি সর্বাঙ্গীণ পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তাহারই পটভূমিতে কার্যকরী হইয়াছে।

সমাজবন্ধনের বিভিন্ন তাগিদ।

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, আচ্ছাদন (বস্ত্র), বাসস্থান সংগ্রহ এবং জীবন, স্বাস্থ্য, গোষ্ঠীর ধারাবাহিকতা রক্ষা মানুষের পক্ষে আবশ্যক। এই সকল প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য মানুষকে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করিতে হইয়াছে। সমাজের খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত হইল নানা নিয়ম কানুন; মানুষের সমাজ ইহার ভিতর দিয়া বৃহত্তর ও দৃঢ়তর সংঘবদ্ধতার পথে অগ্রসর হইল। রাষ্ট্রের বিবর্তনের ইতিহাসে অর্থনৈতিক তাগিদগুলি সদা সক্রিয় রহিয়াছে। এই কথা প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে প্রায় সমভাবে সত্য। দ্বিতীয়ত:, অজ্ঞানাচ্ছন্ন আদিম মানুষ তার অপরিচ্ছন্ন বুদ্ধি ও সীমিত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিগুলির বা পারিপার্শ্বিকের স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই। প্রকৃতির রুদ্ররূপ যেমন তাহাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়াছে, তেমনি তাহার প্রসন্ন প্রকাশ তাহাদের মুগ্ধ বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। তাই মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিতে দেবত্ব আরোপ করিয়াছে। এমনি করিয়া চন্দ্র, সূর্য, তারকা, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বৃষ্টির পশ্চাতে তাহারা দেবতার প্রকাশ কল্পন করিয়াছে এবং এই সকল দেবতার অথবা এক ঈশ্বরের পূজার দ্বারা তাহাদের করুণা ও বরলাভের প্রয়াস পাইয়াছে প্রকৃতির রুদ্র প্রকাশ হইতে আত্মরক্ষা ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়লাভের জন্য। এই সূত্রে সমাজে নানা বিধিনিষেধ ও নীতি প্রভৃতির সৃষ্টি হইল এবং মানুষের জীবনে সমাজবন্ধন ক্রমশ: দৃঢ়তর রূপ ধারণ করিতে লাগিল। তৃতীয়ত:, যুগ যুগব্যাপী মানুষের জীবন সংগ্রামের আর একটি অধ্যায়ও সমাজ বিবর্তনে ও রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করিয়াছে। আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ নিরন্তর হানাহানি করিয়াছে বিরোধী গোষ্ঠীর সহিত। সংঘবদ্ধ মানুষের ইতিবৃত্ত অনেকাংশে যুদ্ধের

ইতিহাস। আত্মরক্ষার জন্য ও যুদ্ধের তাগিদে মানবগোষ্ঠী শাসনবন্ধনে নিজেদের বাঁধিয়াছে এবং তার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংহত রূপ ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে জৈব ও অর্থনৈতিক তাগিদ, ধর্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষাকল্পে সামরিক সংগঠনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়া মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিয়াছে। সভ্যতার অভ্যাগমে মানব-সমাজে মানসিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পরিশীলনের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী সমাজবিধান কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। এই কারণগুলি আদিমযুগ, প্রাচীনকাল, মধ্যযুগ ও বর্তমান কালে সক্রিয়ভাবে মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর নানারূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এইস্থানে সাধারণভাবে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রের বিবর্তনের ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ধর্মের প্রভাব ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে।

সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ বিবর্তনের আলোচ্য সূত্রগুলির মধ্যে মূল ও প্রধানতম সূত্রটির সন্ধান করিয়াছেন। আজকাল মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে রাষ্ট্রের বিবর্তন সম্পূর্ণভাবে ঐহিক বা বাস্তব কারণেই ঘটিয়াছে। পারিপার্শ্বিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণাই সমস্ত সমাজে সর্বকালে মৌল প্রেরণা হিসাবে সক্রিয় হইয়াছে। মানব সমাজের অর্থনৈতিক স্বার্থ-রক্ষার সহায়ক হিসাবে ধর্ম ও সামরিক আয়োজন ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস্ বলেন মানব ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তের অপর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে বারংবার ধর্মকে অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা দখলের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

সমাজ বিবর্তনের মূল সূত্র—মার্কসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা।

কার্ল মার্ক্স আরও মনে করেন যে বাস্তব জীবনে স্বার্থ বা অর্থনৈতিক স্বার্থ বলিতে কোন দেশ বা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ বোঝায় না। ইহার দ্বারা বিভিন্ন সমাজের অভ্যন্তরে প্রভাবশালী শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ বোঝায়। সামন্ততান্ত্রিক বা জমিদারীর যুগে যে স্বার্থ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বিধানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা মূলতঃ সামন্ত শ্রেণীরই স্বার্থ। তাহা ভূমিদাস বা প্রজাসাধারণের স্বার্থ নয়। বরং উপরোক্ত দুই শ্রেণীর বিভিন্ন স্বার্থের একটা সংঘাতই দেখা দিয়াছে সামন্ত-তান্ত্রিক যুগে। তেমনি শিল্পায়নের যুগে যে অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রব্যবস্থা মানব সমাজে মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা শিল্পপতি বা পুঁজিপতিদেরই অনুকূল।

রাষ্ট্র ও শ্রেণী স্বার্থ।

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ পুঁজিপতি সমাজে গৌণ স্থান অধিকার করে। এখানেও শ্রেণী সংঘর্ষের চেহারা সুস্পষ্ট। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বার্থ বলিয়া যাহা লোকসমাজে ঘোষণা করা হয়, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সেই স্বার্থ সত্যকার রাষ্ট্রের স্বার্থ নহে; তাহা সমাজে ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক দিক হইতে প্রভাবশীল অধিকারী শ্রেণীরই স্বার্থ; এবং সেই স্বার্থের সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধতা রহিয়াছে। পল্লবগ্রাহী রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস এই শ্রেণী সংঘাতের হদিশ দিতে পারে না। বাস্তবানুগ সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ দ্বারা কার্ল মার্কস্ উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পুরাতনপন্থী সমাজবিজ্ঞানীরা কার্ল মার্কসের নীতির বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগে মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মূল নীতি মোটামুটিভাবে সকল সমাজবিজ্ঞানীই মানিয়া লইয়াছেন এবং তদনুযায়ী অনেক দেশের ইতিহাস নূতনভাবে লিখিত হইতেছে।

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে মানুষ বিভিন্ন উপায়ে তাহার জৈবিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও প্রসারের চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ ও রাষ্ট্র বিবর্তনের ইতিহাসে এই পন্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

(১) শিকারের যুগ: এই যুগে মানুষ বন্য প্রাণী শিকার করিত এবং শিকারলব্ধ মাংস, ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত। এই সময়ে মানুষ যাযাবর ছিল শিকারের অনুসরণে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইত; কোন স্থায়ী বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা তখন তাহারা বিশেষ অনুভব করে নাই। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী অনুমান করিয়াছেন যে এই যুগের প্রথম অবস্থায় বর্তমান কালের পরিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত ছিল। অনেকে মনে করেন যে এই সমাজ ব্যবস্থা হইতে ধীরে ধীরে পরিবারকেন্দ্রিক পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। আরও অনুমান করা হইয়াছে যে শিকারের যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছু ছিল না। শিকারের দ্বারা লব্ধ মাংস বা শিকার করিবার যন্ত্রপাতি সবই সামাজিক সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। শিকারে পটু মানুষেরা এই যুগে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে ও ক্ষমতার অধিকারী হয়।

শিকারের যুগ।
(Hunting Stage)

(২) পশুপালনের যুগ: এই যুগে শিকার করা ছাড়া মানুষ পশুপালনেও অভ্যস্ত হইয়াছে। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সামান্য প্রসারের সঙ্গে তখন মানুষ

বন্য পশুকে পোষ মানাইতে শিখিয়াছে। পোষা প্রাণীর মাংস, দুধ প্রভৃতি এই যুগের মানুষের প্রাণধারণের প্রধান সামগ্রী ছিল। মানুষ পশুচারণের প্রয়োজনীয়তায় উর্বর চারণভূমির সন্ধানে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বাসস্থান পরিবর্তন করিত। অর্থাৎ যাযাবর জীবন যাপনের অবসান পশুপালনের স্তরেও হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে পশুপালনের যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়। ইহার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তির বৈষম্য দেখা গেল এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবিভেদের সূত্রপাত হইল। যাহারা বৃহৎ পশুপালনের মালিক এই যুগে তাহারাই সমাজে প্রাধান্য লাভ করে দেখিতে পাওয়া যায়।

পশুপালনের যুগ। (Pastoral Stage)

(৩) কৃষিযুগ: কৃষিযুগে মানুষের সভ্যতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। মানুষ কৃষিকার্যের দ্বারা খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। কৃষির প্রয়োজনে মানবগোষ্ঠীকে জলসমৃদ্ধ উর্বর ভূমির সন্ধান করিতে এবং স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিতে হইল। ইতিহাসে তাই সাধারণতঃ দেখা যায় যে প্রধান সভ্যতাগুলি নদী উপত্যকায় গড়িয়া উঠিয়াছে। নীলনদ, ইয়াংসিকিয়াং, হোয়াং হো, সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, টাইগ্রীস, ইউফ্রেটীস প্রভৃতি নদ-নদীর তীরে সভ্যতার পত্তন হইল। কৃষির জন্য ভূমির প্রয়োজন। সেইজন্য যাহারা জমির মালিকানা দখল করিয়া লইতে পারিল তাহারাই সমাজের প্রধান ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হইল। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারীতন্ত্র এই যুগেরই অন্তর্গত।

কৃষিযুগ। (Feudal or Agricultural Stage)

(৪) শিল্পযুগ: এইযুগে প্রাকৃতিক শক্তির (যথা—বাষ্প, বিদ্যুৎ) সাহায্যে কেন্দ্রীভূতভাবে মানুষের সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলেই এই উৎপাদন প্রথা সম্ভব হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শিল্পযুগ আরম্ভ হয়। শিল্পপতিগণ অল্পকালের মধ্যেই বিপুল অর্থের মালিক হইয়া ওঠেন এবং ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্রে সামন্তশ্রেণীর পরিবর্তে তাহাদেরই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

শিল্পযুগ। (Industrial Stage)

মানবসভ্যতার বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি নীতি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এক যুগের সম্পূর্ণ অবসান হইয়া অন্য যুগের আরম্ভ হইল এইরূপ মনে করা ভ্রম। মানবসমাজের বিবর্তন হইয়াছে অতি ধীরে। তাই একই সময়ে বিভিন্ন প্রথা পাশাপাশি বিরাজ করিয়াছে

এমনকি বর্তমান যুগেও নানা স্তরের অর্থনৈতিক পদ্ধতির চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ ধনোৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজে ও রাষ্ট্রে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। কৃষিযুগে জমিদার বা সামন্তেরা ছিলেন ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান। সেইজন্য তাহারাই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার অধিকারী। শিল্পযুগে বিজ্ঞানের বলে ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে যখন পুঁজিপতিরা সামন্তশ্রেণীকে পরাভূত করিলেন তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সামন্ত বা জমিদারী শ্রেণীর হাত হইতে স্খলিত হইয়া পুঁজিপতিদের করায়ত্ত হইল। তৃতীয়তঃ, ধনোৎপাদন পদ্ধতির সহিত রাষ্ট্র ক্ষমতার সম্বন্ধের যে নীতি তাহা সাধারণভাবে দীর্ঘকালের ইতিহাসের গতির দিক হইতে বিচার করা প্রয়োজন। স্বল্পকালের পরিধিতে তাহা পুরাপুরি প্রকট না-ও হইতে পারে। কিন্তু মানবসমাজের চলমান জীবনের দীর্ঘ মেয়াদ বিবেচনা করিলে এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

অর্থনৈতিক বিবর্তন ও রাষ্ট্র ক্ষমতা—সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ। (Feudalism and Capitlism)

সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিভিন্ন যুগে সর্বাঙ্গীণ পারিপার্শ্বিক চাপে রাষ্ট্র বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাচীনকালে প্রাচ্য জগতে কতকগুলি বিরাট সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। মিশর, অ্যাসিরীয়, চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য, প্রভৃতি দেশের নৃপতিবর্গের আধিপত্যে বৃহৎ সাম্রাজ্য দেখা দেয়। বিভিন্ন গোষ্ঠিভুক্ত নানা করদ রাজ্যের উপর ঐসব সম্রাটেরা শাসন বিস্তার করেন। সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া প্রাচ্য জগতে বহু রাজতন্ত্রেরও উদ্ভব হয়। ইউরোপে রাষ্ট্রীয় সভ্যতার প্রধানতম দেশ প্রাচীন গ্রীসে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাষ্ট্র এক অভিনব রূপ গ্রহণ করে। এই রাষ্ট্রগুলিকে নগররাষ্ট্র (City State) বলা হয়। একটি ছোটখাট শহর ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী সীমাবদ্ধ গ্রাম্য এলাকা নগররাষ্ট্রের পরিধি ছিল। প্রাচীন গ্রীসে এইরূপ এক একটি অতি ক্ষুদ্র অঞ্চল লইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন নগর রাষ্ট্রগুলি গড়িয়া উঠে। নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। গণতন্ত্রের ইতিহাসে এথেন্স নগররাষ্ট্রের অবদান অবিস্মরণীয়। ইউরোপে মধ্যযুগেও কতকগুলি নগর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। তাহার মধ্যে ভেনিস ও ফ্লরেন্স সুপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতবর্ষের খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈশালী প্রভৃতি স্থানে অল্পকালের জন্য কতিপয় গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি এতই ক্ষণস্থায়ী ছিল যে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে তাহারা কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই।

রাষ্ট্রের আবয়বিক প্রকার ভেদ।
১। প্রাচ্যের প্রাচীন সাম্রাজ্য।
২। নগর রাষ্ট্র।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মেসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্‌ ও তাঁহার পুত্র ভুবনবিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের বিজয় অভিযানের ফলে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণভাবে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে এবং সেগুলি মেসিডোনিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলেকজাণ্ডারের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী দুর্দমনীয় ঝঞ্ঝার ন্যায় সমস্ত বাধা হেলায় অতিক্রম করিয়া মিশর রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিয়া লয় এবং সিন্ধু নদ পর্যন্ত মেসিডোনীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করে। কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডারের সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। গ্রীসের রাষ্ট্রশক্তির অধঃপতনের পর রোমের দ্রুত অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। রোম রাজতন্ত্ররূপে খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে ইতিহাসে প্রথম দেখা দেয়, প্রজাতন্ত্ররূপে পৃথিবীর ইতিহাসে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং সাম্রাজ্য হিসাবে বিরাট আকার ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে অবনতি ও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। রোমের সাম্রাজ্যবাদী গঠন পদ্ধতি ও শাসন ব্যবস্থা পৃথিবীতে পরবর্তীকালে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ অনেকাংশে রোমক সাম্রাজ্যের গতি-প্রকৃতির আদর্শে নিজ নিজ নীতি ও গঠন প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

৩। পাশ্চাত্যের প্রাচীন সাম্রাজ্য —রোমক সাম্রাজ্য।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রোম সাম্রাজ্যের অবনতির সূত্রপাত হয়। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতি দেশে বিভিন্ন সামন্তবর্গ বা বৃহৎ ভূস্বামীগণ আপন আপন এলাকায় অনেক পরিমাণে স্বাধীন ক্ষমতা স্থাপন করিতে সমর্থ হন। বিভিন্ন সামন্ত এলাকাগুলি মিলিয়া দেশে দেশে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং নির্দিষ্ট কর সংগ্রহ ব্যতীত রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। সামন্তবর্গ জমির সর্বময় মালিক ছিলেন এবং অন্যান্য যে সকল শ্রেণীর জমির সহিত সম্বন্ধ ছিল (যেমন—জোতদার, প্রজা, ভূমিদাস প্রভৃতি) সামন্তশ্রেণী তাহাদের প্রায় সর্বময় প্রভু ছিলেন। জমির কর আদায়, অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূস্বামীদের সহিত ছোট-খাট যুদ্ধবিগ্রহ চালানো, আপন প্রজাদের উপর বিচার ক্ষমতা পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে সামন্তশ্রেণী বেশ স্বাধীনভাবেই কাজ করিতে পারিতেন। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্র যে সকল ক্ষমতার অধিকারী সামন্তশ্রেণী তাহার অনেকগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। মধ্যযুগে তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ; সামন্তবর্গ ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী।

৪। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র।

সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে লইয়া এবং প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের আদর্শে, পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান জগতে রাষ্ট্রনৈতিক একতা সৃষ্টির একটি বিরাট প্রচেষ্টা দেখা যায়। Holy Roman Empire বা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এই প্রয়াসের রাজনৈতিক প্রকাশ। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান গির্জার ধর্মগুরু পোপ এই সাম্রাজ্যের প্রবর্তক ছিলেন বলিয়া তদানীন্তন ধর্মযাজকেরা দাবী করেন; এই কারণে ঐ সাম্রাজ্যকে 'পবিত্র' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। এই তথাকথিত ধর্ম সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ও পোপ্ ঘোষিত খ্রীষ্টান ধর্মের ভিত্তিতে ইউরোপকে এক ধর্মসূত্রে বাঁধিবার প্রয়াস দেখা যায়।

৫। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শুরু হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। কিন্তু অমোঘ ঐতিহাসিক কারণে এই একতার আদর্শ জয়যুক্ত হইতে পারে না। যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ও উপাদান মধ্যযুগীয় একতার আদর্শকে পরাভূত করে তাহার মধ্যে ইউরোপে বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় সত্তার অনুভূতি সর্বপ্রধান। প্রতি রাজ্যে আর্থিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী শ্রেণী এই জাতীয় জাগরণের পুরোধা ছিলেন। এই সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন সামন্তশ্রেণী দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী ধীরে ধীরে সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। দ্বিতীয়োক্ত এই শ্রেণী বিভিন্ন নৃপতিবর্গের প্রধান সহায়ক রূপে অগ্রসর হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যে শক্তিশালী রাজতন্ত্র আবির্ভূত হয়। ইতিহাসে এইরূপে যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল তাহাকে জাতীয় রাষ্ট্রের যুগ বলা যায়। সাধারণভাবে বিবেচনা করিলে রাষ্ট্রের বিবর্তনের ইতিহাসে আমরা এইরূপে চার প্রকারের রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ পাই (১) নগররাষ্ট্র, (২) সাম্রাজ্য, (৩) সামন্ত রাষ্ট্র ও (৪) জাতীয় রাষ্ট্র। এই চার ধরণের রাষ্ট্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

৬। জাতীয় রাষ্ট্র। (Nation State)

প্রথম মহাযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলার পর হইতে শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শ পৃথিবীর সর্বদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্ববিধ্বংসী রূপে ভীতসন্ত্রস্ত মানবসমাজ শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শের দিকে আরও আকৃষ্ট হইয়াছে। আণবিক শক্তিকে মারণাস্ত্রে পরিণত করিবার পর পৃথিবীর সভ্যসমাজে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে মানব সভ্যতা রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকতাই প্রধানতম সহায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্থাপিত League of Nations বা জাতিগোষ্ঠী অথবা দ্বিতীয়

৭। আন্তর্জাতিকতা। (Internationalism)

মহাযুদ্ধোত্তর কালের সম্মিলিত জাতিসংঘ বা United Nations এই আন্তর্জাতিক আদর্শের এক প্রকারের প্রতিষ্ঠানগত প্রকাশ। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে জাতিগোষ্ঠি (League of Nations) বা জাতিসংঘ (United Nations) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। এই দুইটির একটিও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র বা বিশ্বরাষ্ট্র নহে। আন্তর্জাতিকতার প্রভাবে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের নীতি ও প্রকৃতি কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। তাই আন্তর্জাতিকতার আদর্শও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

এই আন্তর্জাতিকতার আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে কিছুটা অন্যভাবেও আলোচিত হইয়াছে। মার্ক্‌স্‌ বলেন যে ধনতন্ত্র শ্রেণীবিন্যাস এবং উগ্রজাতীয়তাবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত ধনতন্ত্র ও শ্রেণী-বিন্যাসমূলক সমাজ বর্তমান থাকিবে ততদিন পর্যন্ত জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাতি বৈরতা বিনষ্ট হইবে না এবং আন্তর্জাতিক সমাজ গঠন অসম্ভবই রহিয়া যাইবে। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর ঐক্যের মধ্য দিয়াই শ্রেণীহীন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র বা বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। বলা বাহুল্য এই নীতি সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মানিয়া লন নাই। অনেকে বলিয়াছেন যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলেও সহাবস্থানের ভিত্তির উপর বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে।

আইন-শাসিত কোন বিশেষ দেশে স্থায়ী বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীকে রাষ্ট্র বলা হয়। রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকারের বৈজ্ঞানিক আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্রের অর্থ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন, রাষ্ট্রের বিভিন্নরূপ, রাষ্ট্রের আবয়বিক গঠনপদ্ধতি, রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তি বা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের আদর্শ ও সেই আদর্শলাভের জন্য কার্যকরী পন্থা, এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সম্বন্ধ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

অতিরিক্ত পাঠ

J. A. DEALAY: The Development of the State—Ch. II

E. JENKS: History of Politics—Chs. VII-XII

H. SIDGWICK: The Development of European politics.

OPPENHEIMER: The State.

W. W. FOWLER: The City States of the Greeks and Romans—Ch. IV-VI.

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বরূপ, প্রসার ও পদ্ধতি

(Political Science—Its Nature, Scope and Method)

[রাষ্ট্র সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, কর্মপন্থা, গঠনপদ্ধতি, রাষ্ট্রের সহিত ব্যষ্টি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয় প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে শাসনপদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা অংশ বই কিছুই নহে।

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে দেখা যায় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), রাজনীতি (Politics), রাষ্ট্র দর্শন (Political Philosophy), ও রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory) প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক সময় একই অর্থে এই বিভিন্ন শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক সময় এই শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্যও করা হইয়া থাকে। তবে এই শব্দগুলির মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা Political Science কথাটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কি না, এই বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা গিয়াছে। এক পক্ষে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ, তুলনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্থান অতীব সঙ্কীর্ণ, সেইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান সত্যকার বিজ্ঞানের স্তরে পৌঁছাইতে পারে নাই। অন্য পক্ষে দেখানো হয় যে অ্যারিষ্টট্‌ল প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ, তুলনামূলক পদ্ধতি সাতিশয় যোগ্যতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে আইন ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং রাষ্ট্রশাস্ত্র বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য হইতে পারে! তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ সীমাবদ্ধ। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলিয়া মানিয়া লওয়াই ভাল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সকল পদ্ধতির মধ্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি ও সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি কার্যকারিতার দিক হইতে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, বিজ্ঞানসম্মত ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ফলপ্রদ। তবে দার্শনিক ও অন্যান্য পদ্ধতিও পরিত্যাজ্য নয়। সুবিধা অনুযায়ী সেগুলির ব্যবহারও অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যক। বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ সম্বন্ধে গোঁড়ামি পরিহার করাই শ্রেয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি হয় deductive বা inductive পদ্ধতিদ্বয়ের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু এ্যারিষ্টট্‌ল্ deductive ও inductive উভয় পদ্ধতি একযোগে ব্যবহার করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বরূপ ও সংজ্ঞা—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র সম্পর্কে যুক্তিমূলক সুসম্বদ্ধ সর্বপ্রকারের বৈজ্ঞানিক আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। রাষ্ট্রের বিবর্তন উৎপত্তি ও প্রকৃতি, তাহার বিভিন্ন প্রকাশ, আবয়বিক গঠন, শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রের আদর্শ ও সেই আদর্শলাভের কর্মপন্থা, রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য, আন্তঃরাষ্ট্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি

সকল বিষয়ই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সদা-পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রের সকল প্রকার অভিব্যক্তিই রাষ্ট্রেবিজ্ঞানের অন্তর্গত ও আলোচ্য বিষয়।

মানুষের জীবন যেমন গতিশীল, মনুষ্যসমাজও তেমনি পরিবর্তনশীল। ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে, নানারূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। রাষ্ট্র মনুষ্য-জীবনের সহিত তাল রাখিয়া কেবলই নব-কলেবর গ্রহণের প্রয়াস পাইয়াছে কালে কালে। রাষ্ট্রের এই গতিশীল প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও তাহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অনুশীলন, তাহার সাংগঠনিক অবস্থার বাস্তব আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। অর্থাৎ একদিকে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সূক্ষ্ম তত্ত্বমূলক আলোচনা ও অন্যদিকে বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতি ও তাহাদের নীতিগত বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি-ভুক্ত বিষয়।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে সর্বপ্রকারের বৈজ্ঞানিক আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনপদ্ধতি—কোন কোন লেখক মনে করেন যে রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সাধারণ আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপযুক্ত বিষয়। রাষ্ট্রের গতি প্রকৃতিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একমাত্র বিষয়বস্তু; সুতরাং শাসনপদ্ধতি বা সরকার সংক্রান্ত কোন আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা কর্তব্য নহে। এইজন্য তাহারা Political Science ও Government অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনপদ্ধতি এই দুইটি বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্রষ্টা অ্যারিস্টটল এবং পরবর্তী যুগের দিক্‌পাল লেখকগণ যথা, মেকিয়াভেলী, হব্‌স, লক্‌, রুশো হেগেল প্রভৃতি উপরোক্ত পৃথকীকরণে বিশ্বাসী নহেন। মোটামুটিভাবে তাঁহাদের মত এই যে শাসনপদ্ধতির আলোচনা ব্যতীত রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক আলোচনা অসম্ভব। কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে শাসনব্যবস্থার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রকে বুঝিতে হইলে শাসন-পদ্ধতির পর্যালোচনা অপরিহার্য। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক আলোচনা শাসনব্যবস্থাকে পৃথক রাখিয়া চলিতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রের অংশ বই কিছুই নহে। সমগ্রকে জানিতে হইলে অংশকে জানিতেই হইবে। সুতরাং শাসনপদ্ধতির আলোচনা রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক আলো-চনার অংশীভূত করা অত্যাবশ্যক। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা। এই সূত্রে ফরাসী রাষ্ট্র-দার্শনিক

শাসনপদ্ধতি (Government) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (Political Science) অন্তর্ভুক্ত।

Paul Janet (পল্ জানে) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে সমাজবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্রের সামগ্রিক ভিত্তি ও শাসননীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বলা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি (Politics) : অ্যারিস্টটল্ রাষ্ট্রনীতি শব্দটি প্রবর্তন করেন। Political-Science বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিলে যাহা বুঝায় অ্যারিস্টটল্ সেই অর্থেই Politics বা রাষ্ট্রনীতি শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। সিজ্উইক, লর্ড এ্যাক্টন প্রভৃতি এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-রাও Politics শব্দটি Political Science এর পরিবর্তে ব্যবহার করিয়াছেন।

তাঁহারা রাষ্ট্রনীতি বা Politicsকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (ক) মতবাদ মূলক রাষ্ট্রনীতি (Theoretical Politics) ও (খ) ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি (Applied Politics)। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের মৌল বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি উৎপত্তি, আদর্শ ও নীতিগত গঠনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয় মতবাদমূলক রাষ্ট্রনীতির বা Theoretical Politics এর অংশীভূত। ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি দ্বারা তাঁহারা সরকারের গঠনপদ্ধতিই বুঝাইতে চান। যে অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা উপরোক্ত দুইটি অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছে। পলক্ রাষ্ট্রনীতি (Politics) ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—এই দুইটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান শব্দটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy) : Political Philosophy বা রাষ্ট্রদর্শন শব্দটি কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্যবহার করিয়াছেন। রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি,মানবসমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্রের আদর্শ, কর্মক্ষেত্র ও সাধারণ-ভাবে রাষ্ট্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই পারিভাষিক শব্দটির দ্বারা সুচিত হইয়া থাকে। Political Science বা রাষ্টবিজ্ঞানের প্রসার আরও বেশী। রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত রাস্ট্রগঠন সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় তাহার আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory) : রাষ্ট্রতত্ত্ব শব্দটির প্রসারতার সহিত রাষ্ট্র-দর্শনের প্রসারতার কোন তফাৎ নাই। রাষ্ট্রতত্ত্ব বা Political Theory রাষ্ট্রের কেবলমাত্র নীতিগত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করে। রাষ্ট্রের দার্শনিক বিচার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদ্ঘাটন রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্দেশ্য। সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে ইহার

সহিত শাসন-পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নাই। এইজন্য Political Philosophy and Government (রাষ্ট্রদর্শন ও শাসনপদ্ধতি) অথবা Political Theory and Government (রাষ্ট্রতত্ত্ব ও শাসনপদ্ধতি)—এই যুগ্মশব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু Political Science বলিলে রাষ্ট্রদর্শন বা রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং শাসনপদ্ধতি দুই-ই বোঝায়। এইজন্য Political Science and Government অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনব্যবস্থা যুগ্মশব্দটি বিচারগ্রাহ্য নহে। কারণ শাসনব্যবস্থার আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করা চলে?—এই আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা, অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ও গবেষণা প্রসূত জ্ঞান ভাণ্ডার।* যদি বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা চলে। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আনুমাণিক পদ্ধতি (deductive method) ও আরোহ প্রণালী (inductive method) অনুযায়ী তাহাদের চিন্তাকে রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন দিকে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহারা ঐতিহাসিক ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা দ্বারা নানা তথ্য ও আদর্শ আহরণ করিয়াছেন এবং এই সকল আদর্শ ও তথ্য সুসম্বদ্ধভাবে গ্রথিত করিয়া জ্ঞানের নূতন জগৎ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এমনি করিয়া তাহারা একটি নূতন শাস্ত্র সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাহারা এই মতাবলম্বী তাহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু অ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সামগ্রিক আলোচনাকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি, গঠন-প্রণালী, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় লন।

অ্যারিস্টট্‌ল কর্তৃক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ।

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলবিচার, তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত নীতি তিনি রাষ্ট্রের আলোচনায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়া তিনি নানা প্রকার রাষ্ট্র ও শাসনপদ্ধতির গুণাগুণ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার

* Contemporary Political Science: A Survey of Methods, Research and Teaching: UNESCO, 1950. The Conference adopted the following meaning of the term 'science': "The sum of coordinated knowledge relative to a determined subject".

রাষ্ট্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তাঁহার মূলগত নীতির সন্ধানলাভও করিয়াছিলেন। মানুষের সমাজপ্রবণতা, ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান Psychology ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানের (Social Psychology) ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সক্ষম হন।

পরবর্তীকালে মেকিয়াভেলী, বোডাঁ, হব্‌স, মঁতেস্কু, সিজউইক, ব্লুনটস্‌লি, মিল, ব্রাইস প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও এই সমাজবিজ্ঞানটি বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। অন্যপক্ষে ঐতিহাসিক মেইট্‌ল্যাণ্ড, সমাজবিজ্ঞানী কোঁৎ প্রভৃতি মনীষীগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা বলেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বীকৃত পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রযোজ্য নহে। পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে দেখা যায় যে জড় পদার্থ সর্বদা, সকল দেশে একই গুণবিশিষ্ট এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে একই ফল দেয়। কিন্তু মনুষ্য সমাজে বা রাষ্ট্রে স্থান কালভেদে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। মনুষ্য সমাজে মানুষের মন ও সমাজমন (Social Psychology) বলিয়া একটি চেতনশীল ও সদা-পরিবর্তনশীল পদার্থ আছে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। সদা-পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা এবং মননশীল সংঘবদ্ধ মানুষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এইরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছুতেই স্থায়ী বা একেবারে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক ফল দিতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একই কারণে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক বিচারও (Comparative method) সম্পূর্ণ নির্ভুল পথ নির্দেশ করিতে অক্ষম। "বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সর্বপ্রধান অস্ত্র অর্থাৎ পরীক্ষা (Experiment) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানী তাহার গবেষণাগারে ইঁদুর বা শশক লইয়া পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষন (observation) করিয়া জীববিদ্যা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র বা মনুষ্য সমাজের একাংশকে লইয়া অনুরূপ বা তুল্য পরীক্ষার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। সুতরাং রাষ্ট্র বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা অনুচিত।"

পরস্পর বিরোধী দুই মত

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের অসুবিধা

তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত নির্ভুলতার স্তরে পৌঁছাইতে পারে না

সত্যই এই সকল যুক্তির সারবত্তা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। যদি কেহ দাবী করেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পদার্থ বিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের ন্যায় এবং একই অর্থে বিজ্ঞানপদবাচ্য তাহা হইলে ভুল হইবে। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে রাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের একটা মৌলিক মিল আছে। তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি, শাসনপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার মোটামুটি সত্যতা প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল নীতি পেরিক্লস, প্লেটো অ্যারিস্টট্‌ল-এর সময় হইতে ব্রাইসের সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হইয়াছে তাহা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। একই দেশের বিভিন্ন সময়ের রাষ্ট্রিক অবস্থার তুলনা দ্বারা বা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের রাষ্ট্রের আবহাওয়া পর্যালোচনা করিয়া এবং সাধারণভাবে দীর্ঘকালব্যাপী বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করিয়া রাষ্ট্রের গঠন ও গতি সম্বন্ধে অনেক নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রগুলি আপন স্বার্থরক্ষাকল্পে কিরূপে সকল ন্যায়নীতি জলাঞ্জলি দেয় মেকিয়াভেলি তাহা অকাট্যভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। মার্কস্‌এর ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা মূলতঃ রাষ্ট্রবিবর্তনের একটি চিরন্তন সত্যের সন্ধান দিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নাই বলিলে ভুল হইবে।

উপরোক্ত যুক্তির আংশিক সারবত্তা অনস্বীকার্য

এই কারণে ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের আসন দিতেছেন বটে, তবে তিনি বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান। মার্শাল যেমন অর্থশাস্ত্রকে জোয়ার ভাটা বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন তেমনি ব্রাইস আমাদের বিজ্ঞানকে Meterology অর্থাৎ আবহাওয়া অথবা আবহ বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত নহে। কিন্তু তথাপি ইহা বিজ্ঞান সংজ্ঞার অধিকারী। পলক্ বলিতেছেন ...“there is a science of politics in the same sense on about the same extent as there is a science of morals.” অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র একটি বিজ্ঞান সেই অর্থে এবং সেই পরিমাণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও বিজ্ঞান পদবাচ্য। ব্রাইস ও পলকের এই মধ্যপন্থা দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করিতে অসুবিধা নাই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমপর্যায়ের নহে—ইহা একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অংশ বিশেষ। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইতালীর চিন্তানায়ক মেকিয়াভেলি রাজনীতি চর্চায় এ্যারিস্টটলীর প্রথা প্রবর্তনের প্রয়াস পান। ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বোডাঁও (ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) ঐ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ দার্শনিক হ্যারিংটন উল্লেখনীয় যোগ্যতার সহিত এ্যারিস্টটলীয় পন্থার পুনপ্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইটালীয় সমাজবিজ্ঞানী ভিকো ও ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক মঁতেস্কু বৈজ্ঞানিক সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তথাপি ঐ শতাব্দীর শক্তিশালী লেখক রুশোর বিপরীতমুখী অনৈতিহাসিক কাল্পনিক ও বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তাধারার প্রবল প্রভাব বশতঃ সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিজীবী সমাজে গৃহীত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্মানীতে গুস্টোভ হিউগো ও স্যাভিগ্‌নী সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রথার সূত্রপাত করেন; ইংলণ্ডে জন স্টুয়ার্ট মিল, হেনরী মেইন্‌ প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা বৈজ্ঞানিক ভাবে রাষ্ট্র ও আইনের আলোচনা শুরু করেন। ফরাসী দেশে কোঁৎ (Comte) ছিলেন এই ধারার প্রবর্তক। এমনি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আরম্ভ হইল। পরবর্তীকালে যাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার বেইন জর্জ কর্ণওয়াল লিউইস ও ব্রাইসের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন অনুসন্ধান পদ্ধতি :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অনুসন্ধান পদ্ধতিগুলি স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। (১) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observational Method); (২) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method); (৩) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method); (৪) তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method); (৫) সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি (Sociological Method) (৬) জীববিজ্ঞানভিত্তিক (Biological Method) (৭) মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Psychological Method); (৮) আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method); (৯) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical Method); (১০) সাদৃশ্যমূলক পদ্ধতি (Analogical Method); (১১) দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method) ও (১২) ব্যবহারিক পদ্ধতি (Behavioural Method)।

১। **পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি**ঃ গ্রীক্ দার্শনিক এ্যারিষ্টট্‌ল বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তক। রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি নিরপেক্ষভাবে বুঝিয়া লইয়া, তাহার রূপ নির্ণয় করা পর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতির মূল সূত্র। এ্যারিষ্টট্‌লের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে যে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই নীতির সার্থক ও ব্যাপক ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের ভিতর ব্রাইসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ব্রাইসের 'The American Commonwealth' ও 'The Modern Democracies' নামক দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ব্রাইস বলেন যে রাষ্ট্রের অন্তর্গত যে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের তথ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। নতুবা সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী ও ভ্রমাত্মক হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র পর্যবেক্ষ মূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিলে সকল ক্ষেত্রে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। ক্ষেত্রবিশেষে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সহিত অন্য একটি বা একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিতে পারে।

২। **পরীক্ষামূলক পদ্ধতি**ঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণায় পরীক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ নহে। গবেষণাগারে বার বার পরীক্ষা করিয়া পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের কোন বিষয় লইয়া, ইচ্ছামত নানা প্রক্রিয়া প্রয়োগে ফল লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রে মননশীল ও সুখ-দুঃখ-চেতনশীল মানুষকে লইয়া যথেচ্ছ পরীক্ষা চলে না। তাই জর্জ কর্ণওয়াল লিউইস বলিয়াছেন যে আমরা কোন বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক সত্য যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে মানুষকে পুতুলের মত যে কোন অবস্থায় ফেলিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারি না।* তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও কিছু পরিমাণে পরীক্ষার স্থান আছে। সকল রাষ্ট্রই নানা আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। যখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে সেই আইন বিভিন্ন ভাবে দুষ্ট, তখন তাহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করা হয়। আমাদের দেশে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রদেশগুলিতে Dyarchy বা দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা চলিয়াছিল। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ প্রয়োগ।

* "We cannot do in Politics what the experimenter does in Chemistry...We cannot take a portion of the community in our hands as the King of Brobdingnag took Gulliver, view it in different aspects and place it in different positions in order to solve social problems and satisfy our spculative curiosity."

হইয়াছিল যে দ্বৈত শাসন পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত নহে। বর্তমান ভারতে মাদক দ্রব্য নিবারণের নীতি লইয়া আজকাল পরীক্ষা চলিতেছে। সীমাবদ্ধ অঞ্চলে ইহা চালু হইয়াছে বটে কিন্তু মোটামুটি ভাবে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে এই নীতি জনসাধারণ সহজ মনে স্বীকার করিয়া লইতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণায় কিছু পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার নিরঙ্কুশ প্রয়োগ সম্ভব নহে।

৩। **ঐতিহাসিক পদ্ধতি:** অ্যারিস্টটল বিস্ময়কর যোগ্যতার সহিত ইতিহাসের ভিত্তিতে তাঁর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি গড়িয়া তোলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন গ্রীসের সমগ্র ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন। তাহা ছাড়া অ্যারিস্টট্ল রাষ্ট্রের গঠন পদ্ধতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রীসের ও তাঁহার সমসাময়িক ১৫০টির বেশি শাসনপদ্ধতি আলোচনা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বা সামগ্রিক ঘটনার সারবস্তু। তাঁহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা হইতেছে "an effort to codify the results of experience in the history of states."। অতীতে ও বর্তমানে রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি ও কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া রাষ্ট্রের স্বরূপ, উদ্দেশ্য, গঠনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্রকে বুঝিতে হইলে তাহার অতীত কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অপরিহার্য। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের গবেষণার ঐতিহাসিক পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের ফলেই অ্যারিস্টট্ল রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামক নূতন বিষয়ের ভিত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় ভিকো, মঁতেসকু্য, স্যাভিগনী, গিয়ার্কে, হেনরী মেইন, ব্রাইস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন।

৪। **তুলনামূলক পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিটিও অ্যারিস্টট্ল অসাধারণ যোগ্যতার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিভিন্ন শাসনপদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিবার জন্য তিনি বিভিন্ন যুগে উদ্ভূত নানা প্রকারের রাষ্ট্রিক শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন। বর্তমান যুগে মঁতেসকু্য, তোকেভিল, ব্রাইস প্রভৃতি দিকপালেরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনামূলক রীতি পারদর্শিতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রাইস গণতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিরাট গ্রন্থে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির গুণাগুণ সমালোচনা করিয়াছেন।

৫। **সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি :** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে সমাজ দেহের অংশবিশেষ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী, রাষ্ট্র ব্যতীত বৃহত্তর সমাজে যে সকল পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক সক্রিয় রহিয়াছে, সেইগুলির দ্বারা রাষ্ট্র কিভাবে এবং কি পরিমাণে প্রভাবিত হইতেছে তাহা পরিমাপ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহার ফল সুদূর প্রসারী। অর্থনীতি, সমাজ গঠন, জাতিভেদ, শ্রেণীবৈষম্য, দেশের আচার-সংস্কার, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতিকে লইয়া সামগ্রিক সামাজিক পটভূমি এই পদ্ধতি অনুযায়ী আলোচনার পবিধির মধ্যে আসিয়া পড়ে। কার্ল মার্কস সমাজ বিজ্ঞানেব ব্যাপক পটভূমিকায় রাষ্ট্রকে বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কোঁৎ ও হারবার্ট স্পেনসারও রাষ্ট্রকে কিছু পরিমাণে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিয়াছেন। ইহারা মনে করেন যে রাষ্ট্রকে সমাজ হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা করিলে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়।

৬। **জীববিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতি :** জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি বাস্তববাদী অনুসন্ধান পদ্ধতি। জীব হিসাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের বাস্তব অভাব অভিযোগ, তাহাদের জৈবিক চাহিদা, বংশবৃদ্ধিব গতি প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রের গতি ও প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। জার্মান দার্শনিক হায়কেল্ (Haeckel) ডারউইনের জীববিজ্ঞানের সূত্র 'Survival of the Fittest' সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

জীবজগতে বাঁচিয়া থাকিবাব জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। জীবন রক্ষার দিক হইতে যে জীব সর্বাপেক্ষা পটু সে বাঁচিয়া থাকে। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রে বাষ্ট্রে সংগ্রাম অতি স্বাভাবিক ব্যাপার; জীবজগতের নিয়মেরই অনুরূপ এই সংগ্রাম। যে রাষ্ট্র এই সংগ্রামে জয়ী হয় একমাত্র তাহারই বাঁচিবার অধিকার আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নীটশে, বার্ণহার্ডি ও ট্রাইট্‌সকে ডারউইনের সূত্রটি উপরোক্ত ভাবে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়াছেন। খাদ্যের চাহিদা, বংশ বৃদ্ধির হার প্রভৃতি রাষ্ট্রের গঠন ও শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জীববিজ্ঞানের বিচার পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। হার্বার্ট স্পেন্সার, শায়েফল্ ও ব্লুনট্‌স্‌লি জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের ব্যাপক তুলনা করিয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

৭। **মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি :** মনোবিজ্ঞান ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে বুঝিবার পক্ষে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত মানষিক প্রবণতা, সমাজের সমষ্টিগত মানস বা গণমানস বিপুলভাবে রাষ্ট্রকে প্রভাবিত

করে। এই দিক হইতে আধুনিক কালে অনেক সমাজ-মনোবিজ্ঞানী রাষ্ট্রকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি, নির্বাচনী দ্বন্দ্ব, জনমত গঠনের ধারা বুঝিতে হইলে মনোবিজ্ঞান বিশেষতঃ সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা social psychology-র আশ্রয় লইতে হয়। ম্যাকডুগ্যাল, লে বঁ প্রভৃতি মনীষী-গণ রাষ্ট্রের স্বভাব বুঝিবার জন্য সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াছেন।

৮। **আইন মূলক বা বিশ্লেষণ মূলক (analytical) পদ্ধতি:** এই পদ্ধতি অনুযায়ী চিন্তা নায়কেরা রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র আইনগত প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। ইংরেজ আইন দার্শনিক অষ্টিন এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া রাষ্ট্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সত্য বটে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে তার সংগঠিত সত্তা লাভ করে, কিন্তু যে মনুষ্যসমাজে রাষ্ট্রের অবস্থান, তাহার গতিপ্রকৃতিকে, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলে সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে আইনগত পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি অভাব পূরণ করিয়াছে। রাষ্ট্র যে প্রধানতঃ আইনের মাধ্যমে সক্রিয় হয় ও নাগরিকদের শাসন করে, এই আবশ্যকীয় তত্ত্বটি এই পদ্ধতি প্রয়োগে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

৯। **পরি সংখ্যানমূলক পদ্ধতি:** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আধুনিক কালে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ দেখা দিয়াছে। ইহার দ্বারা রাষ্ট্রতত্ত্বের বিষয়বস্তু নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে এবং বিশদ হইয়া উঠে। অধ্যাপক ল্যাস্কি পার্লামেণ্টের সদস্যগণ ও মন্ত্রীমণ্ডলীর ব্যক্তিগণ কোন শ্রেণীভুক্ত, তাহা পরিসংখ্যান দ্বারা নির্ণয় করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শ্রেণীগত রূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে কোন দেশে পার্লামেণ্টের বা মন্ত্রিসভার শ্রেণীগত গঠনের সঙ্গে আইন ও শাসনপদ্ধতির যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই পদ্ধতির প্রয়োগও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ।

১০। **সাদৃশ্যগত পদ্ধতি:** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন কাল হইতে দার্শনিকেরা সাদৃশ্যগত যুক্তির অবতারণা করিয়া বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্লেটো সক্রেটিসকে অনুকরণ করিয়া Statesman বা রাষ্ট্রপরিচালককে নাবিক, পশুপালক ও চিকিৎসকের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে নাবিক, পশুপালক ও চিকিৎসক যেমন যথাক্রমে জাহাজের, পালিত পশুর ও রোগীর সেবা করে তেমনি

শাসকেরও কর্তব্য নাগরিক সাধারণের সেবা করা। স্ত্রী-পুরুষের সাম্যস্থাপনের ক্ষেত্রেও প্লেটো প্রাণী-জগতের সহিত মনুষ্যসমাজের সাদৃশ্য দেখাইয়া যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে স্ত্রী ও পুরুষ কুকুর যেমন একইভাবে প্রভুর গৃহ পাহারা দেয়, ঠিক সেইরূপ নারীরাও পুরুষদের মত রাষ্ট্র রক্ষার কার্যে লিপ্ত থাকিতে পারে, ইহা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। হার্বার্ট স্পেন্সার শায়েফ্ল্ ও ব্লুনটস্লি রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহের সাদৃশ্য স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

দুই দেশের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় মনে করা হয় যে একদেশে যে শাসনপদ্ধতি সাফল্যলাভ করিয়াছে, অন্যদেশেও তাহা জয়যুক্ত হইবে। কিন্তু অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। কারণ কিছুটা সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মৌলিক বৈষম্য থাকিতে পারে। স্বীকার করিতে হইবে যে কেবলমাত্র সাদৃশ্যগত যুক্তিবলে কোন তত্ত্বের সারবত্তা গ্রহণ করা চলে না।

এই পদ্ধতিটি রাষ্ট্রের তত্ত্বগুলি বুঝিতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রমাণ হিসাবে সাদৃশ্যগত যুক্তি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা বিজ্ঞানসম্মত নহে।

১১। দার্শনিক পদ্ধতি ঃ দার্শনিক সাধারণতঃ কোন একটি বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) ধারণা বা স্বতঃসিদ্ধকে স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। এই ধারণা বা স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র-চিন্তার ইমারত উঠিতে থাকে। প্লেটো, টমাস মোর, হব্স্, রুশো, হেগেল প্রভৃতি এই দার্শনিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। মানুষের বাস্তব জীবনের সহিত ও রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সহিত এই পদ্ধতির যোগ গভীর নহে বলিয়া দার্শনিক পদ্ধতি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আশানুরূপভাবে সহায়ক হইতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই পদ্ধতিরও যে যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে তাহাও স্বীকার করা কর্তব্য।

১২। ব্যবহারিক পদ্ধতি (Behavioural Method) : চার্লস্ মেরিয়াম, হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল প্রভৃতি আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই পদ্ধতির প্রবর্তক। তাহারা মনে করেন যে কোন রাষ্ট্রকে বুঝিতে হইলে, সেই রাষ্ট্রের অন্তর্গত নাগরিকগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যথা ভোটদাতা হিসাবে, রাজনৈতিক দল হিসাবে, পার্লামেন্টে, মন্ত্রীপরিষদে ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছেন তাহা ঠিকভাবে জানিতে হইবে। ব্যবহারবাদীগণ বলেন জন-ব্যবহারের পিছনে কি মনোভাব ও কি সামাজিক অবস্থা সক্রিয় আছে তাহার উপযুক্ত পরিমাপ করিতে হইবে। অর্থাৎ নাগরিকগণের ব্যবহারেই রাষ্ট্রের সত্যকার পরিচয় পাওয়া

যায়। ব্যবহারিক পদ্ধতির সমর্থকেরা মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান ব্যতীত সংখ্যাতত্ত্বেরও ব্যবহার করিয়া থাকেন। আধুনিককালে এই পদ্ধতি পাশ্চাত্য জগতে ব্যাপকতালাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্বন্ধে মন্তব্য

যে সকল পদ্ধতি আলোচিত হইল তাহার সবগুলিকে হয় আনুমানিক (Deductive) পদ্ধতি অথবা আরোহমূলক (Inductive) পদ্ধতির আওতায় আনা যাইতে পারে। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টট্‌ল এই উভয় পদ্ধতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনানুযায়ী দুইএর একটি, অথবা দুইটি পদ্ধতিই একযোগে ব্যবহার করিয়াছেন। তাই এ্যারিস্টট্‌লের সিদ্ধান্তগুলি বিজ্ঞানসম্মত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পদ্ধতির প্রয়োগ যতই সুষ্ঠু হউক না কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন শাস্ত্রের নির্ভুলতা লাভ করার আশা সুদূর পরাহত। কারণ রাষ্ট্রবিভাগের বিষয়বস্তু জড়পদার্থ নহে; সদা পরিবর্তনশীল, চেতনশীল এবং বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগ বিশিষ্ট মানব সমষ্টি লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার।

যে সকল পদ্ধতি আলোচিত হইল তাহার কোনটিই সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি প্রযুক্ত হইয়াছে। দেশ কাল ভেদে এবং আলোচ্য বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের তারতম্য এবং অবস্থানুযায়ী পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উপায়

তবে স্বীকার করিতে বাধা নাই যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি তুলনামূলক পদ্ধতি, সমাজ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি, বিজ্ঞানসম্মত কার্যকারিতার দিক হইতে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ফলপ্রদ। মানবকল্যাণ ধর্মী রাষ্ট্রদর্শনের দিক হইতে দার্শনিক পদ্ধতির মূল্য কম নহে। উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির যুগপৎ প্রয়োগই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সত্যে উপনীত হইবার প্রকৃষ্ট উপায়। সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহার করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক-দেশদর্শিতা বা পদ্ধতিপ্রয়োগ সম্বন্ধে অন্ধতা বা গোঁড়ামি সর্বথা পরিত্যাজ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয়ের মধ্য দিয়া এই বিজ্ঞানটির প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠে। প্রথমতঃ প্রায়ই দেখা যায় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি রাজনৈতিক অবস্থা হইতে উদ্ভব লাভ করে। রুশোর রাষ্ট্রচিন্তা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের স্বৈরাচারী সমাজ ও

রাজতন্ত্রের প্রতিফলন। মার্কসের রাষ্ট্রবাদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিল্প পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ প্রতিফলিত হইয়াছে। গান্ধীজির অসহযোগ নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। এই সব উদাহরণে ইতিহাসই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক।

আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রগুলি কার্যকরী রাজনীতি ও শাসনপদ্ধতিকে প্রভাবিত করিতেছে। রুশোর সাম্যের আদর্শ, তাহার গণ-সার্বভৌমত্বের নীতি ফরাসী বিপ্লব ও বিপ্লবী শাসন প্রণালীকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যশাসনতন্ত্রগুলির উপর মঁতেসক্যুর রাষ্ট্রক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির যে প্রভাব বিরাট তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি অনেক সময় রাষ্ট্রসংস্কারের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হয়। প্লেটো তাহার Republic ও Laws নামক পুস্তকদ্বয়ে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই আদর্শ বিভিন্ন কালে গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার আশা ছিল যে আদর্শগুলি গৃহীত হইলে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন উন্নততর হইবে। অ্যারিস্টট্‌লও তাঁহার Politics নামক পুস্তকে আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারও অনুরূপ ইচ্ছা ছিল। মার্কসের কমিউনিজম বা সাম্যবাদী সমাজের আদর্শও মানব সমাজ পুনর্গঠনের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ মানবিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারের কোন বিশেষ ইচ্ছা নাই। তিনি শাসনতন্ত্র বা রাষ্ট্রকে বুদ্ধি প্রয়োগে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। তিনি বিশ্লেষণ করিতেছেন নিরপেক্ষ ভাবে। সক্রিয় রাজনীতি হইতে দূরত্ব রক্ষা করিয়া তিনি কেবল বুদ্ধির জগতে বিরাজ করিতেছেন। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে পলিবিয়াস্ রোমের প্রজাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু এইরূপ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি সচরাচর দেখা যায় না। অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আপন নীতির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করিতে উৎসুক।

পঞ্চমতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মালমশলা নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ঐ আলোচনা হইতে আর এইটুকু প্রমাণ হয় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিশাল। সমাজবিজ্ঞান

ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসিয়া পড়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পুস্তকাবলী, বিভিন্ন দেশের ও যুগের শাসনতন্ত্র, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বক্তৃতা, সরকারী দলিল, অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পুস্তকাদি, এমন কি সংবাদপত্র, সাহিত্য ও চিত্রকলার মধ্যেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাহার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পাইতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীয় আলোচনা ক্ষেত্র কেবলমাত্র মানুষের সামগ্রিক কর্ম্মধারা দ্বারাই সীমিত। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিস্তৃত হইয়াছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র তাহার মঙ্গলহস্ত প্রসারিত করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় একটি মানবহিতৈষী বিজ্ঞানরূপে আমাদের সম্মান দাবী করিতেছে।

রাষ্ট্রনীতির শ্রেণীবিভাগ : রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মনোভাব অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) এক শ্রেণীর রাষ্ট্রতত্ত্ব রহিয়াছে যাহার উদ্দেশ্য সমসাময়িক রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করা। ইহাকে রক্ষণশীল রাষ্ট্রনীতি বা conservative political thought বলা যায়। এডমাণ্ড বার্ক তাঁহার Reflection on the Revolution in France পুস্তকে বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করিয়া রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ তাঁহার Divine Right নামক পুস্তকে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে দায়িত্বহীন রাজতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার ফলেই স্থাপিত হইয়াছে। (২) আবার এক শ্রেণীর রাষ্ট্রনীতি সমসাময়িক সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে। ইহাকে critical political thought বা সমালোচনামূলক রাষ্ট্রনীতি বলা যায়। ভারতবর্ষের কংগ্রেস ১৯১৮ সালের পূর্বে যে রাষ্ট্রনীতির প্রচারক ছিল, তাহা critical political thought-এর পর্যায়ভুক্ত। (৩) মন্তেঁসকু্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাজতন্ত্রের সংস্কার কামনা করিয়াছিলেন। সমালোচনাপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাহারা তীব্র সমালোচনা করেন ও ব্যাপক পরিবর্তন কামনা করেন তাহাদের Radical বা আমূল সংস্কারক বলা হয়। মঁতেসকু্য এই শ্রেণীর সংস্কারক ছিলেন। (৪) এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রনীতির মারফৎ বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া থাকেন। রুশো এই শ্রেণীর লেখক ছিলেন। তাঁহার রাষ্ট্রদর্শন ফরাসী বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। মার্কসের রাষ্ট্রনীতিও বিপ্লববাদের রাষ্ট্রনীতি। তিনি যে শুধু রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লব চাহিয়াছিলেন তাহা নহে, নূতন সভ্যতা ও সমাজ গঠনই ছিল

তাঁহার মৌলিক রাষ্ট্র আদর্শ। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রচিন্তাকে বিপ্লবী অর্থাৎ revolutionary political thought আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। (৫) আবার আরও এক শ্রেণীর রাষ্ট্রচিন্তা একেবারেই পুরাতনপন্থী। তাহারা সমসাময়িক অবস্থা রক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন। তাহারা রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী। ফ্রান্সে আজিও পুরাতন যুগের রাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রচিন্তার অস্তিত্ব রহিয়াছে, যদিও ফরাসী দেশে প্রায় একশত বৎসরকাল গণতন্ত্র অব্যাহত ভাবে বিরাজ করিতেছে। এই প্রকারের চিন্তাকে কেহ কেহ reactionary political thought অথবা প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র চিন্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (৬) এক শ্রেণীর রাষ্ট্র চিন্তা ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবিক অধিকার ও স্বাধীন নির্ব্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। এইরূপ রাষ্ট্র চিন্তা Liberalism অথবা Liberal Political Thought অর্থাৎ উদারপন্থী রাষ্ট্রচিন্তা নামে পরিচিত। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, ব্রাইস প্রভৃতি রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ এই শ্রেণীভুক্ত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপকারিতা: (১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও শাসনপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক আলোচনাসম্পুট সমাজবিজ্ঞান। আজ রাষ্ট্র মানুষের জীবনে প্রায় সর্ব্বব্যাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; নাগরিকের শারীরিক মানসিক, আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে, শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশে নয়, প্রায় সমস্ত প্রাগ্রসর দেশেই রাষ্ট্র আজ মানুষের সহায়ক ও বন্ধু। এই কারণে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ আলোচনার অশেষ মূল্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও শাসক সম্প্রদায়কে নির্ভুল পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। গণতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি ও রীতিনীতি সম্বন্ধে যাহারা অভিজ্ঞ তাহারাই গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মঙ্গলপথে পরিচালিত করিতে পারে। (২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমাদের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত নীতি বুঝিতে সহায়ক হয়। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের নীতি (Theory of Limited Monarchy) সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেই ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের ধারা স্পষ্ট হইয়া উঠে। (৩) ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন আমাদিগকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তানায়কগণের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া দেয়। ইহারও সাংস্কৃতিক মূল্য কম নহে।

অতিরিক্ত পাঠ্য

CATLIN : The Science and Method of politics—Chs, I—III
POLLOCK : Introduction to the History of the Science of Politics—Ch. I
SEELEY : Introduction to political Science Lectures I & 2
SIDGWICK : Elements of Politics—Ch. I.

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান

(Political Science and other Sciences)

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত কোন কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবীয় বিজ্ঞানের গভীর সংযোগ রহিয়াছে। এই সূত্রে জীববিদ্যা, ভূগোল, নৃতত্ব, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ইতিহাস ও অর্থনীতির উল্লেখ করা আবশ্যক। রাষ্ট্র হইতেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। রাষ্ট্র একটি জনসমষ্টি। এইজন্য মানুষ সম্পর্কে যত বিজ্ঞান রহিয়াছে সকলগুলির সঙ্গেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিকট। প্রতি রাষ্ট্রের পৃথিবীতে একটা স্থায়ী অবস্থান রহিয়াছে। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থিতি, অধ্যুষিত ভূমিভাগের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে। এই কারণেই ভূগোলের সহিত রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাষ্ট্রের উপজীব্য জনসমষ্টি তাই মানুষের মনের গতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসিয়া পড়ে। এইখানেই মনোবিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যোগ স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া, ধনোপার্জন ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ন্যায় মানবীয় শাস্ত্র তাই অর্থনীতির সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। মানুষের সমাজেতে নৈতিক আকৃতি রহিয়াছে তাহাও রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারে না। তাই নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে। নৃতত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মানুষ ও মনুষ্য সমাজের বিবর্তন। এই সূত্রে এই দুইটি বিজ্ঞানের সহিতও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। যেহেতু মানুষ জীবদেহী সেই হেতু জীববিদ্যার সহিতও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংযোগ গভীর।]

মানব সমাজের জ্ঞানান্বেষণের ফলে প্রাকৃতিক ও মানবিক জগত সম্বন্ধে মানুষ নানা তথ্যের অধিকারী হইয়াছে। এই সকল তথ্য সুসম্বদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত ভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানে স্থান পাইয়াছে। একদিকে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যদিকে জীবজগৎ মানবদেহ, মন ও মানব সমাজ সম্বন্ধে নানা জ্ঞান আহরণ করিয়া নানা বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছে। তদনুযায়ী বিজ্ঞান সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: যথা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবীয় বিজ্ঞান। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। জীববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবীয় বিজ্ঞান।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবীয় বিজ্ঞান

ফরাসী মনীষী পল্ জানে (Paul Janet), জার্মান দার্শনিক জেলিনেক্ ও ইংরেজ লেখক সিজউইক্ বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষ একটি অঙ্গ। কারণ এই আলোচনার দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রসার ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও ভূবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। অন্যদিকে যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীয় বিজ্ঞান সেই হেতু অন্যান্য সমস্ত মানবীয় বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি নিকট।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপকারিতা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জীববিদ্যা (Political Science and Biology) **:** হার্বার্ট স্পেনসার, ব্লুন্টস্লি, নীট্শে, ট্রাইট্শকে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জীববিদ্যার কতকগুলি সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। হারবার্ট স্পেন্সার ও ব্লুন্টস্লি রাষ্ট্রকে Organism বা জীবদেহের সহিত ব্যাপক তুলনা করিয়াছেন। নীট্শে, ট্রাইট্শকে ও বার্ণহার্ডি জীববিদ্যার Survival of the Fittest নীতি আন্তঃরাষ্ট্র সম্বন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন যে জীবজগতে যেমন জীবনরক্ষার অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলিতেছে এবং জীবনরক্ষায় পটু জীব বাঁচিয়া থাকে, অন্যেরা বিলুপ্ত হয়; তেমনি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংগ্রামও স্বাভাবিক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র জয়যুক্ত হইবে, অন্যেরা পর্যুদস্ত হইবে ইহাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায্য। আধুনিক কালে জেঙ্কস্, মরগ্যান্ প্রভৃতি লেখকগণ ডারউইনের বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন যে মানুষ যেমন বিজ্ঞানের অধীন, রাষ্ট্রও তেমনি। মানুষের মত রাষ্ট্রও বিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান জীববিদ্যার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জীববিদ্যার বিভিন্ন নীতির প্রয়োগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল (Political Science and Geography) **:** অ্যারিস্টট্ল, বোডাঁ, মঁতেসক্যু, বাক্‌ল্ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের প্রকৃতির ভৌগোলিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কার্যাবলী অনেকাংশে তাহার ভৌগোলিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। আয়তন, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদ, রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণের চরিত্রও অনেকটা তাহার ভৌগোলিক অবস্থানের উপর

নির্ভরশীল। মন্তেসকু অ্যারিস্টটলের নীতি অবলম্বন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সত্যতা মোটামুটি স্বীকার করা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে শীতপ্রধান দেশে মানুষ কর্মঠ ও উদ্যমশীল হয়, গরমের দেশে মানুষ হয় অলসতাপ্রবণ। ইহার ফলে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশগুলি অনেক সময় স্বাধীনতা হারায় ও সেখানে নানাশ্রেণীর পরবশতার উদ্ভব হয়। অন্য পক্ষে শীতের দেশের মানুষ তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হয় এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার-গুলিও স্বীকৃত হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন সমতলভূমিতে অবস্থিত রাষ্ট্র সহজেই পরাধীন হইয়া পড়ে; কারণ সমতলভূমিতে দেশরক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ; কিন্তু পার্বত্য দেশে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার প্রাকৃতিক সুবিধা বেশী থাকায় পার্বত্য দেশের অধিবাসীরা আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে। পার্বত্য দেশের অধিবাসীদের শক্তি ও সামর্থ্যও সমতলভূমিবাসীদের চেয়ে বেশী। ইহাও তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সহায়ক হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি

আলোচ্য ভৌগোলিক নীতির মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু এই নীতির সমর্থকেরা যে দাবী করেন তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। একমাত্র ভৌগোলিক পরিস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় এরূপ ধারণা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট।

এই নীতির সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব (Political Science and Anthropology): যে সকল বিষয় নৃতত্ত্বের বিষয়ীভূত তাহার মধ্যে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক বিবর্তন, গোষ্ঠীগত বিভাগ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক সম্বন্ধ নির্ণয়, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিমূলক বিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাল মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষের আদিম সংস্কার ও প্রথা, আদিম সমাজের গঠন প্রণালী, পুরাতন যুগের বিধিনিষেধ প্রভৃতি হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়াছে। এডওয়ার্ড জেঙ্কস, মরগ্যান ও ম্যাক্লেনান্ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নৃতত্ত্ব হইতে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি-প্রকৃতির উপর আলোকপাত করিয়াছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক নীতি দুইটি নৃতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরস্পর সংযোগের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। স্যাভিগনী হেনরী মেইন প্রভৃতি মনিষীগণ আইনের ইতিহাস আলোচনাকালে আদিম ও প্রাচীন যুগের বিধিনিষেধের ব্যাপক সাহায্য লইয়াছেন।

নূতন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology): ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রধানতঃ ডারউইনের জীববৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরবর্তীকালে বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানের আলোকে রাষ্ট্রকে বুঝিবার প্রয়াস লোকপ্রিয়তালাভ করিয়াছে। ব্রাইস বলিতেছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল মনোবিজ্ঞানের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (Instinct) ও চিত্তাবেগ (Emotion) মানসিক গঠন ও ইচ্ছাশক্তি (Volition) রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব গণতন্ত্রে বিরাট আকার ধারণ করে। ফরাসী মনোবিজ্ঞানী লে বঁ বলেন যে রাষ্ট্রের ধরণ অনেকাংশে জাতির "mental constitution" বা মানসিক গঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দিতে হইলে সেটিকে জনসাধারণের মানসিক গতির সহিত মিল রাখিয়া চলিতে হইবে। রেনাঁ প্রভৃতি রাষ্ট্র-তাত্ত্বিকেরা স্বীকার করিয়াছেন যে জাতীয়তা (Nationality) অনেক পরিমাণে দেশের জনসাধারণের মানসিক একাত্মতার উপর নির্ভর করে। তেমনি রাজনৈতিক দলগুলি জনমত গঠন করিবার ক্ষেত্রে নাগরিকগণের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী নিজ নিজ নীতি-পদ্ধতি স্থির করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনোবিজ্ঞান তথা সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ইংরেজ লেখক বার্কার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী পদ্ধতি প্রয়োগের কয়েকটি অপূর্ণতার উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিতও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন সত্যসন্ধানের জন্য আবশ্যক। যে সকল মনীষী মনোবিজ্ঞানের আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ম্যাক-ডুগ্যাল, গ্রেহেম ওয়ালাস, ট্রটার, লে বঁ, তার্দে প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রের ধরণ-ধারণ সমাজমন-গত

উপরোক্ত নীতির সীমাবদ্ধতা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Political Science and Ethics): প্লেটো রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। সমাজে আদর্শ-নীতির সাফল্যের জন্য তিনি রাষ্ট্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে Ethics বা নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া

একটি স্বাধীন সত্তা দান করেন।* এইজন্য তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে যথাক্রমে Politics এবং Nichomachean Ethics নামক দুইখানি বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যদিও অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন তথাপি তিনি মনে করিতেন যে একের সহিত অন্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তিনি বলেন যে রাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে, কি পরিমাণে রাষ্ট্র সংঘবদ্ধ নাগরিক জীবনের নৈতিক ও সামগ্রিক উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাই যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন হয়। ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড এ্যাকটনও বলেন: "The great question is to discover not what governments prescribe but what they ought to prescribe." সরকারের নৈতিক কর্তব্যাকর্তব্যের প্রশ্ন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক বটে, কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশেষ কোন রাষ্ট্র প্রশংসার যোগ্য কি নিন্দার যোগ্য—এই প্রশ্নের উত্তর অনেকাংশে তাহার নৈতিক মানের উপর নির্ভর করে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মধ্যযুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্যই স্বীকৃত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইটালীর দার্শনিক মেকিয়াভেলি তাঁহার Prince নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে যে রাজনৈতিক মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন তাহার দুইটি দিক আছে। (১) প্রথমত: তিনি অ্যারিস্টটলের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে নীতিশাস্ত্রকে পৃথক করেন। (২) দ্বিতীয়ত: তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্রের কোনই সম্পর্ক নাই। এই দ্বিতীয় বক্তব্যটি অ্যারিস্টটলের মতবিরোধী। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক বোঁদ্যা (Bodin) মেকিয়াভেলির মত খণ্ডন করিয়া অ্যারিস্টটলের পন্থা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে যদিও এই দুইটি শাস্ত্র পৃথক তথাপি রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বসময়ে উচ্চতম নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য।

উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা অথচ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

মানুষের ও মনুষ্যসমাজের মন বা অন্তরের উৎকর্ষসাধননীতি ও সমাজের প্রতি উপচিকীর্ষামূলক নীতি নীতিশাস্ত্রের উপজীব্য। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান

* "Aristotle struck out a new and altogether different path. In the first place, he made the capital advance of separating Ethics from Politics."

Sir Frederick Pollock—"An Introduction to the History of the Science of Politics."—পৃ: ১৫।

মানুষের বাহ্যিক আচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট; অন্তরের ভালো-মন্দ লইয়া রাষ্ট্র বিজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করে না। সেইজন্য নীতি-শাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন ধরণের সমাজবিজ্ঞান। কিন্তু এই হেতুর উপর নির্ভর করিয়া যদি বলা হয় যে দুইটি একেবারে সম্পর্কহীন তাহা হইলে ভুল হইবে। জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নতিবিধান, তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রবণতার সামঞ্জস্যময় পূর্ণ বিকাশসাধন রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যলাভ করিতে হইলে দুর্নীতি কোনক্রমেই রাষ্ট্রের সহায়ক হইতে পারে না। তাই রাষ্ট্রকে সর্বদা নৈতিক মানের কথা ভাবিতে হইবে এবং যথাসম্ভব উচ্চ নৈতিক-আদর্শে যাহাতে সমগ্র সমাজ পৌঁছাইতে পারে, সেই দিকে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নহে, পরোক্ষভাবে। এই উদ্দেশ্যলাভের জন্য রাষ্ট্র বাহ্যিক আইন-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে জনগণের নৈতিক উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। রাষ্ট্র নীতিশিক্ষার বিদ্যালয় নহে। তথাপি নৈতিক উন্নতির পথে রাষ্ট্রকে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়; রাষ্ট্র কেবলমাত্র অর্থহীন শাসনযন্ত্রে পরিণত হয়।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সংঘবদ্ধ মানুষের বাহ্যিক আচরণ, নীতি অন্তরের সামগ্রী

সন্নীতি রাষ্ট্রের কর্তব্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র—(Political Science and Economics): অ্যারিস্টটল অর্থশাস্ত্রকে Politics বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কি উপায়ে নাগরিকগণ ও রাষ্ট্র ধনোৎপাদন করিতে পারে তাহা তিনি তাঁহার রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রন্থে (Politics) আলোচনা করিয়াছেন। আঠার শতকে ফ্রান্সে ফিজিওক্র্যাটস (Physiocrats) নামক একটি দার্শনিক দলের উদ্ভব হয়; তাঁহারা অর্থশাস্ত্রকে "a branch of statesmanship" বা রাজনীতির একটি শাখা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পুরাতনপন্থী অর্থনীতিবেত্তাগণ এইজন্য Political Economy শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অ্যাডাম স্মিথকে আধুনিক অর্থনীতির স্রষ্টা বলিয়া অনেকে মনে করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থ "The Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"-এ বলেন যে অর্থশাস্ত্রের লক্ষ্য দুইটি: "to enrich the people and the sovereign" অর্থাৎ জনসাধারণকে ও রাষ্ট্রকে অর্থশালী করিয়া তুলিবার উপায় আলোচনা অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নূতনভাবে অর্থনীতির আলোচনা আরম্ভ হয় এবং Political Economy শব্দটির পরিবর্তে Economics শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। আধুনিককালে অর্থশাস্ত্রকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কারণ একের কাজ মানুষের আইনানুযায়ী সংঘবদ্ধ জীবনের আলোচনা, অন্যের বিষয়বস্তু সামাজিক মানুষের আর্থিক প্রচেষ্টার বিশ্লেষণ। দুই বিজ্ঞানই আজকাল বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। তাহাদের গতি প্রকৃতি একই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিলে কোনটির সুবিচার করা সম্ভব নয়। আলোচনার ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে বলিয়াই প্রধানতঃ এই দুইটি বিজ্ঞান কালক্রমে পৃথক হইয়া গিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির বিষয়বস্তু

যদিও এই দুইটি শাস্ত্র পৃথক, তথাপি এই দুইটি শাস্ত্রের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট। একটিকে অন্যের পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সর্বপ্রকার আর্থিক প্রচেষ্টা আধুনিক যুগে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কৃষি ও শিল্প, ব্যাঙ্ক, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (communication), কর-প্রথা ও বৈদেশিক বাণিজ্য, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও কাঁচামাল সরবরাহ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ, জনকল্যাণে অর্থের বিনিয়োগ প্রভৃতি সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ভারতের ন্যায় যে সকল দেশে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের আর্থিক উন্নতি প্রচেষ্টা চলিতেছে, সে সকল দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী না হইয়া পারে না। আধুনিক যুগে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় ধনতান্ত্রিক দেশেও দেশের অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রের প্রভাব বিরাট আকারে দেখা গিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে (রাশিয়া, চীন প্রভৃতি) জাতীয় অর্থনীতি রাষ্ট্রের একটি বিভাগ বই কিছু নহে। অন্যপক্ষে রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি অনেক পরিমাণে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

দুইটি পৃথক বিজ্ঞান কিন্তু একটি অন্যটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত—রাষ্ট্রের উপর অর্থনীতির প্রভাব

ল্যাস্কি* প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মার্কস্‌কে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে আর্থিক ক্ষেত্রে যাহারা শীর্ষস্থানীয়, তাহারাই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। ইহা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক

* "The state, as it operates, does not deliberately seek general justice, or general utility, but the interest in the largest sense, of the dominant class

নীতি, নাগরিকের জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা, তাহাদের অধিকার, রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি প্রায় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র একে অন্যের পরিপূরক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (Political Science and Sociology): সমাজবিজ্ঞান কেবল যে বর্তমান যুগের সমাজের বিশ্লেষণ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে তাহা নহে। আদিম ও প্রাচীনযুগের সমাজ এবং আধুনিক কালের যে সকল সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে সভ্যতার আলোকে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই তাহাদেরও সামাজিক ইতিহাস, রীতিনীতি গঠন পদ্ধতি প্রভৃতিও বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা সমাজবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। ফরাসী দার্শনিক পল জানে (Janet) বলেন যে সমাজ বিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে।* রাষ্ট্রের সত্যকার রূপ ও গতি প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে হইলে সমাজবিজ্ঞানের বিরাট পটভূমিতে রাষ্ট্রকে বুঝিতে হইবে। সমাজবিজ্ঞানী মার্কস্ বিভিন্ন যুগের ও দেশের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীগত প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মত এই যে অর্থ-নৈতিক সম্পদে শক্তিশালী শ্রেণী বিভিন্ন যুগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়াছে।

জেঙ্কস্, মরগ্যান, ম্যাকলেনান, গিডিংস, ওয়ার্ড প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের বিবর্তন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক নীতি দুইটি সম্পর্কে ইহাদের অবদান রাষ্ট্রের ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করিয়াছে।

in society".

' "Any social system reveals itself as a struggle for the control of economic power, since those who possess this power are able in the measure of their possession, to make their wants effective.. ..."

......"That privilege usually goes with the possession of property and that exclusion from property will be exclusion from privilege."

*"Political Science is that part of social science which treats of the foundation of the State, and the principles of Government."

রাষ্ট্র বিরাট সমাজদেহের অংশবিশেষ। সুতরাং ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু রাষ্ট্র মানুষের জীবনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা অপরিহার্য। দীর্ঘকালব্যাপী এই আলোচনার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করিয়াছে এবং বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ জীবনের উপর রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার প্রভাব সুদূর প্রসারী। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানিকে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ক্ষেত্রে স্বাধীন স্থান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

রাষ্ট্র সমাজের অংশ, সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই হিসাবে সমাজ-বিজ্ঞানের অংশীভূত

তথাপি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের স্বাধীন সত্তা অনস্বীকার্য

৯০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস : (Political Science and History) : মানব সমাজের যুগযুগান্তের কথা ও কাহিনী ইতিহাসে বিধৃত রহিয়াছে। এই ইতিহাসই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদানগুলির মূল উৎস। তাই ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংযোগ অতি গভীর। অধ্যাপক সীলী (Seeley)* রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতেই এই দুইটি বিজ্ঞানের নৈকট্য সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিলে ইতিহাস নিষ্ফল হইয়া উঠে অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের কাম্য ফল। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছিন্নমূল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল নিহিত রহিয়াছে ইতিহাসের মধ্যে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে রাষ্ট্র ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাস যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। অন্য দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করিয়া রাষ্ট্র সম্বন্ধে কতকগুলি নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এই নীতিগুলিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলধন। এই নীতিগুলির মাধ্যমে ও আলোকে ইতিহাসের গতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার আলোকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সেই দৃষ্টিতে যদি ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করা না হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ের

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের মূল-ধারার ইঙ্গিত দেয়

*"History without Political Science has no fruit, Political Science without History has no root."

ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে যে নীতি কার্যকরী ছিল তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না এবং ঐ ঘটনাগুলির তাৎপর্য সম্যক আয়ত্ত করাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসের উপর আলোকপাত করিয়া তাহার প্রকৃত রূপ ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে।

উদ্দেশ্যের দিক হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই দুইটি বিজ্ঞানই মানুষের জীবন, কর্মপ্রণালী, সুখ-দুঃখ লইয়া কারবার করে। মানুষের মঙ্গল সাধনের পন্থার ইঙ্গিত দেওয়া ইতিহাসের অন্যতম উপজীব্য। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এইখানে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির মিল দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন নীতি সন্ধানে আমাদের শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এমন কি চারুকলার ইতিহাসও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের নিকট ঋণী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস-নিরপেক্ষ আলোচনা

তবে স্বীকার করিতে হইবে যে ইতিহাসকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) ও কল্পনাভিত্তিক অনেক নীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর এই নীতিগুলি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সূত্রে সামাজিক চুক্তিবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হেগেলের দার্শনিক রাষ্ট্রনীতিও কতক পরিমাণে এই শ্রেণীভুক্ত।

উভয়ের স্বাধীন অস্তিত্ব

পরিশেষে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে যদিও ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান একে অন্যের পরিপূরক, তথাপি এই দুইটিকে পৃথক সমাজবিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করিতে ও মর্যাদা দিতে হইবে। কারণ এই দুইটি বিজ্ঞানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইলেও আলোচনার ক্ষেত্র বিভিন্ন।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের অর্থ

(Meaning of the State)

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন লেখক রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু সংজ্ঞার বিভিন্নতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের মূল উপাদান সম্বন্ধে যে মোটামুটি সকলে একমত তাহা ডাঃ গার্ণার, ম্যাক্‌আইভার ও ল্যাস্কি প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করিলেও বোঝা যায়। রাষ্ট্র গঠনের মূল উপকরণ চারটি, যথা, (১) জনসমষ্টি (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) শাসনব্যবস্থা ও (৪) সার্বভৌমিকতা।

জনতা না থাকিলে সমাজ হইতে পাবে না, তথা রাষ্ট্রগঠনও সম্ভবপর নহে। তবে জনসংখ্যা কত হইবে সে সম্বন্ধে বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। "কমবেশী বহুসংখ্যক" কথাটি ব্যবহার করা হয়।

ভূখণ্ডের সীমারেখার নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যেখানে জনসমাজ স্থায়ীভাবে বসবাস করিবে। ভূখণ্ড বলিতে সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রের কিছুদূর পর্য্যন্ত আকাশপথ প্রভৃতিও বুঝায়। নির্দিষ্টতার প্রয়োজন এইজন্য যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এই সীমারেখার ভিতর চূড়ান্ত, কিন্তু ইহার বাহিরে সাধারণভাবে তাহার এক্তিয়ার নাই।

রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ ও কাযকরী করার ব্যবস্থাকেই শাসনব্যবস্থা বা সরকার বলা হয়। রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ পায় আইনের মারফৎ। সুতরাং আইন প্রণয়ন করা, তাহাকে কাজে পরিণত করা, তাহার ব্যাখ্যা করা,—ইহাই মূলতঃ সরকারের কর্তব্য।

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রসংগঠনকে বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে। ইহার তাৎপর্য হইল, রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে তাহার ইচ্ছাই চরম ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত। অর্থাৎ ইহার উপরে ভিতর বা বাহিরের আর কোন ক্ষমতা আছে বলিয়া স্বীকার করা হয় না; ব্যাপক জনসমাজ ইহার চূড়ান্ত প্রাধান্য মানিয়া চলে।

কোন কোন লেখক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও স্থায়িত্ব এই দুইটিকেও রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করেন।

রাষ্ট্র ও সমাজ এক নহে। রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠন, কিন্তু রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজের তাৎপর্য বিস্তৃততর। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপকেই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্র সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, সমাজ রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে।

অপরাপর সামাজিক সংগঠনের সহিত রাষ্ট্রের পার্থক্য নানাবিধ। অন্যান্য সংগঠনের প্রতি বশ্যতা বা সদস্যপদ গ্রহণ, মানুষের স্বেচ্ছামূলক, রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমার সহিত তাহাদের মিল না থাকিতেও পারে, তাহাদের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট। সর্বোপরি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পীড়নমূলক ক্ষমতার আওতায় তাহাদের কাজ করিতে হয়; রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সর্বব্যাপক, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

রাষ্ট্র ও সরকার স্বতন্ত্র বস্তু। এই দুইয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্তমান। সরকার রাষ্ট্রের

তরফ হইতে কাজ করিলেও তাহার অন্যতম উপাদান মাত্র। সরকার সাময়িক সংগঠন, বারবার সরকার পরিবর্তিত হইলেও রাষ্ট্র একই থাকে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্র সমগ্র জনমণ্ডলীকে লইয়াই গঠিত। সরকার গঠিত হয় সেই জনসমাজের একটি অংশমাত্রকে লইয়া। অনেক লেখক মনে করেন যে রাষ্ট্র বিমূর্ত ভাববস্তু, সরকার সেই ভাবেরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ।]

'রাষ্ট্র' লইয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার। সুতরাং আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রথম পদক্ষেপেই বিষয়টি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা লইয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্রসংজ্ঞার বিভিন্নতা।

অথচ অসুবিধা হইল এই যে এমন একটা মৌলিক বিষয় সম্বন্ধেও এত বিভিন্ন ধরণের সংজ্ঞা ও চিন্তার সম্মুখীন হইতে হয় যে তাহা নূতন পাঠকের নিকট বিস্ময়কর বোধ হইবে।

কোন কোন লেখক রাষ্ট্রের ভিতর শ্রেণী-বিন্যাসের (Class Structure) রূপটি মাত্র দেখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র "অন্যান্য শ্রেণীর উপর একটি শ্রেণীর প্রভুত্ব করিবার সংগঠনমাত্র"।* অনেকের মতে ইহা এমন একটি সংগঠন যাহা শ্রেণীকে ছাড়াইয়া গিয়া সমগ্র সমাজেরই প্রতিভূর স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কাহারও দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নিতান্তই ক্ষমতার সংগঠন (power system), অপরে রাষ্ট্রকে বুঝিয়াছেন জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান (Welfare system) হিসাবে। কেহ ইহার আইনগত রূপ ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করেন না; কেহ আবার রাষ্ট্রের সহিত সমাজের কোন পার্থক্য দেখিতে পান না। কেহ বলেন রাষ্ট্র হইল অমঙ্গলের মূর্তি; কাহারও মতে একমাত্র রাষ্ট্রের ভিতরেই মানব জীবনের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হইতে পারে। মতের ও বিচারের এত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের ভিতর হইতেই আমাদের পথ করিয়া লইতে হইবে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে সংজ্ঞার এই বিভিন্নতা বস্তুতঃ লেখকদের মত ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হইতেই উদ্ভূত। সমাজতাত্ত্বিক যে দৃষ্টিভঙ্গি হইতে রাষ্ট্রকাঠামোকে বিচার করিবেন, আইনবিদ্ সে দিক হইতে করিবেন না। আন্তর্জাতিক আইনের পটভূমিকায় যে লেখক রাষ্ট্রচরিত্র বিশ্লেষণ করিতে বসিয়াছেন তিনি যে বিষয়গুলির উপর জোর দিবেন, সাধারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করিবেন না। তাহার উপর উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া দার্শনিক বিতর্ক শুরু হইলে মতপার্থক্য

*An organisation of one class dominating over the other classes. মূলতঃ মার্কসবাদী ধারণা হইলেও Oppenheimer (The State), Laski (Grammar of Politics) প্রভৃতি কর্তৃক সমর্থিত।

অনিবার্য। আসলে রাষ্ট্র কি হওয়া উচিত এই আদর্শগত দিক হইতে এবং যুগ-যুগান্ত ধরিয়া বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র কিভাবে তাহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিল সেই ইতিহাসগত ব্যাখ্যার দিক হইতেও প্রচুর মতপার্থক্য রহিয়াছে। কতকগুলি প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা উপস্থিত করিলে এই মতপার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ইউরোপীয় 'রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের জনক' বলিয়া পরিচিত গ্রীকদার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) বলিয়াছেন :—রাষ্ট্র হইল "পূর্ণাঙ্গ এবং স্বাবলম্বী জীবন,—অর্থাৎ সুখী ও সম্মানজনক জীবন লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি পরিবার ও গ্রামের সমাবেশ।" তিনি আরও বলিয়াছেন :—যদি "কোন না কোন কল্যাণ সব সমাজেরই লক্ষ্যবস্তু হয় তবে যে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজ যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ এবং যাহা সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে অন্য সকলকে বহুগুণে ছাড়াইয়া চরমতম মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য।"*

কতকগুলি সংজ্ঞা

রোমান পণ্ডিত সিসেরো (Cicero) বলেন : রাষ্ট্র হইল "অধিকার সম্বন্ধে সমচেতনায় ও সুযোগ-সুবিধায় পারস্পরিক অংশ গ্রহণে ঐক্যবদ্ধ বিপুলসংখ্যক, জনসমষ্টি।"**

মধ্যযুগের শেষে ইউরোপীয় নবজাগৃতির সময়কার লেখক গ্রোটিয়াসের (Grotius) সংজ্ঞাও অনুরূপ; "সর্বসাধারণের উপকার ও অধিকারের সুবিধা-ভোগের জন্য ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন মানুষেরা পূর্ণাঙ্গ সমাজ।"†

আবার তৎকালীন অপর লেখক বোদাঁ (Bodin) ১৫৭৬ সালে ঘোষণা করিলেন যে রাষ্ট্র হইল "পরিবারবর্গ ও তাহাদের সাধারণ ধনসম্পত্তির একটি মিলিত সংস্থা যাহা একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা ও যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।"††

আবার প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল রাষ্ট্রকে "ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আত্মার

* A union of families and villages having for its end perfect and selfsufficing life, by which we mean a happy and honourable life.

If "all communities aim at some good, the state or political community, which is the highest of all and which embraces all the rest, aims at good in a greater degree than any other, and at the highest good."

** A numerous society united by a common sense of right and a mutual participation in advantages.

† A society of freemen united for the sake of enjoying the advantage of right and the common utility,

†† An asociation of families and their common possessions governed by a supreme power and by reason.

Garner—Political Science and Government. Ch. IV P. 50-51

প্রমূর্ত রূপ", "ত্রুটিহীন যুক্তির প্রকাশ," "নৈতিক চেতনার বাস্তবরূপ", "বাস্তব স্বাধীনতার অভিব্যক্তি", প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞায় অভিষিক্ত করিয়াছেন।*

বিচারে দেখা যাইবে যে প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্রবাসী দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যবস্তুর উপরই জোর দিয়াছেন এবং রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি হিসাবে পরিবার ও গ্রামকে গ্রহণ করিয়াছেন। রোমান নাগরিকত্ব যে যুগের মানুষের কাছে সাতিশয় কাম্যবস্তু ছিল, সে যুগের রোমান সিনেটার সিসেরো যে রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রাণবস্তুর সন্ধান পাইবেন তাহাও সহজে বোঝা যায়। ফিউডালী শৃংখল ভাঙ্গিয়া পড়িবার সময় লিখিতে গিয়া গ্রোটিয়াসও "স্বাধীন মানুষের" অধিকারের উপর প্রাধান্য দিলেন। বোদাঁ্যার সংজ্ঞার গুরুত্ব পাইল "চূড়ান্ত ক্ষমতা" ও শাসনের ধারণা। আর ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের নিকট রাষ্ট্র এক বিমূর্ত ভাবের প্রকাশ হিসাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে এত মতান্তরের ভিতর রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপকে আমরা কিভাবে খুঁজিয়া পাইব? সমকালীন কতকগুলি সংজ্ঞার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে চেষ্টা করিব।

সমকালীন সংজ্ঞা

গার্ণারের মতে "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের ধারণায় রাষ্ট্র হইতেছে অল্পবিস্তর বহুসংখ্যক জনতার এক সমাজ, যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করে, যে সমাজ বাহিরের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ বা প্রায় স্বাধীন এবং যে সমাজের একটি সংগঠিত শাসনব্যবস্থা আছে, যে শাসনব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের বিশাল অংশ অভ্যাসবশতঃ বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে" ("The state, as a concept of political science and public law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory; independent, or nearly so, of external control, and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.")।†

গার্ণার

* "the incarnation of the objective spirit", "perfected rationality"; "the realisation of the moral idea", "the actualisation of concrete freedom".

† Garner—Ibid. P. 51.

ম্যাকআইভার বলিতেছেন: "রাষ্ট্র হইতেছে এমন এক সংগঠন যাহা সীমা-নির্ধারিত ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী জনসমাজে সামাজিক শৃংখলার সর্বজনীন ও বাহ্যিক উপকরণগুলি বজায় রাখে; এ কাজ তাহাকে করিতে হয় আইনের মারফৎ; রাষ্ট্রের সরকার, আইন ঘোষণা করে (এবং) সে সরকারের ঐ উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ করিবার অধিকার রহিয়াছে।" ("The State is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order.")।†

ম্যাক আইভার

আর ল্যাস্কি বলেন: "আধুনিক রাষ্ট্র হইতেছে একটি ভূখণ্ডবাসী সমাজ, যাহা শাসকমণ্ডলী ও প্রজার মধ্যে বিভক্ত, যাহা নিজস্ব নির্ধারিত প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের উপর চরম ক্ষমতা দাবী করে। বস্তুতঃ ইহা সামাজিক ইচ্ছার চূড়ান্ত আইনগত আধার। ইহা অন্যান্য সর্ববিধ সংগঠনের পটভূমিকা পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইহা যে মানবিক কর্মকাণ্ডকে স্বকীয় নিয়ন্ত্রণে আনা বাঞ্ছনীয় বোধ করে সে সকলকেই আপন আওতায় আনয়ন করে। উপরন্তু এই চরম ক্ষমতার পরোক্ষ অর্থ হইল যে, যাহা কিছু ইহার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকিল, তাহা নিজস্ব স্বাধীনতাটুকু ভোগ করে ইহার সম্মতির ভিত্তিতে।...রাষ্ট্র হইল সমাজ-তোরণের মূল প্রস্তর। যে অসংখ্য মানবজীবনের ভাগ্য বিধাতৃর দায়িত্ব সে গ্রহণ করিয়াছে ইহা সেই জীবনধারার আকৃতি ও অর্থকে রূপায়িত করে।" ("The modern state is a territorial society divided into government and subjects claiming, within its alloted physical area, supremacy over all other institutions. It is in fact, the final legal depository of the social will. It sets the perspective of all other organizations. It brings within its power all forms of human activity the control of which it deems desirable. It is morever, the implied logic of

ল্যাস্কি

* Garner—Ibid. P. 52

† MacIver—The Modern State. P. 22

this supremacy that whatever remains free of its coutrol does so by its permission...The State is the keystone of the social arch. It moulds the form and substance of the myriad human lives with whose destinies it is charged.")*

এই তিনটি সংজ্ঞার মধ্যেই, লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, রাষ্ট্রের চারিটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সে চারিটি বৈশিষ্ট্য হইল: (১) জনসমষ্টি ; (২) নির্দিষ্টভূখণ্ড ; (৩) শাসনব্যবস্থা বা সরকার ; এবং (৪) সার্বভৌমিকতা বা চূড়ান্ত ক্ষমতা।

মূল উপাদান

আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডাঃ গার্ণার তাঁহার নিজস্ব সংজ্ঞায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে আধুনিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সম্মত বাহ্যিক (physical) ও আত্মিক (spiritual) সর্বপ্রকার অপরিহার্য উপকরণগুলির সন্ধান ইহাতে মিলিবে। তাই তিনি (১) অল্পবিস্তর জনতার এক সমাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাসের কথা বলিয়াছেন; (৩) রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করা ও কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনে সংগঠিত সরকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; এবং (৪) সার্বভৌমিকতার ধারণাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য তাহার দুইটি দিক উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন: (ক) রাষ্ট্রের ইচ্ছা বহিঃ-নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত, ও (খ) এই রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে ব্যাপক অধিবাসী সমাজ অভ্যাসবশতঃ মানিয়া চলে। ডাঃ গার্ণার প্রদত্ত আইনজ্ঞের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যা লইয়া আমরা পরে আলোচনা করিব। এস্থলে শুধু বহিঃ-নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি প্রসঙ্গে "প্রায় তদ্রূপ" কথাটি তিনি কেন ব্যবহার করিলেন তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। তিনি বলিতেছেন যে, কড়াকড়ি আইনের দৃষ্টিতে বহিঃ-নিয়ন্ত্রণ হইতে যাহারা সম্পূর্ণ মুক্ত নহে তাহাদিগকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার না করা গেলেও, যাহাদের উপর বাহিরের নিয়ন্ত্রণ শুধু নামেমাত্র বজায় আছে, আর তাহাও কেবল বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, সেগুলিকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি কানাডা প্রভৃতি বৃটিশ ডোমিনিয়নের উল্লেখ করেন। কারণ, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় আছে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থায়ও

সংজ্ঞা তিনটির মিল ও পার্থক্য

* Laski—Grammar of Politics. P. 21

ইহাদের সমন্বীকৃতি মিলিয়াছে। তাঁহার মতে 'আশ্রিত রাষ্ট্রগুলির' (Protected state) মর্যাদাও অনুরূপ।*

এইবার ইহার সহিত ম্যাকআইভার ও ল্যাস্কি প্রদত্ত সংজ্ঞা দুইটি মিলাইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহারাও রাষ্ট্রের উপকরণ হিসাবে সেই জনসমাজ, নির্দিষ্টকৃত ভূখণ্ড, সরকারও চরম ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিতেছেন। তবে প্রভেদ কোথায়?

ম্যাকআইভার রাষ্ট্রকে সামাজিক সংগঠন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের চরমক্ষমতা যে বলপ্রয়োগ কবিবার ক্ষমতা ও তাহা যে ন্যস্ত থাকে সরকারের হাতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। 'বলপ্রয়োগ' কথাটির তাৎপর্য হইল যে, রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থার ভিন্ন মত বা পথকে রাষ্ট্র প্রযোজনমত জোর করিয়া নিজ নির্ধারিত পথে আনিতে পারে, অন্যথায় দমন করিতে পারে। কিন্তু এ বলপ্রয়োগের ক্ষমতা সরকারের ইচ্ছাধীন নহে। সরকারকে এ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে আইনকে রূপদান ও কার্যকরী করিবার নিমিত্ত, এবং সরকার এ ক্ষমতা ব্যবহার কবিতে পারে একমাত্র আইনের মারফত। অর্থাৎ, তাঁহার মতে, আইনই হইল সার্বভৌমিকতার আধার এবং আইনের মারফতেই সার্বভৌমিকতার প্রকাশ। উপরন্তু, আইনের মূল লক্ষ্যবস্তুকেও তিনি সংজ্ঞার অঙ্গীভূত করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র-সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছে যে জনসমাজ, তাহার মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাই এই আইনের উদ্দেশ্য। এ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার বাহ্যিক উপকরণের প্রতি নজর রাখে এবং সর্বসাধারণের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে এমন রূপেই ইহা প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক ল্যাস্কি অপরদিকে সমাজের দ্বিধাবিভক্ত রূপের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। রাষ্ট্রবাসী জনসমাজ মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত,—এক, পীড়নমূলক ক্ষমতার অধিকারী শাসকমণ্ডলী বা সরকার ও অপরপ্রান্তে শাসিত প্রজাপুঞ্জ। আর সরকারের এই ক্ষমতা কত ব্যাপক, কত গভীর, কত প্রচণ্ড, তাহাও তাঁহার বক্তব্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। ল্যাস্কির সংজ্ঞায় এই ক্ষমতা লোকে অভ্যাসবশতঃ স্বাভাবিকভাবে মানিয়া চলে অথবা আইনই ইহার মূল ভিত্তি কি না তাহা আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রবস্তু নহে; চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করাই হইল প্রধান কথা।

* Garner—Ibid Pp. 101-102 উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির স্বাধীনতা বর্তমানে প্রশ্নাতীত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার ভিত্তি ও প্রকাশ লইয়া, অর্থাৎ সার্বভৌমিকতার রূপ ও অর্থ লইয়া যথেষ্ট মতপার্থক্য বর্তমান। এক কথায় রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও, কোন্ কোন্ উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত সে সম্বন্ধে সকলেই মোটামুটি একমত। আমরা এইবার এক এক করিয়া সেই উপাদানগুলির বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব।

রাষ্ট্র মানবিক প্রতিষ্ঠান; রাষ্ট্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কাজেই রাষ্ট্রবাসী মানুষ না থাকিলে কাহাকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে? এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,— কতগুলি লোক লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হইবে? প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের চিন্তানায়কগণ জনসংখ্যার সীমা বাঁধিয়া দিবার কথা ভাবিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় রক্ষা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সর্বাঙ্গীণ সুখের কথা চিন্তা করিয়া নগর-রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে কাম্য জনসংখ্যা কত হইবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে তাঁহারা সচেষ্ট ছিলেন। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে কাম্য জনসংখ্যার সমস্যা আজও বাতিল হইয়া যায় নাই। কিন্তু সে প্রশ্ন আজ প্রধানতঃ অর্থনীতি বা সমাজতত্ত্বের বিষয়ীভূত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তরফ হইতে সাফ জবাব দেওয়া যায় যে রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসাবে জনসংখ্যার কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই। ক্ষুদ্র মোনাকোও রাষ্ট্র আবার বিশালকায় চীন বা ভারতও রাষ্ট্র।

১। জনসমষ্টি

কাহারও মনে এমন প্রশ্নও হয়ত উঠিতে পারে যে তাহা হইলে কত কমসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত সংগঠন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি পাইবে; একটি পরিবারকে কি রাষ্ট্র বলতে পারি? স্বভাবতঃই তাহা পারি না। সামাজিক জীবনের যে জটিলতার সমাধান কল্পে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ভিত্তি ও প্রগতি, তাহা পরিবারের মধ্যে নাই। বহুসংখ্যক মানুষ ও বহু পরিবার যে সমাজের অঙ্গীভূত সেই সমাজই রাষ্ট্রের উপাদান। এই জন্যই ডাঃ গার্ণার "অল্পবিস্তর বহুসংখ্যক" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ম্যাক্‌আইভার, ল্যাস্কি প্রমুখ পণ্ডিতেরা সামাজিক সংগঠনের ধারণার উপর জোর দিয়াছেন।

নির্দিষ্ট সীমারেখায় নির্ধারিত ভূখণ্ড হইল রাষ্ট্রের অপর উপাদান। অতীতে কোন কোন লেখক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলেও, বর্তমানকালে ইহা সর্বজনস্বীকৃত। ভ্রাম্যমান যাযাবর লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। বস্তুতঃ সারা পৃথিবীর সমস্ত জমিই আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টিত। তাহা ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক

২। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড

হইতে রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া দেখা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাহা না হইলে কোন এক জনসমষ্টি আজ এ রাষ্ট্র কাল ও রাষ্ট্রের এলাকায় যদি ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে সার্বভৌম কর্তৃত্ব লইয়া সঙ্ঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী এবং সেক্ষেত্রে অধিকারের ন্যায্যতা নির্ণয় করাও সম্ভব হইবে না।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিতে আমরা শুধুমাত্র ভূমির বহিঃপৃষ্ঠটুকু বুঝি না। ইহার অন্তর্গত নদী, পর্বত ভূগর্ভস্থ সম্পদ, উপরকার আকাশপথ ও সমুদ্রোপকূল হইতে কয়েক মাইল পর্যন্ত ¹সমুদ্র রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য হয়। অর্থাৎ এই সবকিছু লইয়া যে অঞ্চল তাহার উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনাধিকার বজায় থাকিবে। তাহা ছাড়া যে কোন রাষ্ট্রের জাহাজকে সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় সেই রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত হয়।

এই বক্তব্যেরই অপরদিক হইল যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব কিন্তু শুধুমাত্র এই অঞ্চলের উপরই বিস্তৃত থাকিবে। অবশ্য অন্য রাষ্ট্রবাসী নিজস্ব নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বজায় আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু সে নাগরিক নিজরাষ্ট্রভুক্ত এলাকায় পদার্পণ না করা পর্যন্ত তাহার উপর শাসন চালানো সম্ভব নয়।*

কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, বৈদেশিক সম্পর্কের খাতিরে যে কোন দেশেই অপর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতাবাস সেই বিশেষ দেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলিয়া গণ্য হয়।

ব্যতিক্রম

১। পূর্বে, উপকূল হইতে তিন মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রাঞ্চল রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকৃত হইত। বর্তমানে ইহা বাড়াইয়া বারো মাইল পর্যন্ত করা হইবে কি না তাহা বিবেচনাধীন আছে।

*উদাহরণস্বরূপ বার্জেস ও ম্যাকলীনের বিষয় উল্লেখ করা যায়। ইঁহারা দুইজন ইংরেজ নাগরিক; পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকুরী করিতেন। হঠাৎ তাঁহারা গোপনে সোভিয়েত ইউনিয়নে পলাইয়া যান। ব্রিটিশ সরকার ইঁহাদের দেশদ্রোহী মনে করিলেও, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভূখণ্ডে তাঁহাদের না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করা সম্ভব নয়। অবশ্য ইজরেলী সরকার কুখ্যাত নাৎসী হত্যাকারী আইক্‌ম্যানকে আর্জেন্টিনা হইতে গোপনে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ দেশে বিচারে হাজির করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে আইকম্যান ইজরেলের নাগরিক ছিল না। এ কার্যের জন্য তাঁহারা আনুষ্ঠানিকভাবে আর্জেন্টিনা সরকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং মানবিক নীতির দিক হইতে স্বীয় কার্যকে সমর্থন করিয়াছেন।

২। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের সময় এক বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইতে দেখা যায়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা সহজ হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে হিটলার-জার্মানী, পোল্যাণ্ড গ্রাস করিল। পরাজিত পোলিশ সরকার ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় লইয়া সেখানে নিজেদের সরকারী অফিস খুলিয়া বসিলেন। ব্রিটিশ মিত্রপক্ষ ইহাকেই প্রকৃত পোলিশ সরকার বলিয়া মানিয়া লইলেন। তত্ত্বের দিক হইতে ধরা হইল যে পোলিশ রাষ্ট্র এখনও বর্তমান এবং ইংল্যাণ্ডে নির্বাসনযাপনরত পোলিশ সরকারই পোল্যাণ্ড শাসন করিতেছে; যদিও বাস্তবে এই সরকারের শাসন পোল্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছায় না, এবং সেখানে নাৎসি সামরিক শাসন তখনও বলবৎ। অর্থাৎ, কোন এক রাষ্ট্রের সরকার পলাইয়া অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণকালীন আদি রাষ্ট্রের বিধিসঙ্গত সরকার বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, যদিও তখন নিজ-ভূখণ্ডে তাহার শাসন অচল।

অবশ্য এ অবস্থা নিতান্তই সাময়িক হইতে বাধ্য। কারণ, হয় কিছুদিন পরে এ সরকার নিজদেশে ফিরিয়া গিয়া নিজস্ব শাসন পুনরায় চালু করিবে, নতুবা দীর্ঘদিন নির্বাসিত থাকিলে, সেই দেশে তৎকালে প্রকৃত যে শাসনব্যবস্থা বর্তমান আছে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাকেই বিধিমত রাষ্ট্রকর্তৃত্ব বলিয়া মানিয়া লইবে। আন্ত-র্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সামরিক বলই যাহাতে চূড়ান্ত কথা হইয়া না দাঁড়ায় সেইজন্যই এ ব্যবস্থা। কিন্তু ন্যায়ের নামে অন্যায় ঘটে। ইহারই সুযোগে, গৃহ-যুদ্ধোত্তর চীনের বিধিসম্মত কমিউনিষ্ট সরকারকে স্বীকার না করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার অনুসরণকারী সরকাররা জাতিসংঘে তাইওয়ানে নির্বাসিত চিয়াং-কাই-শেকের প্রতিনিধিকে চীনের প্রতিনিধি বলিয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন।

৩। তৃতীয়তঃ, কোন একটি অঞ্চলের উপর একাধিক রাষ্ট্রের যুক্তশাসন বা ***Condominium*** চালু থাকিতে পারে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সুদানের উপর ইঙ্গ-মিশর যুগ্ম কর্তৃত্ব বজায় ছিল

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যাগত পরিমাণ লইয়া যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে রাষ্ট্রান্তর্গত ভূখণ্ড সম্পর্কেও তেমনই বলা যাইতে পারে যে ইহার আয়তনের পরিমাণের উপর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রত্ব নির্ভর করে না। অতিকায় চীন প্রজাতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতীয় ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি সান মেরিনো বা মোনাকোর মত লিলিপুটদেরও রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার সমানাধিকার আছে। তবে এই

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রের সমস্যা

সূত্রে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড কত বৃহৎ হওয়া বাঞ্ছনীয় সেদিক হইতে বিচার করিয়া কেহ ক্ষুদ্র কেহ বা বৃহৎ রাষ্ট্রের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্লেটো রাষ্ট্রের আয়তনের সহিত সুগঠিত নরদেহের তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ কাম্য স্থূলতা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও সক্রিয়তা। অ্যারিস্টট্‌ল মধ্যপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন। রুশো (Rousseau) প্লেটোর তুলনারই অনুসরণ করিয়া বলেন যে প্রকৃতি যেমন স্বাভাবিক নরদেহের বৃদ্ধির সীমা টানিয়া দিয়াছে তেমনই রাষ্ট্রান্তর্গত ভূখণ্ডের বিস্তারেরও পরিমিতি নির্ধারিত আছে। অতিক্ষুদ্রতা যেমন স্বনির্ভরতার পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তেমনি অতিবিস্তর সুশাসনকে ব্যাহত করিতে পারে। তাহা ছাড়া বিশালকায় রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক যোগসূত্র ক্ষীণ হইতে পারে। রুশোর মতে রাষ্ট্রের আয়তনের সহিত সরকারের চরিত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। অতিকায় রাষ্ট্রের পক্ষে রাজতন্ত্র মাঝারি আকারের রাষ্ট্রের পক্ষে অভিজাত-তন্ত্র এবং ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্রের জন্য গণতন্ত্র প্রকৃষ্ট। মঁতেসক্যু (Montesqieu) ও ডি টক্‌ভিল্‌ও (Toqueville) মনে করিতেন যে গণতন্ত্র ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্রের সহিতই খাপ খায়।

ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্রের স্বপক্ষে যুক্তি হইল অধিবাসীগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সাধন করা সহজ, সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্যের মূল ভিত্তি কার্যকরী জনমত গঠনও সহজসাধ্য। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে গভীরতর একতা ও দেশপ্রেম লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রেরই সম্ভব। গণতন্ত্রের পক্ষে অহিতকর চিন্তাধারা বৃহৎ রাষ্ট্রে সহজেই প্রকাশ পায়।

অপরপক্ষে বৃহৎ রাষ্ট্রের সপক্ষে অন্যতম প্রধান বক্তা জার্মান পণ্ডিত ট্রিটশ্‌কে (Trietschke) রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতাকে পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ; ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রধান অপরাধ যে তাহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়া দুর্বল হইতে বাধ্য। উপরন্তু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে কূপমণ্ডুকতার ভাব অনেক বেশী পরিলক্ষিত হইবে। বৃহৎ রাষ্ট্রে সংস্কৃতির স্ফুরণ ঘটিবার সুযোগ অনেক বেশী।

বর্তমান যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাচীনদের সিদ্ধান্তগুলিকে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। ব্রিটেন ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্র হইলেও সারা পৃথিবীর উপর সাম্রাজ্যের বিস্তার করিয়াছিল। জাপান ক্ষুদ্রাবয়ব সত্ত্বেও, অর্থনীতি বা সামরিক ক্ষেত্রে বহু বৃহৎ রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রভৃতির বিকাশে, সভ্যতার ভাণ্ডারে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অবদান প্রচুর ও বিচিত্র। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কল্যাণে যে কোন বৃহৎ

রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সাধন বা জনমত গঠন আজ আর পূর্বের ন্যায় দুঃসাধ্য নয়। বৃহৎ রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সফলতার নিদর্শনও আমাদের জানা আছে।

অপরদিকে প্রাচীনেরা যে সমস্ত সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলিকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সাধারণভাবে বলিতে গেলে বৃহৎ রাষ্ট্রের তুলনায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দুর্বল হইবার সম্ভাবনা অধিক এবং দুর্বল রাষ্ট্রের পরনির্ভরশীলতা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে খণ্ডিত করে এবং বিশ্বরাজনীতিকে জটিল করিয়া তোলে। আবার অতিকায় রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ সমাজবোধ জাগ্রত করার সমস্যাকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমস্যা বাস্তব না হইলে ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ আজ National integration বা জাতীয় সংহতির জন্য এত উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল কেন?

সরকার হইল রাষ্ট্রের ইচ্ছার রূপকার। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের যাহা ইচ্ছা তাহাকে প্রকাশ করা এবং কার্যকরী করার যে ব্যবস্থা তাহারই নাম হইল সরকার। সরকার না থাকিলে দেশবাসী অসংগঠিত জনসমষ্টি থাকিয়া যাইত। দেশবাসীকে একটি লক্ষ্যে উপনীত করিবার জন্য—তা সে লক্ষ্য যাহাই হউক না কেন—আইন ও শৃঙ্খলার পাশে আবদ্ধ করিবার সংগঠন সরকার। ক্লাব করিতে হইলে সমিতি গঠন করিতে হইলেও, তাহার আইন-কানুন থাকে যাহা সদস্যদের মানিয়া চলিতে হয়; বিভিন্ন দায়িত্বভার ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত করিতে হয়, যাহারা সমগ্র সংগঠনের নামে সেই বিশেষ কার্যগুলি সম্পাদন করিবে। তেমনি রাষ্ট্র নামক সংগঠনের আইন-কানুন প্রণয়ন করা, সেই আইনকে কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করা, আইন ভঙ্গ করিলে অপরাধীর বিচার ও প্রয়োজনমত সাজা দিবার ব্যবস্থা করা যে ব্যক্তিবর্গের উপর মিলিতভাবে ন্যস্ত থাকে, সেই সম্মিলিত ব্যক্তিপুঞ্জকে মিলিতভাবে সরকার বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত দেশে অনেক সময় মন্ত্রিসভাকেই 'সরকার' বলা হইলেও (যেমন, 'নেহেরু সরকার') রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞানুসারে তাহা সঠিক নহে এবং 'সরকার' কথাটিকে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা প্রয়োজন। অপর দিকে অনেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীকেও সরকারের অংশ বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু সেইরূপ ব্যবহারে কথাটির অর্থের অতি-বিস্তৃতি দোষ ঘটে এবং সেহেতু বর্জনীয় মনে করি।

৩। সরকার

'সরকারের মারফৎ সম্মিলিতভাবে জনসাধারণের ইচ্ছা রূপ পায়'—এ কথা

ইচ্ছা করিয়াই বলা হয় নাই। কারণ, এরূপ যে হইবেই তাহার কোন কথা নাই। এরূপ হইলে ইতিহাসে বিক্ষোভ থাকিত না, বিদ্রোহ থাকিত না, সরকারের পতন ঘটিত না। কিন্তু সরকার বলিয়া যাহাকে মানা হইয়াছে, তাহার তৈয়ারী আইনকে রাষ্ট্রে ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাহা না করিলে রাষ্ট্রের সংগঠিত রূপকে অস্বীকার করা হইবে। বিদ্রোহের সময় সরকারপক্ষ বিদ্রোহীদের "রাষ্ট্রদ্রোহী" বলিবে, বিদ্রোহীরা উহাদের "জনদ্রোহী" বলিতে পারে। বিদ্রোহীরা পরাজিত হইলে শাস্তি পাইবে, জয়ী হইলে নিজেরা সরকার গঠন করিয়া আইন পাল্টাইয়া নিজেদের প্রণীত আইনকেই "রাষ্ট্রের ইচ্ছা" বলিয়া ঘোষণা করিবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রকৃতপক্ষে শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা। শাসকমণ্ডলী বা সরকারের দায়িত্ব হইল আইন প্রণয়ন করা এবং আইনানুযায়ী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়া। দেশবাসী এই ব্যবস্থা মানিবে। পছন্দ না হইলে অবস্থার উন্নতির জন্য শাসকবর্গকে বুঝাইতে, বাধ্য করিতে বা বদলাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ কোন না কোন শাসকমণ্ডলী রাখিতে হইবে, এবং জনসাধারণকে সেই শাসন মানিয়া চলিতেও হইবে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চরম ইচ্ছা, ইহাই হইল সার্বভৌমত্বের অর্থ। অর্থাৎ, অন্য যে কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার নিকট মাথা নত করিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের নতিস্বীকার করিতে বাধ্য করা বা অধিকার হরণ করিয়া শাস্তি দিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। রাষ্ট্রের এ ক্ষমতা না থাকিলে সমগ্র দেশবাসী এক আইন ও শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকিত না; পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা ও স্বার্থের সংঘাতে যধ্যমান জনসমাবেশে পরিণত হইত মাত্র। অন্ততঃ শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় থাকিবার কোন নিশ্চিত ভিত্তি থাকিত না। তাই যে কোন বিশিষ্ট ইচ্ছার উপরে রাষ্ট্রের ইচ্ছার স্থান।

৪। সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্বকে বুঝিতে হইবে দুই দিক হইতে। এক, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই সার্বভৌম ক্ষমতার নিকট সকলে বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। দুই, রাষ্ট্রের বাহিরের কোন নিয়ন্ত্রণ সে মানে না। কারণ, বাহিরের নিয়ন্ত্রণ মানিলে পরে নিয়ন্ত্রণকর্ত্তার ইচ্ছাকেই অধিকতর ক্ষমতাশালী বলিয়া স্বীকার করা হইবে। চরম ক্ষমতা বলিলে, যুক্তির দিক হইতে অন্তত: 'চরমতর ক্ষমতা' আর কিছু থাকে না।

বাহিরের নিয়ন্ত্রণ হইতে স্বাধীনতা ও অভ্যন্তরীণ দিক হইতে চরম ক্ষমতা,

—সার্বভৌমত্বের এই যে রূপ, ইহাই রাষ্ট্রকে তাহার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছাই যখন রাষ্ট্রের ইচ্ছা নামে ঘোষিত ও কার্যকরী হয় তখন সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের গুণ না বলিয়া সরকারের গুণ বলা হইবে না কেন? রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য কি তাহার পরিপূর্ণ আলোচনার ভিতর হইতেই অবশ্য এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব মিলিবে। কিন্তু সে পর্যায়ে যাইবার পূর্বেও খানিকটা প্রাথমিক আলোচনা এখানে করিয়া রাখা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিন্তাধারায় এমন মতবাদসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান মিলিবে যাঁহারা রাষ্ট্র ও সমাজকে সম্পূর্ণ একাত্ম করিয়া দেখিয়া শাসকমণ্ডলী বা সরকারকেই সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলিতে দ্বিধা করেন। কিন্তু এরূপ মত গ্রহণ করা যায় না।

যে সংগঠনের মধ্যে মানুষ ব্যক্তিগত, পরিবারগত, শ্রেণীগত, সংগঠনগত-ভাবে, তাহার সমস্ত অভাব ও দাবী লইয়া পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে ও সে দ্বন্দ্বের যথাসম্ভব নিরসন করিতে পারে সেই ব্যাপকতম সামাজিক সংগঠনের নামই রাষ্ট্র। কাজে কাজেই সে তার আনুগত্য নিবেদন করিবে এই চূড়ান্ত রাষ্ট্রসত্তার নিকটেই। ম্যাক্‌আইভার এইজন্যই সার্বভৌমত্বের ভিত্তি হিসাবে দেখিয়াছেন "General Will" বা "সমষ্টিগত ইচ্ছা"-কে, যাহা "ততটা রাষ্ট্রের ইচ্ছা নয়, যতটা রাষ্ট্রের জন্য ইচ্ছা, রাষ্ট্রকে বজায় রাখিবার ইচ্ছা" This is not so much the will *of* the State as the will *for* the state, the will to maintain it.")।*

সরকার কাল ও পাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ ব্যবস্থামাত্র। একটি বিশেষ জনমণ্ডলী একটি বিশেষ সময়ের জন্য রাষ্ট্রের নামে কাজ করিবার অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্রের নামে কাজ করিতেছে বলিয়াই এই বিশেষ সময়ের জন্য চরম ক্ষমতা ব্যবহার করিবার সুযোগ তাহারা পায়।

কাজেই সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রেরই উপাদান। রাষ্ট্র হইল ইহার আধার; ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগের উপকরণ হইল সরকার।

শুধুই দৈনন্দিন ব্যবহারে নিযুক্ত চরম ক্ষমতা হিসাবে অনুসন্ধান করিলে সার্বভৌমিকতার সন্ধান মিলিবে সরকারে; কিন্তু অপরদিকে জনসাধারণের

* MacIver—Ibid P. II

আস্থা, আনুগত্য, অন্ততঃ নিরাসক্ত সম্মতির দিক হইতে বিচার করিলে পৌঁছাইতে হইবে রাষ্ট্রের ব্যাপক স্বরূপে।

ডাঃ গার্ণার বলেন: "আন্তর্জাতিক আইনের ভাষ্যে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ও স্বাধীন সমাজ হইতে হইবে, যাহার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার আইনসঙ্গত যোগ্যতা রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যবৃন্দের নিকট হইতে আন্তর্জাতিক আইন যে সকল দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য বলিয়া দাবি করে তাহা করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা রহিয়াছে। উপরন্তু অনুরূপ স্বীকৃতি লাভ করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সমমর্যাদাবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র সমাজের অন্যতম বলিয়া গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।*

আন্তর্জাতিক আইনেব দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

অর্থাৎ, রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত গুণগুলিও থাকিতে হইবে:

১। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের আইনসঙ্গত যোগ্যতা

২। আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা ও ইচ্ছা;

৩। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক স্বীকৃতি;

৪। অন্যান্য রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা।

মনে রাখিতে হইবে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় অথবা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম বলিয়া অনেক রাষ্ট্রকেই বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক আইনের চোখে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের পদমর্যাদা সমান।

রাষ্ট্রের অপর একটি গুণের কথাও কোন কোন লেখক উল্লেখ করিয়াছেন,—তাহা হইল স্থায়িত্ব। রাষ্ট্রের অধীনে সরকার প্রায়শঃই পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু সেই রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন হয় না। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে রাষ্ট্রের সরকার প্রায়ই বদল হয় কিন্তু রাষ্ট্রটি ঠিকই থাকে। অবশ্য সংযোজনের ফলে রাষ্ট্রের এলাকা বৃদ্ধি পাইতে পারে, আবার কিছু অংশ হস্তান্তর হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্র বিনষ্ট হয় না। অবশ্য স্থায়ী বলিতে চিরন্তন কিছু বলা যাইতেছে না। রাষ্ট্রও

*A state in the sense of international law must be a fully sovereign and independent community with legal capacity to enter into international relations, and must possess the power and will to fulfil thc obligations which international law requires of all members of the family of nations. Furthermore, it must have been recognised as such and thereby admitted to membership in the international community on a footing of equality with other states.—
Garner-Ibid.—p.56

ধ্বংস পাইতে পারে, যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে অন্য রাষ্ট্রের অধীন হইয়া, স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের সহিত মিলনের মাধ্যমে, অথবা আভ্যন্তরীণ বিভাগের মারফৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের জন্মের ভিতর দিয়া। অনেকে যুক্তি দেন যে এরূপ ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরিত হইল মাত্র। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে পুরাতন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তখন আর রহিল না। কাজে কাজেই "স্থায়িত্বকে" ঐতিহাসিক কালের সীমার মধ্যে বুঝিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে সরকারের সহিত পার্থক্যের পটভূমিকায়।

রাষ্ট্রের ভাবগত (Idea) ও ধারণাগত (Concept) পার্থক্য: কোন কোন লেখক রাষ্ট্রের ভাবগত ও ধারণাগত পার্থক্য টানিয়া থাকেন।

মানুষ সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখিতে গেলে আমরা যেমন বিশেষ কোন মানুষ সম্বন্ধে না লিখিয়া, মানুষ বলিতে সাধারণভাবে যাহা বুঝি তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি, রাষ্ট্রের 'ভাব' বলিতে সেইরূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, বাস্তবে কোন একটি বা অনেক রাষ্ট্রের বিবরণে এই 'ভাবটি' নাই, বাস্তব রাষ্ট্রের অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কল্পনায় রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত সত্যটিকে চিত্রিত করিতে পারিলেই রাষ্ট্রের বিমূর্ত ভাবটি ধরিতে পারা যাইবে। 'ভাববাদী' (Idealist) দার্শনিকদের মতে রাষ্ট্রের 'ভাবের' স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট অস্তিত্ব রহিয়াছে, বাস্তব রাষ্ট্রগুলি তাহারই প্রকাশমাত্র। অর্থাৎ, এই 'ভাবেই' রাষ্ট্রের প্রকৃত অস্তিত্ব, বাস্তবে রাষ্ট্র এই ভাবানুগ না হইলে তাহাকে প্রকৃত রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিবার কারণ নাই। জার্মান লেখক ব্লুটশ্‌লি (Bluntschli) বলিয়াছেন: "বাস্তব রাষ্ট্রগুলির স্বতোৎসারিত অপরিহার্য গুণাগুণ লইয়া কারবার হইল রাষ্ট্রের ধারণার। রাষ্ট্রের ভাব, রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কিত করে এক কল্পিত ত্রুটিহীনতার ঔজ্জ্বল্যে, যাহা এখনও অর্জিত হয় নাই, কিন্তু যাহার জন্য প্রয়াস চালাইতে হইবে।"*

ভাব ও ধারণা

বার্জেসও (Burgess) এই চিন্তাধারাই অনুসরণ করিয়াছেন।

কোন কোন দার্শনিক অবশ্য রাষ্ট্রকে বস্তুনিরপেক্ষ একটা বিমূর্ত ভাব হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন। হেগেল ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বলিয়াছেন যে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে মূর্ত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল ভাবরূপে।

সে যাহাই হউক, ডাঃ গার্ণারের অনুসরণ করিয়া আমরা মোটের উপর

*"The concept of the state has to do with the natural and essential characteristics of actual states. The idea of the state presents a picture, in the splendour of imaginary perfection, of the state as not yet realised but to be striven for."
Garner—Ibid. p. 54

বলিতে পারি যে এই সব অতিপ্রাকৃত দার্শনিক সূক্ষ্ম বিভাগীকরণের বাস্তব মূল্য খুব কমই।*

ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ষোলটি State বা রাজ্য আছে। নাম অনুযায়ী ইহাদের কি রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা যাইবে। বাহ্যিক উপকরণ মিলাইলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের ভূখণ্ড নির্দিষ্ট সীমাঙ্কিত। বিরাট সংখ্যায় জনসমষ্টি স্থায়িভাবে এই সব এলাকায় বসবাস করে, প্রত্যেকটি এলাকার সংগঠিত সরকারও শাসনকার্য চালনা করিয়া থাকে। কিন্তু অবশিষ্ট যে উপাদান, অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব, তাহা ইহাদের নাই। সেইজন্য ইহাদের রাষ্ট্র বলা চলিবে না। আর ওই পার্থক্য নির্দেশের জন্যই state-এর বাংলা অনুবাদ রাজ্য করা হইয়াছে, রাষ্ট্র নহে।

ভারতীয় ইউনিয়নের রাজ্যগুলি (state) কি রাষ্ট্র?

অবশ্য ভারতীয় ইউনিয়নের "রাজ্যগুলির" তুলনায় মার্কিন রাষ্ট্রের state গুলির স্বাধীনতা অনেক বেশী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'রাষ্ট্রের' সংজ্ঞা অনুযায়ী সেগুলিকে পূর্বোল্লিখিত ঐ একই কারণে রাষ্ট্র বলা যাইবে না। পরে 'যুক্তরাষ্ট্র' সম্পর্কে আলোচনায় এ প্রশ্নের আরও বিশদ জবাব দেওয়া যাইবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্র বলা চলে কিনা সে প্রশ্নেরও জবাব এই সূত্রেই দেওয়া সমীচীন। জাতিপুঞ্জ শতাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলনক্ষেত্র। বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভার মতই জাতিপুঞ্জে আলোচনা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা ও তাহা কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা আছে; এমন কি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ও আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ রাষ্ট্র নহে। বিভিন্ন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য, কিন্তু তাহারা কেহই নিজস্ব সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করে নাই। ভারতীয় ইউনিয়ন জাতিপুঞ্জের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা ভারতীয় ইউনিয়নের নাগরিক। এ ভূখণ্ড ভারতীয় ইউনিয়নেরই কর্তৃত্বাধীন, জাতিপুঞ্জের নহে। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের "চরমতর" কোন আইনগত ক্ষমতা জাতিপুঞ্জের নাই। কাজেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে "রাষ্ট্র" বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ আজও ঘটে নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N. O.) ও রাষ্ট্র

১৮৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান, পোপের (Pope)

* The distinction is largely metaphysical or philosophical and has little practical value. Garner—Ibid. p. 55

শাসনাধীন এলাকা রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইত। ঐ সালে পোপের প্রাসাদ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ খানিকটা অঞ্চল বাদ দিয়া বাকি সমস্ত এলাকা ইটালির জাতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তাহা সত্বেও কোন কোন রোমান ক্যাথলিক লেখক মনে করেন যে, পোপের শাসনে এখনও তাঁহার প্রাসাদ ও কিছু জমি আছে; তাঁহার কর্মচারীদের তাঁহারই প্রজা বলিয়া গণ্য করা যায়; তত্রস্থ নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থা ও বিচারালয় আছে; পোপের উপর অন্য কাহারও শাসন চলে না; তাঁহার কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া থাকে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত তাঁহার চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং অন্ততঃ ক্যাথলিকপ্রধান রাষ্ট্রগুলি তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করিয়াছে।

'পোপে'র শাসনাধীন এলাকার (papacy) পদমর্যাদা

কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্য এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। বিভিন্ন শান্তিচুক্তিতে তাঁহার প্রতিনিধির স্থান হয় নাই। তাঁহার চুক্তিগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় এবং তাঁহার কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কর্মক্ষেত্রও ধর্মের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ।

১৯২০ সালে তাঁহার সহিত ইটালীর যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে প্রায় ৪০০ অধিবাসীসহ প্রাসাদ ও তাহার চারিপাশের ১৬০ একর জমির উপর পোপের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারও ইটালী মানিয়া লইয়াছে। পোপের তরফ হইতে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে বিশেষভাবে আহুত না হইলে ধর্মসম্পর্কিত বিষয়ের বাহিরে অন্য যে কোন বিসংবাদে কোনরূপ হস্তক্ষেপ তিনি করিবেন না।*

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society):—

রাষ্ট্রিক চিন্তার ইতিহাসে কেহ কেহ উভয়কে এক করিয়া দেখিলেও রাষ্ট্র ও সমাজ যে এক নহে তাহা আজ দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করা যায়। জৈবধর্মের প্রেরণায় সমাজের উৎপত্তি। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে সমাজের আবির্ভাব, রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজের তাৎপর্য বিস্তৃততর ও গভীরতর। জৈবপ্রেরণায় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ যখন তাহারই মত অপরাপর মানুষের সহিত 'একাত্মবোধের ভিত্তিতে' (Consciousness of the kind) আসিয়া মেশে, তখনই সমাজ গড়িয়া ওঠে। আর রাষ্ট্র হইল এক বিশেষ প্রকারের মানবিক

রাষ্ট্র ও সমাজ State (and Society)

*Garner—Ibid, P. 59-61

সামাজিক সংঠগন। তাই দেখি আদিম মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত। কিন্তু তখনও রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। রাষ্ট্র আসিয়াছে অনেক পরে, মানুষের সমাজ জীবন যখন অনেক বেশী জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চিন্তা-চেতনায় যখন আসিয়াছে একাধারে গম্ভীরতা ও সূক্ষ্মতা।

স্নেহ-প্রেম, ঈর্ষা-দ্বেষ, খ্যাতির লোভ, প্রশস্তির মোহ, এই সবকিছুই মানুষের জীবনকে মথিত করে। এই সব প্রেরণার উৎস রাষ্ট্রিক সংগঠন নয়। এই সবের তাড়নায় মানুষ যে অপর মানুষের সহিত মেশে তাহাও রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া নহে। সে তাহার জৈব ও আত্মিক প্রয়োজন মিটাইতে অন্যান্য মানুষের সহিত মিশিয়া যে নানাবিধ সামাজিক সংগঠন গড়িয়া তুলে তাহাও মূলতঃ নিজস্ব তাগিদে, রাষ্ট্রের তাগিদে নহে। রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপকেই আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই রাষ্ট্র মানুষের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণের মারফৎ তাহার প্রেরণা-কামনাকে লালিত বা খর্ব করিতে পারে, তাহাদের পথ উন্মুক্ত করিয়া সুষ্ঠুতর পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, আর দমনের প্রয়াসে সংগঠনগুলিকে বিনষ্টও করিতে পারে। রাষ্ট্র সমাজের সন্তান; সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু তাহার সহিত এক হইতে পারে না।*

উপরের যুক্তি অনুসরণ করিলে উভয়ের সম্পর্কের আর একটা দিকও নজরে পড়িবে। সমাজের সার্বিক রূপ যেমন রাষ্ট্রের মধ্যে দেখা দেয় না, তেমনি আবার মূল সামাজিক শক্তির প্রতিফলন রাষ্ট্রের মধ্যে হইতে বাধ্য। রাষ্ট্র সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, আবার সামাজিক প্রেরণা, চিন্তাধারা, প্রথা, ঐতিহ্য রাষ্ট্রের গতিপথ নির্দেশিত করিতেছে। এইভাবে নিরন্তর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের ভিতর দিয়াই উভয়ের পরিস্ফুটন লক্ষ্য করিতে হইবে।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন (State and other associations): রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক পার্থক্য বুঝিবার পর রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ। এ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে তাহাদের গঠনরূপ কার্য-পদ্ধতি, ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যবস্তুতে;

১। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের উদ্ভব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভিতর, আর শতসহস্র সামাজিক সংগঠন জন্মলাভ করিতেছে মানুষের স্বেচ্ছামূলক

* Maciver—Ibid p, 48

পরিকল্পনার ভিতর দিয়া। মানুষের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক, কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করা বা না করা তাহার ইচ্ছাধীন। অন্যান্য সংগঠনের সদস্যপদ সে ইচ্ছা করিলেই বর্জন করিতে পারে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহা পারে না।

রাষ্ট্র ও সামাজিক সংগঠনের পার্থক্য

২। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ ইচ্ছামত যতগুলি সম্ভব সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু একটিমাত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াই তাহার পক্ষে সম্ভব।

৩। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ: অন্যান্য সংগঠনের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে, নাও পারে; বহু রাষ্ট্রাধিকৃত এলাকায় তাহাদের কাজ ছড়ান থাকিতে পারে।

৪। চতুর্থতঃ, সাধারণ সামাজিক সংগঠনগুলির উদ্দেশ্য কতিপয় বিশিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর মধ্যেই নির্দিষ্ট থাকে; রাষ্ট্রের লক্ষ্য বহু-বিস্তৃত এবং ক্রমেই ব্যাপকতর হইতেছে। বলা যায়, যে কোন বিষয়ই মনুষ্য সমাজকে কৌতুহলাবিষ্ট করে, সে সবকিছুর মধ্যেই রাষ্ট্র ক্রমে আপন হস্ত প্রসারিত করিতেছে।

৫। পঞ্চমতঃ, সীমাবদ্ধ অর্থে বলা যায় যে নানাবিধ সংগঠন মনুষ্যসমাজে বুদ্বুদের মত ফুটিয়া উঠিতেছে আবার মিলাইয়া যাইতেছে; তাহাদের তুলনায় রাষ্ট্র অনেক বেশী স্থায়ী সংগঠন। অবশ্য, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মত সংগঠনও আছে, যাহা শত শত রাষ্ট্রের ভগ্নশেষের উপরে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

৬। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্র চরম পীড়নমূলক ক্ষমতার অধিকারী, অন্যান্য সংগঠন নহে। রাষ্ট্র আইনভঙ্গকারীকে আইনানুমোদিতরূপে চরম শাস্তি দিতে পারে; অন্যান্য সংগঠন নানারূপ সামাজিক চাপ সৃষ্টি করিতে পারে, শেষ পর্যন্ত নিজ সংস্থা হইতে বিতাড়ন পর্যন্ত করিতে পারে। অধিক কিছু করিবার বিধিসম্মত অধিকার তাহাদের নাই।

৭। সপ্তমতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার তাৎপর্য হইল যে অন্যান্য সকল সংগঠনের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম রাষ্ট্রের সম্মতিসাপেক্ষ। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই তাহাদিগকে বাঁচিতে ও কাজ করিতে হইবে। রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করিলে যে কোন সংগঠনকে আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে তাহা পারিয়া উঠিবে কি না সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রনায়কগণ হঠাৎ উন্মাদ হইয়া পারিবারিক প্রথাকে অচল ঘোষণা করিতে পারেন। বলিতে পারেন, মাতা, পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগিনী, কোন সম্পর্কই আর আইনসিদ্ধ রহিল না। কিন্তু সে আইন যে বিফল হইবে

তাহা অবধারিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত চরম ক্ষমতা থাকিলেও সে সমাজের সন্তান, সামাজিক শক্তির টানাপোড়েন তাহাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government): রাষ্ট্র ও সরকার যে সমার্থক নহে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এস্থলে তাহাদের পার্থক্যগুলির বিশদ বর্ণনা করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য

১। রাষ্ট্র যে বিশাল সামাজিক সংগঠন, সরকার তাহার একটি উপাদান, তাহার কার্যকরী সমিতি মাত্র। সরকারের মারফৎ রাষ্ট্রের ইচ্ছা ঘোষিত ও কার্যে পরিণত হয়।

২। সুতরাং, যেহেতু সরকার রাষ্ট্রের agent বা প্রতিনিধি মাত্র, সেহেতু সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রেরই গুণ, সরকারের নহে।

৩। সরকার সাময়িক সংগঠন; কিছুদিন পরপর তাহার রূপান্তর ঘটে তুলনামূলকভাবে স্থায়ী রাষ্ট্রিক সংগঠনের মধ্যে।

৪। রাষ্ট্র গঠিত হয় সমগ্র জনমণ্ডলকে লইয়া; এই বিশাল জনসমষ্টির একটা অংশমাত্র শাসনকার্যে জড়িত থাকে এবং সরকার বলিতে সেই অংশটুকুই বুঝায়। অতএব এ সিদ্ধান্ত খুবই স্বাভাবিক যে সরকার হইল রাষ্ট্রের একটি উপাদান, তাহার অংশমাত্র।

৫। অবশ্য অনেক লেখক বলেন যে রাষ্ট্র হইতেছে বিমূর্ত ভাববস্তু (abstract idea) এবং সরকার হইতেছে তাহারই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ (concrete expression। তবে এ পার্থক্য স'ত্র গৃ'ীত হয় না। রাষ্ট্র যে কল্পিত ভাব নহে, ইহাও যে একটি সামাজিক সংগঠন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

রাষ্ট্র ও জাতি (State and Nati.n): জাতি বলিতে আমরা যে বিশেষরূপে ঐক্যবদ্ধ জনসমাজকে বুঝি তাহার কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।* প্রাথমিকভাবে শুধু এটুকু বলিয়া রাখা দরকার যে দুইটি কথা সমার্থক নহে, তাহাদের তাৎপর্য ভিন্ন। তবে ইতিহাসের গতিতে দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্র তাহার বিভিন্ন পর্যায় পার হইয়া ক্রমেই জাতির ভিত্তিতে সংগঠিত হইবার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমরা পরের অধ্যায়ে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অতিরিক্ত পাঠ্য

GARNER—Political Science and Government.
MACIVER—The Modern State.
LASKI—Grammar of Politics.

*—ষষ্ঠ অধ্যায় (জাতিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তিতত্ত্ব

(Theories of the Origin of the State)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাঁচটি তত্ত্বের বিচার আবশ্যক। সেগুলি হইল যথাক্রমে, (১) ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্ব, (২) সামাজিক চুক্তি মতবাদ, (৩) শক্তিমূলক মতবাদ, (৪) পরিবার সম্প্রসারণের মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক, এবং (৫) ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদের তত্ত্ব।

১। ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্বে দাবী করা হয় যে ঈশ্বর স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রশাসনের ভার তাঁহার প্রতিভূর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। কখনও যাজক-প্রধান কখনও বা রাজা এই অধিকার দাবী করিয়াছেন। অর্থাৎ ইঁহাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মানিলেই চলিবে না, ইহাদের আজ্ঞা অমান্য করা ঈশ্বরদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য হইবে। আদিম সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য এ তত্ত্ব যতই উপযোগী হউক না কেন, বস্তুতঃ যুক্তির দিক হইতে এ তত্ত্ব অবাস্তব, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিরোধী ও অগ্রহণীয়।

২। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল প্রবক্তা তিনজন,—হবস্, লক্ ও রুশো। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং মানুষ স্বেচ্ছায় চুক্তির মারফৎ সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। উপরোক্ত প্রবক্তা তিনজন তাঁহাদের নিজস্ব যুক্তি-কৌশলে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তিন প্রকার সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। হবসের মতে অবাধ রাজতন্ত্র শ্রেষ্ঠ। লক্ মনে করেন সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রই বাঞ্ছনীয়। রুশোর সমর্থন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রতি। যাহা হউক, এ মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিসঙ্গত নহে। তথাপি ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্বের উপর মারাত্মক আঘাত হানিয়া, রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে মানবাধিকার ও প্রজাসম্মতির দাবী ঘোষণা করিয়া এ তত্ত্ব রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখিয়া গিয়াছে।

৩। শক্তিমূলক মতবাদে বলা হইতেছে যে শক্তির দ্বারা কোন এক ব্যক্তি দলের উপর তাহার প্রভুত্ব স্থাপন করে, কোন একদল একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিতর অন্যান্য দলের উপর তাহার প্রাধান্য বিস্তার করে, এবং এইরূপেই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতরকার জনসমাজ কর্তৃপক্ষের আজ্ঞা-পালনের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়; অর্থাৎ, রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু একমাত্র বলপ্রয়োগের মারফতই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে একথা মানা যায় না। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রমাণ হয় যে মানুষের সংঘবদ্ধ সমাজ-প্রতিষ্ঠা ও আইন-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবার অভ্যাসের পিছনে অন্যান্য নানাবিধ উপকরণ রহিয়াছে। যদিও শক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাহা ছাড়া, এইরূপ বিশ্লেষণে রাষ্ট্রচরিত্রের মধ্যে জনসম্মতি ও ন্যায়নীতির ভূমিকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। অবশ্য, বিপরীত দিক হইতে জনসাধারণের সচেতন সম্মতিই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি এ কথা বলাও আংশিক সত্যকেই বাড়াইয়া বলা মাত্র।

৪। পরিবার সম্প্রসারণের তত্ত্বে ঘোষণা করা হয় যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে পরিবার সম্প্রসারণের মারফৎ। অর্থাৎ, পরিবারের কর্তার শাসন পরিবার মানিয়া চলে, বংশবৃদ্ধির ফলে পরিবার বাড়িয়া ক্ল্যানে (clan) পরিবর্তিত হইল, কিন্তু সকলে বংশপ্রধানের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিল। পুনরায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একটি ক্ল্যান বহু ক্ল্যানে বিভক্ত হইল, ট্রাইবের সৃষ্টি হইল, কিন্তু এখনও তাহারা পূর্বের ন্যায় প্রধানের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে লাগিল। এই ভাবেই একটি অঞ্চলে রক্তের সম্বন্ধ ও প্রধানের কর্তৃত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়িয়া ওঠে। এই তত্ত্বেরই দুইটি ব্যাখ্যা আছে, কেহ মনে করেন কর্তৃত্ব পিতা হইতে পুত্রে বর্তাইয়া পিতৃকর্তৃত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। আবার অন্যেরা বলেন কর্তৃত্ব বর্তাইয়াছে মাতা হইতে কন্যায় এবং রক্তের সম্পর্ক নির্ধারিত হইয়াছে মাতার সম্পর্ক-সূত্রের দ্বারা। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে উভয় তত্ত্বই বর্তমানে বর্জিত হইয়াছে। রক্তের সম্বন্ধ সঞ্জাত নৈকট্যবোধ নিশ্চয়ই আদিম মানুষের সমাজ-গঠনে গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া পরিবার সম্প্রসারণের মারফৎ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, এ কথা অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক।

৫। বর্তমানকালে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদের তত্ত্বই গৃহীত হয়। ইহার মূল বক্তব্য হইতেছে ইতিহাসের গতিপথে সমাজের ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া আধুনিক রাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সম্পত্তিসম্পর্ক, রক্তের সম্বন্ধবোধ, আত্মরক্ষার প্রয়োজন ও শক্তির সংগঠন ও ব্যবহার, ধর্মের অনুশাসন ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা—এই প্রত্যেকটি উপকরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া আধুনিক রাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে। প্রাথমিক স্তর হইতে সমাজ জীবনের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ফলস্বরূপ ইহার আবির্ভাব এবং সেই ক্রম পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই ইহার অগ্রগতি।

মানুষের ইতিহাস রচনারও বহুপূর্বে, মানবজীবনের অতি প্রত্যুষে মানব সমাজ কি করিয়া প্রথমে রাষ্ট্ররূপ ধারণ করিল, সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণসিদ্ধ তথ্য আজও হাজির করা যায় নাই। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে বিভিন্ন মনীষী তাঁহাদের যুক্তি বিশ্লেষণ ও অনুমানের সাহায্যে নানা তত্ত্ব হাজির করিয়াছেন। ফলে, এমন হইয়াছে যে একের যুক্তি অপরে খণ্ডন করিয়াছেন। এক যুগে যে বিশেষ মত প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, পরবর্তী যুগে তাহাই আবার বর্জিত হইয়াছে। তথাপি যুগের পর যুগ ধরিয়া মানুষ রাষ্ট্রের জন্ম-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। মত ও যুক্তি, সংঘর্ষ ও গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়া, তমসাচ্ছন্ন অতীতের বিভিন্ন দিক পরিচিতির আলোকে উদ্ভাসিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমেই সমাজতত্ত্ব (Sociolgy), নৃতত্ত্ব (Anthropology), মানব সমাজের কুলগত বিশ্লেষণ (Ethnology), তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তির সমস্যায় অধিকতর আলোকপাত করিয়াছে। ফলে বর্তমান পর্যায়ে আমরা মোটামুটি সন্তোষজনক একটি ব্যাখ্যায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি, এবং ঐ তত্ত্বের নামকরণ হইয়াছে—ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদের তত্ত্ব (Historical or Evolutionary Theory)।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় অন্যান্য তত্ত্বগুলিও জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। পূর্বেকার বিভিন্ন আনুমানিক তত্ত্বকে কেন বর্জন করা হইল তাহা বুঝিতে পারিলে যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাহাকে বোঝা আরও দৃঢ়ভিত্তিক হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ঐ তত্ত্বগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে যতটুকু সত্যের আভাস ছিল তাহাও জানা প্রয়োজন। সর্বোপরি, ভুলিলে চলিবে না যে, এই সমস্ত তত্ত্ব কখনও কখনও সমকালীন চিন্তাজগতে এমন প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল যে বাস্তব জগতে তাহার প্রতিক্রিয়া তদানীন্তন ও পরবর্তী ইতিহাসকে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সে প্রভাব এখনও নানারকমে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিভিন্ন তত্ত্বগুলির সহিতই আমাদের পরিচিত হইতে হইবে।

উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্বের সহিত পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক যে পাঁচটি তত্ত্ব লইয়া আমাদের আলোচনা করিতে হইবে তাহা হইল :

১। ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্ব (Theory of Divine Origin)।

২। সামাজিক চুক্তি (Social Contract Theory)।

৩। শক্তিমূলক ব্যাখ্যা (Theory of Force)।

৪। পরিবার সম্প্রসারণের তত্ত্ব—পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক (Patriarchal or Matriarchal Theory)।

৫। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদের তত্ত্ব (Historical or Evolutionary Theory)

ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্ব (Theory of Divine Origin)

এ তত্ত্বের সহজ অর্থ হইল ঈশ্বর স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রাষ্ট্র-প্রধান তাঁহারই নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া থাকেন। সুতরাং রাষ্ট্রনায়ক হইতেছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি; তাঁহার কার্যের হিসাব নিকাশ একমাত্র ভগবানের বিচারসভাতেই হইতে পারে। পার্থিব মানুষের নিকট কোনপ্রকার কৈফিয়ত দিতে তিনি বাধ্য নহেন। 'ভগবানের মারের' উপর যেমন আবেদন নাই, তেমনি ঈশ্বর-প্রতিভূ রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশের কোন প্রতিবিধান নাই। ধর্মবিশ্বাসী মানুষকেও সর্ববিধ হুকুমনামাই মানিয়া চলিতে হইবে—প্রতিবাদ ঘোরতর গর্হিত পাপ।

তত্ত্বের অর্থ

এই ধর্মীয় তত্ত্ব রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রাচীনতম তত্ত্ব। অতি প্রাচীন যুগে

প্রকৃতির রহস্য মানুষের নিকট যখন মূলতঃ অনাবিষ্কৃত, নিষ্ঠুর ও ভীষণ প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করিবার মন্ত্র-তন্ত্র, কলা কৌশলের দৈব বা ঐশী শক্তির অধিকারী বলিয়া আগাইয়া আসিয়াছিল পুরোহিত বা ঐন্দ্রজালিকেরা। অতি সহজেই সমাজে তাহারা নিজ-প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল এবং রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করিয়াছিল। ধর্মবিশ্বাস রাষ্ট্রশক্তিকে সংহত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। প্রাচীন মিশরে রাজাই প্রধান ধর্মযাজক আবার প্রজারা তাঁহাকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছে। হিন্দু পুরাণে বহু রাজারই দেবাংশে জন্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে আছে যে মানুষ প্রার্থনা করিতেছে: "হে প্রভো! নায়কবিহীনে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের নিকট একজন নায়ককে প্রেরণ কর, যাহাকে আমরা পূজা করিব এবং যিনি আমাদের রক্ষা করিবেন।" প্রাচীন ইহুদিরাও ধর্মীয় শাসনই রাজ্য শাসনের ভিত্তি বলিয়া মনে করিতেন। মোজেসের (Moses) নিকট রাজ্যশাসনের মূল আইনগুলি ঈশ্বরের আদেশরূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল। Old Testament-এ অনুরূপ বহু নিদর্শন ছড়ানো রহিয়াছে। গ্রীক ও রোমানরা রাষ্ট্রকে মূলতঃ মানুষের স্বভাবজাত সংস্থা বলিয়া মনে করিতেন। খ্রীষ্টের বিখ্যাত বাণীতে "সীজারের যাহা প্রাপ্য সীজারকে, এবং ঈশ্বরের যাহা প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও"*—ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পৃথক করিয়া দেখিবার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সেণ্ট পল লিখিলেন: "প্রত্যেকেই উচ্চতর শক্তির বশ্যতা মানিয়া লউক। কারণ ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও ক্ষমতা নাই। যে শক্তি বর্তমান তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সুতরাং যে কেহ সে শক্তির প্রতিরোধ করে, সে ঈশ্বরের অনুজ্ঞারই প্রতিরোধ করে; এবং যাহারা তাহা করে তাহাদের জন্য নির্ধারিত আছে অনন্ত নরক।"† সেণ্ট পলের সময় হইতেই রোমান সম্রাটদের সহিত খ্রীষ্টধর্মের বোঝাপড়া শুরু হয়। ইহারই জের টানিয়া ইউরোপে মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ও ক্ষমতাশালী রাজাদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। উভয় পক্ষই নিজেকে ঈশ্বরাভিষিক্ত বলিয়া দাবী করিতে থাকেন। মীমাংসা যেমনই হউক, বুঝা যাইতেছে, রাজনীতি ও ধর্ম ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া ছিল। মধ্যযুগের শেষভাগে

তত্ত্ববিকাশের ইতিহাস

*Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's."

†Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God, the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.

New Testament-Romans xii, [*Suggested Additional Reading* - 1. Ghoshal —A History of Hindu Political Theories, 2. Gettell—Readings in Political Science]

পোপের ক্ষমতা খর্ব হইল; ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজারা অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। এবং এই সময়ে ধর্মীয় রাজশক্তির তত্ত্ব নবরূপে আবির্ভূত হইল।

রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকার (Divine Right of Kings): ইউরোপে ধর্মবিপ্লবের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক পোপের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু মার্টিন লুথার, জুইংলি, ক্যালভিন প্রভৃতি প্রোটেস্ট্যান্ট (Protestant) ধর্মবিপ্লবের নবনায়কগণ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বশ্যতা জানাইবার জন্য জনসমাজকে আহ্বান জানাইলেন। মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন রাজশক্তির সহায়তায় এই সকল ধর্মনায়কগণ তাঁহাদের ধর্মমত পোপের রোষানল হইতে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন রাজা এই মতবাদকে শুধু পোপের বিরুদ্ধে নয়, জনতার ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের বিরুদ্ধেও, ব্যবহার করিলেন। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেমস্ স্টার চেম্বারের সম্মুখে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করিলেন যে, ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন যেরূপ ঈশ্বরদ্রোহী বিধর্মীর আচরণ, অনুরূপ রাজা কি করিতে পারেন বা না পারেন সে সম্বন্ধে বাদানুবাদও প্রজার পক্ষে ধর্মদ্রোহিতা।* স্টুয়ার্ট রাজবংশের আমলের কিছুকাল পরের লেখক স্যার রবার্ট ফিলমারও (Sir Robert Filmer) তাঁহার "পেট্রিয়ার্কা" (Patriarcha) গ্রন্থে একই মতের সমর্থন করেন। ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের পুত্রের শিক্ষক বসুয়ে (Bossuet) রাজার উপর আক্রমণকে ধর্মদ্বেষিতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া রাজার মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সন্দর্শনের জন্য সর্বসাধারণকে আমন্ত্রণ জানাইলেন।

তত্ত্বের প্রকারভেদ

চারিটি সূত্রের ভিতর দিয়া এই তত্ত্বের সারাংশ উপস্থিত করা যায়:

নূতন রূপে ইহার মূল চারিটি সূত্র

১। রাজতন্ত্র ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং রাজার রাজ্য শাসনের অধিকার ঈশ্বরের নিকট হইতেই মিলিয়াছে।

২। রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিকভাবেই চলিবে এবং রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকার পিতা হইতে পুত্রে বর্তাইবে।

৩। একমাত্র ঈশ্বরের নিকটেই রাজা কৈফিয়ৎ দিতে পারেন।

---

* "It is atheism and blasphemy to dispute what God can do; good Christians content themselves with His will revealed in his words, so it is presumption and high contempt in a subject to dispute what a king can do, or say that a king cannot do this or that, but rest in that which is the king's revealed will in his law"—Gettell—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ।

৪। রাজশক্তি প্রতিরোধের প্রয়াস পাপ।

এমন কি অত্যাচারী এবং অন্যায়কারী রাজার শাসনও যে মানিয়া চলা উচিত, রাজা প্রথম জেম্‌স সে সম্বন্ধেও যুক্তি খাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে,—রাজার অন্যায় ও অবিচার আসলে প্রজাদের শাস্তি। ঈশ্বর যখন রাজার মারফৎ প্রজাদের এই শাস্তিবিধান করিতেছেন, তখন তাহাদের কর্তব্য হইল নম্রতার সহিত সে শাস্তি মানিয়া লওয়া।

সমালোচনা: কিন্তু প্রথম জেম্‌স্ যাহাই বলুন না কেন, অচিরেই রাষ্ট্রিক চিন্তাজগতের ক্ষেত্রে এ তত্ত্বকে স্বকীয় গৌরবের আসন পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে প্রথম জেম্‌সের পুত্র, পরবর্তী রাজা প্রথম চার্লসের যুদ্ধে পরাজয়, তাঁহার বিচার ও মৃত্যুদণ্ড, তথাকথিত ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত রাজকীয় মর্যাদায় মারাত্মক আঘাত হানিল। একদিকে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার, অপরদিকে তত্ত্বের ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি মতবাদের অভ্যুত্থান—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের পরাজয় অনিবার্য করিয়া তুলিল। উপরন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্র যে স্বতন্ত্র এ বোধ যতই প্রসারলাভ করিতে লাগিল, ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্ব ততই পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। সর্বোপরি, আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে রাষ্ট্রকে মানুষের সামাজিক সংগঠন হিসাবে দেখিয়া এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে ইহার ক্রমবিকাশ নির্ণীত করিয়া 'ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্বকে' সম্পূর্ণ বর্জন করা হইল।

তত্ত্বের উপর বাস্তব ইতিহাস ও বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের ও সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রতিক্রিয়া

এই তত্ত্ব বিজ্ঞান-বিরোধী, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকে। যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে। ইহা কেবল রাজকীয় কর্তৃত্বকে সমর্থন করে। শুধু বশ্যতা স্বীকার করা ও হুকুম তামিল করা, সাধারণ মানুষের জন্য এইটিই কর্তব্যমাত্র বলিয়া নির্দেশ দেয়। রাজার পক্ষে অন্যায় করা ও প্রজার পক্ষে অন্যায় সহ্য করা—এই উভয়ের প্রতিই ইহার সমান সমর্থন। ঈশ্বর স্বহস্তে একটার পর একটা রাজ্য বানাইয়া একের পর এক রাজ পরিবারকে শাসনভার দিয়া গিয়াছেন,—দাবিদারদের উচ্চ চিৎকার ভিন্ন তাহার আর কোনও প্রমাণ নাই। বরং যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, হিংস্রতা ও হীনতার ভিতর দিয়া রাজারা কিভাবে সিংহাসন দখল করিয়াছেন, তাহা সুপরিচিত। যদি কোন রাজাকে ঈশ্বরের

১। ইহা বিজ্ঞান সম্মত নহে।
২। রাষ্ট্রাধিপকে ঈশ্বরের প্রেরিত কল্পনা করা অযৌক্তিক
৩। স্বৈরাচারিতার পক্ষপাতী প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তি

আশীর্বাদপূত বলিয়া কল্পনা করাও যায়, তাহা হইলেও তাঁহার পুত্র-পৌত্র বংশানুক্রমিকভাবে ঈশ্বরের দূত হইবে কোন্ যুক্তিতে? রাজ্য লইয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তবে প্রজারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বিচার করিবে কি করিয়া? ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকৃত ব্যাখ্যাতা কে—রাজা না ধর্মগুরু? একাধিক ধর্মাবলম্বী জনসমষ্টি রাষ্ট্রে রাজার বিপরীত ধর্মাবলম্বী প্রজাদের গতি কি হইবে? এই রাজ্যে তাহারা কি ধরণের ব্যবহার প্রত্যাশা করিবে—রাজাকেই বা তাহারা নিজ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিবে কি? রাজতন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য ধরণের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তো কোন ব্যাখ্যাই এই তত্ত্ব হইতে মিলিবে না।

ইহার গুরুত্ব: এককথায় বলিতে গেলে এই তত্ত্ব ভ্রান্ত। কিন্তু তত্ত্ব ভুল হইলেও, সেই সুদূর অতীতে সরল ধর্মবিশ্বাসে ভর করিয়া রাজাকে ঈশ্বরের দূত বলিয়া মানিয়া লওয়ায়, শাসন-ব্যবস্থার শৃংখলা আনয়ন যে সহজ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হইলেও ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ভাবা সঠিক হইবে না। এক ধর্মবিশ্বাসী জনসমষ্টি লইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা উচিত—এই মতের ভিত্তিতে বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগেও পাকিস্তান ও ইজ্রেল রাষ্ট্র গঠিত হইতে দেখা গেল। তাহার উপর পাকিস্তান তো কিছুদিন পূর্বে নিজেকে ইস্লামীয় প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে এবং শাসনকার্য ইস্লামীয় নীতির ভিত্তিতে পরিচালনার কথা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে। অবশ্য নূতন একনায়কের আবির্ভাবের সময় এই সংবিধান সংবৃত হয়। বুঝিতে হইবে, পশ্চাৎপদ চিন্তার প্রভাব মানুষের মনে এখনও প্রবল; সুতরাং এতত্ত্ব শুধু অতীত ইতিহাসের পর্যালোচনা নহে, ইহার বাস্তব গুরুত্ব এখনও রহিয়াছে।

রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক যুগে জনতাকে বশ্যতা শিখাইয়াছে, রাষ্ট্রশক্তিকে দৃঢ় করিয়াছে

সামাজিক চুক্তি মতবাদ: (Social Contract Theory)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্বের উপর প্রবল আঘাত হানিয়াছিল। বস্তুতঃ, রাষ্ট্র যে মানবিক চুক্তির ফলপ্রসূত একটা সংস্থা এই ধরণের চিন্তা বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে কৌটিল্য রাষ্ট্রের প্রথম উৎপত্তির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যে রাজা প্রজার মধ্যে চুক্তির ভাবটাই প্রকট হইয়া উঠে। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এ ধারণা প্রচলিত ছিল; অবশ্য প্লেটো ও

মতবাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস

কৌটিল্য

অ্যারিস্টট্‌ল এ যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্যই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান আইনের (Roman Law) ভিতর হইতে এ ধারণার সূত্র চলিয়া আসিতেছে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত। ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা যাইতেছে যে এ ধরণের চিন্তা রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। ফরাসী পুস্তিকা Vindiciae Contra Tyrannos (১৫৭৯) ও রিচার্ড হুকারের (Richard Hooker)—Laws of Ecclesiastical Polity (১৫৯৪) প্রভৃতিতে সামাজিক চুক্তির মতবাদকে উপস্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু এত দীর্ঘ ইতিহাস সত্ত্বেও যে তিনজন চিন্তানায়কের লেখার ভিতর দিয়া সামাজিক চুক্তির মতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিল, তাঁহারা হইতেছেন টমাস হবস্ (Thomas Hobbes)—১৫৮৮-১৬৭৯, জন লক্ (John Locke)—১৬৩২-১৭০৪ এবং জাঁ জাক্ রুশো (Jean Jacques Rousseau)—১৭১২-১৭৭৮।

প্রাচীন গ্রীক চিন্তা

প্লেটো, অ্যারিস্টটল ইহার বিরুদ্ধে; রোমান আইনের ধারা মধ্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের লেখা ও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হবস্, লক্ ও রুশোর চিন্তার চরম বিকাশ

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বিষয়গুলি ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—

(১) রাষ্ট্রের উৎপত্তি কি করিয়া হইল তাহা ব্যাখ্যা করা।

(২) শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ শাসকের কর্তৃত্বের সীমা ও প্রজা পুঞ্জের স্বাধীনতার সীমা নির্দেশ করিয়া রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল সমস্যার সমাধান করা। এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই মতবাদের প্রধান তিন প্রবক্তা তিনভাগে ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; বিশ্লেষণের মত সিদ্ধান্তও তাঁহাদের পৃথক। কিন্তু যে যেভাবেই এই তত্ত্বকে হাজির করুন না কেন, মূল যতটুকু বক্তব্য সকলের ক্ষেত্রেই এক থাকিয়া যাইতেছে তাহা প্রাথমিকভাবে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ইহার মারফৎ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও রাষ্ট্রের চরিত্র উভয়বিধ ব্যাখ্যার সংস্থাপন

সামাজিক চুক্তি মতবাদ দুইটি স্তম্ভের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ঃ

১। 'প্রাকৃতিক অবস্থার' (State of Nature) অস্তিত্ব, ২। মানুষের স্বেচ্ছাকৃত সামাজিক চুক্তির (Voluntary Social Contract) মাধ্যমে প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

মতবাদের দুইটি স্তম্ভ

অর্থাৎ রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে মানুষ যে অবস্থায় বাস করিত তাহাকে 'স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। তখন সংগঠিত সমাজ ছিল না; তাই সামাজিক আইন-কানুন ছিল না; আইন কার্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষও ছিল না। যাহা ছিল, তাহাকে বলা হইতেছে স্বাভাবিক আইন (Law of Nature) ও স্বাভাবিক অধিকার (Natural Right)। মনুষ্যকৃত আইন তখন ছিল না; অথচ মানুষকে চলা-ফেরা, বাঁচিয়া থাকা, মেলামেশার তাগিদে কোন না কোন নিয়ম শৃংখলা মানিয়া চলিতেই হইবে। প্রকৃতি হইতে মানুষ নিয়ম-শৃংখলা বা আইন যতটুকু বুঝিয়া জীবনে প্রয়োগ করিল, তাহাই হইল স্বাভাবিক বা প্রকৃতিদত্ত আইন। যেহেতু কোনরূপ মানবিক কর্তৃপক্ষ নাই, সেহেতু সে সদামুক্ত, সদাস্বাধীন। তাই 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' প্রকৃতির আইন মানিয়া, মানুষ যে স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করিতেছিল, তাহাই হইল, স্বাভাবিক অধিকার।

১২। "প্রাকৃতিক অবস্থা"

ইহার সাথে যে বিষয়টি সকলেই মানিয়া লইয়াছেন তাহা হইল এই যে, প্রথমে 'প্রাকৃতিক অবস্থা' ভাল বা মন্দ যাহাই থাকুক না কেন এমন একটা অবস্থা ক্রমে সৃষ্ট হইল যখন মানুষকে স্বেচ্ছায় 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে হইল। ফলে প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তে আসিল রাষ্ট্র, স্বাভাবিক আইনের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় আইন, স্বাভাবিক অধিকারের বিকল্পে রাষ্ট্রসম্মত অধিকার।

"প্রাকৃতিক অবস্থা বর্জনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র সৃষ্টি হইল একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে,—যেন সমস্ত মানুষ কোন এক সময়ে একসঙ্গে মিলিত হইয়া প্রতিশ্রুতি-আবদ্ধ হইল যে তখন হইতে 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র অবসান এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিল। ইহার তাৎপর্য এই যে—ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া দেন নাই, আপনা হইতেও ইহা গড়িয়া উঠে নাই, মানুষই ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে।

২। "সামাজিক চুক্তির" মাধ্যমে "প্রাকৃতিক অবস্থা" বিসর্জন ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি

এইবার মূল প্রবক্তাদের মতামতগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা যাক।

হবস্ঃ হব্‌সের বিখ্যাত গ্রন্থ 'লেভায়াথান' (Laviathan) প্রকাশিত

হয় ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে, যদিও ইহার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছিল বহুপূর্বে, প্রায় ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলণ্ডের তৎকালীন সংঘাতমূলক রাজনীতির প্রগাঢ় প্রভাব পড়িয়াছে তাঁহার লেখার উপর। রাজা প্রথম চার্লসের সময়কার কথা। রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্বে অভিভূত, তদানীন্তন গণতান্ত্রিক দলের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারায় বিপদাশংকায় ত্রস্ত, অন্তর্দ্বন্দ্বে খর্বিত ধর্মমতের উপর আস্থাস্থাপনে অক্ষম হব্‌স্ সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভিত্তিতে নিরংকুশ রাজতন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করিলেন। অবশ্য রাজপরিবারের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ছিল। তিনি রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বাল্যে তাঁহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

হব্‌সের চিন্তার পটভূমিকা

তিনি তাঁহার তত্ত্বকে উপস্থাপিত করিলেন মানবচরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বকীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে। তাঁহার মতে মানুষ হইল চরিত্রগতভাবে স্বার্থপর, ধূর্ত, নির্দয়, লোভী ও আক্রমণমুখী। সুতরাং প্রাকৃতিক অবস্থায় যে যাহা পাইত লুটিয়া লইত, যতক্ষণ পারিত ধরিয়া রাখিত, নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাইতেই সর্বদা ব্যস্ত থাকিত। স্বাভাবিক আইন পরিণত হইয়াছিল—'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিতে। আপন ক্ষমতাবলে যে যতটুকু বজায় রাখিতে পারিত, ততটুকুই টিকিয়া থাকিত তাহার স্বাভাবিক অধিকার।

মানব চরিত্র সম্বন্ধে হব্‌সের ব্যাখ্যা: মানুষ মূলতঃ মন্দ, অসামাজিক

"প্রাকৃতিক অবস্থা" দুঃসহ

বুঝিতে কষ্ট হয় না যে এ অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাই মানুষ একত্র হইয়া চুক্তি করিল, প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্রের পত্তন করিল আত্মরক্ষার প্রাথমিক তাগিদে।

সুতরাং চুক্তি

হব্‌সের মতে,—সকল মানুষ মিলিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদন করিল—প্রত্যেকে নিজের স্বাভাবিক অধিকার চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করিয়া দিল ব্যক্তিবিশেষ বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিগোষ্ঠীর হস্তে,—'যেন প্রত্যেকে প্রত্যেককে বলিতেছে যে আমি নিজেকে চালাইবার অধিকার ত্যাগ করিয়া এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিলাম এই শর্তে যে তুমিও তোমার অধিকার উহাকে অর্পণ করিবে, এবং অনুরূপভাবে উহাকে

চুক্তির মারফত সমস্ত স্বাভাবিক অধিকার ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তি গোষ্ঠীর হস্তে সমর্পণ

সকল কার্যের ক্ষমতা প্রদান করিবে।'* অর্থাৎ, সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া এক সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিগোষ্ঠী সৃষ্টি করা হইল —তাহার কার্যের প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিবার কোন অধিকারই অবশিষ্ট রহিল না। 'এইভাবে জন্মলাভ করিল বিশাল লেভায়াথান, বা শ্রদ্ধাসহকারে বলিতে গেলে মরণশীল দেবতা, অমর ঈশ্বরের ছত্রচ্ছায়ায় যিনি আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার নিয়ন্তা।'†

সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আবির্ভাব

হবস্ বলিলেন,—সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর হস্তে সর্বক্ষমতা সমর্পণ করা ছাড়া শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার আর কোনও উপায় নাই বলিয়াই লোকে এই ধরণের চুক্তি করিয়াছে। কিন্তু তিনি নিজে এই চুক্তির মধ্যে জড়িত নহেন। কারণ চুক্তিটি হইয়াছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, সার্বভৌমের সহিত নহে। ফলে, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষমতা সম্ভোগ করিবেন, কিন্তু তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে কোন কাজের জন্য, এমন কি চুক্তি রক্ষার জন্যও দায়ি করা চলিবে না।

ক্ষমতাব অধিকাবী চুক্তির উর্ধ্বে

হব্‌সের মতে সার্বভৌমের ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন শর্ত থাকিতে পারে না। হয় 'প্রাকৃতিক অবস্থার' অনিশ্চয়তা, নতুবা নিরঙ্কুশ সার্বভৌমিকের শাসন—এই দুই অবস্থার মধ্যে বাছিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' ফিরিয়া যাওয়া চলে না। মানুষকে চুক্তি মানিয়া চলিতেই হইবে। আর এ চুক্তির বন্ধন অনন্তকালব্যাপী বংশপরম্পরায় মানুষের উপর বজায় থাকিবে। আপত্তি করিবার উপায় নাই,—বিদ্রোহ করিবার অধিকার নাই।

এ ক্ষমতা শর্তাধীন নহে,—অবাধ

বিদ্রোহেব অধিকাব নাই

হব্‌স এইবার তুলনা করিয়া দেখাইলেন যে ব্যক্তিগোষ্ঠীর শাসন অপেক্ষা একজন রাজার শাসন বাঞ্ছনীয়। কারণ, রাজা শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়াছেন, তাঁহার নূতন কিছু পাইবার নাই। একটি গোষ্ঠীর হস্তে ক্ষমতা সমর্পিত হইলে সেই গোষ্ঠীর ভিতরকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, অশান্তি ও

অবাধ রাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা

* "as if every man should say to every man, I authorise and give up my right of governing myself to this man or this assembly of men, on this condition, that thou give up thy right to him, and authorise all his actions in like manner."

† "This is the generation of that great Leviathan, or rather, to speak more reverently, of that Mortal God to which we owe under the Immortal God our peace and defence".

অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিবে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হইল অবাধ, নিরংকুশ, চরম রাজতন্ত্র।

তাহা হইলে রাষ্ট্রে সাধারণের অধিকার বা স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই কি থাকিবে না? এ প্রশ্নের জবাবে হব্স্ বলিলেন,—আইন হইল সার্বভৌমিকের আদেশ, তিনিই সকল আইনের উৎস। সুতরাং স্বাধীনতা হইবে সার্বভৌমিকের দান। অর্থাৎ, হব্স্-নির্দেশিত সীমারেখার মধ্যে স্বাধীনতার পরিধি দুইটি ক্ষেত্রে ব্যপ্ত হইল:

আইন—সর্বভৌমিকেব আদেশ

(১) রাজার নিষেধ অর্থাৎ, আইনের মানা যেখানে নাই, স্বাধীনতাব অস্তিত্ব শুধু সেখানেই।

প্রজাব অবিকাব

ও (২) আত্মরক্ষার অধিকার। এই শেষোক্ত স্বীকৃতির ভিতরেই হব্সের যুক্তি পদ্ধতিতে ক্রটি রহিয়া গেল।

লক্: বাস্তবে নিরংকুশ রাজতন্ত্র যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সেই সময়ে হব্সের অনমনীয় যুক্তিজাল লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। প্রশ্ন উঠিতে লাগিল: 'প্রাকৃতিক অবস্থা' কি সত্যই এত খারাপ ছিল? যে চুক্তি অতীতে সংশোধিত হইয়াছিল, তাহা অনন্তকালের জন্য অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়া যাইবে কেন? অন্ততঃ চুক্তি মানিবার দায় উভয় পক্ষের উপর সমভাবে বর্তাইল না কেন? তাহাছাড়া, প্রথমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার পরই না আসিল সার্বভৌম রাজা;—তাহা হইলে রাষ্ট্রকে বজায় রাখিয়া রাজাকে পরিবর্তন করা যাইবে না কেন?—এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া ও তাহারই সাথে সাথে ইংলণ্ডের ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ন্যায্যতা প্রমাণিত করিয়া, লক্ সামাজিক চুক্তি মতবাদকে নূতন রূপে হাজির করিলেন তাঁহার Two Treatises on Civil Government নামক গ্রন্থে। ১৬৯০ সালে বইখানি প্রকাশিত হয়।

হব্সীয তত্ত্বেব প্রতিবাদে লক্

লক্ বলিলেন: শৃংখলা যদি পশুশালা বা বন্দীশালার শৃংখলে পরিণত হয়, তবে তাহা মানুষের কাম্য নহে। মানুষ চায় এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বাস্তবে অনুভব করা যায়, যেখানে আছে সম্পত্তির নিরাপত্তা ও ন্যায়-বিচার। লক্ ঘোষণা করিলেন: 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র দায়-দায়িত্ব সামাজিক জীবনে অবলুপ্ত হইয়া যায় না।* 'আইনের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বজায় রাখা ও তাহার পরিধিকে

"স্বাধীনতার উপর লকের গুরুত্বদান"

*The obligations of the law of nature cease not in society.

বিস্তৃত করিয়া লওয়া, তাহাকে ধ্বংস করা বা খর্বিত করা নহে।'† অর্থাৎ, প্রজার স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব শাসকের পুরো মাত্রাতেই রহিয়াছে। সুতরাং শাসক সে পর্যন্ত ক্ষমতার অধিকারী থাকিতে পারেন, যতক্ষণ তিনি প্রজার প্রতি তাঁহার কর্তব্য করিয়া চলিয়াছেন। নির্গলিতার্থ,—শাসকের ক্ষমতার ভিত্তি হইতেছে প্রজার স্বেচ্ছামূলক সম্মতি (consent)।

মূল সুর : শাসনের ভিত্তি প্রজার সম্মতি

লক্ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন মানবচরিত্র ও 'প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্নরূপ' ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

লকের মতে,—মানুষ মূলতঃ আত্মসর্বস্ব, অসামাজিক জীব নহে; সে স্বাভাবিক আইন, অর্থাৎ, যুক্তির বিচার মানিয়া চলে। 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' সব মানুষই সমান, সবাই স্বাধীন। কিন্তু এ স্বাধীনতা হবস্-বর্ণিত বল্গাহীন উচ্ছৃংখলতা নহে, ইহা স্বাভাবিক আইন, তথা যুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং 'প্রাকৃতিক অবস্থা' বন্য হানাহানি-কাটাকাটির রাজত্ব নহে, এখানে আছে পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সহায়তা, আছে শান্তি ও নিরাপত্তা।

স্বাভাবিক আইন—যুক্তির বিচার

কিন্তু তাহাই যদি হয় তবে 'প্রাকৃতিক অবস্থা' ছাড়িয়া আসিবার প্রয়োজন ঘটিল কেন? লক্ জবাব দিলেন: 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' তিনটি অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে: (১) প্রথমতঃ, ন্যায় ও অন্যায়ের নির্দেশক, সর্ববিধ বিরোধ নিষ্পত্তির মানদণ্ড, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও স্বীকৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুনির্দিষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত আইন ছিল না;'* (২) দ্বিতীয়তঃ, 'পরিচিত ও নিরাসক্ত বিচারকে'র (known and indifferent judge) অভাব ছিল; এবং (৩) তৃতীয়তঃ, অভাব ছিল ন্যায় বিচারকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য কার্যকরী বিভাগের। এই অবস্থায় কিছু অসৎ ব্যক্তি পরিস্থিতিকে বিপদসংকুল করিয়া তুলিতে পারে। ফলে, প্রয়োজন হইল রাষ্ট্রগঠনের।

"প্রাকৃতিক অবস্থার তিনটি দুর্বলতা : (১) নির্দিষ্ট আইন, (২) নিরপেক্ষ বিচারক, ও (৩) কার্যকরী বিভাগের অনুপস্থিতি

† The end of the law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom.

*First, the want of an established, settled, known law received and allowed by common consent to be the standard of right and wrngo and the common measure to decide all controversies between them.

স্বাভাবিক আইনকে কার্যকরী করিবার যে অধিকার প্রতি মানুষ ভোগ করিত তাহা সে চুক্তির দ্বারা সর্বসাধারণে সমর্পণ করিল অর্থাৎ, প্রথমতঃ কতকগুলি মাত্র অধিকার সমর্পণ করা হইল; দ্বিতীয়তঃ, সমর্পণ করা হইল সর্বসাধারণ্যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিগোষ্ঠীকে নহে; তৃতীয়তঃ, চুক্তি সংঘটিত হইল কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য।

প্রথম পর্যায়ের চুক্তি

"প্রাকৃতিক অবস্থার" অভাবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কাজেই সেই অভাবগুলি দূর করার জন্য রাষ্ট্র গঠনের পরের পর্যায়ে আসিল সরকার গঠনের পালা। লকের হিসাবে,—এইবার ঘটিল দ্বিতীয় চুক্তি: রাষ্ট্র তাহার সংগঠিত চরিত্রের সাহায্যে (in its corporate capacity) এইবার সরকার গঠন করিল, শাসক নির্বাচন করিল। সুতরাং, শাসকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রহিল চুক্তির দ্বারা; যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহার পত্তন করা হইয়াছে, তাহা সফল করিয়াই স্বীয় অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে হইবে; সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত আইনকে কার্যকরী করিতে হইবে; কর্তব্যে ব্যর্থতার জন্য শাসককে পরিবর্তন করিবার অধিকার প্রজাদের আছে। অর্থাৎ, প্রজাদের সামগ্রিকভাবে, এমনকি ব্যক্তিগতভাবেও বিদ্রোহ করিবার অধিকার স্বীকৃত হইল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের চুক্তি

লক্ তাঁহার যুক্তি প্রকরণের ভিতর দিয়া প্রমাণ করিলেন যে সরকারের উদ্দেশ্য হইল প্রজার কল্যাণ সাধন, তাহার ভিত্তি প্রজার সম্মতি এবং তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। রাজার ব্যক্তিগত আদেশই আইন নহে। সুপরিচিত আইনকে বিধিসম্মত ব্যবস্থার মারফৎ রূপদান করিতে হইবে। স্বাভাবিক অধিকার বলিতে হব্‌স্‌ ব্যক্তিগত "নিরাপত্তার" উপর অত্যধিক জোর দিয়াছিলেন। লকের মতে যে মূল অধিকার প্রত্যেকেরই রহিয়া গেল, তাহা হইতেছে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার। তাঁহার সিদ্ধান্তে,—সরকারী ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল আইন-প্রণয়ন বিভাগ, শাসন পরিচালনার মূলনীতি হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত। ন্যায্যতঃই আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) লক্‌কে ব্রিটিশ হুইগপন্থীদের পুরোধায়ী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।*

জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার

*"Thus was created the edifice of Whiggism that was to dominate English political philosophy for close upon a hundred years......In fact Loke was typical whig". Ivor Brown-English Political Theory. P. 64

লকের লেখায় 'জনতার সার্বভৌমিকতা'র নীতি উপস্থাপিত হইল ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও লক্ সার্বভৌমিকতার নীতিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিলেন না। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিলেন, কিন্তু সাথে সাথে রাষ্ট্র-শক্তিকে সীমিত করিয়া দেখাইলেন। 'স্বাধীনতা'র কথা দৃঢতাব সহিত প্রচার করিলেন, কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত অনুসৃতির নিদর্শন মিলিল না 'সাম্যে'র সমস্যা বিচারে। এই সমস্যা সম্বন্ধে নূতন পথনির্দেশ আসিল ফরাসী দার্শনিক রুশোর নিকট হইতে।

তাঁহার চিন্তার দুর্বলতা

রুশো : সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যার দ্বারা হব্‌স্ অবাধ রাজতন্ত্রের ন্যায্যতা প্রমাণিত করেন, লক্ উপস্থিত করিলেন সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের যৌক্তিকতা, আর রুশো প্রতিষ্ঠিত করিলেন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অনিবার্যতা।

সেই পুরাতন 'প্রাকৃতিক অবস্থা' ও 'সামাজিক চুক্তি'র ধারণাই তিনি ব্যবহার করিলেন বটে, কিন্তু রুশোর হস্তে তাহাদের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সভ্য সমাজের কৃত্রিমতা ও কুটিলতায় ক্ষুব্ধ রুশো 'প্রাকৃতিক অবস্থা'কে শুভময়রূপে কল্পনা করিয়াছেন। সেখানে হানাহানি নাই, নিষ্ঠুরতা নাই, জটিলতা নাই, আছে সরলতা, সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ব। মরজগতে যেন স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছিল। এ বক্তব্য অনিবার্য ছিল এইজন্য যে রুশোর মতে, মানুষের চরিত্র মূলতঃ ভালো। 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' মানুষ ছিল স্বাধীনচেতা, সরল, সুস্থ, সাহসী ও সন্তুষ্ট। অপরকে আঘাত করিবার কোন প্রেরণা সে বোধ করিত না, বরং তাহার প্রতি সৌহার্দ্য ও মমতাই অনুভব করিত। এক কথায় সে ছিল—মহান, মুক্ত, বন্য, আদিম মানুষ। রুশোর প্রথম নিবন্ধ 'Discourse on the Origin of Inequality among Men'এ 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র এই চিত্রই তিনি আঁকিয়াছিলেন।

"প্রাকৃতিক অবস্থা" মরজগতে স্বর্গ

রুশোর ব্যাখ্যায় মানবচরিত্র

রুশোর সুবিখ্যাত পুস্তক *Contrat Social* প্রকাশিত হয় ১৭৬৩ সালে। তাঁহার সামগ্রিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও, তিনি মোটামুটি যাহা বলিলেন তাহা হইল এই যে, এই স্বর্গরাজ্য হইতে মানুষকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পত্তির উদ্ভবের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার মতে যে মানুষ প্রথম একটুকরা জমি স্বতন্ত্র করিয়া নিজের বলিয়া দাবি করিল এবং অন্যান্য সরলমনা

প্রাকৃতিক অবস্থা পরিত্যাগের কারণ ত্রিবিধ

লোকদের দিয়া স্বীকার করাইয়া লইল, সে-ই নব্যব্যবস্থার প্রথম স্থাপয়িতা।*

তাহাতে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, "প্রাকৃতিক অবস্থা"য় মানুষ যুক্তি দিয়া বিচার করিত না, স্বাভাবিক প্রেরণার দ্বারা চালিত হইত। এইবার সে স্বাভাবিকত্ব হারাইল, হারাইল আদিম সুখ ও সাম্য। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, সম্পত্তির উদ্ভব ও বুদ্ধি ও যুক্তির প্রয়োগ, এই তিনের ফলে সৃষ্টি হইল বৈষম্য, অশান্তি, জটিলতা। ফলে, প্রাকৃতিক অবস্থা বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্র-সৃষ্টি অনিবার্য হইয়া উঠিল।

রুশো বলিলেন—রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। সকলে মিলিয়া চুক্তি করয়, তাহাদের সর্ব অধিকার সমর্পণ করিল তাহাদের সামগ্রিক, মিলিত, যৌথ এক ব্যক্তিত্বের (collective body) নিকট, রুশো যাহার নামকরণ করিলেন, **"সমষ্টিগত ইচ্ছা"** (General Will)।

চুক্তি: সর্বসাধারণের যৌথ ব্যক্তিত্বের নিকট সর্ব অধিকার সমর্পণ

সমষ্টিগত ইচ্ছ : এই 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'র নিকটেই যেহেতু সকলে সকল ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছে, সেহেতু রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইল এই **সমষ্টিগত ইচ্ছা**। ইহা অমান্য করিবার অধিকার কাহারও নাই। ইহার উপর কোন শর্ত আরোপ করা চলে না; ইহাকে সীমাবদ্ধ করা চলে না। কেন না প্রাথমিক সমর্পণ ছিল সর্বাত্মক, চূড়ান্ত। ইহাকে ভাগ করা চলে না যেহেতু সমষ্টিগত ইচ্ছা এক সময়ে একটাই হইতে পারে। তাহার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অন্তর্বিরোধের কোন স্থান নাই।

সমষ্টিগত ইচ্ছা—চরম, অবাধ

কিন্তু সমষ্টিগত ইচ্ছা সকলের মিলিত ইচ্ছা, সামগ্রিক ইচ্ছা; সকলেই ইহার সমান অংশীদার। সেহেতু কাহারও কোন অধিকারের কিছু কমতি পড়িল না। প্রত্যেকে যেমন সর্ব অধিকার দিয়াছিল, তেমনি এই যৌথ ব্যক্তিত্বের অংশ হিসাবে প্রত্যেকে তাহা ফিরিয়া তো পাইলই, উপরন্তু এই অধিকার বজায় রাখিবার ব্যবস্থা আরও দৃঢ়তর হইল। অর্থাৎ, সমষ্টিগত ইচ্ছা বা সার্বভৌমত্বের অধিকারী

সমষ্টিগত ইচ্ছার মধ্যে নিহিত সর্বসাধারণের অধিকার

* "The first man, who after enclosing a piece of ground, bethought himself to say 'this is mine', and found people simple enough to believe him, was the real founder of civil society".

হইল সমগ্র জনসাধারণ। উপরন্তু যেহেতু সমগ্র জনসাধারণের অংশগ্রণের ভিতর দিয়া এই সমষ্টিগত ইচ্ছা উদ্ভূত হইতেছে, সেজন্য জনসাধারণ সমষ্টিগত ইচ্ছা সৃষ্টির দায়িত্ব আর কাহারও উপর ন্যস্ত করিতে পারে না। সুতরাং রাজতন্ত্র বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র উভয়ই সমান অবাস্তর ও অযৌক্তিক। যেখানে সমগ্র জনসাধারণ আইন-প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিল না, অর্থাৎ, সমষ্টিগত ইচ্ছা যথাযথ মূর্ত হইল না, সেখানে সত্যকারের স্বাধীনতা নাই, সেখানে প্রকৃত রাষ্ট্র-রূপ নাই, সেখানে সমষ্টিগত ইচ্ছার বিকৃতি ঘটিয়াছে। রুশোর মতে, প্রকৃত রাষ্ট্রমূর্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে একমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থায়।

সমষ্টিগত ইচ্ছা সৃষ্টির ভার অপরকে সমর্পণ করা যায় না

এই সমষ্টিগত ইচ্ছা সর্বসাধারণের কল্যাণের ইচ্ছা। যাহা সর্বসাধারণের কল্যাণকর নহে, তাহা সমষ্টিগত ইচ্ছা হইতে পারে না। মানুষের মনে সাধারণের মঙ্গলের ইচ্ছা থাকে। আবার নিতান্ত স্বার্থপর চিন্তাও তাহার পাশে বাসা বাঁধিয়া থাকে। সকলের মনে সকলের মঙ্গলের যে ইচ্ছা রহিয়াছে, তাহাই চুনিয়া চুনিয়া রুশো-কল্পিত সমষ্টিগত ইচ্ছা তিলোত্তমা রূপ ধারণ করে। সাধারণের মঙ্গল-ইচ্ছা, অতএব প্রত্যেকের মঙ্গলের ইচ্ছা। ইহাকে প্রত্যেকের 'প্রকৃত ইচ্ছা' (Real Will) বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যদি কাহারও ইচ্ছা ইহার বিরোধী হয়, তবে সে ইচ্ছা তাহার প্রকৃত ইচ্ছা নহে। রুশোর সমষ্টিগত ইচ্ছা সর্বব্যাপক, সর্বগ্রাসী, সর্বোচ্চ, সর্বকল্যাণকর। ইহার প্রতিরোধ নাই, প্রতিবিধান নাই।

সমষ্টিগত ইচ্ছা সদা মঙ্গলময়

এই ইচ্ছাই প্রতি মানুষের প্রকৃত ইচ্ছা

বুঝা যাইতেছে, এই সমষ্টিগত ইচ্ছা সর্বসাধারণের ইচ্ছার যোগফল মাত্র নহে। ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও নহে। ইহার চরিত্র কি, রুশো তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া ইহার সন্ধান মিলিবে সে সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্য আবছা, ধোঁয়াটে।

রুশো তাঁহার বক্তব্যের ভিতর দিয়া প্রমাণ করিলেন যে রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ হইল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র; আইন সমষ্টিগত ইচ্ছার মূর্ত রূপ; রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে অংশ গ্রহণের ভিতর দিয়াই প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্বাধীনতা'; আর 'স্বাধীনতা' ও 'সাম্য' দুই-ই চলে সমান তালে পা ফেলিয়া, কারণ 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' প্রণয়নে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার।

রাষ্ট্রে প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

'স্বাধীনতা' ও "কর্তৃত্বের" (Liberty and Authority) যে আপাতবিরোধ, রুশো এইভাবেই তাহার নিষ্পত্তি করিলেন। রুশো তাঁহার গ্রন্থের প্রথমেই যে লিখিয়াছিলেন,—'মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মিয়াছে কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ' (Man is born free and everywhere he is in chains),—তাহা বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ রণধ্বনি হইয়া দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় (Declaration of Independence) এবং ১৭৮৯ সালের বিজয়ী ফরাসী বিপ্লবে "মানুষের অধিকার" সম্পর্কিত ঘোষণায় রুশোর বাণীরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল: 'মানুষ জন্ম হইতেই স্বাধীন ও সমানাধিকারসম্পন্ন (Men are from birth free and equal in rights)' 'স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার'—এ ঘোষণা আজ বিংশশতাব্দীতেও এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার পরাধীন মানুষের গভীর অন্তর হইতে উত্থিত হইতেছে।

রুশোর মতবাদের প্রভাব

যাহা হউক, রুশো তাঁহার সমষ্টিগত ইচ্ছার তত্ত্বের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন সর্বসাধারণকে সার্বভৌমত্বের অধিকার করিয়া দিলেন, তেমনি ইহাকে অবাধ, অপরিসীম, নিরংকুশ ক্ষমতায় আসীন করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতার বিরোধিতার পথও বন্ধ করিয়া দিলেন। রুশো ঠিকই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে সামাজিক জীবনে একটা সামাজিক সংহতি রহিয়াছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে গেলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপক জনতার স্বার্থই বিঘ্নিত হইবে। ইহাও সঠিক যে রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্যই হইবে সামগ্রিক মঙ্গলচিন্তা। কিন্তু অনির্দিষ্ট সমষ্টিগত ইচ্ছার সাহায্যে রাষ্ট্রের যে অবাধ ক্ষমতা তিনি স্থিরীকৃত করিলেন, তাহাই আবার সর্বপ্রকার ভিন্ন-মতকে ধ্বংস করিয়া সর্বগ্রাসী রূপ গ্রহণ করিল।

রুশোর অবাধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব:

হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর তুলনামূলক আলোচনা: এইবার এই ত্রয়ীর মতামতকে পুনরায় পাশাপাশি সাজাইয়া দেখা যাক।

১। প্রাকৃতিক অবস্থা, স্বাভাবিক আইন, স্বাভাবিক অধিকার:—

হব্‌স—প্রাকৃতিক অবস্থা মূলতঃ মন্দ। জীবন এখানে বীভৎস, পাশবিক ও স্বল্পস্থায়ী। আপন প্রাণ বাঁচাইবার মন্ত্রই এখানে একমাত্র স্বাভাবিক আইন। বাহুবলই হইল একমাত্র অধিকার।

লক্‌—প্রাকৃতিক অবস্থা মূলতঃ কল্যাণকর, এখানে শান্তি ও শুভেচ্ছা বিরাজ করে। মানুষের বিবেকে যে নীতিবোধ নিহিত রহিয়াছে তাহাই স্বাভাবিক

আইন। বিবেকবান মানুষের নীতিবোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে স্বাধীনতা।

রুশো—প্রাকৃতিক অবস্থা পার্থিব স্বর্গ। মানুষের জীবন সরল, স্বাধীন ও মহিমময়। আইন তাহার কল্যাণকর মৌল প্রেরণা হইতে উদ্ভূত।

(২) **চুক্তির প্রকৃতি:** হব্‌স্—চুক্তি একটি। প্রত্যেকে তাহার সর্বপ্রকার অধিকার চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করিয়াছে। সার্বভৌমত্বের অধিকারী চুক্তির অংশীদার নহেন।

লক্—সুস্পষ্ট উক্তি না থাকিলেও বোঝা যায় যে চুক্তি হইয়াছিল দুইটি। মানুষ সর্ববিধ অধিকার ত্যাগ করে নাই। রাজা বা সরকার চুক্তির অংশীদার।

রুশো—চুক্তি একটি। অধিকার সবই সমর্পিত হইয়াছিল যৌথ ব্যক্তিত্বের হস্তে, কিন্তু প্রত্যেকেই সেই ব্যক্তিত্বের অংশীদার বলিয়া স্বাধীনতা বা সাম্যের কোনপ্রকার হানি ঘটে নাই। ইহাতে রাজা বা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কোন স্থান নাই।

(৩) **সার্বভৌমত্ব:** হব্‌স্—রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আদি, অপরিসীম অবাধ, চূড়ান্ত। কিন্তু ইহার মালিক রাজা বা সরকার স্বয়ং। রাজার আজ্ঞাই আইন।

লক্—অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব তিনি বিশ্বাস করেন না। সাধারণভাবে সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছে; কিন্তু জনতার অধিকারের দ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ। আবার জনতার সার্বভৌমত্বের নিয়মিত ব্যবহার নাই। কেবল শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের দ্বারা সরকারের উৎখাতের অধিকার তাহাদের রহিয়াছে। মোটামুটি যুক্তিধারা কিছুটা অস্পষ্ট।

রুশো—হব্‌সের মতই নিরংকুশ সার্বভৌম ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাসী। কিন্তু রাজা বা সরকার ইহার মালিক নহে, ইহার অধিকারী সক্রিয় সমগ্র জনতা। এখানে লকের সহিত তাঁহার মত মিলিল। আইন হইল সমষ্টিগত কল্যাণকর ইচ্ছার প্রকাশ।

শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা:—হব্‌স্—অবাধ রাজতন্ত্র। লক্—সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র। রুশো-প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র।

মানুষের অধিকার: হব্‌স্—স্বাভাবিক অধিকারের অবশিষ্ট বিশেষ কিছু রহিল না। থাকিল আইন-প্রদত্ত অধিকার এবং আত্মরক্ষার অধিকার।

লক্—স্বাভাবিক অধিকার অনেকখানিই থাকিয়া গেল। রহিল জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার, রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ ক্রিয়াকর্মের গণ্ডীর বাহিরের স্বাধীনতা এবং বিপ্লবের অধিকার।

রুশো—স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতি মানুষের জন্মগত অধিকার। 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'র প্রকাশের ভিতর দিয়া স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। স্বাভাবিক অধিকারের কোন হানিই ঘটে নাই।

রুশোর তত্ত্বে হব্‌স্‌ ও লকের তত্ত্বের মিলন

প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে রুশো, হব্‌স্‌ ও লকের চিন্তাধারায় মিলন সংসাধিত করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে এ উক্তি স্ববিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে: কারণ, অবাধ রাজতন্ত্রের ভাষ্যকার হব্‌স্‌ ও মানুষের অধিকারের উদ্গাতা ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চারণ রুশোর মধ্যে হঠাৎ মিল খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল। কারণ যে মিলনের কথা বলা হইতেছে তাহা নিতান্তই 'প্রাকৃতিক অবস্থা' ও 'সামাজিক চুক্তি'র মিল নহে, তাহা আরও গূঢ়।

আসলে রুশো হব্‌সের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইল সার্বভৌমত্বের ধারণা। হব্‌সের মতে সার্বভৌম রাষ্ট্র হইল লেভায়াথান যাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইবার মত আর কোন শক্তি নাই।*

এই সার্বভৌমের নিকট সকলকে নির্দ্বিধায় আনুগত্য জানাইতে হইবে। সকল চুক্তি, সকল অধিকারের ঊর্ধ্বে ইহার স্থান। রাষ্ট্রান্তর্গত সর্ব-মানুষের ঐক্যের প্রতীক এ; সব প্রজাই সার্বভৌমের সকল কাজের ভাগীদার।†

হব্‌সের এ চিন্তার সহিত লকের ধারণার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু রুশো সার্বভৌমত্বের এ তত্ত্ব সামগ্রিকভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। হব্‌সের মতই রুশোও মনে করেন যে সার্বভৌমত্ব এক এবং অবিভাজ্য, অভ্রান্ত, মৃত্যুহীন ও সর্বশক্তিমান। হব্‌সের মতই রুশোও প্রজাদের সার্বভৌমের আদেশের বিরুদ্ধে অধিকারের অবশিষ্টটুকুও রাখেন নাই। শুধু তাই নয়, হব্‌স্‌ প্রজাদের সহিত সার্বভৌমের ইচ্ছার যে ঐক্য কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, রুশোর নাগরিকগণ সমষ্টিগত ইচ্ছার সহিত অনেক বেশী পরিমাণে একাত্ম।

কিন্তু সার্বভৌমের সর্বব্যাপকতায় ও শক্তির চূড়ান্ত অধিষ্ঠানে যদি হব্‌স্‌ ও রুশোর মতের মিল হইয়া থাকিতে পারে, তবে ইহাদের পার্থক্যও প্রগাঢ়।

*"Leviathan then is the Sovereign State, and according to Hobbes "there is no power on earth which may be matched against it", Ivor Brown English Political Theory. p. 45.

† "Every subject is author of every act the Sovereign doth". Ivor Brown. ibid. p. 48.

রুশো ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতায় চূড়ান্ত বিশ্বাসী এবং মনে করিতেন যে নীতিবোধ ও স্বাধীনতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। তাঁহার নিকট সমস্যা হইল এমন সংগঠন সৃষ্টি করা যাহা সমগ্র মিলিত শক্তি দিয়া প্রতি সদস্যের দেহ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবে এবং যাহাতে প্রত্যেকে সকলের সহিত মিশিয়া নিজেকেই মান্য করিবে, অর্থাৎ, স্বাধীন থাকিবে।* সুতরাং হবস্ যে স্থলে সার্বভৌমত্বের অধিষ্ঠান দেখিয়াছিলেন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে; রুশো সে স্থলে সকল নাগরিকের প্রকাশিত সমষ্টিগত ইচ্ছাই সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানেই রুশো হবস্‌কে বর্জন করিয়াছেন এবং আহ্বান করিয়াছেন লক্‌কে। চুক্তি-ভঙ্গকারী শাসককে হঠাইয়া দিবার অধিকার জনসাধারণের হস্তে অর্পণ করিয়া লক্ জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই জনসাধারণ সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয়; শুধু বিদ্রোহ করিবার অধিকারে তাহাদের চরম ক্ষমতা ব্যক্ত হইতে পারে। রুশোর জনসাধারণ প্রতিনিয়ত সক্রিয়। তাহাদের নিয়মিত অংশগ্রহণের ভিতর হইতেই সমষ্টিগত ইচ্ছা জন্মলাভ করিতেছে।

'স্বাধীনতা' ও 'অধিকারের' ক্ষেত্রে এই মিল ও গরমিল আরও উজ্জ্বল। হবসের মতে, আইন যতটুকু স্বীকার করিয়াছে সাধারণ ততটুকু স্বাধীনতাই ভোগ করিতে পারিবে। লক্ বলিতেছেন যে আইনের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতার সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হয়। রুশো সেক্ষেত্রে সোচ্চারে ঘোষণা করিতেছেন যে আইনের ভিতরেই স্বাধীনতার প্রকাশ ও পরিণতি।†

আসলে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধানের সমস্যার সম্মুখে হবস্ সব স্বাধীনতাই সমর্পণ করিয়াছেন সার্বভৌমের পদপ্রান্তে। লক্ মূলতঃ ব্যক্তির স্বাধীনতার বিশ্বাসী বলিয়া এই দুই দাবীর মধ্যে একটা ভারসাম্য আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রুশো প্রতিটি নাগরিকের সমষ্টিগত ইচ্ছা গঠনে অংশগ্রহণের

* "The problem is to find a form of association which will defend and protect with the whole common force the person and goods of each associate and in which each, while uniting himself with all, may still obey himself alone and remain as free as before".

† "If Hobbes declares that liberty exists only in the interstices of law, if Locke reconciles law and liberty only by assigning to the former the sole task of reducing the field of the latter, Rousseau boldly makes law the very expression and fulfilment of liberty".

MacIver—The Modern State. (p. 443.)

তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও স্বাধীনতায় মৌলিক বিরোধ নাই। রাষ্ট্রকর্তৃত্বে অংশগ্রহণের ভিতরেই স্বাধীনতার চরম বিকাশ সম্ভব। কারণ, কর্তৃত্ব মান্য করা বস্তুতঃ নিজেকেই মান্য করা, অর্থাৎ স্বাধীন থাকা।†

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জনতার যে স্বাধীনতা লক্ নিরাপদ রাখিতে চাহিয়াছিলেন, রুশো সেই স্বাধীনতাকে সম্যক গুরুত্ব দিয়া আরও প্রসারিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সার্বভৌম যে ব্যাপক ও চরম ক্ষমতার অধিকারী, তাহা লকের সীমাবদ্ধ সরকারের ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' জনতার স্বাধীনতার রূপায়ণ; কিন্তু এই ইচ্ছার বিরোধী ব্যক্তির কোন স্বাধীনতাই রুশো মানিতে রাজী নহেন। এ মনোভাবে যুক্তির দিক হইতে অন্তর্বিরোধ থাকিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পারস্পরিক যে বিরোধ রহিয়াছে ইহা তাহারই প্রতিফলন।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন : হব্‌সের পুস্তক প্রকাশিত হইবার সাথে সাথেই 'সামাজিক চুক্তি'র মতবাদ সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং ক্রমে ক্রমে তীব্র যুক্তিবাদী চিন্তার আক্রমণে উনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া রাজনৈতিক চিন্তার আসরে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। হিউম, বেন্থাম, বার্ক, ফণ হলার, অস্টিন, লিবার, উল্‌সি, মেইন, গ্রীণ, ব্লুন্টসলি, সার ফ্রেডারিক পোলক প্রভৃতি তীক্ষ্ণ যুক্তির আঘাতে 'সামাজিক চুক্তি'র ধারণাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেন। নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির ভিতরে আমরা বিভিন্ন বক্তব্যগুলির সারাংশ উপস্থিত করিতে পারি।

১। সমগ্র মানবেতিহাস অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ চুক্তির কোন প্রমাণ হাজির করা যায় না। এমন কি, হব্‌স্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন যে এইরূপ ঘটনা যে ঘটিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। কেহ কেহ ইংলণ্ড হইতে 'মেফ্লাওয়ার' জাহাজ করিয়া যে অভিযাত্রীদল উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ পত্তন করিতে যান, তাঁহাদের চুক্তিকে ইহার নিদর্শনরূপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ যুক্তি কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না এজন্য যে যাঁহারা যাইতেছিলেন তাঁহারা কেহই 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' বাস করিতেন না; একটি অগ্রসর রাষ্ট্র হইতে তাহারই বশ্যতাভুক্ত উপনিবেশ স্থাপন করিতে চলিয়াছিলেন।

ইহার স্বপক্ষে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না

† 'Each coalescing with all, may nevertheless obey only himself and remain as free as before."

২। এইরূপ চুক্তি সম্ভবও ছিল না। আদিম যুগের সরল মানুষের মনে চুক্তি সম্বন্ধে ধারণা আসাটাই অস্বাভাবিক ছিল। সমাজে বিনিময় ও বাণিজ্য যথেষ্ট বিকাশলাভ করিলে পরই চুক্তির আবির্ভাব হয়, যে চুক্তি চুক্তিকারীদের উপর বাধ্যতামূলক হয়, যাহা ভঙ্গ করিলে শাস্তির সম্মুখীন হইতে হয়। আদিম মানুষের সরল জীবনে এইরূপ পাকাপোক্ত চুক্তির কোন স্থান থাকিতে পারে না।

এরূপ চুক্তি সম্ভব ছিল না

৩। 'সামাজিক চুক্তির' ভাষ্যকারগণ বলিয়াছেন যে 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র মানুষেরা ব্যক্তি হিসাবে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায় যে প্রথমে মানুষের জীবন মূলতঃ যৌথজীবন। যৌথজীবনে যুথের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই মানুষের স্থান নির্দিষ্ট থাকিত; ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের চেতনা আবির্ভূত হইয়াছে বহু পরে। ফলে, ব্যক্তিরা সচেতনভাবে স্বকীয় ইচ্ছার ভিত্তিতে চুক্তি করিতেছে—এ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সমাজজীবনের অনেকখানি অগ্রগতি ঘটিবার পর।* নৃতত্ত্ববিদেরাও বর্তমান পৃথিবীতে যে সকল আদিম অধিবাসী বাস করিতেছে তাহাদের জীবনধারা বিচার করিয়া এই বক্তব্যই সমর্থন করিতেছেন।

সামাজিক বিকাশের ধারা গোষ্ঠী হইতে ব্যক্তিতে

৪। 'সামাজিক চুক্তির' প্রবক্তাগণ প্রত্যেকেই স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু, যেখানে অধিকার স্থিরীকৃত করিবার জন্য সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আইন নাই, সে আইনকে কার্যকরী করিবার জন্য রাষ্টকর্তৃত্ব নাই, সেখানে অধিকার থাকিবে কি করিয়া? আইনই যে স্বাধীনতার সর্ত (Law is the condition of liberty) ইহা তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সুপরিচিত তত্ত্ব।

আইন রক্ষার ব্যবস্থার অভাবের মধ্যে স্বাভাবিক অধিকারের কল্পনা অযৌক্তিক

৫। বেন্থাম প্রশ্ন করিলেন: রাষ্ট্রকর্তৃত্ব মানিয়া চলার তত্ত্ব হিসাবে 'অতি প্রাচীন যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এক চুক্তি করিয়া গিয়াছিলেন, সেইজন্যই তাহা মানিতে হইবে'—এ যুক্তি অপেক্ষা—'রাষ্ট্রকর্তৃত্ব না মানিলে আমাদেরই অনিষ্ট'—এ যুক্তি অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য নয় কি?

বেন্থামের হিতবাদী সমালোচনা

* Sir Henry Maine বলিয়াছেন: সমাজ আগাইয়া চলে status হইতে ccontract-এ।

স্বাভাবিক সাম্যও যুক্তিসঙ্গত নহে

৬। অনেকে প্রশ্ন তুলিলেন মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক বৈষম্য দেখা যায়, তাহাতে 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' সব মানুষই সমান ছিল এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়? রুশো নিজেও তো এই বৈষম্যের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

রাষ্ট্রের ভিত্তি চুক্তি হইতে পারে না—তাহা আরও দৃঢ

৭। চুক্তির বৈশিষ্ট্য হইল যে স্বেচ্ছায় যে চুক্তি করা হইয়াছে, ইচ্ছামূলকভাবে সে চুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসা যায়, বা তাহার অবসান ঘটানো যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ নিয়ম কি আরোপ করা সম্ভব? রাষ্ট্র তো একটা যৌথমালিকানা স্বতন্ত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানমাত্র নহে। রাষ্ট্রের বশ্যতা প্রত্যেককেই স্বীকার করিতে হইবে; বিপ্লব করিয়া সরকার পাল্টাইলেও রাষ্ট্র পরিবর্তিত হয় না।

৮। আর এই কারণে অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন যে সামাজিক চুক্তির মতবাদ রক্তরাঙা বিপ্লবকে আবাহন করিয়া আনিবে।

এ তত্ত্ব গ্রহণীয় নহে

৯। সন্ত্রাসগ্রস্ত ভদ্রলোকদের ভীতির যথেষ্ট বাস্তব কারণও যে ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিপ্লবের ভয়ে ভীত না হইয়াও বলা চলে যে সামাজিক চুক্তি মতবাদকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে এবং রাষ্ট্রবিবর্তনেও এ মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছে।

ইহার অবদান

এ মতবাদের বৃহত্তম কীর্তি হইল যে ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে গূঢ়ধর্মতত্ত্বের জটিল জটাজাল হইতে মুক্ত করিয়া নূতন ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিল। বাইবেলের কূট ব্যাখ্যার উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর নির্ভরশীল রহিল না; রাষ্ট্র যে মূলতঃ মনুষ্যপ্রয়াস হইতে উদ্ভূত মানবিক সংগঠন তাহা দৃঢতার সহিত উপস্থিত করা হইল। এবং তারই সাথে অবাধ রাজতন্ত্রের

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কল্পনার অবদান

মূল তাত্ত্বিক ভিত্তিপ্রস্তরও অপসারিত হইয়া গেল। হব্‌স্ নিরংকুশ রাজতন্ত্রের সমর্থন জানাইলেও, তাঁহার যুক্তিতে যখন তিনি বলিলেন যে প্রজাদের ইচ্ছার ভিত্তিতেই প্রথম রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষাই এ চুক্তি সম্পাদনের উৎস, তখনই তিনি অবাধ রাজতন্ত্রের পাষাণ প্রাচীরে প্রথম চিড় ধরাইলেন। আর সেই বিদীর্ণ অংশকেই ক্রমে প্রসারিত করিয়া লক্ ও রুশো গণতন্ত্রের কেতন

উড়াইলেন। বস্তুতঃ এই 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হইল, যে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হইতেছে প্রজার সম্মতি (Consent), শুনা গেল, 'মানুষের অধিকারে'র বাণী। তৎকালীন অপরিণত চিন্তাকে পরবর্তী চিন্তানায়কগণ ঘ ষিয়া মাজিয়া প্রোজ্জল করিয়া তুলিয়াছেন, নানা ধারা আসিয়া মিশিয়া ইহাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই প্রাথমিক 'মানবিক অধিকারের' ঘোষণাকে আজিকার দিনের মানুষ আমরা শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ না করিয়া পারি না।

মানুষের অধিকারের কথা

কিছুটা পুনরুক্তি হইলেও বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন যে 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ 'রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকার' তত্ত্বের প্রধান প্রতিষেধক (chief antidote)।*

রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকারতত্ত্বের প্রধান প্রতিষেধক

'রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকার' তত্ত্বের মূল ভিত্তি হইল রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজা ও তাঁহার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীদিগের চরম ও অবাধ রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট। সামাজিক চুক্তি এই ভিত্তিই অপসারিত করিয়া দিল। এ মতবাদে রাষ্ট্রের স্রষ্টা হিসাবে আবির্ভূত হইল সাধারণ মানুষ তাহাদের ইচ্ছা ও তাহাদের নিজেদের চুক্তি। সত্য বটে হব্‌স্‌ অবাধ রাজতন্ত্রের ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু 'ঈশ্বরদত্ত অধিকার তিনি বরবাদ করিয়া দিলেন। তাহার পরিবর্তে আনিলেন রাজার আইন ও নীতিগত অধিকারের প্রশ্ন †

অথচ একবার 'ঈশ্বরদত্ত অধিকারের' যুক্তি বাতিল করার পর 'চুক্তি' তত্ত্বের দ্বারা রাজাদের অবাধ শাসনের অধিকার আর খাড়া করিয়া রাখা গেল না। হব্‌সের পরবর্তী লেখকগণ তাঁহার যুক্তির দুর্বলতা সহজেই প্রকাশ করিয়া দিলেন। কারণ, চুক্তি করিয়া সব ক্ষমতাই যে রাজাকে দিতে হইয়াছিল, কোন অধিকারই রাখা যায় নাই, এবং সেই এক চুক্তিই যে চূড়ান্ত ও চিরন্তন,—হব্‌সের এ বক্তব্য

* "The contract theory however......served a useful purpose in its day by providing a weapon for combating irresponsible rules and justification for resistance to tyranny". Garner-political Science and Government. p. 228.

"For it helped to clear men's mind......of those fervent ideas of divine right and inherent irresponsible power".....MacIver-The Modern State, Pp. 438-439.

† "Hobbes was not concerned to justify the Divine Right of Kings but he was adamant in defence of their civil and legal right". Iver Brown-English Political Theory, Pp. 42-447.

সহজেই পাল্টাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল। লক্ ও রুশোর কথার পুনরাবৃত্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। শুধু তাঁহারাই নহেন, এই যুগের রাষ্ট্রনীতিকদের চিন্তার কাঠামোই মূলতঃ পরিবর্তিত হইয়াছিল, পূর্বতন "ঈশ্বরদত্ত অধিকার" তত্ত্ব সে কাঠামোয় আর নিজস্ব ঠাঁই করিয়া নিতে পারিল না।

হবস্ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব যেরূপে উপস্থিত করিলেন, পরে অষ্টিনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাহাই আইনগত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব (Legal Sovereignty) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রুশো প্রচার করেন "জনগণের সার্বভৌমিকতার" (Popular Sovereignty) তত্ত্ব। "সার্বভৌমিকতার" বিচারের সময় এই সব প্রশ্ন পুনরায় আলোচনা করিতে হইবে।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তির শক্তিমূলক মতবাদ
(The Theory of Force)

"সামাজিক চুক্তি" মতবাদের মতই এ তত্ত্বেরও উদ্দেশ্য মূলতঃ দুইটি: (১) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা ও (২) রাষ্ট্রের প্রকৃতি উদ্ঘাটন করা। ওপেনহাইমার (Oppenheimer)*, জেন্‌কস্ (Jenks)† প্রভৃতি বহু লেখক এই মতবাদকে অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইঁহারা যে বর্ণনা দিয়া থাকেন তাহা হইল মোটামুটি এইরূপ: মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হইলেও, তাহার চরিত্র মূলতঃ কলহপ্রিয়, আক্রমণমুখী ও প্রভুত্বকামী। আদিতে যে কোন দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান ব্যক্তি বাহুবলের সাহায্যে দলভুক্ত অন্যান্য সকলকে পরাজিত করিয়া তাহার হুকুম মানিয়া চলিতে তাহাদের বাধ্য করিত। পরে এই দলের, সমগ্র শক্তি লইয়া, আবার অপর কোন দলকে আক্রমণ করিয়া এই দলের, অর্থাৎ, প্রধানতঃ দলপতির, বশ্যতা স্বীকার করাইত। এই পদ্ধতি চলিতে চলিতে ক্রমে একটি সমগ্র এলাকায় এই দলের, তথা দলপতির প্রভুত্ব কায়েম হইয়া বসিল। এই প্রভুর আজ্ঞা হইল আইন; সমগ্র এলাকার সমস্ত লোকের পক্ষেই সে আজ্ঞা মান্য করা বাধ্যতামূলক; অমান্যকারীর দণ্ডদান করিয়া দলপতি তাঁহার প্রভুত্ব বজায় রাখিতেন। এই মতবাদের প্রবক্তারা বলিয়া থাকেন রাষ্ট্রোৎপত্তির প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিভিন্ন ট্রাইব (Tribe) ও

মতবাদের ব্যাখ্যা

* Oppenheimer—The State,
†Jenks—A Short History of Politics.

ক্ল্যান (Clan) ক্রমে ক্রমে একটি বিশেষ ট্রাইবের এবং তাহার অধিপতির ক্ষমতার বশীভূত হইয়া রাষ্ট্রের সৃজন করিয়াছে। ইহারা মনে করে যে, আধুনিক রাষ্ট্রের মূল যে দুইটি বৈশিষ্ট্য, চূড়ান্ত সামরিক শক্তি ও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা, উভয়েরই সঙ্গত ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের মারফত পাওয়া যায়। ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে শক্তির কিরূপ প্রয়োগ হইয়াছিল তাহারও বহুবিধ উদাহরণ তাঁহারা হাজির করেন।

রাষ্ট্রকে নিজস্ব ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা বজায় রাখিতে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়। অধিকন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থাকেও একচেটিয়া ভাবে কেন্দ্রীভূত রাখিতে হয় (monopoly of power) কারণ, তাহা না রাখিতে পারিলে এবং প্রভুত্ব খাটাইবার অন্যান্য শক্তিশালী কেন্দ্র উদ্ভূত হইলে, আইন ও শৃংখলা বজায় রাখা দুরূহ হইয়া উঠে। সুতরাং এই শক্তিমূলক মতবাদকেই প্রসার করিয়া, বহু লেখক, বিশেষ করিয়া জার্মান লেখক হাইন্‌রিখ্‌ ফন্‌ ট্রিট্‌স্‌কে (Heinrich Von Treitschke) রাষ্ট্রশক্তির উপাসনা ও যুদ্ধের গৌরবগাথায় মুখর হইয়া উঠিলেন। কোকার (Coker)* দেখাইয়াছেন বিংশ শতাব্দীর ফ্যাসিস্ট চিন্তাধারা এই উৎস হইতে যথেষ্ট রসবস্তু সংগ্রহ করিয়াছিল। মার্ক্সীয় চিন্তাধারা যুদ্ধ বা রাষ্ট্রশক্তির উপাসনা না করিয়াও শক্তিকে রাষ্ট্রের মূল আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। "The Origin of the Family, Private Property and the State" নামক বিখ্যাত পুস্তকে এঙ্গেল্‌স্‌ (Engels) মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লেনিন (Lenin) সূত্রাকারে বলিয়াছেন: "মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র, একশ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর নিপীড়ন-চালানর যন্ত্র; ইহা "শৃঙ্খলা" সৃষ্টি করে, যে শৃংখলা শ্রেণী-সংঘর্ষকে সীমাবদ্ধ ও সংযত করিয়া এই নিপীড়নকেই আইনসিদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী করে।"†

এই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্র-চরিত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

শক্তিমূলক উৎপত্তির মতবাদকে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার

* Coker—Recent Political Thought. CH. XVI—The Doctrine of Political Anthority by Force.

‡According to Marx, the state is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another ; it is the creation of "order" which legalises and perpetuates this oppression by moderating the conflict between the classes,"

Lenin—The State and Revolution—Foreign Languages Publishing House Moscow. p 13.

করিয়াছেন। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক চার্চ, তথা পোপের ক্ষমতাকে রাষ্ট্র-শক্তির উপরে স্থান দিবার জন্য বলা হইত যে চার্চের শক্তি, ধর্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে স্থলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হীন বাহুবল হইতে।* সুতরাং, চার্চের প্রভুত্ব উচ্চস্তরের ও অধিকতর বশ্যতার দাবী করিতে পারে। হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নীতি উপস্থাপিত করিবার জন্য বলিলেন: "সরকারের জন্ম পাপ হইতে; অশুভ জন্মের চিহ্ন সে বহন করিতেছে।"† সুতরাং, ব্যক্তিজীবন হইতে সরকারী হস্তক্ষেপ যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল, বিশেষ করিয়া যখন সরকারী হস্তক্ষেপের অবর্তমানে যোগ্যতমের জয় অনিবার্য (Survival of the fittest)। মার্ক্সপন্থীরা আবার তাঁহাদের নিজস্ব যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলেন যে, যেহেতু শ্রেণীনিপীড়নের শক্তি যোগাইতে এবং তাহাকে বিধিসিদ্ধ করিবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব, সেজন্য সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, শ্রেণী-সংঘর্ষের অবসানের সহিত রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক শক্তি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ হইয়া শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত হইয়া যাইবে (Withering away of the State)।**

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ইহার প্রয়োগ

রাষ্ট্রগঠনের সময়ে ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় রাখিবার ব্যাপারে শক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কেহই অস্বীকার করেন না। শুধু ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও এ তত্ত্বের নীতিগত সমর্থনে ব্লুন্টশ্‌লি (Bluntschli) বলেন যে সার্বভৌম চরম ক্ষমতাই হইল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এবং শক্তিমূলক মতবাদে সেই বৈশিষ্ট্যটিকেই

* Gregory VII wrote (A. D. 1080), "Which of us is ignorant that kings and lords have had their origin in those who ignorant of God, by arrogance, rapine, slaughter, by every crime with the devil agitating as the prince of the world have contrived to rule over their fellow-men with blind cupidity and intolerable presumption ?"—Leacock, Elements of Political Science. Pp. 32-33 quoting from Otto-Gicrke's Political Theories of the Middle-Age.

† Government is the offspring of evil, bearing about it the marks of its parentage.

**V. I. Lenin—The State and Revolution. রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতবাদের আলোচনার জন্য সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে।* কিন্তু এ তত্ত্বের সমালোচনা আসিতেছে মুখ্যতঃ দুইটি সূত্র ধরিয়া : (১) একমাত্র শক্তিই কি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব করিয়াছে, না, সে সম্বন্ধে অন্যান্য উপাদানেরও যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল? (২) শক্তিই যদি রাষ্ট্রের চরিত্রের মূল বিষয়বস্তু হয়, তবে মানিয়া লইতে হয়—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। ফলে রাষ্ট্রনীতিতে যুক্তি, নীতি ও আদর্শ এবং প্রজাসাধারণের স্বচ্ছন্দ-সম্মতির (Consent) কোন স্থানই থাকে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের শক্তি আছে বলিয়াই তাহাকে মানি, এবং একক বা দলবদ্ধভাবে যথেষ্ট বলশালী হইলে রাষ্ট্রকে অমান্য করিবার আর কোন বাধা থাকে না। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে শক্তি অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করিয়াছে, একমাত্র নহে।† ইংরাজ দার্শনিক গ্রীণ (T. H. Green) বলেন : মানুষের স্বেচ্ছাসম্মত ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি, শক্তি নহে (Will and not force is the basis of the State)। এ বক্তব্যেরই ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন : "নিপীড়নমূলক শক্তি হইলেই চলিবে না, তাহা যখন বহিঃশত্রু বা অভ্যন্তরীণ আক্রমণ হইতে বর্তমান অধিকার সমূহকে রক্ষা করিবার জন্য, লিখিত বা অলিখিত আইন অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়, তখনই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে।"** অর্থাৎ, গ্রীণ বলিলেন, লোকে রাষ্ট্রশক্তির ভয়ে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্বীকার করে তাহা নহে, স্বীকার করে এই জন্যই যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আইনগতভাবে অধিকার বজায় রাখিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। এই বক্তব্য হইতে দুইটি সিদ্ধান্ত ফুটিয়া উঠে : (১) রাষ্ট্রের প্রতি বশ্যতার ভিত্তি ভয় নহে, যুক্তি ও বিচার; (২) রাষ্ট্রের প্রাধান্যের ভিত্তি পশুবল নহে, নৈতিক বল, আইনের বল, অধিকার রক্ষার কল্যাণকর সংকল্পের বল।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি

অবশ্য গ্রীণের বক্তব্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইলেও অভ্রান্ত নহে। ফাইনার

* .....It makes prominent one element which is indispensable to the state namely force, and has a certain justification as against the opposed theory (that of contract) which bases the state upon the arbitrary will of individuals and leads logically to political importance." Bluntschli, The Theory of the S'ate, 3rd edition p. 293.

† লেনিনের গ্রন্থে অবশ্য মার্ক্সপন্থীদের বিশেষ জবাব পাওয়া যাইবে।

**It is not coercive power as such but coercive power exercised according to law, writenor, unwritten for maintenance of the existing rights from external or internal invasions, that makes a State.

(Finer) বলেন : সক্রেটিসের (Socrates) মত বিচার বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রদণ্ড মাথা পাতিয়া লইবার মত মনোবৃত্তি অধিকাংশ লোকের মধ্যেই দেখা যাইবে না। আইন মানিয়া চলে কেহ অভ্যাসের বশে, কেহ ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহে না বলিয়া, আবার কেহ বা গত্যন্তর নাই বলিয়া।* বস্তুত: লোকে আইন মানিয়া চলে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য : (১) আলস্য (Indolence), (২) অজ্ঞতা (Ignorance), (৩) অভ্যাস (Habit), (৪) ভয় (Fear) ও (৫) যুক্তি (Reason)।

গ্রীণের মতও অসম্পূর্ণ

শক্তি ও সম্মতি, আপাতবিরোধী এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি রাষ্ট্রের সঠিক ভিত্তি সে সম্বন্ধে লিণ্ডসের (A. D. Lindsay) মতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন : "(অধিকাংশ আইন) প্রযোগ করা সম্ভব এই জন্য যে অধিকাংশ লোকই সাধারণত: তাহা চালু রাখিতে চায়। রাষ্ট্রের সংগঠিত শক্তি থাকে এবং তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে এইজন্যই যে অধিকাংশ লোকই সাধারণত: সকলের উপযোগী একধরণের নিয়মকানুন চায় এবং চায় যে সেগুলি সর্বথা প্রযুক্ত হউক; সকলে এই সকল নিয়ম না মানিলে সেগুলি নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায় এবং অধিকাংশ লোকের সাধারণত: মানা এবং সকল লোকের সর্বক্ষণ মান্য করা, ইহার মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকিয়া গেল তাহা পূরণের উদ্দেশ্যেই শক্তির প্রয়োজন হয়।"† অর্থাৎ, অধিকাংশ লোক স্বেচ্ছায় মানে বলিয়াই, অল্পসংখ্যক আইনভঙ্গকারীকে দমন করা রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে সম্ভব। সুতরাং, রাষ্ট্র বজায় থাকিবার পক্ষে শক্তির প্রয়োজন যেরূপ, অনুরূপ প্রয়োজন স্বেচ্ছামূলক সম্মতির। আর এই সম্মতিই রাষ্ট্রকে তাহার বিধিসম্মত রূপদান করিয়াছে। কেবলমাত্র শক্তিপ্রয়োগের উপরেও তাহাকে নৈতিক মর্যাদা দান করিয়াছে।

শক্তি ও সম্মতির আপেক্ষিক সম্পর্ক

সুতরাং শক্তিমূলক মতবাদ রাষ্ট্র উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে অসম্পূর্ণ ও সেইজন্যই অগ্রহণীয়।

* Herman Finer. The Theory and practice of Modern Government : p. 11,

† "Most laws....will work and can be enforced because most people want usually to keep them. The state can have and use organised force beacuse most people usually want common rules and most people want those rules to be universally observed ; there must be force beacuse there are rules which have little value unless everyone keeps them, and force is needed to fill up the gap between most people usually and all people always obeying."

A. D. Lindsay ; The Modern Democratic Stat Vol. I. p. 206.

৪। পরিবার সম্প্রসারণের মতবাদ : পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) ও মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পণ্ডিতদের একাংশের মধ্যে ক্রমেই এ চিন্তা ব্যাপ্তিলাভ করিতে থাকে যে কোন এক আনুমানিক প্রকল্পের ব্যাখ্যার দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্ভবের তত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না, তাহার জন্য নিশ্চিত প্রমাণ প্রয়োজন। তাই ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান হইতে তথ্য আহরণ করিয়া, তাহাদের তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণের সাহায্যে, আধুনিক রাষ্ট্রের জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস চলিতে লাগিল। ক্রমেই এই বিশ্বাস দৃঢবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিল যে মানব-সমাজ কোন এক আদিম পর্যায় হইতে শুরু করিয়া ক্রমশ: বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই অনুসন্ধানেরই প্রাথমিক পর্যায়ে আবার দুইটি তত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইল,—তাহাদের নাম যথাক্রমে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ : স্যার হেনরি মেইনের (Sir Henry Maine) নামের সহিত এ মতবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'Ancient Law' নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার মত প্রথম উপস্থাপিত করেন। পরে ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত Early History of Institutions-এ তিনি প্রতিপক্ষের জবাব দিয়া স্বীয় মতকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। প্রাচীন আইন-কানুন, প্রাচীন যুগের ইতিহাস ও সমকালীন আদিম অধিবাসীদের সমাজ-জীবনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ হইতে তথ্য স গ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হন।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ ও স্যার হেনরি মেইন

এ মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য হইল যে আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে পরিবার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এবং এই পরিবার মূলত: পিতৃকর্তৃত্বভিত্তিক পরিবার। শুরুতে পিতা, মাতা, সন্তান-সন্ততি লইয়া একটি পরিবার ছিল; এ পরিবারের প্রধান হইলেন পিতা, সমগ্র পরিবারের উপর ছিল তাঁহার অখণ্ড কর্তৃত্ব। পিতা হইতে সন্তানের পরিচয় শুধুমাত্র নয়, তিনি তাহার দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। কিন্তু ক্রমে সন্তানরা বড় হয়, বিবাহ করে, তাহাদেরও সন্তান-সন্ততি জন্মায়। অর্থাৎ, শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইল না, একাধিক পরিবারের বীজ উপ্ত হইল। যতদিন বৃদ্ধ পিতা জীবিত থাকিবেন

মতবাদের ব্যাখ্যা

ততদিন সমগ্র বংশ তাঁহার একাধিপত্য মানিয়া চলিবে; তাঁহার মৃত্যুতে এই সমগ্র গোষ্ঠী সর্বাগ্রজ পুরুষের প্রাধান্য মানিবে। এইভাবে একটি পরিবার ভাঙ্গিয়া বহুতর পরিবার গড়িয়া উঠে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বন্ধনসূত্র থাকে দুইটি: (১) রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তার বন্ধন; (২) একটি পিতৃপ্রধানের কর্তৃত্ব। এইভাবে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ বহুসংখ্যক পরিবার মিলিয়া গড়িয়া উঠে ট্রাইব (Tribe), যে ট্রাইব একটি পুরুষ প্রধানের বশ্যতা স্বীকার করে। আবার ক্রমে ক্রমে সেই একই পদ্ধতিতে একটি ট্রাইব হইতে বহু ট্রাইবের সৃষ্টি হয় এবং তাহারা মিলিয়া একই রাজার কর্তৃত্বাধীনে রাষ্ট্র গড়িয়া তোলে।

তিনটি মূল বিষয় ধরিয়া লইয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে:

১। চিরস্থায়ী বিবাহ বন্ধন ও রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে এই পরিবার গঠিত।

মতবাদের মূল তিনটি ভিত্তি

২। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির উদ্ভব হইতেছে আদি পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বংশ পরম্পরায় বিস্তৃতির মাধ্যমে।

৩। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পিতৃপ্রধান সমগ্র পরিবারের উপর যে অখণ্ড ও ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিয়াছেন, যে কর্তৃত্বের অধিকার তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গতভাবেই পাইয়াছে তাহাই হইতেছে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের আদিম উৎস।

স্যার হেনরি মেইন তাঁহার মতবাদের সপক্ষে প্রাচীন ইহুদি, গ্রীক ও রোমক ইতিহাস এবং ভারতীয় যৌথ পরিবার প্রথা হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থিত করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার মতবাদ প্রচারের অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়। মর্গ্যান (Morgan), ম্যাকলেনান (Mclenan), জেঙ্ক্স (Jenks) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও লেখকগণ তাঁহাদের বহু কষ্টার্জিত গবেষণার ফলাফল লইয়া মেইনের মতকে অপপ্রমাণিত করিতে আগাইয়া আসেন। তাঁহাদের সমালোচনার সারাংশ হইল এইরূপ:

সমালোচনা

১। মেইন্ বর্ণিত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই পরিবারের আদি রূপ নহে। কালের বিচারে আগে আসিয়াছে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার, যেখানে মাতার সূত্রে সম্পর্ক নির্ণীত হইত। এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে সমাজের আদিম রূপে এক নারীর একসাথে বহু পতি গ্রহণ (Polyandry) এবং মাতার কর্তৃত্বই দেখা গিয়াছিল। সমাজবিকাশের অনেক পরবর্তী স্তরে এক বিবাহ ও পিতৃকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। বংশ বৃদ্ধির সহিত পরিবার ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া ট্রাইবে রূপান্তরিত হইয়াছে ইহা সত্য নহে। বরং ট্রাইবই ছিল আদিম ও প্রাথমিক সমাজ। সেই সমাজ ক্রমে ভাঙ্গিয়া ক্ল্যান এবং তাহা ভাঙ্গিয়া পরিবারে পরিণত হইয়াছে।

৩। বর্তমান যুগেও কোন কোন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এক নারীর বহু পতি গ্রহণ এবং তাহার সাহায্যে সম্পর্ক নির্ণয় করার ব্যবস্থা বজায় থাকার ফলে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাহা মনে করা চলে না।

৪। এ মতবাদ আদিম সমাজ গঠন সম্পর্কে আলোকপাত করে মাত্র, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমানের অধিক আর কিছুই নহে।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ: পূর্বোক্ত মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ হিসাবে আবির্ভূত হইল মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ।* অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিমতম অধিবাসীদের জীবনধারা বিশ্লেষণ করিয়া মর্গান, ম্যাকলেনান, প্রমুখ লেখকগণ নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপিত করিলেন:

মতবাদের ব্যাখ্যা

১। বিবাহ সম্পর্ক ছিল সাময়িক, ক্ষণভঙ্গুর।

২। সম্পর্ক নির্ণীত হইত নারীর সূত্রে।

৩। মাতার কর্তৃত্ব মানিতে হইত।

৪। সম্পত্তি ও ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হইত নারী।

সুতরাং, তাঁহারা বলিলেন, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারই আগে আসিয়াছে, এবং এই সিদ্ধান্ত হইতে অগ্রসর হইয়া কেহ কেহ দাবি করিলেন যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারই রাষ্ট্রের আদি জনক।

এ তত্ত্বের সমালোচনা পুনরায় সূত্রাকারে উপস্থিত করা যায়:—

মতবাদের সমালোচনা

১। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছিল ঠিকই, কিন্তু এ ব্যবস্থা যে সমাজগঠনের আদিতে অপরিহার্য ছিল তাহার প্রমাণ নাই।

২। তাহা ছাড়া এ পরিবারই সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে তাহারও প্রমাণ অনুপস্থিত।

৩। বস্তুত:, এ তত্ত্ব সমাজগঠনের ভিত্তি লইয়াই আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ এক বস্তু নহে। জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে পরিবার ফুলিয়া ফাঁপিয়া বৃহদাকার ধারণ করিলেই যে রাষ্ট্র হয় না, রাষ্ট্রগঠনে আরও উপাদানের প্রয়োজন, এ তত্ত্বে তাহার স্বীকৃতি নাই।

* Lewis H. Morgan-এর 'Ancient Society' প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

রাজাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতে হইবে, রাজাও প্রজাকে পুত্রের মত পালন ও শাসন করিবেন, প্রতিবেশীকে ভাইয়ের মত দেখিতে হইবে, প্রভৃতি উপদেশাবলী বহু পুরাতন সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সম্পর্কে পরিবারের উপমা দীর্ঘকাল হইতেই মানুষের চিন্তায় প্রতিভাত হইয়াছে। হইবার কারণও ছিল। তুলনা হইতেই রাষ্ট্র সম্বন্ধে মূল দুইটি বস্তু প্রকট হইয়া ওঠে। (১) রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব মানিবার প্রয়োজনীয়তা, যেমন পরিবারে বাস করিতে গেলে পরিবারের কর্তৃত্বও মানিতে হয়; (২) রাষ্ট্র পরিচালনার মূল লক্ষ্য—সর্বসাধারণের কল্যাণ, ঠিক যেমন পরিবারকেও সকলের মঙ্গলের কথা ভাবিতে হয়। অতীতে অ্যারিস্টটল্‌ও বলিয়াছেন যে পরিবার সম্প্রসারণের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু উপমা বা আপ্তবাক্য,—উভয়ই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নহে। আদিম সমাজজীবন সংগঠন ও ধারণের কার্যে তৎকালীন মানুষের পক্ষে রক্তের সম্বন্ধজনিত আত্মীয়তাবোধ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য। কিন্তু সপক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ মত থাকিলেও, পরিবারই সমাজজীবনের প্রাথমিক রূপ সে সম্বন্ধে মতপার্থক্যের কারণ রহিয়াছে। সমাজ-বিবর্তনের পথে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে সেটুকু সত্য নিশ্চয়ই মানিব। কিন্তু প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অন্যান্য উপাদানের সহিত ইহার যথাযথ ভারসাম্য নির্ধারিত করিতে হইবে।

মূল্যায়ন

ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদের তত্ত্ব

(Historical or Evolutionary Theory)

ডাঃ গার্ণার বলেন : "রাষ্ট্র 'ঈশ্বরনির্মিত বস্তু নহে, দুর্বার বলপ্রয়োগের ফলমাত্রও নহে, সম্মেলন বা তথা গৃহীত প্রস্তাব হইতেও ইহার সৃষ্টি হয় নাই, পরিবারের সম্প্রসারণের ভিতর দিয়াও ইহার জন্ম হয় নাই।"* তবে রাষ্ট্র কোথা হইতে আসিল? দীর্ঘকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনা ও অনুশীলনের ভিতর হইতে বর্তমানে এ সত্য আজ সর্বথা গ্রাহ্য হইয়াছে যে রাষ্ট্রের জন্মের কোন সরল সূত্র খুঁজিলে চলিবে না। নানাবিধ উপাদানের জটিল মিশ্রণে নানা পর্যায়ের

*"The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family."

ভিতর দিয়া, বহুবিধ স্তর পার হইয়া মানুষের সমাজ-জীবন আদিম অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে আজ আধুনিক রাষ্ট্ররূপ গ্রহণ করিয়াছে। বার্জেসের ভাষায় বলিতে গেলে,—রাষ্ট্র হইতেছে "মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ—ইহার জন্ম হইয়াছে মোটা দাগের অসম্পূর্ণ অবয়ব লইয়া, ইহার গতি হইতেছে অসম্পূর্ণ তথাপি ক্রমোন্নতিশীল রূপায়ণের ভিতর দিয়া সকল মানুষের ক্রটিহীন বিশ্বজনীন সংগঠনের পথে।"* বার্জেস রাষ্ট্রের ভবিষ্যত গতির যেদিক নির্দেশ করিয়াছেন তাহা লইয়া মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত যে সত্যকে ধরিতে হইবে তাহা হইল যে রাষ্ট্র মানবসমাজের বিবর্তনের ফল। অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, ক্রটিবহুল সামাজিক সংগঠন হইতে উন্নত হইতে হইতে জীবনযাত্রার সামগ্রিক প্রসারের ভিতর দিয়া ইহা ক্রমে আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছে।

জীবনধারার বিবর্তনে ক্ষুদ্রকায় মানুষ পৃথিবীর বুকে একদিন সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিয়াছিল। প্রকৃতি হইতে আজ মানুষ নিজেকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়াছে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সহিত। মানুষকে বাঁচিতে হইবে, তাহাকে আহার্য সংগ্রহ করিতে হইবে, বিরূপ প্রকৃতি ও আততায়ী পশু হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, বংশবৃদ্ধি করিতে হইবে, যাহাতে মনুষ্যজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হইয়া না যায়। জৈব-প্রেরণার বশে মানুষ যূথবদ্ধ হইয়াছে, প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ মানাইয়াছে, আবার প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। মানুষ এ কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়াই সে আজ বিশ্বজেতা শুধু নয়, পৃথিবী ছাড়াইয়া মহাকাশ বিজয়ে যাত্রা করিয়াছে। আর অতিকায় মহাবলশালী জীব তাহা পারে নাই বলিয়া তাহাদের ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মানুষের এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে তাহার সমাজজীবন বা যৌথ-জীবনের মাধ্যমে। মানুষ সামাজিক জীব। সে তাহার সমাজ জীবনকে ক্রমাগত পরিবর্তন করিয়া তাহার গতিপথকে সুগম করিয়া লইয়াছে।

উপরোক্ত বক্তব্য হইতে এ ধারণা যেন না হয় যে মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা অত্যন্ত সচেতনভাবে পরিকল্পনামাফিক করিয়াছে, তাহা নহে। সে কথা বলিলে তো সামাজিক চুক্তির যুক্তিতেই ফিরিয়া যাইতে হইত। প্রতিপাদ্য বিষয়

---

* "The state is a continuous development of human society out of a grossly imperfect beginning, through crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organisation of mankind."

হইতেছে এই যে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে তাহার সমাজ-জীবন নানাবিধ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই রূপান্তরের ভিতর দিয়াই আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব।

এই সমাজ-জীবনের রূপান্তরে যে যে উপাদানের অংশ রহিয়াছে সেগুলি হইল এইরূপ :

(ক) অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সম্পত্তি-সম্পর্ক ,

(খ) রক্তের সম্বন্ধ বোধ ,

(গ) আত্মরক্ষার প্রয়োজন ও শক্তির সংগঠন ও ব্যবহার ,

(ঘ) ধর্মের নির্দেশ ;

(ঙ) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা।

ক। **অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সম্পর্ক :** মানুষের বাঁচিবার তাগিদ হইতেছে প্রাথমিক এবং সর্বশক্তিমান। তাহাকে আহার্য সংগ্রহ করিতে হইবে। আদিম মানুষকেও আহার্য সংগ্রহ করিতে যূথবদ্ধ হইতে হইয়াছিল এবং সেই যৌথজীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা ও নায়কের নির্দেশ মানিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। যে ধরণের সামাজিক ব্যবস্থা আহার্য সংগ্রহ সুগম করে, সেই ব্যবস্থাই ক্রমে প্রচলিত করিতে হইয়াছিল।

খ। **রক্তের সম্বন্ধ :** অপরদিকে সন্তান-উৎপাদন মানুষের আদিম ও মৌল প্রেরণার ফল। সেই সন্তানকে বাঁচাইয়া বড করিবার প্রয়োজনে, প্রধানতঃ নারীকে হইলেও, সমগ্র যূথকেই কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। আবার বংশবৃদ্ধির ফলে এবং সন্তান-লালনের প্রয়োজন হইতে একটা নৈকট্যবোধ গড়িয়া উঠে। সে বোধও নিশ্চয়ই শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক হয়। তাহা হইলে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যে যৌথজীবন গড়ে আর বংশরক্ষার প্রয়োজন যাহা সৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে অন্তর্বিরোধ কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই ; বরং ধরা যাইতেই পারে যে উভয়বিধ প্রেরণাই মানুষের যৌথজীবনকে দৃঢ়-সংবদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছিল, শৃঙ্খলার বন্ধন সহজ ও প্রীতিপদ হইয়া উঠিয়াছিল।

গ। **শক্তির ব্যবহার :** এই সমাজে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দান ও নির্দেশ মান্য করার প্রশ্ন উঠিয়াছে। এইবার শক্তির প্রয়োগের প্রশ্ন আসিল। শক্তির ব্যবহার শুরু হইতেই রহিয়াছে। শিকার, পশুপালন অথবা কৃষি, যে কোন উপায়েই আহার্য সংগ্রহ করিতে জনশক্তিকে নিয়োজিত করিতে হয় ; আততায়ী পশু বা

মানুষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাতেও তাহার প্রয়োজন হয়। এইবার এই জনশক্তিকে চালনা করা বা নায়কের নিকট বশ্যতা স্বীকারের জন্য সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক নির্দেশ মান্য করাইবার জন্য, বিরোধীর উপর শক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন আসিল। অর্থাৎ সামাজিক নির্দেশ বজায় রাখিবার জন্য শক্তি প্রয়োগও অপর উপাদান হিসাবে দেখা দিল।

ঘ। ধর্মের নির্দেশ: কিন্তু মানুষ শুধু খাইয়াই বাঁচে না। তাহাকে প্রতিনিয়ত দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক শক্তির সম্মুখীন হইতে হয়; জন্ম-মৃত্যু রহস্য তাহাকে বিচলিত করিয়া তোলে। সুতরাং তাহার এই প্রশ্নের জবাব সে খোঁজে। সেই আদিম যুগে যাহারা এইসব প্রশ্নের উত্তর লইয়া আগাইয়া আসিল, তাহারা সমাজতত্ত্বের ভাষায়, ইন্দ্রজালিক বা magician বলিয়া পরিচিত। ইহাদের প্রকৃতি-রহস্যের স্থূল ব্যাখ্যা পরের যুগে ধর্ম ও দর্শনের পথ প্রস্তুত করিতে থাকে। বস্তুতঃ, এই প্রাথমিক স্তরে এবং পরবর্তী অধিকতর উন্নত স্তরে ধর্ম একই বিশ্বাসের বাঁধনে, একই নির্দেশের পাশে, একই উপাসনার পদ্ধতিতে সমাজ-জীবনকে আরও ঘনসংবদ্ধ করিয়া তুলিল। এখানেও মূলবস্তু তিনটিই উপস্থিত: (১) নির্দেশ, (২) বশ্যতা, (৩) নৈকট্যবন্ধন!

ঙ। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা: প্রথম যুগের অর্থনৈতিক ও জৈব প্রয়োজন মিটাইবার যে অন্ধ প্রেরণা, সরল বিশ্বাস ও স্থূল ধর্মনির্দেশ মানুষের যে সমাজ-জীবনের সৃষ্টি করে তাহা ক্রমেই অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার মত সামগ্রীর অধিক (surplus) উৎপাদিত হইতে লাগিল। এই উদ্বৃত্ত যুথের ভিতর কিছু লোক ছলে, বলে ও কৌশলে আত্মসাৎ করিবার ফলে সৃষ্টি হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তখন সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তির অধিকারে রাখিবার জন্যই প্রয়োজন হইল জটিল আইন ও শাসনব্যবস্থা। এইবার সামাজিক মঞ্চে পুরাদস্তুর রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইল।

ইহার পরে, মার্জিত চেতনা ও বুদ্ধির সাহায্যে সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার ও উন্নতির ভিতর দিয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

একের পর এক পাঁচটি উপাদান স্বতন্ত্র করিয়া দেখান হইয়াছে নিতান্তই সহজ করিয়া বুঝিবার খাতিরে। এ কথা ভাবিলে ভুল হইবে যে তাহারা স্বতন্ত্রভাবে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ

একে অপরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত—এবং সেই হিসাবেই তাহারা সমাজ-বিকাশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একমাত্র সুগঠিত রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার আবির্ভাব যে পরবর্তী পর্যায়ে আসিয়াছে তাহাই কেবল জোর করিয়া বলা চলে।

এইভাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ইতিহাসের বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ইতিপূর্বেই দেখানো হইয়াছে কিরূপে প্রাচ্য-সাম্রাজ্য, গ্রীক্ নগররাষ্ট্র, রোমান সাম্রাজ্য ও পরে মধ্যযুগের ফিউডালি প্রথার অবসানে রাজা মহারাজার কর্তৃত্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্র আবির্ভূত হইল। ক্রমে জাতীয়তাবোধের ভিতর দিয়া "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" (One Nation, One State) এই আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে আধুনিক যুগে প্রধানতঃ জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে আবার দেখা যায় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে প্রত্যেকটি জাতিই, তথা সমগ্র মানবসমাজই, প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে! সভ্যতার বিলোপের এই আশংকাকে দূরীভূত করিবার প্রয়োজনেই রাষ্ট্রনীতিতে আবার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অবাধ অধিকার অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে সংযত করিবার ও পারস্পরিক সম্পর্কে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য বিশ্বজনীন সংস্থা গড়িয়া তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতে লাগিল। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একাধারে রাষ্ট্রের অখণ্ড, অবাধ-কর্তৃত্ব, অপরদিকে-বিশ্বব্যাপী শান্তি ও শৃংখলা আনয়নের সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। রাষ্ট্রের বিবর্তনে ইহাও এক নবপর্যায়। পরবর্তী আলোচনায় আমরা সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব।

অতিরিক্ত পাঠ্য

MACIVER—The Modern State
C. D. BURNS—Political Ideals
IVOR BROWN—English Political Theory
DUNNING—History of Political Theories—Vols. II & III.
GETTELL—Readings in Political Sci nce
SABINE—History of Political Theory

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতিতত্ত্ব

(Theories of the Nation)

[এক বিশেষ-ধরণের ঐক্যবোধে উজ্জীবিত জনসমাজ যখন স্বাধীনতার দাবীতে অগ্রসর হইতেছে অথবা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তখন তাহাকে জাতি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কোন্ কোন্ বাস্তব অবস্থার যোগাযোগে এই ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়, তাহা বুঝাইতে গিয়া অনেক লেখকই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিহার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—কুলগত ঐক্য, এক ধর্ম বিশ্বাস, এক ভাষা, সন্নিহিত ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে স্থায়ী বসবাস ও একই অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন। কিন্তু বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকেও জাতি গঠিত হইয়াছে। আবার কোথাও বা একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এক জাতি না হইয়া একাধিক জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, এই গুণগুলির অপরিহার্যতা প্রমাণিত হইল না।

এই অবস্থায় অনেকে বলিয়াছেন: "অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা" এই ভাবগত ঐক্যবোধের ভিত্তিতেই জাতি গড়িয়া উঠিবে; অপর কোন বাস্তব মূল অনুসন্ধান করিয়া লাভ নাই।

আধুনিক মতবাদ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জনসমাজের রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়ার ভিতর জাতির উৎপত্তি দেখিতে পায়। সামন্তপ্রথা বা বিদেশী শাসনের অবসান, ধনতান্ত্রিক প্রথার উদ্ভব বা তাহার প্রসারের তাগিদ এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ—এই তিনের মিশ্রণে আধুনিক জাতির জন্ম।

জাতির স্বাধীনতার আবেগ প্রবল ও দুর্বার। যুক্তির দিক হইতে, ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে এবং মানব সভ্যতার বৈচিত্র্যময় বিকাশের প্রয়োজনে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করা চলে না। তথাপি জাতীয় সমাজ মাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করার পথে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ইতিহাসগত বাধা আছে। সুতরাং একাধিক জাতীয় জনসমাজকে একই রাষ্ট্রশাসনে বাস করিতে হইলে প্রত্যেকেরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিকাশের ও রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমব্যবহারের অধিকার স্বীকার করা প্রয়োজন।

জাতীয়তাবাদ স্বজাতিপ্রেমের অতিরঞ্জিত ও বিকৃত রূপ লইয়া দেখা দেয়। অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ, পরমত-অসহিষ্ণুতা, সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ও যুদ্ধকামনা ইহার বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্রের ধ্বংস ও ফ্যাসিস্ট পন্থার অভ্যুত্থান ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

প্রকৃত জাতীয়তাবোধের সহিত আন্তর্জাতিকতার বিরোধ নাই। মানবসমাজের ধ্বংস এড়াইবার জন্য, শান্তির দাবীতে, ও বিশ্বসভ্যতার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের প্রয়োজনে, জাতীয়তাবাদের সঙ্কোচন প্রয়োজন।]

শব্দার্থ

বাংলা ভাষায় 'জাতি' শব্দটি বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা 'বর্ণ' বলিতে,—ইংরাজীতে Caste—'জাতি' বলি। যথা—জাতিতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি। 'আর্যজাতি', 'মোঙ্গল জাতি', প্রভৃতি শব্দের প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যায়; এক্ষেত্রে বুঝাইতে চাই ইংরাজিতে যাহাকে বলে Race বা বাংলায় কুল। ইংরাজী Nationality

বুঝাইতেও বলি 'জাতি', Nation বলিতেও ব্যবহার করি ঐ একই শব্দ। এই জন্যই অর্থ বিভ্রাট ঘটিবার আশংকা এড়াইবার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ষাট বৎসর পূর্বে, ১৩০৮ সালে তাঁহার "নেশন কী" প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, "...নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থ-দ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।"* তথাপি বাংলা পাঠ্যপুস্তকে 'Nation'-এর প্রতিশব্দরূপে 'জাতি' শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে। আমরাও তাহার ব্যতিক্রম করিলাম না সুতরাং ইংরেজী Nation-এর অর্থে 'জাতি' বুঝিতে হইবে, ভিন্ন অর্থে নহে।

এই সূত্রে ইংরেজী আরও কয়েকটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ এ স্থলেই স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন; কারণ এই শব্দগুলি বর্তমান আলোচনায় বারবারই আসিয়া হাজির হইবে। আমরা বর্তমান আলোচনায় People, Nationality, Nation ও Nationalism বলিতে যথাক্রমে জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ এই শব্দগুলি ব্যবহার করিব।

জাতি কাহাকে বলে? স্বভাবতঃই প্রতিশব্দের সহিত পরিচয় সূত্রপাত মাত্র, শব্দের কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া তাহার তত্ত্বগত রূপটি উদ্ঘাটন করিতে হইবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জাতি বলিতে আমরা কি বুঝি তাহারই ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

জাতীয় জনসমাজ ও জাতি

মানুষ যূথবদ্ধ জীব। সে সমাজে বাস করে, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে ও সামাজিক বন্ধন ব্যতীত তাহার চলে না। এক বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ বহুসংখ্যক মানুষকে আমরা জাতীয় জনসমাজ (Nationality) বলিয়া অভিহিত করি, এবং তাহারই রাষ্ট্রনৈতিক রূপকে বলি জাতি (Nation)। প্রশ্ন হইল: কোন্ কোন্ বিশেষ উপাদানের সংমিশ্রণে এই বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক-বন্ধন গড়িয়া উঠে?

জাতীয়তার উপাদান

এ প্রশ্নের জবাবে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে যখন কোন মানবসমাজ পরস্পরের সহিত রক্তের সম্পর্কে 'আবদ্ধ' অর্থাৎ তাহাদের কুলগত (Racial) ঐক্য আছে, যখন তাহাদের ধর্ম এক, ভাষা এক, যখন তাহারা একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাস করে এবং একই ধরণের অর্থনৈতিক স্বার্থবন্ধনে যুক্ত, তখন জাতীয় জনসমাজের জন্ম হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইহাদের অতীত ইতিহাস এক,

* রবীন্দ্রনাথ—'আত্মশক্তি'।

সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য এক ; ইহারা একই ধরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, একই রকমের চিন্তা করিতে অভ্যস্ত ; একই প্রকারের মানসিক গঠনে চিহ্নিত।

কুলগত ঐক্য, এক ধর্মবিশ্বাস, এক ভাষা

যখন বহু মানুষ বিশ্বাস করে যে তাহাদের ধমণীতে একই রক্ত প্রবাহিত এবং তাহাদের আকৃতিতে একই ধরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্তমান তখন স্বভাবতঃই তাহারা সমগ্র গোষ্ঠীকেই স্বজন বলিয়া মনে করে। আবার এক ঈশ্বরের উপাসনা তাহাদিগকে সম-বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরস্পরের নিকটে টানিয়া আনে এবং এক উপাসনা-পদ্ধতি সেই নৈকট্যকে আরও গাঢ় করিয়া তোলে। পুনরায়, ভাষা হইল মানুষের মনোভাব প্রকাশের মূল বাহন। কাজেই যাহারা এক ভাষায় কথা বলে, তাহারা পরস্পরের মনের কথা সহজে বোঝে এবং বুঝাইতে পারে। এক ভাষার অর্থ, তাহাদের প্রকাশভঙ্গি এক, তাহাদের রঙ্গ-রসিকতা এক ধরণের, তাহাদের ইঙ্গিত, ইসারা, সংকেত সমবর্গীয়। মানুষের চিন্তাবস্তু অতি সহজেই এক ভাষার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গভীর ঐক্যবোধ সকলকে বাঁধিয়া রাখে। ভাষাগত ঐক্য সেজন্য বিভিন্ন মানব পরিবারসমূহ বা গোষ্ঠীসমূহকে যেভাবে বাঁধিয়া রাখে তাহার তুলনা নাই। তাহার পর আসে এক ভৌগোলিক সীমানাবন্ধন প্রসঙ্গ। যখন একদল লোক শিশুকাল হইতে একই প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়িয়া উঠে,

এক ভৌগোলিক সীমানা, অতীত স্মৃতি

যখন তাহারা দেখে যে এই দেশের জমি, জল, হাওয়া হইতেই তাহারা তাহাদের ও আহার্য ও ঐহিক সম্পদ সংগ্রহ করিতেছে, এই দেশের মাটির সহিত তাহাদের অতীত পিতৃপুরুষের স্মৃতি ও ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত রহিয়াছে, তাহাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তা-ভাবনা ওতপ্রোতভাবে মিলাইয়া গিয়াছে তখন স্বভাবতঃই তাহাদের মন বলিয়া উঠে,—"ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।" আর একই সাথে পাশাপাশি

অর্থনৈতিক সমস্বার্থ

দাঁড়াইয়া অর্থনৈতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিলে যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় তাহার সম্বন্ধে বিশদ্ ব্যাখ্যা বাহুল্যমাত্র। সুতরাং অর্থনৈতিক সমস্বার্থ যে বহুসংখ্যক মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিবে তাহা বুঝিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে বোঝা গেল যে কুলগত, ধর্মগত, ভাষাগত, ভৌগোলিক সীমানাগত ও অর্থনীতিগত ঐক্য যদি কোন জনসমাজে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে সে জনসমাজ যে গভীর একাত্মবোধে আপ্লুত থাকিবে তাহাতে

সন্দেহ নাই। এই একাত্মবোধকেই জাতীয়তার অনুভূতি বলা হইতেছে। এই অনুভূতিসম্পন্ন জনসমাজ হইল জাতীয় জনসমাজ; এবং এই জাতীয় জনসমাজ যখন স্বাধীন হইয়া নিজ ভাগ্য নিজেই নির্ণীত করে বা তাহা করিবার দাবীতে অগ্রসর হয়, তখন জাতির জন্ম হইল।

ঐ উপাদানগুলি অপরিহার্য নহে

এখন প্রশ্ন হইল, এই উপাদানগুলি কি নিতান্তই অপরিহার্য? অর্থাৎ সকল জাতির মধ্যেই যদি এই উপাদানগুলি দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জাতি গঠনের মৌলিক উপাদান বলিয়া এইগুলিকে নির্দিষ্ট করা যাইবে না। সুতরাং বিভিন্ন জাতির প্রকৃতি ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে এই উপাদানগুলির সন্ধান কতটা মেলে।

আধুনিক বিজ্ঞান সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে কুলগত পবিত্রতা (Racial purity) কোথাও বজায় নাই। প্রত্যেকটি জাতিই বিভিন্ন কুলের মিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং কুলকে জাতিগঠনের তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। ধর্ম সম্বন্ধে বক্তব্যও অনুরূপ। কারণ ইউরোপে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি প্রায় সকল জাতির মধ্যেই ক্যাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট, ইহুদি ও নিরীশ্বরবাদী একই সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়া ও রাশিয়ায় এই সবের সহিত মুসলমান ধর্মবিশ্বাসীও যথেষ্ট। জাপানে শিন্টোমতাবলম্বীর সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান পাশাপাশি রহিয়াছে। চীনে রহিয়াছে কনফিউশিয়-পন্থী, তাওবাদী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুস্লিম। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে পার্থক্য সত্ত্বেও জাপানী বা চীনা জাতি ঠিকই গড়িয়াছে। আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে, একই ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ফরাসী, ইতালী, জার্মান, প্রভৃতি জাতি গঠন করিয়াছে; বৌদ্ধ মতাবলম্বী মানুষ চীনা ও জাপানী হিসাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। ধর্মমত এক হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন জাতি গঠন করিতে বাধা হইল না। আবার ভাষার কথা ধরিলেও দেখা যাইবে যে জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়ান এবং রোমান্‌স (Romanasch) এই চারি ভাষাভাষী সুইজারল্যাণ্ডের মানুষ মিলিত হইয়া এক সুইস জাতি গড়িয়াছে। কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাভাষী মিলিত হইয়া এক ক্যানাডিয়ান জাতি সৃষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা ইংরেজী বলিলেও তাহারা স্বতন্ত্র জাতিই গঠন করিয়াছে। বহু মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার অবিসংবাদী ক্ষমতা সত্ত্বেও বলা যায় যে এক ভাষা হইলেই যে একজাতি হইবে তাহাও যেমন ঠিক নয়,

তেমনি বহু ভাষা ব্যবহার করা সত্ত্বেও এক জাতি গঠন করা খুবই সম্ভব। অনুরূপভাবে এক ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক সমস্বার্থকেও বাতিল করিতে হয়। কারণ, নদী, সাগর, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি স্বাভাবিক সীমারেখা (natural boundaries) সর্বত্র জাতিগুলিকে বিভক্ত করে নাই, এবং একই ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে একাধিক জাতির অবস্থানের প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে। অর্থনৈতিক সমস্বার্থ হইতে বাণিজ্য-শুল্ক খাড়া করা বা তুলিয়া দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু জাতীয় মনোভাব গড়ে না।

রেঁনার মত :

তাহা হইলে, বাকি রহিল কি? জাতি গঠনের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া কাহাকে নির্দেশিত করিব? ফরাসী মনীষী রেণাঁ (Renan) উপরোক্ত সমালোচনার ভিত্তিতে এ প্রশ্নের জবাব দিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে রেণাঁর মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ভাষাতেই বিষয়টি উপস্থাপিত করিতেছি :

"…রেণাঁ বললেন,—মানুষ জাতি (Race অর্থে,—লেখক), ভাষার, ধর্মমতের বা নদী পর্বতের দাস নহে। অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চরিত্র সৃজন করে, তাহাই নেশন।

"নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিস বস্তুত: একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে—সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা,—

জাতীয়তাবোধ একটি মানস পদার্থ

যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমতো নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত-কালের প্রয়াস, ত্যাগ স্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্ব পুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরই ন্যাশন্যাল ভাবের মূলপত্তন। অতীতকালে সর্বসাধারণের এক গৌরব, এবং বর্তমানকালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা; পূর্বে একত্র বড় কাজ করা, এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প, ইহাই জনসম্প্রদায় গঠনের ঐকান্তিক

মূল।* আমরা যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আমাদের ভালবাসা সেই পরিমাণে প্রবল হইবে।..."

"অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ; একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা এইগুলিই আসল জিনিস, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝায়—একত্রে মাশুলখানা-স্থাপন বা সীমান্ত নির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশী। একত্রে দুঃখ পাওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।"

"অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগ দুঃখ স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্যে সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি দ্রবীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তাহাই নেশন। ইহার পশ্চাতে একটি অতীত আছে বটে কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে—সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত ইচ্ছা।" †

রেনঁার মত অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির জন্য কোন বাস্তব উপাদানের প্রয়োজন নাই, অতীত স্মৃতিও ভবিষ্যতের আশা,—এই মানসিক প্রবণতাই যথেষ্ট। অনুরূপ চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া জিমার্ণের (A. F. Zimmern) বক্তব্যও হইল: "যে জনসমাজের মধ্যে জাতীয় জনসমাজের চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই জাতীয় জনসমাজ" (If a people feels itself to be a nationality, it is nationality)।

রেণঁার মতের সমালোচনা

তাহা হইলে, এই অনুভূতিমাত্রকেই কি জাতীয় জনসমাজ গঠনের ভিত্তি বলিয়া ধরিয়া লইব? ইহার জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কোনরূপ বাস্তব উপকরণের কি প্রয়োজন নাই? যে কোন একদল লোক নিজেদের জাতীয় জনসমাজ বলিয়া দাবী করিলেই তাহা মানিতে হইবে নাকি? ম্যাক্আইভার স্বভাবতঃই প্রশ্ন করিয়াছেন: "ইহারা

* "What constitutes a nation is not speaking the same tongue or belonging to the same ethnic group, but having accomplished great things in common in the past and the wish to accomplish them in the future." (Renan)—Mac Iver—The Modern State P. 123.

† রবীন্দ্রনাথ—আত্মশক্তি

কাহারা, যে একসাথে বড় কাজ সম্পাদন করিয়াছে বলিয়াই নিজেদের জাতি বলিয়া মনে করিতেছে? এ শর্ত তো একটি পরিবার, এক জাহাজের নাবিক মণ্ডলী বা একদল ষড়যন্ত্রকারীও পরিপূরণ করিতে পারে, কিন্তু সেজন্য তাহারা জাতি হইয়া উঠে না।*

এ প্রশ্নের উত্তর ম্যাক্‌আইভার স্বয়ংই দিয়াছেন: "জাতীয়তাবোধ হইল সেই সামাজিকবোধ যাহা এক বিশেষ সামাজিক যুগের ঐতিহাসিক পরিবেশের ভিতরে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে অথবা রাষ্ট্রের মাধ্যমে আপন অভিব্যক্তির এখনও অনুসন্ধান করিতেছে।**

ম্যাকআইভারের মত

ম্যক্‌আইভার পুনরায় বলিয়াছেন: "দুইটি প্রধান উপকরণ জাতীয় "চৈতন্যের" অপ্রতিরোধ্যতা ও প্রগাঢ়তার জন্য দায়ী: একটি হইল রাষ্ট্রের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ—তাহা যখন দেশব্যাপী রাষ্ট্রের পর্যায়ে উপনীত হয়; অপরটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে সামাজিক পরিবেশের ভিতর, যে পরিবেশ হইতে ইতিহাসগতভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে।"†

রাষ্ট্র ও সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের গুরুত্ব

অর্থাৎ, জাতিগঠনের মূল বিষয়টি কি তাহা বুঝিতে হইলে অনুসন্ধান করিতে হইবে ইতিহাসের মধ্যে।

শুরুতেই যে কথা স্বীকার করা প্রয়োজন তাহা হইল, মানবেতিহাসের

* "But just who are they, who having accomplished great things in common feel themselves a nation? The condition may be fulfilled by a family or a ship's crew or a hand of conspirators, but they do not on that account become a nation." MacIver. Ibid. P. 124.

**Nationality is the sense of community which under the historical conditions of a particular social epoch, has possessed or still seeks expression through the unity of a state. লক্ষ্য করিবার বিষয়, ম্যাক্‌আইভার এস্থলে Nationality বলিতে জাতীয়তাবোধ বুঝিয়াছেন, জাতীয় জনসমাজ নহে। ইংরেজীতে শব্দটি এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
MacIver Ibid. P. 124.

† There are two great factors which account for the insistence and intensity of the national spirit. One is the operation of the state itself when it reaches the stage of being a country-state, the other is found in the social conditions whence that stage has historically arisen. Ibid P. 125.

সর্বপর্যায়ে 'জাতির' সাক্ষাৎ মিলিবে না। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে 'জাতীয়তাবোধ' সাম্প্রতিক ঘটনা। অতীতে ইহা ছিল না। ইহার অভ্যুত্থান হয় ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানের সময়ে, আধুনিক যুগের প্রথম দিকে। গ্রীক নগর রাষ্ট্র, রোমান সাম্রাজ্য বা মধ্যযুগে ফিউডালী প্রথা ও 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের' (Holy Roman Empire) সময় লোকে 'জাতি' হিসাবে নিজেদের ভাবিত না। তখন সমাজ সংগঠন ছিল ভিন্নপ্রকারের, জীবনধারা অন্য প্রকৃতির, সামাজিক চেতনা স্বতন্ত্র গোত্রের। 'জাতির' অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়া পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিল, গড়িয়া উঠিল নূতন ব্যবস্থা। এই ভাঙ্গা-গড়ার প্রক্রিয়ায়, প্রথমতঃ ধ্বসিয়া যাইতেছে —ফিউডালী সমাজ-শাসন, গ্রাম্য-সঙ্কীর্ণতা, গিল্ড-প্রথার কঠিনতা, সমগ্র দেসবাসীর মধ্যে সহস্র বিভেদ। ইউরোপে এই ফিউডালী প্রথার অবসানের জন্য যাহারা আগাইয়া আসিল, মূলতঃ তাহারাই বিভিন্ন দেশে জাতির জনক।

'জাতির' অভ্যুত্থান আধুনিক যুগের ঘটনা

শতধাবিভক্ত ফিউডালী সমাজের অবসানে জাতীয় ঐক্যবোধের জন্ম

মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন হইতে থাকে। এই ধনিক-ব্যবসায়ীদের সম্প্রসারণের পক্ষে বৃহত্তম বাধা ছিল ফিউডালী বন্দোবস্ত। ফিউডালী জমিদার ও সামন্তপ্রভুরা একদিকে নানাবিধ খামখেয়ালী কর ও বন্ধনে ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবসার পথ রোধ করিতেছিল। অপরদিকে কৃষক কুলকে নিজেদের শাসনে আটক করিয়া ফ্যাক্টরি-মালিকদের সস্তায় শ্রমিক পাওয়া অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে এই ধনিক ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের সংগ্রামে তাই শরিক ছিল পুরাতন ব্যবস্থায় উৎপীড়িত কৃষক সমাজ। প্রথম যুগে এই মিতালীর অগ্রভাগে ছিল এক একটি নৃপতি বংশ। ইংল্যাণ্ডে টিউডর রাজবংশের অধীনে, ফ্রান্সে বুর্বোঁ বংশের শাসনে, স্পেনে ফার্ডিন্যাণ্ড-ইসাবেলার রাজত্বের ভিতর দিয়া জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সামাজিক পরিবেশের মৌলিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়া 'জাতীয় রাষ্ট্রের' (National State) জন্ম। এবং এই সংগ্রামে তাহারাই বিশেষ করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে যাহারা ভাষাগত, ধর্মগত, কুলগত (যদিও মূলতঃ কল্পিত) ঐক্যের ভিতর দিয়া নিজেদের সমগোত্রীয় বলিয়া সহজেই চিনিতে পারিয়াছে। শুধুমাত্র যান্ত্রিকভাবে সামন্তগোষ্ঠীর সহিত ধনিকগোষ্ঠীর বিরোধ দেখিলে ভুল হইবে। তাহা হইলে সারা ইউরোপময় দুই পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সংগ্রাম

বাস্তব সাংস্কৃতিক ঐক্য জাতীয় ঐক্য বোধের সহায়ক

ঘটাই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু বাঁধা অঙ্কের ছকে ইতিহাস চলে না। সেইজন্য বিশেষ করিয়া বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে কোথাও কোথাও সামন্ত প্রভুদেরও যোগ দিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু সামন্ত-তান্ত্রিক ফিউডালী বিভেদময় সমাজে সমস্ত মানুষের মধ্যে জাতীয়তার তাৎপর্যময় ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠা সম্ভবপর নহে।

সুতরাং এই মূল সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে এক একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত মানবসমাজ তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতিগত ঐক্য ও অপর জনসমাজের সহিত তাহাদের বিভিন্নতা দিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সামাজিক বিকাশের ভিতর দিয়া, বিভিন্ন 'জাতি' গড়িয়া তুলিয়াছে।

লক্ষণীয় যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত জাতি সম্বন্ধে মার্কসবাদী চিন্তার মৌলিক সঙ্গতি রহিয়াছে, যদিও তাঁহারা স্বভাবতঃই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। লেনিন বলিয়াছেন: "সারা পৃথিবীতে সামন্ততন্ত্রের উপর ধনতন্ত্রের চরম বিজয় জাতীয় আন্দোলনের সহিত জড়িত রহিয়াছে। এই সকল আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে পুঁজিবাদিদের দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাজার সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার প্রয়োজনের উপর, কারণ তাহার উপর নির্ভর করিতেছে পণ্য-উৎপাদন অর্থনীতির সম্পূর্ণ সাফল্য; ইহার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র-নীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ ভূখণ্ড, যেখানকার জনসাধারণ এক ভাষায় কথা বলিয়া থাকে এবং প্রয়োজন সেই ভাষার সম্পূর্ণ বিকাশ ও সাহিত্যে তাহার সুসংবদ্ধরূপের পথে সর্ববিধ বাধার অপসারণ। মানবিক সম্পর্কের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হইল ভাষা। আধুনিক ধনতন্ত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ প্রকৃত স্বাধীন ও বিস্তৃত ব্যবসায়িক সম্পর্ক সৃষ্টি। জনসমষ্টিকে স্বাধীন ও ব্যাপকরূপে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ ও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, ক্রেতা বা বিক্রেতা, প্রতিটি মালিকের সহিত বাজারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম প্রধান শর্ত হইল ভাষার ঐক্য ও তাহার বাধাহীন বিকাশ।"*

---

*"Throughout the world the period of the final victory of capitalism over feudalism was associated with national movements. The economic basis of these movements lies in the fact that the complete victory of commodity production requires that the bourgeoisie capture the home market; it requires politically united territories with a population speaking the same language, and the removal of obstacle to the development of the language and to its consolidation in literature. Language is the most important means of human intercourse. Unity of Language and its unimpeded development is one of the most important conditions for genuinely free and extensive commercial intercourse on a scale commensurate with modern capitalism, for a free and broad grouping of the population in all its separate classes and lastly for the establishment of connection between the market and each and every proprietor big or small seller and buyer.

Lenin. The Right of Nations to Self-Determination in The National Liberation Movement in the East.—Pp. 65-66

তাহা হইলে বুঝা গেল :

১। 'জাতির উদ্ভব আকস্মিক নহে, একদল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়চেতনার জাগরণও কারণবিহীন নহে।

২। ইতিহাসের অগ্রগতির পথে একটি মানবসমাজ নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক মৌল পরিবর্তনের ইপ্সিত সাফল্য লাভ করিবার জন্য যখন রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে সোচ্চার হইয়া উঠে, তখনই জন্ম হয় জাতীয় আন্দোলনের, ঘটে 'জাতির অভ্যুত্থান'।

জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য

৩। পূর্বোক্ত ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য, সম সুখদুঃখভাগের স্মৃতি, প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান আসিয়া জাতীয়-চেতনার বিকাশের ধারাকে গভীর, বিশাল ও উত্তাল তরঙ্গময় করিয়া তুলে।*

৪। বিভিন্ন জাতির জন্ম ও বিকাশের মধ্যে প্রত্যেকটি উপাদানই যে সমভাবে থাকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন উপকরণ না থাকিতেও পারে; কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তন ও বিভিন্ন বাস্তব উপাদানের মিশ্রণ ব্যতীত জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার পটভূমিতে বুঝিলে বার্জেস্ (Burgess) প্রণীত সংজ্ঞাটি সুন্দর। তিনি বলিয়াছেন : "পরস্পর সন্নিহিত কোন ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাসকারী এক জনসমাজ যদি একই ভাষা ও সাহিত্য, একই ইতিহাস ও ঐতিহ্য, একই আচার ও ব্যবহার, একই ধরনের ন্যায়-অন্যায় ও সুখ-দুঃখের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে জাতি বলা চলিবে।"†

৫। জাতির সহিত রাষ্ট্রক্ষমতার অঙ্গাঙ্গী সংযোগ। কারণ, হয় জাতি রাষ্ট্রক্ষমতার মারফতে পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নিজেকে আরও সংহত ও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, অন্যান্য দেশে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ সন্ধান করিতেছে, নতুবা আত্মবিকাশের দাবিতে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারে সচেষ্ট হইয়াছে।

৬। জাতি শুধু মানুষকে ঐক্যবদ্ধই করে না, বিভক্তও করে। অর্থাৎ, যখনই

* Coker বলেন : 'Nationality is primarily the product of historical experiences and cultural tradition.—*Recent Political Thought*—p. 449.

† A nation is a people having a common language and literature, a common tradition and history, common customs and a common consciousness of rights and wrongs, inhabiting a territory of geographic unity.

কেহ নিজেকে ইংরেজ বলিয়া পরিচয় দিল তখনই সে শুধু যে নিজের সহিত অন্যান্য ইংরেজের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা মানিয়া লইল তাহাই নহে, ফরাসী, জার্মান, তথা বিশ্বের অন্য সকল জাতির মানুষের সহিতই এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের কথাও সে ঘোষণা করিল।

উপরিউক্ত বক্তব্য হইতে অনেকে প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে এখনও এমন বহু জাতীয় জনসমাজের সাক্ষাৎ মিলিবে যাহারা অন্যান্য জাতীয় জনসমাজের সহিত একই রাষ্ট্রে বাস করিতেছে। তাহা হইলে তাহাদের জাতিসত্তা কি অস্বীকার করিতে হইবে?

বস্তুতঃ একই রাষ্ট্রে বহু জাতীয় জনসমাজের বাস দুই প্রকারের হইতে পারে: (১) সেই রাষ্ট্র প্রধানতঃ একটি বৃহৎ জাতীয় জনসমাজ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে, অন্যান্যরা সেখানে নিপীড়িত, অবদমিত; অথবা, (২) প্রধানতঃ একটি বা দুইটি প্রধান জাতীয় জনসমাজ কর্তৃক শাসিত হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্যরা কতকগুলি মৌলিক রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে একই সঙ্গে মোটামুটি শান্তিতে বাস করিতেছে। প্রথমোক্ত বিভাগের অগণিত উদাহরণ ছড়াইয়া আছে। রুশ সাম্রাজ্য অস্ট্রোহাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্যের অত্যাচারমূলক শাসন হইতে মুক্তির জন্য বিভিন্ন জাতি ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, এবং ঐসব সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ হইতেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে পোলিশ্, হাঙ্গারিয়ান, চেকোশ্লোভাক প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্র। অপরদিকে দ্বিতীয় বিভাগের উদাহরণ মিলিবে গ্রেটব্রিটেনে স্কটিশ্ বা ওয়েল্শ্‌দের মধ্যে, অথবা সোবিয়েত ইউনিয়নে বহুসংখ্যক জাতীয় জনসমাজের ভিতর। প্রত্যেকটি জাতীয় জনসমাজই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া, নিজস্ব ভঙ্গীতে, নিজেদের জীবনধারা প্রবাহিত করিতে চায়। যখন এ চাহিদা সহজে স্বীকৃতি লাভ করে, তখন হয়ত সমস্বার্থ ও ইতিহাসগত বন্ধনের খাতিরে সে অন্যান্যদের সহিত একত্রে থাকিতে রাজী হইবে। যদি সে নিজেকে নিপীড়িত ও অবদমিত বলিয়া বোধ করে, যদি সে মনে করে তাহার স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ, তবে স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের দাবি লইয়া অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনীত হইলে সে জাতি, প্রথম পর্যায়ের কাল পর্যন্ত জাতীয় জনসমাজই তাহার পরিচয়। এই কারণেই অনেক লেখক জাতীয় জনসমাজকে একটি 'সংস্কৃতিমূলক ধারণা' (Cultural concept) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের স্বরূপ

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার (Self-determination of nations): ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া বিভিন্ন জাতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নেপোলিয়ন যুদ্ধের অবসানে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেসে শান্তিচুক্তির বৈঠকেই পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা এবং জার্মানী ও ইতালীর ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উঠিয়াছিল। বিজয়ী রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তখন তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু আন্দোলন চলিতে থাকিল। তুর্কি সাম্রাজ্যের শাসন হইতে গ্রীস স্বাধীন হইল। ১৮৩০ সালে বেলজিয়াম ওলন্দাজ শাসন অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ১৮৪৯ সালে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র ইউরোপীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইল। পরে তাহাকে অনুসরণ করিয়া আসিল ঐক্যবদ্ধ ইতালী। ১৭৭৬ সালেই উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা মহাদেশে আরও বহু জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন হয়। এদিকে বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর ইউরোপে বহু স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করে। পরে হিটলার-মুসোলিনির নৃশংস আক্রমণ সাময়িকভাবে ইউরোপে জাতীয় স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশকে রুদ্ধ করিলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাহাদের পরাজয়ের ফলে ইউরোপে স্বাধীন জাতিগঠনের প্রক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বলা চলে। আবার ঐ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়েই প্রথমে এশিয়া ও পরে আফ্রিকায় বিভিন্ন জাতির স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন নিরবচ্ছিন্নভাবে ও অনিবার্য গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

অর্থাৎ, প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অধিকার ইতিহাস দ্বিধাহীনভাবেই সপ্রমাণ করিতেছে।

কিন্তু ইতিহাসে যাহাই ঘটিতেছে তাহাই ন্যায্য বা সঠিক একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যে যুক্তি রহিয়াছে তাহার বিচার প্রয়োজন।

জাতীয়তাবোধ তাহার ব্যাপকতা ও বাস্তবতায় পূর্ববর্তী যে কোন সামাজিক চেতনাকেই ছাপাইয়া গিয়াছে। ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ, রাজা ও প্রজার মধ্যে সকল পার্থক্যই জাতীয় চেতনার সম্মুখে ম্লান হইয়া যায়। এই সাম্য ও ঐক্যের অনুভূতিই

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সপক্ষে যুক্তি

রবীন্দ্রনাথের গোরার মুখে ভাষায় রূপ পাইয়াছে: "আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"*

ব্যাপক ও গভীর চেতনার আত্ম-প্রকাশের স্বাভাবিক দাবি

ম্যাক্‌আইভার বলিতেছেন: "যে চেতনা এত ব্যাপক, এত জটিল, এত সূক্ষ্ম তথাপি এত প্রবল, তাহা কোনো সংগঠনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চায়, সে সংগঠন অনিবার্যরূপেই রাষ্ট্ররূপ ধারণ করে। ......অপর কোনরূপ সংগঠনই ইহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিত না,......রাষ্ট্র জাতির বাহ্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়, অন্ততঃ হইতে চায়।"‡

স্বাধীনতার জন্য অনিবার্য তাগিদের কথা যদি বাদও দিই তাহা হইলেও নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য প্রতি জাতির অত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিতে হয়।

আরও চারিটি যুক্তি

১। প্রত্যেকটি জাতিরই নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। দেখা গিয়াছে, এ বৈশিষ্ট্যের যথাযথ বিকাশ তখনই হয় যখন সে জাতি অপরের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বকীয় চেষ্টায়, স্বকীয় পদ্ধতিতে নিজস্ব উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকে। সুতরাং প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব গুণের প্রস্ফুটন ও সামগ্রিক বিকাশের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে।

২। ইহার ফলে শুধু যে সেই জাতির কল্যাণ হইবে তাহা নহে, সমগ্র মানব-সমাজই উপকৃত হইবে। বৈচিত্র্যেই সৌন্দর্যের প্রকাশ। সারা পৃথিবীময় মানুষের একই প্রকারের হাব-ভাব, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, প্রথা ও প্রকাশভঙ্গি দেখিতে কেহই চাহে না। বৃহদাকার ফ্যাক্টরি হইতে ছাপ-মারা দ্রব্যের মত একই ধরনের মানুষ দিয়া অন্তত ঐশ্বর্যপূর্ণ মানব সভ্যতা গড়িয়া উঠিত না। সুতরাং বিভিন্ন জাতির নানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের বিকাশ সমগ্র মানব সভ্যতাকে অধিকতর সম্পদময় করিয়া তুলিবে।

৩। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চিন্তাধারা হইতেও জাতীয় স্বাধীনতার দাবি সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। কারণ, যদি মনে করা যায় রাষ্ট্রক্ষমতা

* রবীন্দ্রনাথ—গোরা।

‡ A spirit so pervasive, so complex, so subtle, and yet so strong, seeks embodiment in an association, inevitably in the state. No other association could serve its end......The state becomes or seeks to become, the body of nationality...
MacIver Ibid P. 132.

কে বা কাহারা পরিচালনা করিবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সাধারণ মানুষ, তাহা হইলে যখন বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ আত্মবিকাশের দাবিতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া থাকিতে চায়, তখন সে চাহিদা উপেক্ষা করা যাইবে কি উপায়ে ?

৪। তাহা ছাড়া, জাতি স্বাধীন হইলেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইবে একথা ভাবিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ব্যক্তি যেমন সমাজে বাস করিয়া অপর সকলের চাহিদা,প্রয়োজনের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইয়াই স্বকীয় দাবি পূরণ করে, তেমনি বৃহৎ মানবসমাজে অন্যান্য জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই প্রতিটি জাতি স্বকীয় জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। বিরোধ অনিবার্য নহে, সহযোগিতা কাম্য ও সম্ভব।

সুতরাং এ স্থলে মিলের মতটি উপস্থাপিত করা অযৌক্তিক হইবে না:

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সিদ্ধান্ত

"যেখানে জাতীয়তাবোধ কিছুটা পরিমাণে শক্তিশালী সেখানেই জাতীয় জনসমাজের সকল মানুষকে একটি স্বতন্ত্র সরকারের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রাথমিক যুক্তি রহিয়াছে"।*

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

আর বার্ট্রাণ্ড রাসেল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের উদারনৈতিক মত সম্বন্ধে তাঁহার অনবদ্য ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহাও লক্ষণীয়। কোন জনসমাজকে তাহাদের নিজস্ব জাতীয় সরকার ব্যতিরেকে অপর কোন সরকারের শাসনাধীনে থাকিতে বাধ্য করা একটি নারীকে সে ঘৃণা করে এমন পুরুষকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবার মত (অপরাধনীয়-লেখক) বলিয়া মনে করা হইত।"†

কিন্তু ইহা তো গেল জাতির স্বাধীনতার অধিকারের সপক্ষে কথা। এইবার ইহার বিপক্ষে মতামতের দিকে মনোনিবেশ করা যাক।

আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরুদ্ধে মতামত

১। জাতির, স্বাধীনতার অধিকারের পথে ভূগোলই বোধ হয় সর্বাধিক গোলযোগ সৃষ্টি করে। কারণ, প্রত্যেকটি জাতীয় জনসমাজে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলে

*"Where the sentiment of nationality exists in any force there is prima facie case for uniting all the members of the nationality under the same government, and a government to themselves apart". John Stuart Mill—Representative Government (The World Classics edition) P. 381.

†To force a people to live under a government not that of their own nation was felt to bc like forcing a woman to marry a man whom she hates.

Bertrand Russel—Freedom and Organisation, (1814-1914) P. 394.

দেখা যাইবে বহু দীর্ঘকালের সুপ্রতিষ্ঠিত সুশৃংখল রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে হইতেছে। যথা—গ্রেট ব্রিটেনকেই হয়ত চারিটি রাষ্ট্রে ভাঙ্গিতে হইবে (ইংরেজ, স্কটিশ, ওয়েল্স ও নর্থ আইরিশ্) বা সুইজার্ল্যাণ্ডকে তিনটিতে। বস্তুতঃ, এই নীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে গেলে শুধু ইউরোপেই ন্যূনাধিক ষাটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

অসুবিধা, ভৌগোলিক কারণে

২। কিন্তু সে পন্থাতে তো সমস্যা মিটিবে না। কারণ, অনেক স্থানেই বিভিন্ন জাতির মানুষ পরস্পরের সহিত এমন মিশিয়া বাস করে যে রাষ্ট্রসীমানার প্রাচীর দিয়া তাহাদের বিভক্ত করা সম্ভব নহে। অর্থাৎ, এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সমূহতেও সংখ্যালঘুদল থাকিয়া যাইবে। তাহা হইলে গ্রাম বা পাড়া ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে না কি? বিকল্প পন্থা হইল ব্যাপকভাবে লোকাপসরণ ও স্থানান্তরীকরণ (Population Transfers)। কিন্তু তাহার মারাত্মক দুঃখজনক ও ভয়াবহ রূপ কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইউরোপ হইতে দেশ বিভাগের পরবর্তী ভারতবর্ষ পর্যন্ত সকলের সম্মুখেই প্রকট হইয়া উঠে নাই?

৩। তাহার পর এই সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি অর্থনীতিতে আত্মনির্ভর হইয়া উঠিতে পারিবে কি না তাহাতে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে

৪। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজস্ব দুর্বলতার জন্য কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাঁবেদার হইয়া তাহাদের চলিতে হইবে। ফলে, স্বাধীনতার নিরাপত্তাও থাকিবে না, অধিকন্তু জটিলতা বাড়িয়াই যাইবে।

আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের বিষয়ে

৫। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে একাধিক জাতীয় জনসমাজ একই রাষ্ট্রে শান্তিতে বাস করিতে পারে এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে ও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মারফৎ তাহারা উপকৃতই হইয়াছে। শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক নীতির খাতিরে ইহাদের সুখেই সংসার ভাঙ্গিবার প্রয়াস ভ্রান্তনীতি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বহু পণ্ডিতেরা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে স্বাধীনতা জাতির অধিকারমাত্র নহে ইহা অর্জন করিতে বা বজায় রাখিতে যোগ্যতার সহিত নানাবিধ শর্ত পালন করিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তায় এই সব শর্ত আরোপকে ব্যঙ্গ করিয়া বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন:

(১) স্বাধীনতার দাবী যেন কোন ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনসমাজ হইতে উত্থিত না হয়। (২) এশিয়া, আফ্রিকাকে এই হিসাব হইতে বাদ রাখিতে হইবে। (৩) সুয়েজ খাল বা পানামা খালের মত আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন অঞ্চল সম্পর্কে এ নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।*

ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া গিয়াছে। এশিয়া, আফ্রিকা, সুয়েজ খাল আজ আর উপরোক্ত শর্ত শুনিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বিপরীত যুক্তিগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না। একসাথে একাধিক জাতি বাস করিলে সকলেরই শক্তিবৃদ্ধি ও স্বার্থরক্ষা যে সহজ হয়, তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু ইহা সম্ভব তখনই, যখন প্রত্যেকে সানন্দে ও স্বেচ্ছায় এই মিলনে যোগ দিয়াছে। ইতিহাসের বিচারে দেখা গিয়াছে, কোন জাতিকেই জোর করিয়া এক শাসনে দমিত করা যাইবে না। বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতে থাকিবে; যত দিন যাইবে পৃথক হইবার দাবি ততই শক্তিশালী হইয়া উঠিবে; শান্তি, শৃংখলা বিঘ্নিত হইবে। সুতরাং মিলনের পথ হইতেছে ভ্রাতৃত্বের পথ, প্রত্যেকেরই আত্মবিকাশের অধিকার স্বীকৃতির পথ।

জাতীয় জনসমাজের বিশেষ অধিকার (Rights of Nationalities): রাষ্ট্রশাসনে একাধিক জাতীয় জনসমাজকে বাঁধিয়া রাখিতে গেলে প্রত্যেকের নিম্নোক্ত অধিকার-সমূহকে মানিয়া লইতে হইবে।

দুইটি মৌলিক অধিকার

প্রথমতঃ, প্রত্যেকটি জাতীয় জনসমাজের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশের সুযোগ নির্দিষ্ট করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে ও রাষ্ট্রিয় ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে প্রত্যেকেরই ন্যায্য অংশ পাইবার বিধি ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপরোক্ত অধিকারের ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নাই। মূল বিষয় হইল: নিপীড়নের গ্লানি যেন কোন অংশে জমিয়া উঠিতে না পারে। কারণ, সেই সূত্র হইতেই আসে বিক্ষোভ, বিশৃংখলা ও ভাঙ্গনের সম্ভাবনা।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism): যে পারিপার্শিকের ভিতর হইতে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হয়, তাহাতে স্বজাতিপ্রেম মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণা রূপেই আত্মপ্রকাশ করে এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ভালবাসা, বজার রাখা ও বিকাশ করাইবার প্রয়াসকে প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে কোন

*Bertrand Russell, Ibid p. 394

বাধা নাই। এ কথাও মানিতে হইবে যে বিভিন্ন জাতির বিকাশের ভিতর দিয়া সমগ্র মানবজাতিই উন্নতি লাভ করে। কিন্তু এই স্বাজাত্যবোধ যখন যুক্তি, বুদ্ধি, পরমতসহিষ্ণুতা ও মানবতাবোধের গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়া, অযৌক্তিক আত্মশ্লাঘা, অসহিষ্ণুতা, দ্বেষ ও হিংসামূলক আক্রমণমুখী এক বিকৃত অন্ধ আবেগে রূপান্তরিত হয় তখনই জন্ম হয় জাতীয়তাবাদের।

জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবোধেরই বিকৃত রূপ

অনেকে অবশ্য জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদ, উভয় শব্দকেই সমার্থক বলিয়া মনে করেন এবং 'সত্যরূপ' ও 'বিকৃতরূপ' এই বলিয়া প্রকারভেদ করেন। নাম লইয়া বিবাদ নিরর্থক। জাতীয় চেতনা বা স্বাজাত্যবোধের কল্যাণময় রূপের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এস্থলে জাতীয়তাবাদের বীভৎস মানব বিদ্বেষী রূপ লইয়া আলোচনা প্রয়োজন।

হেজ বলিয়াছেন—"আমাদের যুগে, জাতীয়তাবোধ, জাতীয় রাষ্ট্র ও দেশপ্রেমের মিশ্রণ হইতে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছে তাহা মারাত্মক অন্যায় ও অমঙ্গলের অখণ্ড উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিভিন্ন লেখায় বিশেষ করিয়া 'Nationalism' গ্রন্থে, এই অন্ধ জাতীয়তাবাদকে তীব্র, তিক্ত ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন: "The truth is that the spirit of conflict and conquest is at the origin and in the centre of western nationalism, its basis is not social co-operation. It has evolved a perfect organisation of power, but not spiritual idealism. It is like the pack of predatory creatures that must have its victims. With all its heart it cannot bear to see its hunting grounds converted into cultivated fields. In fact, these nations are fighting among themselves for the extension of their victims and there reserve forests".†

জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রের আলোচনা এবার শুরু করা যাক।

*Nationalism—the combination of nationality, the national state and national patriotism, as effected in our age—is the indivisible source of grave abuses and evils. Carlton J. H. Hayes—Nationalism—P. 258

† Rabindranath—Nationalism—P. 21 রবীন্দ্রনাথের উক্তির বঙ্গানুবাদ করা হইল না।

জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র

১। মানুষ নিজেকে ভালবাসে বলিয়াই স্বার্থপর নহে। কিন্তু সুস্থ জাতীয়তাবাদের বিকৃতি আসে মানসিক সংকীর্ণতা সৃষ্টির মাধ্যমে; অন্য সকল জাতির বিরুদ্ধে মানসিক প্রাচীর খাড়া করিয়া, অপরের প্রতি প্রথমে আসে উপেক্ষা, পরে ঘৃণা। শুরুতে মনে হয়, আমার জাতিই সেরা; পরে বিশ্বাস জন্মিতে থাকে যে সুতরাং অন্য সকল জাতির আমাদের প্রাধান্য মানিয়া লওয়া উচিত। ক্রমে, যুক্তি আসে যে তাহারা যদি সহজে এ প্রাধান্য মানিতে না চায়, তবে তাহাদের জোর করিয়া বাধ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ, আত্মবিকাশের তাৎপর্য অপরকে অবদমন; স্বজাতি-প্রীতির অর্থ সাম্রাজ্য বিস্তার।

(২) অন্ধ আবেগে জাতীয়তাবাদ দাবি করে, জাতির সকলকেই এক চালে চলিতে হইবে, অর্থাৎ শতকরা একশতভাগকেই "জাতীয়" হইতে হইবে। এই 'ইউনিফর্মিটি'র একাধিপত্য সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও মতপার্থক্যকে দমন ও নিশ্চিহ্ন করিতে চায়।

৩। এই মনোভাব হইতেই আসে অসহিষ্ণুতা। একবার ঘোষণা করিলেই হইল যে অপর মত জাতীয়তাবিরোধী; তখন আর যুক্তি শুনিবার দরকার নাই, নজির, সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নাই। ভিন্ন মতকে দাবাইয়া দিবার উত্তেজিত আবেগে তখন সকলে উন্মত্ত।

৪। এই অবস্থা হইতেই একদিকে ত্রাস ও অপরদিকে বশ্যভাবের উৎপত্তি। সত্য প্রকাশ করিবার সাহস নিঃশেষ হইয়া যায়, সকল প্রকার পার্থক্য ঢাকিবার চেষ্টায় মানুষ ব্যস্ত হইয়া পড়ে। শুধু অত্যাচারের আতংক নহে, পার্থক্য প্রকাশ করিয়া উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও অসম্মান কুড়াইতে সাধারণতঃ কেহ চাহে না। যে বৈচিত্র্যের দাবিতে জাতিসত্তার জয়গান করা গিয়াছিল, সেই বৈচিত্র্য বিকাশের সম্ভাবনাই জাতীয়তাবাদের নিষ্করুণ চাপে বিলীন হইয়া যাইতে থাকে।

৫। জাতীয়তাবাদের এই আক্রমণমুখী রূপের অনিবার্য পরিণাম হইল যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবিস্তার, গণতান্ত্রিক অধিকারের হত্যা ও ফ্যাসিজম।

যদি সর্বদাই মনে করি, ঠিক হউক, বেঠিক হউক আমার দেশের দাবিই সর্বাগ্রগণ্য (My Country, right or wrong), যদি যুক্তি শুনিতে রাজি না হই, আলোচনা করিতে অস্বীকার করি, তবে বিরোধ মীমাংসার একমাত্র পন্থা হইল যুদ্ধ। যদি মনে করি; অন্যান্য জাতিকে সভ্য করিবার জন্যই আমাদের জাতির প্রাধান্য বিস্তার প্রয়োজন, তাহা হইলে, কিপলিং-কথিত "শ্বেতাঙ্গের

বোঝা" (White Man's Burden), বা হিটলার-ঘোষিত নর্ডিক কুলের উৎকর্ষ ("Superiority of the Nordic Race"), যে কোন অজুহাতেই হউক না কেন, অপর জাতির উপর সাম্রাজ্যবিস্তারের জয়গান গাহিতে আর বাধা থাকিবে না। যদি বিশ্বাস করি, জাতির স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরের সর্বপ্রকার বিরোধিতা খর্ব করা প্রয়োজন, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বরবাদ করিতে অধিক সময় লাগিবে না। আর এই সব মিলিয়া ফ্যাসিজমের ভয়াবহ উত্থান অনিবার্য হইয়া পড়ে।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা : জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ কি? প্রায় সকল লেখকই স্বীকার করিতেছেন যে জাতীয়তাবোধের মধ্যে যে মৌলিক সত্য রহিয়াছে তাহার জন্য মানুষ 'জাতিসত্ত্বাকে' কোন না কোনরূপে বাঁচাইয়া রাখিবে। কিন্তু সাথে সাথে প্রায় সকল চিন্তানায়কই বলেন যে জাতীয়তাবাদের এই ভয়াবহ রূপকে সংযত করিতেই হইবে।

অন্ধ জাতীয়তাবাদ সংযত করা প্রয়োজন

বর্তমান যুগের যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির ফলে একদিকে জাতিতে জাতিতে অপরিচয় ও বিভেদের প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িতেছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংযোগ গড়িয়া উঠিতেছে, অপরদিকে আধুনিক বিশ্বধ্বংসী মারণাস্ত্রের ফলে সম্ভাব্য যুদ্ধের পরিণামে মানব সভ্যতা এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। যুদ্ধকে রাষ্ট্র নায়কের ক্ষমতার লড়াইয়ের কৌশল হিসাবে আজ আর গণ্য করা চলে না। বিকল্পে, সহযোগীতার মাধ্যমে অপরিমেয় অগ্রগতির সম্ভাবনা সমগ্র মানব সমাজের সম্মুখে আজ উন্মুক্ত। এইজন্যই ল্যাস্কি বলিয়াছেন: "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণ পরাধীনতার মধ্যবর্তী শব্দ আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।" * এবং নেহরু বলিতেছেন: "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিকল্প হইতেছে সম্মিলিত বিনষ্টি।"†

নতুবা সভ্যতার অবক্ষয় ও ধ্বংস অনিবার্য

এ দাবি আজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অতীতে মানুষ পররাষ্ট্রকে উপেক্ষা করিয়াছে, বা শত্রু হিসাবে দেখিয়াছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানবসমাজ ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের তিক্ত শিক্ষা

সুস্থ জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবাদে বিরোধ নাই

---

* We have to find middle terms between complete dependence and complete ndependence. Laski, Grammar of Politics Pp. 287-288

† "The alternative to peaceful co-existence is co-destruction."

হইতে লীগ অব্ নেশন্‌স্ (League of Nations) গড়া হইয়াছিল। আশা পূর্ণ হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাহার সমাধি রচনা করিয়াছে। কিন্তু মানুষের বাঁচিবার ইচ্ছা, উন্নতির ইচ্ছা, শান্তির কামনা অমর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুনরায় "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ" (United Nations) প্রতিষ্ঠিত হইল। উদ্দেশ্য : যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ ও সর্বজাতির উন্নয়ন। ইতিমধ্যেই দেখা গিয়াছে যে এ সংগঠনের বহুবিধ ত্রুটি ও দুর্বলতা রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহা দীর্ঘ মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য ইহার জন্ম, সকল জাতির উন্নতি কামনা ইহার ঘোষিত উদ্দেশ্য। সকল মানুষের বিচিত্র অবদানে সমৃদ্ধ বিশ্বসভ্যতার রসানুভূতিতে যদি সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়, প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ যদি সকলকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে, তবে হয়ত মানুষ জাতীয়তাবাদের আতংকময় পরিবেশ বিসর্জন দিয়া স্বজাতিপ্রেম ও আন্তর্জাতিক মানবতাবোধের মিলনসঞ্জাত এক নূতন সভ্যতায় উত্তীর্ণ হইবে। রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি এখানে উপস্থিত করিয়া আমরা এ আলোচনায় পরিসমাপ্তি টানিতে পারি :

"তোমার চিঠিতে বারবার তুমি লিখেছ, দেশের কাছ থেকেই সব কিছু নিতে হবে। সত্য কথা, কিন্তু নিজের দেশ সকল দেশেই আছে, অন্য দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সকল দেশের—যদি অভিমানে বা অশক্তিতে তা না নিই তবে নিজের সম্পত্তিকে অস্বীকার করা হয়। বিশ্বমানবের বেদীতে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, জ্ঞানের, প্রেমের, কর্মের, তাতে সকল মানুষেরই ভোগের অধিকার, —তাকে নিয়েও যদি জাত মানতে হয় তবে সম্পূর্ণ হিন্দু হয়েই মরব, মানুষ হয়ে বাঁচব না। যদি বল দেশের বাইরে থেকে যা পাই সে তো নকল, তা নিজের দেশের নকলও নকল, পরের দেশের নকলও নকল—যে কর্ম খাঁটি তা নকল নয়, যা মেকি তাই নকল, তার উপরে স্বদেশেরই আর বিদেশেরই ছাপ থাক।"*

অতিরিক্ত পাঠ্য

MACIVER—The Modern State
LASKI—Grammar of Politics
DUNNING—History of Political Theories Vol. III
DELISLE BURNS—Political Ideals
CARLTON J. H. HAYES—Essays on Nationalism
RABINDRANATH—Nationalism.

* রবীন্দ্রনাথ—পত্রধারা প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৮।

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি

Nature of the State

[রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত সত্তা কি ? অথবা দার্শনিক দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের চরিত্র কিরূপ ?—এই সমস্যা সমাধানের জন্য নানা মতবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাষ্ট্র শুধুমাত্র রাষ্ট্রের নাগরিকগণের সমষ্টি। এই মতানুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের যন্ত্র মাত্র। কিন্তু এই মতবাদ মানুষের সমষ্টিগত জীবনকে অনেকাংশে অবহেলা করিয়াছে তাহার ফলে সমাজের ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থহানি হওয়ার সম্ভাবনা। ইহার দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয় এবং জনকল্যাণকর অনেক কর্মপ্রচেষ্টা হইতে রাষ্ট্রকে বিরত থাকিতে হয়। তবে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর এই মতবাদ জোর দিয়াছে বলিয়া ইহার মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রের জীববাদী ব্যাখ্যা রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রদেহের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। এই মত সমষ্টিগত জীবনকে বড় করিয়া দেখিয়াছে বটে, কিন্তু ব্যক্তি এই মতানুযায়ী রাষ্ট্রের হস্তে ক্রীড়ণকে পরিণত হয় ও স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে।

আইনমূলক মতবাদানুসারে রাষ্ট্র আইনগত সত্তার অধিকারী। কারণ রাষ্ট্র ব্যক্তির ন্যায় অধিকার ও কর্তব্যসম্পন্ন, আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। অনেকে বলেন যে রাষ্ট্র প্রকৃত ব্যক্তি সত্তার অধিকারী, ঠিক ব্যক্তিরই ন্যায়। এই দ্বিতীয় মত অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট, কারণ চেতন মননশীল মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের পুরাপুরি তুলনা হয় না

ভাববাদী দার্শনিকেরা রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ নীতির প্রকাশ-সত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহারা রাষ্ট্রের জীববাদী ব্যাখ্যায়ও বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মত বাস্তবতার সহিত সম্পর্কহীন এবং অনেকাংশে কল্পনাপ্রসূত। তবে রাষ্ট্রের সামগ্রিক সত্তা ও তাহার প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহা মূল্যবান।

কেহ কেহ রাষ্ট্রের সংহত শক্তিকেই বড় করিয়া দেখিয়া বলিতেছেন যে রাষ্ট্র শক্তির প্রকাশ। এই মত একদেশদর্শিতায় দোষমুক্ত নয়। কোন কোন দার্শনিক বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতীক। এই মতের দীর্ঘ ইতিহাস আছে কিন্তু ইহা যুক্তিভিত্তিক নহে, বিশ্বাসভিত্তিক, সুতরাং অবৈজ্ঞানিক।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় ব্যাখ্যা বর্তমান জগতে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়ন আনিয়াছে। এই মতানুযায়ী রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক, মালিকশ্রেণীর সংহত শক্তিপ্রকাশক প্রতিষ্ঠান। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দার্শনিকেরা এই মতবাদের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা কেবলমাত্র

অর্থনীতির দিক হইতে সমাজ ও সমাজ-সম্পর্ক (Social Relations) বিচার করিবার ফল। সুতরাং এই মতটি একদেশদর্শী। মার্কস্‌বাদীগণ এই সমালোচনাকে ভিত্তিহীন বলিয়াছেন। স্বীকার করিতে হইবে যে মার্কস্‌বাদ অর্থ নৈতিক বৈষম্যের বিষময় ফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্তমানসমাজের মূল ব্যাধির উপর আলোকপাত করিয়াছে।]

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত দার্শনিকেরা রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। রাষ্ট্র কতকগুলি উপাদানে গঠিত। রাষ্ট্রদেহের বিশ্লেষণ দ্বারা এই উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ঐক্য, স্থায়ী সরকার ও সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অপরিহার্য লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু এই সকল উপাদানকে অতিক্রম করিয়াও রাষ্ট্রের একটা সামগ্রিক সত্তা ও স্বরূপ আছে, যাহার অস্তিত্ব কেবলমাত্র উপাদানগুলির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় না। মানুষ যে গৃহে বাস করে তাহা কেবলমাত্র ইট, কাঠ, চুন, বালির সমষ্টি নয়। এই উপকরণগুলি উত্তীর্ণ হইয়া গৃহ মানুষের জাগতিক জীবনের একদিকের প্রকাশরূপ; তেমনি রাষ্ট্র মানবসমাজের সংঘবদ্ধ জীবনের চরিত্র প্রকাশক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের এই সত্তা, এই বৈশিষ্ট্য দার্শনিক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের এই প্রকৃত স্বভাব বা স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন নানা মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত সত্তা কি?

(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যাখ্যা

(Individualistic or Mechanistic Theory of the Nature of the State)

রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে যে মতবাদ সর্বাপেক্ষা পুরাতন তাহাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যাখ্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এ্যন্টিফোন, ক্যালিক্লিস প্রভৃতি গ্রীকদেশীয় দার্শনিকগণ সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন; তাঁহাদের মতে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। সুতরাং রাষ্ট্রকে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির স্বার্থবাহী হওয়াই সমীচীন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাষ্ট্র অনেক সময় ব্যক্তি-স্বার্থের পরিপন্থী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাঁহারা বলেন যে বিশ্ববিধান অথবা প্রকৃতির (Nature) মৌল নিয়মের সহিত বস্তুতঃ রাষ্ট্রের কোন সম্বন্ধ নাই। রাষ্ট্র একটি মনুষ্যকৃত কৃত্রিম (artificial) প্রতিষ্ঠান। সেইজন্য সমাজ ব্যবস্থায় তাহার মূল্য গৌণ। মানুষ বা ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

ব্যষ্টি ব্যক্তির চরম মূল্যস্বীকার—প্রাচীন গ্রীস

প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এই মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং দার্শনিকভাবে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের প্রভুত্ব স্থাপনের অনুশীলন মতবাদ প্রচারে ব্রতী হন।

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের ব্যক্তিতান্ত্রিক ব্যাখ্যার বহুল সমর্থক দেখা যায়। যে সকল দার্শনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে চুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক মতবাদের পোষকতা করেন। সপ্তদশ শতকের হব্‌স, লক্‌ প্রভৃতি যুক্তিবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ, অষ্টাদশ শতকের ফিজিওক্র্যাট নামক একশ্রেণীর তত্ত্ববিদগণ, জার্মান দার্শনিক কাণ্ট্‌ ও হাম্‌বোল্ড এবং উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিতান্ত্রিক দার্শনিকরা (বেনথাম, মিল, সিজউইক প্রভৃতি) এই মতবাদটিকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারা সমাজ বা রাষ্ট্রের পৃথক সত্তা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র কেবলমাত্র রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি। ব্যক্তিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। রাষ্ট্রের সত্যকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। স্বাধীন সত্তার অধিকারী প্রতি ব্যক্তি নিজের সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য অনুরূপ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত মিলিত হয় তাহারই ফলে সমাজ বা রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। সুতরাং সমাজ বা রাষ্ট্র তদন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের যোগফল বই কিছুই নহে। এই শ্রেণীর দার্শনিকেরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তি স্বার্থলাভের যন্ত্র হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যক্তির হস্তে যন্ত্রমাত্র; ব্যক্তি সেই যন্ত্রকে নিজ মঙ্গল-সাধনে ব্যবহার করিবে—অর্থাৎ অবস্থার মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে যন্ত্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক যান্ত্রিক মতবাদও (Mechanistic Theory of the Nature of the State) বলা হইয়া থাকে।

রাষ্ট্র ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি মাত্র

রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা—রাষ্ট্র ব্যক্তির সুখ-সুবিধা লাভের যন্ত্র মাত্র

সমালোচনা: এই মতবাদের ভিতর যে বিরাট সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। সত্যই প্রতি মানুষের স্বাধীনসত্তা রহিয়াছে; প্রতিটি মানুষ অন্যান্য সকল মানুষের মধ্যে অনন্য; একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য গভীর ও নানাদিক-প্রসারী। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা মানিয়া লওয়াই সমীচীন। তাহা মানিয়া না লইলে, ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের হস্তে ক্রীড়ণকে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র ও শাসন পদ্ধতির ইতিহাস সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে সেই ইতিহাসের প্রতি স্তরে মানুষের প্রচেষ্টায় ও তাহার ইচ্ছাকৃত পরিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ অনেক পরিমাণে রাষ্ট্র মনুষ্যসৃষ্ট; তাহা মানুষের

সুযোগ-সুবিধার তাগিদে যুগে যুগে বিবর্তিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র যদি মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র ব্যক্তির উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না। এই নীতি দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিক হইতে রাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক বা যান্ত্রিক ব্যাখ্যার যথেষ্ট মূল্য আছে।

রাষ্ট্র মনুষ্যসৃষ্ট সুতরাং রাষ্ট্রকে মানুষের অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নীতি স্বীকার করিতে হইবে

অন্যপক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র কৃত্রিম যন্ত্র হিসাবে গণ্য করাও দোষমুক্ত নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রে চেতন ও মননশীল মানুষের সহ-অবস্থানের ভিতর দিয়া কি কোন সংঘবদ্ধ সত্তা গড়িয়া উঠে না? সমাজপ্রবণ মানুষেরা পরস্পর পরস্পরকে অলক্ষ্যে প্রভাবিত করে এবং একটি সমাজ বা রাষ্ট্রিক মন জন্মলাভ করে। মানুষের অলক্ষ্যে মনোজগতের এই সৃষ্টি বিস্ময়করভাবে সত্য হইয়া উঠে। মানুষ ব্যষ্টিকে ও ব্যষ্টিস্বার্থকে অতিক্রম করিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রিকভাবে চিন্তা করে ও তদনুযায়ী কার্যে লিপ্ত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আদর্শ জাতীয়তা যে প্রাণাবেগে চঞ্চল, তাহা রাষ্ট্রকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করিয়া ঐক্যবদ্ধ মনোময় সংঘবদ্ধতা আনিয়া দেয়। এই সত্য দেশে দেশে লক্ষ্য করা গিয়াছে। রুশো বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের সামগ্রিক ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই তাহার প্রাণবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এই মতবাদের মধ্যেও সত্য নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রসত্তাকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। দুই-এরই একপ্রকারের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। মনোবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক হইতে এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা অসমীচীন হইবে।

রাষ্ট্রের চেতন ও মননশীল অস্তিত্ব আছে

দ্বিতীয়তঃ যদি রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক বা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে এই নীতি হইতে উদ্ভূত একটি Corollary বা উপসিদ্ধান্ত আমাদের মানিয়া লইতে হয়। সেটি হইতেছে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—যাহার প্রয়োগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক নানা কার্যাবলী হইতে বিরত থাকিতে হয়। এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ, সমাজ কল্যাণ, (হাসপাতাল, শিক্ষায়তন, সমাজ উন্নয়ন) প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে রাষ্ট্রের নাগরিকগণের

রাষ্ট্রের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সঙ্কুচিত হয় ও তদ্দ্বারা ব্যক্তির স্বার্থহানির আশঙ্কা থাকে

অধিকাংশেরই স্বার্থহানি হওয়া সুনিশ্চিত। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক বা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা অযৌক্তিক।

পরস্পরবিরোধী উপরোক্ত দুই মতের সংমিশ্রণেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সত্যরূপ ধরা পড়ে। রাষ্ট্র কতক পরিমাণে যন্ত্রের সহিত তুলনীয়; ব্যক্তির অনন্যতা ও স্বাধিকার অনস্বীকার্য। আবার রাষ্ট্রের নিজস্ব সত্তা নাই তাহাও জোরের সহিত বলা চলে না। রাষ্ট্রের একটি ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রাণবন্ত মনোময় অস্তিত্ব আছে। রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে হইলে দুই মতের মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

মতের সামঞ্জস্য সাধন

(২) জৈব মতবাদ

(The Organic Theory of the State or the Organismic Theory of the State): এই মতবাদটি দুইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা দিয়াছে। (ক) সাদৃশ্যমূলক যুক্তির ভিত্তিতে একশ্রেণীর সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের একটি সত্তা আছে, ইহা যন্ত্রাবশেষ নহে। এই সত্তা জীবদেহের সহিত তুলনীয়। জীবদেহের যেমন একটি সামগ্রিকতা আছে, তাহা এক ও অভিন্ন, রাষ্ট্রও তেমনি সামগ্রিকতাময় একটি অবিভক্ত সত্তা। দ্বিতীয়তঃ, জীবদেহের বিভিন্ন অংশগুলি যেমন পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ তেমনি রাষ্ট্রদেহের বিভিন্ন অংশ, অর্থাৎ শাসনপদ্ধতির বিভিন্ন বিভাগ একটি অন্যটির সহিত এবং রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিবর্গ একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তৃতীয়তঃ, মানুষের হস্তপদাদি যেমন মনুষ্যদেহের অংশবিশেষ, তেমনি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রদেহের অংশীভূত। বৃক্ষের সঙ্গে বৃক্ষপত্রের যেমন যোগ, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিবর্গের ঠিক সেই প্রকারেরই যোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ব্যক্তি বা ব্যষ্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। চতুর্থতঃ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যেমন জীবদেহের বিবর্তন অর্থাৎ জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু হয়, তেমনি রাষ্ট্রও বিবর্তনশীল ও জন্ম প্রভৃতির নিয়মাধীন। জীবদেহের পরিবর্তন রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পঞ্চমতঃ, জীবদেহ যেমন জীবকোষ দ্বারা গঠিত, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত। সমাজ ও রাষ্ট্রবিবর্তনের ফলে একটি মাত্র সত্তা পাওয়া যাইতেছে, সেটি হইতেছে সমাজ বা রাষ্ট্র। ব্যক্তি বা ব্যষ্টির পৃথক সত্তা নাই। ব্যক্তি বা ব্যষ্টি সমাজ বা রাষ্ট্রদেহে বিলীন হইয়াছে। জৈব মতবাদীগণ তাই

রাষ্ট্রের একটি সামগ্রিক, অবিভক্ত সত্তা আছে—জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রদেহের তুলনা

বলিতেছেন যে, রাষ্ট্রের ব্যক্তিতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। রাষ্ট্রিক সত্তার মঙ্গলকল্পে রাষ্ট্র যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক আপত্তি অসম্পূর্ণ ও অবান্তর। কারণ, সমগ্র রাষ্ট্রের পক্ষে যাহা কল্যাণপ্রসূ, রাষ্ট্রের অংশবিশেষ ব্যক্তির পক্ষেও তাহা স্বতঃসিদ্ধভাবেই মঙ্গলকর। সমগ্রের (State) মঙ্গলেই অংশের (Individual) মঙ্গল। প্লেটো, অ্যারিস্টটল্, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো জৈব মতবাদটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রাষ্ট্র প্রাণবন্ত সামাজিক জীব

(খ) কোন কোন জৈব মতবাদী জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের তুলনা করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে রাষ্ট্র সত্য সত্যই একটি Living Organism বা প্রাণবন্ত সামাজিক জীব। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের ও জীবন্ত প্রাণীর প্রকৃতি, ধরন-ধারণ কার্যকলাপ একই প্রকারের। বলা বাহুল্য যে জীবন্ত প্রাণীর সহিত ব্যাপক সাদৃশ্যের উপরেই তাহাদের যুক্তি নির্ভরশীল।

কয়েকজন আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যাখ্যা ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করে, তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই চরমপন্থীনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। পোল্যাণ্ডদেশীয় লেখক গামপ্লাউইট্স্ ১৮৯২ সালে প্রকাশিত তাহার Sociological Idea of the State গ্রন্থে সোজাসুজি বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের জীবসত্তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; রাষ্ট্রদেহের সহিত জীবদেহের মিল শুধু তুলনাতেই পর্যবসিত হয় না। রাষ্ট্র একটি জীবন্ত সামাজিক প্রাণী। জার্মান দার্শনিক ব্লুন্ট্স্লি বলিলেন যে জীবদেহ যে অর্থে সত্য, রাষ্ট্রদেহ ও রাষ্ট্রজীবন ঠিক সেই অর্থেই সত্য। তিনি রাষ্ট্রের লিঙ্গ নির্ণয় করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার মতে রাষ্ট্রকে পুরুষজীব বলিয়া গণ্য করা উচিত। তিনি চার্চকে (Church) স্ত্রী-জীব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ইংরেজ সমাজতাত্ত্বিক হারবার্ট স্পেন্সার ও অষ্ট্রীয় সমাজবিজ্ঞানী এ্যাল্বার্ট শাফল্ (Albert Schaffle) জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রদেহের তুলনা অনেক দূর লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ব্লুন্ট্স্লি বা গামপ্লাউইটসের ন্যায় রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ-

স্পেন্সার ও শাফল্-এর মত

ভাবে জীবন্ত সামাজিক প্রাণী হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। স্পেন্সার বলেন যে জীবদেহের অংশগুলি সমগ্র দেহের সহিত ও পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে চির-সম্বন্ধে আবদ্ধ; কিন্তু রাষ্ট্র দেহের অংশসমূহ অর্থাৎ ব্যক্তি সেরূপ নহে। ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা আছে; ব্যক্তি

রাষ্ট্রদেহের সহিত তেমনভাবে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে এবং পরস্পরের সহিত তাহাদের একই অর্থে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নাই। জীবদেহে চেতনা ও সুখ-দুঃখ অনুভূতির ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রদেহে তাহা নহে; কেবল চেতনশীল ব্যক্তিরাই সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সূত্র ধরিয়াই স্পেন্‌সার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি রচনা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্পেন্‌সার জৈব মতবাদের সহিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যাখ্যার একটি সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার মোটামুটি বক্তব্য এই যে জীবদেহের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রে বা সমাজদেহে বিদ্যমান কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিকে ভুলিলে চলিবে না। তাহার স্বাধীন চেতনশীল সত্তাকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সর্বাংশে স্বীকার করিতে হইবে। ব্যক্তিস্বাধীনতা নীতির ইতিহাসে হারবার্ট স্পেন্‌সারের অবদান অবিস্মরণীয়। শাক্‌ল্‌-এর মতবাদের ভিতর হারবার্ট স্পেন্‌সারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অভাব দেখা যায়। তিনি জীবনের ও রাষ্ট্রদেহের তুলনা আরও কিছুদূর লইয়া গিয়াছেন এবং Social Physiology বা সামাজিক শারীর বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু তথাপি তিনি বলিতেছেন যে জীবদেহের সহিত রাষ্ট্র বা সমাজদেহের একটা পার্থক্য শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে।

সমালোচনা: সমাজ বা রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদের অনেক সমর্থক তুলনামূলক যুক্তি তুলিয়া বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র বা সমাজের ঐক্য ও মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে হইলে জীবদেহের সহিত রাষ্ট্র বা সমাজের সাদৃশ্য স্থাপন খুবই উপযোগী ও কার্যকর। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে জীবদেহের জীবকোষের (germ cell) সহিত রাষ্ট্রের ভিত্তি-স্বরূপ ব্যক্তির তুলনা করা যায়। জীবকোষ লইয়া জীবদেহ গঠিত ; তেমনি ব্যক্তি লইয়া রাষ্ট্র। ইহারা বলিতেছেন যে রাষ্ট্র বা সমাজ জীবদেহের অনুরূপ—ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এই দুই পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিবার পক্ষে এবং রাষ্ট্র এবং সমাজের একত্রীভূত জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গঠনের জন্য এই তুলনা সুবিধাজনক। সত্যই রাষ্ট্র বা সমাজের সহিত জীবদেহের কতকগুলি বাহ্যিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। মতবাদটি এইরূপ ভাবে নিবদ্ধ হইলে ইহা খুব বেশি আপত্তিজনক নহে। তথাপি এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে অনেকের মতে এই তুলনাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তুলনা-মূলক যুক্তিকে বেশীদূর লইয়া গেলেই নানা প্রকারের অযৌক্তিকতার উদ্ভব হয়।

মধ্যপন্থী জীববাদী মত

চরমপন্থী জৈবমতবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনায় বহু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। তাঁহারা বলিতেছেন যে জীবদেহ এবং সমাজ বা রাষ্ট্র-দেহ অভিন্ন; দুই-এর মধ্যে কোন তফাৎ নাই। এইরূপ অতিশয়োক্তি-দুষ্ট মত স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। প্রথমতঃ কেবলমাত্র সাদৃশ্যগত প্রমাণ প্রয়োগে তাঁহারা এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, শুধুমাত্র সাদৃশ্যগত যুক্তি কিছুই নির্ভুল-ভাবে প্রমাণ করিতে পারে না। সাদৃশ্যগত যুক্তি পদ্ধতি সমাজ বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচার-গ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তি জীবদেহের কোষের সঙ্গে তুলনীয় নহে। ব্যক্তি চেতনশীল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, স্বতন্ত্র সত্তা। জীব-কোষের স্বতন্ত্র জীবন নাই, ইচ্ছাশক্তি নাই। তৃতীয়তঃ জীবকোষ কোন বিশেষ জীবকেই অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে পারে; জীবদেহের মৃত্যুর সঙ্গে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তি এক রাষ্ট্রের ধ্বংস হইলেও অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক বা বসবাসকারী হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে সমর্থ হয়। চতুর্থতঃ, জীবদেহের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জীবদেহ এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই নিয়ম অনেকাংশেই প্রযোজ্য নয়। রাষ্ট্রের বৃদ্ধি, ক্ষয় বা মৃত্যু না হওয়াও সম্ভব। জীবের মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু রাষ্ট্রের মৃত্যু সেইরূপ নহে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র বহু বছর বাঁচিয়া আছে। পঞ্চমতঃ, এক জীবদেহ হইতে অন্য জীবদেহ জন্মলাভ করে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহা নাও হইতে পারে। সম্পূর্ণ নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব অসম্ভব নয়। নব নব রাষ্ট্রের উদ্ভবের কাহিনী মানব ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ষষ্ঠতঃ, স্পেন্সার, শাফ্‌ল্‌, গামপ্লাউইট্‌স্‌ প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকেরা জীবদেহের বিভিন্ন অংশ ও তাহার কার্যকারিতার সহিত রাষ্ট্র বা সমাজের বিভিন্ন বিভাগ ও তাহার কার্যকারিতার যে ব্যাপক সাদৃশ্যগত আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনাভিত্তিক। সেইরূপ আলোচনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক-ভাবে কিছু প্রমাণ করা সম্ভব নহে। সপ্তমতঃ, যদি জৈব মতবাদ মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি বা নাগরিক কেবল মাত্র রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয় এবং সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে। অর্থাৎ জৈবমতবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী; কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যতীত মানবসমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। সত্যই জৈবমতবাদ একটি প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রিক আদর্শ এবং এইজন্য ইহা গ্রহণের অযোগ্য।

চরম জীববাদী নীতি

তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে এই মতের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রাচীন গ্রীসে যখন নাগরিকেরা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাষ্ট্রের বা সমষ্টির বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল তখন প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল্ জৈব মতবাদ প্রচার করিয়া নাগরিকগণকে সমাজপ্রীতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভাব ও রাষ্ট্রনীতি ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছিল তখন জৈব-মতবাদ সমষ্টি বা সমগ্রতার দাবি লোক সমাজে প্রচার করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যক্তিবর্গ যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, প্রতিটি ব্যক্তির সুখ দুঃখ যে অন্য প্রতি ব্যক্তির ভালমন্দের সহিত জড়িত এই সত্য জৈবমতবাদের দ্বারা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সহযোগিতা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র-সেবার আদর্শ জনসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তাই সীমিত-ভাবে জৈবমতবাদ গ্রহণ করা অসমীচীন নহে।

জৈবমতবাদের মূল্য

(৩) আইনমূলক মতবাদ (Juristic or Juridical Theory)

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রকে সংবিধান দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনমূলক প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য করিয়াছেন। রাষ্ট্র Creature of Law অথবা আইনের দ্বারাই সৃষ্ট। ইহার বাহিরে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নাই। রাষ্ট্রের সত্তা আইনগত। রাষ্ট্রের সামগ্রিক আইনসমূহের মধ্যে রাষ্ট্র-সত্তা বিধৃত রহিয়াছে। এইভাবে রাষ্ট্রকে আইনগত সংগঠন বলিয়া গণ্য করিলে আপত্তি করিবার কিছুই নাই।

রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে আইন-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে রাষ্ট্রের আইনগত ব্যক্তিত্বও (Legal Personality) রহিয়াছে। ব্যক্তির যেমন অধিকার ও কর্তব্য আছে রাষ্ট্রেরও তেমনি অধিকার ও কর্তব্য রহিয়াছে। ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় রাষ্ট্র ধন সম্পত্তির মালিক হইতে পারে। রাষ্ট্র ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী আদালতে নালিশ করিতে পারে। ঠিক তেমনি ব্যক্তি ও ব্যক্তিসমষ্টির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নালিশ করার অধিকার রহিয়াছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সাদৃশ্য রহিয়াছে। আইনানুসারে কর্তব্য

রাষ্ট্রের আইনগত ব্যক্তিত্ব

ও অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির আইনগত সত্তা বা অস্তিত্ব (Legal Personality) আইনশাস্ত্রে (Jurisprudence) স্বীকার করা হইয়াছে। সেই হিসাবে কর্তব্য ও অধিকার সমন্বিত রাষ্ট্রেরও Legal Personality রহিয়াছে। তবে এই আইনগত ব্যক্তিত্ব প্রকৃত বা Real নহে। এই ব্যক্তিত্বকে Fictitious বা কাল্পনিক বলা চলে।

জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গিয়ার্কে ও সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যবহারশাস্ত্রবিদ মেইটল্যাণ্ড রাষ্ট্রের প্রতি প্রকৃত ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া বলিতেছেন যে আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যখন ঠিক ব্যক্তিরই ন্যায় আইনসম্মত কর্তব্য ও অধিকারের সমষ্টি তখন ব্যবহার শাস্ত্র বা আইনানুসারে এই দুই-এর মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করা অসমীচীন। তাঁহারা রাষ্ট্র সম্বন্ধে Doctrine of Real Personality বা রাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যক্তিত্বের নীতি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে আইনগতভাবে ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রের চেতনও মননশীল; ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রেরও ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রও আইনগত প্রকৃত সত্তার (Real Personality) অধিকারী।

রাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব মূলক মতবাদ

সমালোচনা: এই নীতি অধিকাংশ আইনবিদ্ ও রাষ্ট্র-দার্শনিক স্বীকার করিয়া লন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ব্যক্তি বা অধিকার ও কর্তব্য বিশিষ্ট মানুষ যে অর্থে আইনের ক্ষেত্রে চেতন-মনন-শীল ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, ঠিক সেই অর্থে রাষ্ট্রও ঐ গুণগুলির অধিকারী এইরূপ মানিয়া লওয়া চলে না। তবে দুই-এর ভিতর সাদৃশ্য যে রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। সুতরাং রাষ্ট্রের Fictitious বা কাল্পনিক সত্তা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়; কিন্তু রাষ্ট্র প্রকৃত সত্তার (Real Personality) অধিকারী বলিলে, অতিশয়োক্তি করা হইবে সন্দেহ নাই। অতএব রাষ্ট্রের কাল্পনিক বা আইনগত সত্তা আছে; অধিকার ও কর্তব্য সমন্বিত মানুষের ন্যায় তাহার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব বা সত্তা নাই। সকল দিকে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

রাষ্ট্রের চেতন-মনন-শীলতার অভাব, তাই প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-শালী নহে

(৪) রাষ্ট্রের ভাববাদী ব্যাখ্যা (Idealist Theory of the Nature of the State)

এই মতবাদটিকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। বিকল্পে ইহাকে Absolute Theory of the State (দেশ কালাতীত মতবাদ), Philosophical Theory

of the state (দার্শনিক মতবাদ) Metaphysical Theory of the State (আধ্যাত্মিক মতবাদ) Mystical Theory of the State (অলৌকিক মতবাদ) ও বলা হইয়া থাকে। জার্মান মনীষী হেগেল প্রচারিত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদ—Idealism হইতে এই মতবাদটি প্রায়শঃই রাষ্ট্রের ভাববাদী ব্যাখ্যা (Idealist Theory) নামই দেওয়া হয়। এই দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী বাহ্যবস্তু সমূহ ভাবমাত্র। অর্থাৎ উহাদের কোনরূপ প্রকৃত সত্তা নাই। Idea অথবা ভাবেরই কেবল অস্তিত্ব আছে। এই মতটিকে বাহ্যশূন্যবাদও বলা যাইতে পারে। প্রতিটি বস্তু কোন বিশেষ ভাবের (Idea) প্রকাশ মাত্র। ভাববাদী দার্শনিকেরা রাষ্ট্রকেও এইরূপেই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে (ক) রাষ্ট্র মনুষ্যসমাজের সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ; সুতরাং রাষ্ট্রের সকল আদেশই চরম সত্যের ন্যায় সর্বথা পালনীয়: অন্যথা করা শুধু অন্যায় নহে, গুরুতর নৈতিক অপরাধ। (খ) রাষ্ট্র পৃথিবীতে মঙ্গলময় ঈশ্বরের জয়যাত্রার অন্যতম প্রকাশ (God's march on earth)। রাষ্ট্রের সকল আদেশ ঈশ্বরের ইচ্ছার ন্যায় নির্ভুল, ন্যায়সঙ্গত। তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতার ন্যায় অসীম। রাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূলতা করার ন্যায় মহাপাপ।

রাষ্ট্রীয় ভাববাদের মূল কথা রাষ্ট্র ভাবের প্রকাশরূপ

ভাববাদী দার্শনিকগণ এই দুইটি মূলনীতি হইতে কতকগুলি উপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। (ক) রাষ্ট্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্যান্য নির্ভরশীল সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। মনুষ্যসমাজের বিবর্তনের ফলে সর্বশেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর স্তরে সামাজিক বিবর্তন অসম্ভব। সবার উপর রাষ্ট্রই সত্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহার উপরে নাই। (খ) রাষ্ট্র মনুষ্য সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনের অধীন নহে। রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও গ্রহণযোগ্য নহে। (গ) ভাববাদী দার্শনিকগণের মতে জীবদেহের ন্যায় রাষ্ট্রদেহও প্রত্যক্ষ সত্য। রাষ্ট্রদেহ চেতন ও মননশীল। মানুষের যেমন ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান। এই ইচ্ছা শক্তিকে হেগেল রুশোর মতানুযায়ী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসাবে নির্দেশ করিয়াছেন। রুশো রাষ্ট্রের এই সমবেত বা সামগ্রিক ইচ্ছাকে সমষ্টিগত ইচ্ছা (General Will) আখ্যা দিয়াছেন; হেগেল ইহাকে যুক্তিমূলক ইচ্ছা

রাষ্ট্রীয় ভাববাদের অন্যান্য সূত্র

(Rational Will) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিতেছেন যে কার্যতঃ এই যুক্তিমূলক ইচ্ছা রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। (ঘ) জীবদেহের জীবকোষের ন্যায় ব্যক্তি রাষ্ট্রের অংশমাত্র। রাষ্ট্রের সামগ্রিক মঙ্গলেই ব্যক্তির মঙ্গল। হেগেল প্রভৃতি ভাববাদী দার্শনিকদের মতে রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তি রাষ্ট্রদেহের অংশ ও অধীন বলিয়া তথাকথিত ব্যক্তিগত বা মৌলিক অধিকারেরও কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ব্যক্তি রাষ্ট্রদেহে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রদেহে লয়প্রাপ্তির মধ্য দিয়াই ব্যক্তি সর্বোচ্চ-স্বাধীনতা ও নৈতিক উন্নতিলাভ করিতে পারে। (ঙ) রাষ্ট্র স্বাধীনতার প্রতীক (actualisation of freedom)। যে সূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তার করিয়া হেগেল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা লক্ষণীয়। তিনি বলিয়াছেন যে মানুষ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা চায়; স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল; যতক্ষণ সে প্রকৃত বুদ্ধি, প্রজ্ঞা বা বিবেচনাশক্তি অনুযায়ী কাজ করে ততক্ষণই সে স্বাধীন। ব্যক্তিবিশেষ যদি স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য একক প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে তাহা হইলে সে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না; কারণ সে তখন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থের কথাই চিন্তা করিবে এবং অনেক সাময়িক ও অবান্তর ভাবনা তাহার মনকে বিভ্রান্ত করিবে। তাই আপন স্বাধীনতালাভের জন্য তাহাকে নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ বুদ্ধির পরিচালনা মানিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্র এই নৈর্ব্যক্তিক প্রজ্ঞার অধিকারী। প্রকৃত স্বাধীনতালাভের জন্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সামাজিক প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কারণ এই সামগ্রিক প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও নৈতিক উন্নতি বিধানে এবং স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম। এই কারণেই হেগেল রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রকাশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। (চ) যেহেতু রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যেই চরম নৈতিক আদেশের প্রকাশ হয়, সেইহেতু রাষ্ট্র প্রচলিত সর্বপ্রকার সামাজিক নীতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত। (ছ) যুদ্ধ-বিগ্রহ দোষমুক্ত নয় সত্য, কিন্তু যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের অধীন ব্যক্তিবর্গের আত্মত্যাগ করিবার সুযোগ দেয়, আপন স্বার্থবলি দিয়া নাগরিকেরা সামগ্রিক স্বার্থের জন্য ধন-প্রাণ বিসর্জন দিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে যুদ্ধের ভিতর দিয়া মানুষের নৈতিক উন্নতির অবকাশ ঘটে।

রাষ্ট্রের ভাববাদী ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হেগেল রাষ্ট্রের যে ভাববাদী ব্যাখ্যা প্রচার করেন তাহা রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। এই ব্যাখ্যার মূলসূত্র গ্রীক মনীষী প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌লের দর্শনে নিহিত রহিয়াছে। প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্রকে বুঝিবার জন্য রাষ্ট্রের নাগরিক, তাহার ভৌগোলিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বাস্তব উপাদানগুলির উপর গুরুত্ব দেন নাই, তাহারা রাষ্ট্রের মূল প্রকৃতি বুঝিবার জন্য তাহার ভাবরূপকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অ্যারিস্টট্‌ল্ বলিতেছেন যে রাষ্ট্র 'good life' বা পরিপূর্ণ জীবনের প্রতীক। ইহাই রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয়। প্লেটোর মতে রাষ্ট্র 'perfect morality' অর্থাৎ সর্বোচ্চ নীতির পূর্ণ প্রকাশ। এই দুইজন গ্রীক দার্শনিকের মতে উপরোক্ত ভাবাদর্শের মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ আমরা চিনিয়া লইতে পারি।

হেগেল

প্লেটো, অ্যারিস্ট্টল

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক রুশো রাষ্ট্রকে 'Common Good' অর্থাৎ সর্বোদয় বা সর্বসাধারণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের আলোকে বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের জনমণ্ডলীর সাধারণ মঙ্গল ইচ্ছার (General Will) মধ্যেই এই সামগ্রিক কল্যাণের সন্ধান পাওয়া যায়।

রুশো

হেগেলের পরবর্তীকালে জার্মানীতে ভাববাদী-নীতি দ্রুত প্রসার লাভ করে। ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রীন্, ব্রাড্‌লী ও বোসাঙ্কেট কিছুটা পরিবর্তিত আকারে রাষ্ট্রের ভাববাদী ব্যাখ্যা প্রচার করেন। গ্রীন্ হেগেলের মূলসূত্র গ্রহণ করিয়াও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার উপর বেশ জোর দেন। কিন্তু বোসাঙ্কেটের মতবাদ হেগেলীয় নীতির খুব কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইংলণ্ডের ভাববাদীগণ

সমালোচনা: রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাববাদী মতবাদের তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের বাস্তব জীবন অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র ভাব ও আদর্শজগতে বিচরণ করিলে রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। রাষ্ট্র ভৌগোলিক সীমান্ত ও অবস্থান, জনসমষ্টি, সমাজগঠন, আর্থিক সঙ্গতি, শাসন পদ্ধতি প্রভৃতি বাস্তব উপাদানগুলির দ্বারা সীমিত। ভাববাদী ব্যাখ্যা এই সকল বাস্তব

অংশগুলিকে উপযুক্ত মূল্য দেয়না। তাহার ফলে ভাববাদী সিদ্ধান্ত প্রায় সর্বক্ষেত্রে কাল্পনিক জগতে বিচরণ করে। দ্বিতীয়তঃ, কেবল মাত্র ভাবগত ব্যাখ্যার আলোকে এই মতবাদের সমর্থকগণ যে রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছেন, তাহা মানুষের জগতে স্থাপন করা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রনৈতিক বার্কার তাই বলিতেছেন যে ভাববাদীগণ রাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা স্বর্গরাজ্যে হয়তো বা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু পৃথিবীতে তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তৃতীয়তঃ, এই মতানুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন। এই ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ। এই পরিধির বাহিরে সমাজ সক্রিয়। সেই ক্ষেত্রে নানা আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান মারফত নাগরিক তাহার নানা চাহিদা মিটাইয়া লইতেছে। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের ভাববাদী ব্যাখ্যা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি বা নাগরিক রাষ্ট্রের হাতে ক্রীড়নক বই কিছুই নহে। ভাববাদীগণ একপ্রকার প্রত্যক্ষভাবেই রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। ইহার ফল অত্যন্ত বিষময়; ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাবে নাগরিকগণের নৈতিক ও মানসিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য (অর্থাৎ নাগরিকগণের পরিপূর্ণ জীবন গঠন) যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পঞ্চমতঃ, ভাববাদী হেগেল প্রভৃতি রাষ্ট্রের জৈব মতবাদ সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতেছেন, ইহাও আপত্তিজনক। কারণ রাষ্ট্রের সহিত জীবদেহের কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও দুইটি অভিন্ন মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ষষ্ঠতঃ, সকল নৈতিক মানের উর্ধ্বে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান এইরূপ মনে করারও কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের বাস্তব ইতিহাসের সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। সপ্তমতঃ, হেগেল বলিতেছে যে যুদ্ধের নৈতিক মূল্য রহিয়াছে, এই মারাত্মক নীতি জার্মানীতে সমরোন্মাদ ও যুদ্ধের অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি করিয়া দুইটি মহাযুদ্ধ আনিয়া দিয়াছে। জার্মানীর বাহিরে ইটালী প্রভৃতি দেশেও এই নীতি সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। অষ্টমতঃ, হেগেল রাজতন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনপদ্ধতি বলিয়া যে অমোঘ বিধান দিয়াছেন তাহাও কিছুতেই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

এই মতবাদটি অবাস্তব

ভাববাদী রাষ্ট্র স্থাপন অসম্ভব

এই মত রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য অস্বীকার করিতেছে

এই মত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের

রাষ্ট্রই সর্বোচ্চ নীতির প্রতীক এই তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নহে

এই মত যুদ্ধ ও রাজতন্ত্রের এবং কেবল মাত্র প্রজ্ঞাই রাষ্ট্রের উৎস—এই মতবাদ সমর্থনীয় নহে

নবমতঃ, হেগেলের রাষ্ট্র reason বা প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত। ইহাও মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ মানুষের ন্যায় মানব সমাজও হৃদয়াবেগ, প্রবৃত্তি, রাগদ্বেষাদিরও বশীভূত হইতে পারে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীগণ এই নীতি যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই কেবলমাত্র প্রজ্ঞার সাহায্যে মানুষের রাষ্ট্রকে বুঝিতে পারা যায়।

উপসংহার: রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক ভাববাদী ব্যাখ্যা নানা দোষে দুষ্ট হইলেও এই মতবাদটি (১) রাষ্ট্রের একতা ও সামগ্রীকতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। (২) রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীন স্বার্থরক্ষা কল্পে রাষ্ট্রের হস্তে শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে তাহাও অনস্বীকার্য। (৩) নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হইবে—মতবাদের এই অংশটুকুও অবশ্য গ্রহণযোগ্য। (৪) সামগ্রিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রতি নাগরিককে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, রাষ্ট্রের সহায়তায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে—এই সত্যটুকুও ভাববাদীগণ লোকসমাজে প্রচার করিয়াছেন। এই দিক হইতে বিচার করিলে ভাববাদ-মূলক ব্যাখ্যার মূল্য রহিয়াছে। কিন্তু এই মতবাদ অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। সেই জন্যই এই মতবাদের বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে।

এই মতবাদের মূল্য

(৫) রাষ্ট্রের শক্তিমূলক ব্যাখ্যা *

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রে প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে শেষ বিশ্লেষণে রাষ্ট্রকে শক্তির প্রকাশ বলিয়াই মনে হয়। রাষ্ট্র সংহত শক্তি ছাড়া কিছু নহে। গ্রীক দার্শনিক থ্যাসিমেকাস খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এই মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন যে যাহারা শক্তিশালী তাহারাই সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সরকার গঠন করে। এমনি করিয়াই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র শক্তির প্রকাশ মাত্র। শক্তির মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইটালীর মেকিয়াভেলিও বলেন যে শক্তির ভিতরই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হেগেলীয় দর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া ট্রাইটস্কে ও বার্ণহাডি প্রভৃতি জার্মান লেখকগণও রাষ্ট্রকে শক্তির প্রকাশ হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রকে উত্তরোত্তর অধিক সঞ্চয় করিতে হইবে। এই লেখকগণের মতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ সমর্থনীয়; কারণ যুদ্ধের ভিতর দিয়াই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শক্তির প্রকাশ ও বিচার হয়।

রাষ্ট্র সংহত শক্তির প্রকাশরূপ

* এই সূত্রে পঞ্চম অধ্যায়ে "রাষ্ট্রের উৎপত্তির শক্তিমূলক মতবাদ" (পৃঃ ৮৩-৮৭ দ্রষ্টব্য।

সমালোচনা: রাষ্ট্রের শক্তিময় রূপটির ভিতরে সত্য নিহিত আছে সন্দেহ নাই। কারণ সংহত শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া উঠে। শক্তি প্রয়োগে অনেক রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে এবং বর্ধিত হইয়াছে তাহাও সত্য। কিন্তু শুধু শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের ন্যায় জটিল প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত চরিত্র বুঝিয়া লওয়া অসম্ভব। মানবের মননশক্তি, অনুভূতি, প্রবৃত্তি অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা উপেক্ষা করিয়া শুধু শক্তিমূলক ব্যাখ্যা রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে না।

মার্কসের শক্তিবাদী ভাষ্য: কার্ল মার্কস রাষ্ট্রকে বিশেষ অর্থে শক্তির প্রকাশ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্থিক বলে যাহারা বলীয়ান, তাহাদের হস্তে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা আসিয়া পড়ে। তাহারা বলপ্রয়োগ দ্বারা আর্থিক হিসাবে হীনবল অধীন শ্রেণীকে চাপিয়া রাখে। এমনি করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। রাষ্ট্র সমাজে অধিকারী বা মালিক শ্রেণীর শক্তিদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং রাষ্ট্র শক্তির প্রকাশ বই কিছু নহে।*

৬। রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা

এই মতানুযায়ী রাষ্ট্র ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র; অন্য কিছু নহে। এই মতের সমর্থকেরা রাষ্ট্রের প্রতি দেবত্ব আরোপ করেন। মধ্যযুগের কবি-দার্শনিক দান্তে হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ রাজা প্রথম জেম্‌স্‌, ইংরেজ লেখক রবার্ট ফিল্‌মার ফরাসী লেখক বস্যুয়ে প্রভৃতি এই নীতির সমর্থক ছিলেন। হেগেলও রাষ্ট্রের অলৌকিক মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাষ্ট্রকে March of God on earth অর্থাৎ পৃথিবীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা রাজতন্ত্র ও নৃপতিবর্গের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অনুকূল এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

রাষ্ট্র ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ

সমালোচনা: এই মতবাদটি ধর্মসংস্কারের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। বিভিন্ন ধর্মপুস্তকের উদ্ধৃতি দ্বারা এই মতটিকে অনেক সময়ে সমর্থন করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে যুক্তিতর্কের স্থান নাই। অতএব রাষ্ট্র সম্বন্ধে ঐশ্বরিক মতবাদটি কোন বৈজ্ঞানিক মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তবে স্বীকার করা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে এই মতবাদটির স্থান উপেক্ষনীয় নহে।

এই মতটির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

---

* এই সূত্রে পরবর্তী 'রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা' শীর্ষক আলোচনা পঠিতব্য।

১। রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় ব্যাখ্যা (Marxist Theory of the State):

জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস্ আধুনিক পৃথিবীর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। মার্কসীয় রাষ্ট্র দর্শন না বুঝিলে আধুনিক জগতের গতি প্রকৃতি উপলব্ধি করা অসম্ভব—এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক জগতের এক তৃতীয়াংশ মানুষ তাহার আদর্শানুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে মার্কসীয় নীতি একটি প্রধান আলোচনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন মনীষী চিন্তা ও কর্মজগতে এককভাবে এইরূপ স্বীকৃতিলাভ করেন নাই।

কার্ল মার্কসের মতের মূল্য

মার্কসের রাষ্ট্রচিন্তা প্রধানতঃ দুইখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি ১৮৬৪ সালে তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী এঙ্গেল্‌সের সহযোগিতায় Communist Manifesto বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার প্রকাশ করেন। মার্কস্ লিখিত বিরাট গ্রন্থ Capital (Das Capital) ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি পুস্তকে অসাধারণ তীক্ষ্ণতা ও পাণ্ডিত্যের মিলন ঘটিয়াছে। মার্কস এই দুইখানি পুস্তকের মাধ্যমে এক অভিনবত্ব জীবন ও রাষ্ট্রদর্শন লোকসমাজে প্রচার করেন। মার্কসের রাষ্ট্রনীতির মূলকথা তাঁহার বন্ধু এঙ্গেল্‌স্ অতি সহজ কথায় সর্বজনবোধ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "ডারউইন যেমন জীবজগতের বিবর্তন-নীতি আবিষ্কার করিয়াছেন মার্কস্ তেমনি মানব ইতিহাসের বিবর্তন সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা চিরন্তন সত্য—মানুষ রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ও অন্য কিছু চর্চায় নিযুক্ত হইবার পূর্বে তাহাকে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এই সোজা কথাটি এতদিন অলস ভাববিলাসিতা ও শৌখিন আদর্শবাদিতার আগাছার চাপে কাহারও চোখে পড়ে নাই। মার্কস্ প্রমাণ করিলেন, মানুষের প্রয়োজনীয় ধনোৎপাদন ও সেই উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাবে মানবসমাজে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি আরও প্রমাণ করিলেন যে কোন সময়ের বা কোন সমাজের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান, আইন-ব্যবস্থা, কলা এমন কি ধর্মও সেই সময়ে বা সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে এবং তাহারই দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং আইন, কলা, ধর্ম ও সামাজিক অন্যান্য সংস্কার স্বরূপ সমসাময়িক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

মানব ইতিহাসের এইরূপ ব্যাখ্যাকে Economic Interpretation of History বা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বলে। হেগেল বলিয়াছেন যে, ভাব (Idea), আদর্শ ও ধ্যানধারণা পরিবর্তনের দরুন ইতিহাসের ধারা বদলায় ও সমাজ পরিবর্তিত হয়। মার্কস্ বলিলেন, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দরুনই সমাজের ও রাষ্ট্রের কাঠামো বদলাইয়া যায় এবং তারই সঙ্গে তাল রাখিয়া ভাব (Idea) বা ধ্যানধারণা ও আদর্শ পরিবর্তিত হইতে থাকে।

ইতিহাসের ব্যাখ্যা হেগেলের ভাববাদী ব্যাখ্যা ও মার্কসের জড়বাদী ব্যাখ্যা

হেগেলের মতে অর্থনীতি ভাবের (Idea) অনুগামী। মার্কসের মতে ভাব অর্থনৈতিক অবস্থার অনুগামী। বলা বাহুল্য যে মার্কস্ ধর্ম, নীতি, আদর্শ, ভাব (Idea) প্রভৃতিকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন যে মানুষের চিন্তায় এইগুলির স্থান আছে সুতরাং ইতিহাসেও ইহাদের স্থান আছে। কিন্তু এই সকলই সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন। সকল সমাজেই জড় জগতের সহিত মনুষ্যসমাজের সম্বন্ধ বিন্যাসের উপর ভাব বা আদর্শের (ধর্ম, নীতি, কলা ইত্যাদির) চরিত্র নির্ভর করে। ইহাকেই Dialectical Materialism বা জড়বাদী বিবর্তন বলা হইয়াছে। মার্কস্ লিখিয়াছেন: "...with me the idea is nothing else than the material world reflected by the human mind and translated into forms of thought." অর্থাৎ আদর্শ মানুষের মনে জড়জগতের প্রতিফলন বই কিছুই নহে। এই প্রতিফলন হইতেই মানুষের মনে তত্ত্বমূলক ভাব বা আদর্শের সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া মার্কস্ বলিয়াছেন যে আদিমকালে মানুষ যখন কেবল শিকারের উপর নির্ভরশীল ছিল তখন এক প্রকারের আদিম সাম্যবাদ বা Primitive Communism প্রচলিত ছিল। শিকারের যন্ত্রপাতি, শিকার করা প্রাণী, সবই ছিল শিকারী সমাজের সাধারণ সম্পত্তি। পশুশিকারের যুগ অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন পশুপালনের যুগে উপস্থিত হইয়াছে, তখন দেখা যায় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আবির্ভূত হইয়াছে। যাহারা অনেক পশুর মালিক সমাজে তাহাদেরই প্রতিষ্ঠা; তাহারাই সমাজের উপর কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতেছেন। অর্থাৎ সেই যুগে ধনোৎপাদনের প্রধান উৎসস্বরূপ পশুপালনের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার দরুন একটি বিরাট সামাজিক পরিবর্তন আসিয়াছে।

মার্কসের মতে মানবসমাজের বিবর্তনে অর্থনীতির স্থান

(১) পশুশিকারের যুগ

সেই কারণে আদিম সাম্যবাদের অবসান হইল। সমাজে শ্রেণী বিভাগ দেখা দিল। যাহারা অধিকারী শ্রেণী অর্থাৎ মালিক শ্রেণী তাহারাই সমাজপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের অধীনস্থ রহিল দরিদ্র মালিকানাহীন জনসাধারণ। শ্রেণী সংঘর্ষ বা Class War-এর বীজ সমাজে রোপিত হইল।

(২) পশুপালনের যুগ

অর্থনৈতিক বিবর্তনের তৃতীয় যুগে অর্থাৎ কৃষি অথবা সামন্তযুগে এই শ্রেণীবিভাগ ও সংঘর্ষ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই যুগেই আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। যাহারা জমির মালিক তাহারা এই মালিকানার বলেই সমাজে ধনোৎপাদনের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ও লাভজনক উৎসের অধিকারী হইলেন এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিয়া লইলেন। যাহারা জমির মালিকানা হইতে বঞ্চিত তাহারা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য অসহায়ভাবে নির্ভরশীল হইলেন মালিকশ্রেণীর উপর। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা অসহায় ব্যক্তিবর্গ মালিকগণের অধীনস্থ দাস শ্রেণীতে পরিণত হইলেন। মধ্যযুগে ইহারাই ভূমিদাস বা Serf নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ভূমিদাস ছাড়াও জমিদার বা সামন্ত-শ্রেণীর অধীনে কয়েকটি মধ্যবর্তী শ্রেণী দেখা গেল। তাহারা সামন্তশ্রেণীর বরকন্দাজ সম্প্রদায়। বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষ এই যুগের একটি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। শ্রেণীবিভেদ ও অবিচ্ছিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষ কখনও কখনও প্রত্যক্ষ শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত হইল। কখনও বা পরোক্ষ সংগ্রামের সংঘাত চলিতে থাকিল।

(৩) সামন্ত বা কৃষিযুগ

শিল্পযুগে ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হইল। ইহার ফলে এক নূতন অধিকারী শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হইল। এই শ্রেণী হইতেছেন কলকারখানার মালিকগণ বা ধনিক সম্প্রদায়। এই শ্রেণী অল্পকালের মধ্যে ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে জমিদার বা সামন্তশ্রেণীকে পরাভূত করিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করিয়া আপন স্বার্থানুকূল্যে আইন-কানুন প্রণয়ন করিলেন। শিল্পায়নের যুগে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর উদ্ভব হইল। প্রথম ধনিক শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রমিকশ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি মধ্য-বিত্ত শ্রেণীও আসিয়া জুটিলেন। মোটামুটিভাবে তাঁহারা হইতেছেন শিক্ষিত শ্রেণী, কেরানী, শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক প্রভৃতি। সামন্ত যুগে শ্রেণীসংগ্রামের যে আকার ছিল তাহা আরও একটু ঘোরালো ও জটিল হইয়া

(৪) শিল্পযুগ

উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)

দাঁড়াইল। শিল্পায়নের ফলে সমাজের উৎপন্ন ধনের বড় একটা অংশ মালিকেরা অথবা ধনিকেরা করায়ত্ত করিয়া লইলেন। শ্রমিক তাহার উৎপাদনের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেন। যে অংশটুকু শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা, কিন্তু যাহা মালিক গ্রাস করিতেছেন মার্কস্ তাহাকে Surplus Value বা উদ্বৃত্ত মূল্য আখ্যা দিয়াছেন।

শোষিত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সম্মুখীন হইয়া সকল যুগেই মালিকানার অধিকারী সম্প্রদায় আপন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকল্পে বেতনভোগী পুলিশ, সৈন্যদল ও অধীনস্থ অন্নদাস ও পরগাছা শ্রেণী মানুষদের একত্রীভূত করিয়া বিরাট শক্তি সঞ্চয় করে এবং এই কেন্দ্রীভূত পশুশক্তি প্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীকে দাবাইয়া রাখে। কেন্দ্রীভূত পশুশক্তিবলে গঠিত এই যে সংগঠন ধনিককুলের শ্রেণীস্বার্থে শোষিত শ্রমিকশ্রেণীকে দাবাইয়া রাখে, তাহাকেই রাষ্ট্র বলা হয়। তাই রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক; রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত পশুশক্তি বই অন্য কিছু নহে।

মার্কসের রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা

শিল্পায়নের বিবর্তন বিশ্লেষণ করিয়া মার্কস্ বলেন যে অর্থনীতির অমোঘ নিয়মানুযায়ী, বিশেষতঃ ধনিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে প্রতি শিল্পে বৃহৎ কলকারখানাগুলিই বাঁচিয়া থাকিবে। দ্বিতীয় স্তরে বৃহৎ শিল্পসংস্থানগুলি অধিক লাভের আশায় প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া বৃহত্তর সম্মিলিত সংস্থা গঠন করিবে। ইহার ফলস্বরূপ মালিকের মুনাফা বাড়িবে, কিন্তু তদনুপাতে শ্রমিক শ্রেণী উৎপন্ন ধনের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ পাইবে না। শ্রমিক ও মালিকের সংঘর্ষ ইহার দ্বারা তীব্রতর হইবে। দেশে দেশে ধনসম্পত্তি এবং ধনোৎপাদনের সমস্ত উৎস মুষ্টিমেয় শ্রেণীর করতলগত হইবে। অধিকাংশ মানুষ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া শোষিত ও সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হইবে এবং শ্রেণীসংঘর্ষ বৈপ্লবিক আকার ধারণ করিবে। শোষক অথবা বণিকশ্রেণী স্বার্থরক্ষাকল্পে পুলিশ, সৈন্যদল প্রভৃতি গঠন করিবে এবং শক্তিপ্রয়োগে আপন ক্ষমতা রক্ষায় তৎপর হইবে। বিভিন্ন দেশের ধনিকেরা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় একত্রীভূত হইবে। ঠিক তেমনি বণিকশ্রেণীর শত্রু শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে একতাবদ্ধ হইয়া ধনিকশ্রেণীর সম্মুখীন হইবে। এমনি করিয়া সমাজে শ্রেণীসংঘর্ষ

আধুনিক শিল্পের বিবর্তন—একচেটিয়া ধনতন্ত্রের উদ্ভব

জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রবাদ হইতে উদ্ভূত

শুরু হইবে। মার্কসের মতে তথাকথিত জাতীয় রাষ্ট্র শ্রেণীশাসন বই কিছুই নহে।

লেনিনের মতে সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রবাদ হইতে উদ্ভূত। ইউরোপের শিল্পোন্নত জাতীয় রাষ্ট্রগুলি শোষকশ্রেণীর স্বার্থে এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশগুলি বলপ্রয়োগে দখল করিয়াছে এবং সেখানে রাজনৈতিক স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক শোষণ চালাইয়াছে। এমনি করিয়া আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বর্তমান ধনতান্ত্রিকতার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কস্ বলিতেছেন যে সর্বহারা বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণী বিরামহীন ক্রমবর্ধমান শোষণের সম্মুখীন হইয়া সংগঠনে মনোনিবেশ করিবে। কিন্তু সমাজে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তাহাদের বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। অন্য পন্থা নাই। কারণ মালিকশ্রেণী তাহাদের স্বার্থরক্ষাকল্পে স্বভাবতঃই সর্বস্ব পণ করিবে। তিনি একের পর এক, যে সকল পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ:

মার্কসের বৈপ্লবিক নীতি

(১) শ্রেণীসংগ্রাম: সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা মালিকশ্রেণীকে পরাজিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রভৃতিকে সমাজ সচেতন ও বিপ্লবী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। (২) শোষিত সর্বহারাগণ যখন সশস্ত্র সংগ্রামে শোষকশ্রেণীদের পরাজিত করিবে তখন Dictatorship of the Proletariat বা শ্রমিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শ্রমিক একনায়কত্বের উদ্দেশ্য তিনটি: (ক) প্রথমতঃ রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া ধনিকশ্রেণী ও ধনিকতন্ত্রকে বিনষ্ট করিতে হইবে; (খ) রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (State Socialism) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; এবং (গ) রাষ্ট্রাধীন ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রের স্থানে ধীরে ধীরে কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদী সমাজ গঠন করিয়া তুলিতে হইবে।

কমিউনিজমের আদর্শ

তখন সমাজে সর্বজনীন শান্তি বিরাজ করিবে। প্রতি ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনমত ভোগ করিবে এবং নিজ সাধ্যমত উৎপাদন ও সমাজসেবা করিবে। অর্থাৎ কমিউনিজমের আদর্শ "From each according to his capacity and to each according to his need"—এই আদর্শ সমাজে পৌঁছাইতে পারিবে। যখন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইবে না। কারণ সাম্যবাদী সমাজ পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অবস্থায় পৌঁছাইলে দেখা যাইবে যে শোষণের অবসান হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির আর প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না।

মার্কস্‌বাদের সমালোচনা : মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শনের সমালোচকেরা যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা কিছু পরিমাণে একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট। তথাপি তাহার মধ্যে লক্ষ্যণীয় বস্তু রহিয়াছে সন্দেহ নাই।

(১) প্রথমে বলা হইয়াছে যে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা পুরাপুরি সত্য নহে। কারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ব্যতীত আরও কতকগুলি উপাদান আছে যাহার প্রভাব সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে কম নহে। ইহার উত্তরে মার্কস্‌পন্থীরা বলিয়াছেন যে, মার্কস্ ধর্ম, নীতি, আদর্শ কলা, কৃষ্টি, প্রকৃতির প্রভাব অস্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে ধর্ম, নীতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিক হইতে উদ্ভূত।

(২) মার্কস্ ধর্ম ও নীতির আপেক্ষিকতায় (Relativity) বিশ্বাসী। তাঁহার কোন কোন সমালোচক বলেন যে নীতিশাস্ত্রের অনেক সূত্র চিরন্তনী, সেগুলির পরিবর্তন নাই। সর্বযুগে, সর্বক্ষেত্রে তাহা সত্য ও অব্যয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পরস্পরবিরোধী নীতি বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে। বহুবিবাহ কোথায়ও নীতিবিরুদ্ধ, কোথায়ও তাহা ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রসম্মত। এইরূপ অবস্থায় নীতির অব্যয়বাদ স্বীকার করা সুকঠিন।

(৩) আরও বলা হইয়াছে যে মার্কসের দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নাই। প্রথমত: তিনি লিখিয়াছিলেন যে দরিদ্র শোষিত শ্রেণী ক্রমে দরিদ্রতর হইবে; কিন্তু শিল্পায়নের ফলে সকল ধনতান্ত্রিক দেশেই শ্রমিকসম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। দ্বিতীয়ত: মার্কসের মতে জার্মানী বা ইংলণ্ডে শোষিতশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে নাই। বিপ্লব হইয়াছে শিল্পে অনগ্রসর রাশিয়াতে। ইহার উত্তরে মার্কস্‌পন্থীরা বলিয়াছেন যে এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নাই বলিয়া মার্কসের মূল রাষ্ট্রনীতি যে ভ্রান্ত তাহার প্রমাণ হয় না।

(৪) সমালোচকেরা আরও বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের অবসাননীতি (Theory of withering away of the state) গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার অবসানের কোন চিহ্নই নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মাত্র ৪৮ বৎসর এক বিরাট সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে অকিঞ্চিৎকর। কেবল পূর্বোক্ত তর্ক দ্বারাই মার্কসীয় নীতিকে অগ্রাহ্য করা চলে না।

(৫) শ্রেণীসংঘর্ষের উপর মার্কস্ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই সমালোচনার উত্তরে মার্কস্বাদীগণ বলিতেছেন যে ইতিহাসে শ্রেণীর উদ্ভব দেখা যায়। শ্রেণীস্বার্থের বিভিন্নতা ও দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক সত্য।

(৬) শ্রেণীসংঘর্ষ, সশস্ত্র বিপ্লব, হিংসা প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কখনও মার্কসের সহৃদয়তাপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সাম্যবাদী সমাজে পরিণত হইতে পারে না। অর্থাৎ হিংসা-দ্বেষ, হানাহানির মধ্য দিয়া প্রীতিবন্ধনে যুক্ত সাম্যবাদী আদর্শ সমাজে পৌঁছানো যাইবে না! ইহার উত্তরে মার্কস্পন্থীগণ বলিয়াছেন যে সাম্যবাদ বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারাই সম্ভব। সেইরূপ মৌলিক পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। সুতরাং নিরাশ হইবার কারণ নাই।

(৭) আদর্শ হিসাবে মার্কস্বাদ বা সাম্যবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু রাশিয়াতে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছে। এই সমালোচনার উত্তরে কমিউনিজ্মের সমর্থকগণ বলিয়া থাকেন যে সত্যকার কমিউনিজ্ম বা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলেই পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে; তাহার পূর্বে নহে। ব্যক্তিস্বাধীনতার যে সকল ব্যত্যয় রাশিয়াতে দেখা গিয়াছে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থার দ্যোতক। সুতরাং কমিউনিজ্মের চরম আদর্শ সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ নাই।

(৮) কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে জাতীয়তা ও গোষ্ঠী আনুগত্য যে কতদূর শক্তিশালী হইতে পারে তাহা মার্কস্ বুঝিতেই পারেন নাই। তিনি কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে (Communist Manifesto) উদাত্ত-আহ্বান করিয়াছেন: "Workers of the world unite" অর্থাৎ বিশ্বের শ্রমিক এক হও। তিনি সকল দেশের শ্রমিককে এক আন্তর্জাতিক আদর্শের বন্ধনে একতাবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। Communist International নামক আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান এই আদর্শের ভিত্তিতেই গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শ্রমিকগণ উগ্র জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারা জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক আদর্শকে অগ্রাহ্য করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। মার্কস্পন্থীগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে শ্রমিক সাধারণের এই বিচ্যুতি দ্বারা মার্কস্-এর মূলনীতি ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হয় না। আজও বিশ্বের শ্রমিক বিভিন্ন বিশ্বসংস্থায় একত্রীভূত রহিয়াছে।

উপসংহার: বলাবাহুল্য যে বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও মার্কসীয় রাষ্ট্র দর্শন

বর্তমানকালে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অধ্যাপক ল্যাস্কি তাহার 'কার্ল মার্কস্' নামক প্রবন্ধে সত্যই বলিয়াছেন "In every country of the world where men have set themselves to the task of social improvement Marx has been always the source of inspiration and prophecy" অর্থাৎ যেখানেই মানুষের সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা হইয়াছে সেখানেই কার্ল মার্কসের বাণী অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। কার্ল মার্কস্‌কেই মানুষ ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা বলিয়া পূজা করিয়াছে। অধ্যাপক ল্যাস্কি আরও বলিয়াছেন: "He put in the forefront of social discussion the ultimate question of the condition of the people" অর্থাৎ মার্কস্ সাধারণ মানুষের দুরবস্থার কথা সমাজবিজ্ঞান আলোচনাক্ষেত্রের পুরোভাগে আনিয়াছেন। মার্কস্-এর ধনতান্ত্রিক সমাজের কঠোর সমালোচনা সম্পর্কে অধ্যাপক ল্যাস্কি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য: Where he was also irresistibly right was in his prophecy that the civilzation of this epoch was built upon sand." অর্থাৎ মার্কস্ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, বর্তমান সভ্যতার সৌধ বালুকাস্তরের উপর গঠিত। ইহাও অবিসংবাদী সত্য।

অতিরিক্ত পাঠ্য

BARKER, E—Political Thought in English from Spencer to To-day Chaps. I-III

BROWN, I—English Political Theory—Ch. XI

COKER, F—Recent Political Thought—Chs. II, VIII, IX.

JOAD, C. E. M—Modern Political Theory—Chs, I, III, IV, V.

„ „ —Guide to Philosophy and Morals—Chs, XVII, XV II,

LASKI, H. J—Karl Marx.

অষ্টম অধ্যায়

সার্বভৌমিকতা

(Sovereignty)

[সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সর্বোচ্চ ক্ষমতা; যে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল সংগঠনের উপর ইহার নির্দেশ প্রযোজ্য ও বাধ্যতামূলক; অমান্যকারী দণ্ডিত হইবে। রাষ্ট্রের স্থিরতা ও স্থায়িত্বের জন্য ক্ষমতার এই একচেটিয়াত্ব অপরিহায। লোকে স্বভাবতঃই এই নির্দেশ মানিয়া চলিবে। লোকের এই স্বেচ্ছা-সম্মতি হইল সার্বভৌমিকতাব অপর বৈশিষ্ট্য।

সার্বভৌমিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইল আইন। সার্বভৌমিকই আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিপতি। অনেকে বলেন যে আইনের ভিত্তি রহিয়াছে বলিয়াই সার্বভৌমিকের নির্দেশের নৈতিক প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। বিপরীত মত হইল: সার্বভৌমিকই আইনের উৎস। সুতরাং আইন সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হইতে পারে না।

ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী হইতে সার্বভৌমিকতার আধুনিক তত্ত্ব রূপ পাইয়াছে। মধ্যযুগের ক্ষয়প্রাপ্তির সাথে সাথে নূতন রাষ্ট্রশক্তি প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে; তত্ত্ব পরে আসিয়া বাস্তব অবস্থাকে ধারণায় রূপ দান করে। বোদাঁ, গ্রোটিয়াস্, হবস্, রুশো, অস্টিন প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও ভাষ্য মারফৎ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে।

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নরূপ: (১) স্থায়িত্ব, (২) একাকিত্ব, (৩) সর্বব্যাপকতা (৪) অবিচ্ছেদ্যতা, (৫) ইহা আদি, অকৃত্রিম ও অনন্ত।

অনেকের মতে যুক্তরাষ্ট্রে সাবভৌমিকতা বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র এবং তাহার সার্বভৌমিকতা প্রকাশ পাইতেছে, কেন্দ্র ও অঞ্চল, এই দুই সরকারেব ক্ষমতা বিভাগের মধ্যে। সুতরাং এখানেও সার্বভৌমিকতা এক ও অখণ্ড।

সাবভৌমিকতা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। (১) নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা,—প্রধানতঃ মর্যাদাসূচক উপাধি, নৃপতি সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়। (২) আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার বিশেষ তাৎপয পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যগুলি যোগ করিয়া নিম্নলিখিত সূত্রে প্রকাশ করা যাইতে পারে: (ক) এ ক্ষমতা সর্বোচ্চ; (খ) আইন হইল সার্বভৌমিকের আজ্ঞা; (গ) এ ক্ষমতা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের হস্তে ন্যস্ত। বস্তুতঃ আইনজ্ঞের পক্ষে নির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে বিচারের জন্য উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে আইনের প্রত্যক্ষ উৎস ও প্রত্যক্ষ প্রয়োগের পশ্চাতে যে অন্তর্লীন শক্তিগুলি কাজ করিতেছে তাহার বিচার করিতে হয়। তাহা হইতে আসিয়াছে (৩) রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব, যাহা সেই শক্তির বন্দনা করিয়া থাকে যে শক্তির দৃঢ় ইচ্ছার সম্মুখে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিককে শেষ পর্যন্ত মাথা নত করিতে হয়। রাষ্ট্রের নির্বাচকমণ্ডলীকে ইহার উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা স্বীকার করার অর্থ, সার্বভৌমিকতাকে খণ্ডিত করা নয়; ইহা একই সাভৌমিকতার দ্বিবিধ প্রকাশ।

(৪) জনতার সার্বভৌমিকতার অর্থ হইল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনগণের হস্তেই মজুত থাকে। ইহার ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হইল 'সমষ্টিগত ইচ্ছার' তত্ত্ব ও বিপ্লবের অধিকারের দাবি।

(৫) জাতীয় সার্বভৌমিকতা বলিয়া প্রধানতঃ জাতীয়তার প্রধান্যই ঘোষণা করা হইয়াছে। যদিও এ শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত নহে।

(৬) কার্যকরী সার্বভৌমত্ব বলিতে বুঝায় বাস্তবে যাহাব ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে প্রযুক্ত হয়।

(৭) আইনসিদ্ধ সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় যাহার এই ক্ষমতা ব্যবহারের আইনসঙ্গত অধিকার রহিযাছে ; যুদ্ধের সময় বিদেশী সৈন্যের দখলীকৃত অঞ্চলে ইহার প্রকাশ পায়। দখলদার সৈন্যবাহিনী কাযকরী সাবভৌমিকত্ব প্রয়োগ করে ; আদি রাষ্ট্রের থাকে আইনসিদ্ধ সার্বভৌমিকতা।

(৮) রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতার অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে অষ্টিনের বক্তব্য আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার মূল ভিত্তি বচনা করিয়াছে এবং সেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অষ্টিনের তত্ত্বের বহু দিক দিয়া সমালোচনা হইযাছে। অন্যান্য বক্তব্য ছাড়াও দুইটি মূল বক্তব্য থাকিয়াই যাইতেছে ; সার্বভৌমিকতা (১) শাসনতন্ত্রেব দ্বারা ও প্রজার অধিকারের দ্বারা এবং (২) অন্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

আন্তর্জাতিক আইন সার্বভৌম বাষ্ট্রের পাশাপাশি বহুপ্রকাবের সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রের সন্ধান দেয়।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বহুত্ববাদী মতবাদ সাম্প্রতিক যুগে বিশেষ আলোচনার বস্তু হইয়া দাঁডাইযাছে। ইহা সার্বভৌমিকতাকে অবাধ ও অনন্তরূপে দেখে না ; মানুষের আত্মবিকাশের প্রয়োজনে যে নানাবিধ সংগঠন রহিয়াছে সেগুলিরও নিজস্ব এক্তিয়ারের মধ্যে অধিকার চরম ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা বহির্ভূত বলিয়াই বহুত্ববাদিদের ধারণা। উপরন্তু, সার্বভৌমিকতার শাসনতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক সীমার উপর ইঁহারা গুরুত্ব দেন। অবশ্য বহুত্ববাদীগণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না। বহুত্ববাদী মত স্বীকৃত না হইলেও এই আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।]

সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান, এই বৈশিষ্ট্যই অন্য সর্বপ্রকার সংগঠন হইতে রাষ্ট্রকে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রকে বুঝিতে গেলে সার্বভৌমিকতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সার্বভৌমিকতার স্বরূপ

বহুসংখ্যক মানুষ হইয়া রাষ্ট্র সংগঠিত হইয়াছে ; তাহাদের আছে বিভিন্ন ধরণের, অনেক সময়েই বিপরীত চরিত্রের, ইচ্ছা ও স্বার্থ। এই সকল নানা মত, পথ ও স্বার্থের সংঘাতের ভিতর হইতে সামগ্রিক সমাজের স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা ও অচঞ্চলতা—ইংরেজীতে এক কথায় 'stability' বলিতে যাহা বুঝি,—বজায় রাখিতে গেলে সকলের পক্ষেই প্রয়োজন একটি আশ্রয়স্থল, দ্বন্দ্ব-নিষ্পত্তির একটি সর্ব-স্বীকৃত উৎস।

সে দায়িত্বভার অর্পিত রহিয়াছে রাষ্ট্রের উপর। এখন, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ যদি সকলের উপরেই প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের স্থান হইতে হইবে সকলের উপরে। ইহার নির্দেশ সকলকেই মানিতে হইবে, এবং যদি কেহ সে নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাহাকে বলপূর্বক মানিতে বাধ্য করা, অথবা অমান্য করিবার জন্য শাস্তি দিবার শক্তিও রাষ্ট্রের থাকিতে হইবে।

তাহা হইলে, এই চরম নির্দেশদাতাকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সমাজের আর যে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা সংগঠন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন ; নতুবা অবাধ্যকে বাধ্য করা যাইবে না। সুতরাং রাষ্ট্রের এই শক্তি হইল চূড়ান্ত শক্তি, যাহা সর্বাপেক্ষা বলবান ও সকলকে স্বীয় নির্দেশ মানিতে বাধ্য করিতে পারে।

ইহাকেই আবার শক্তি একচেটিয়াত্ব (monopoly of power) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কারণ শক্তি একস্থানে কেন্দ্রীভূত না থাকিয়া যে পরিমাণে বিভক্ত হইবে সে পরিমাণে দুর্বল হইবে। অপরকে নির্দেশ মানিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইবে। সামাজিক স্থিরতা ও ঐক্য ভাঙ্গিয়া গিয়া রাষ্ট্র-চরিত্র নষ্ট হইয়া যাইবে।

কিন্তু শুধুমাত্র শক্তির যুক্তি মানুষকে কতখানি বশ মানাইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। স্বল্পকালের জন্য বহু মানুষকে, অথবা দীর্ঘকালের জন্য অল্পসংখ্যক জনতাকে, শক্তির দ্বারা বশ করা সম্ভব হইলেও, দীর্ঘকালের জন্য বহু মানুষের উপর অনুরূপ পন্থায় প্রাধান্য বিস্তার সম্ভবপর নয়। সুতরাং শক্তির সহিত দ্বিতীয় বস্তুর সংযোগ প্রয়োজন : তাহা হইল, রাষ্ট্রের নির্দেশকে ব্যাপক জনতার পক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় মানিয়া লওয়ার অভ্যাস। তাহা হইলে, শক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন উঠিবে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক অবাধ্য লোকের ক্ষেত্রে। অন্যথায় শুধু শক্তি প্রয়োগ দ্বারাই যদি সর্বদা সকলকে চালাইতে হয়, তবে সমাজ-জীবন নিরবচ্ছিন্ন শক্তি-পরীক্ষার আখড়ায় পরিণত হইবে।

কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে ; লোকে আজ্ঞা মানিয়া লইতেছে তাহা জানিয়াও মন সন্তুষ্ট হইতে চাহে না। মানুষ বুঝিতে চায় যে সে যাহা করিতেছে তাহা ন্যায়তঃ করিতেছে, এবং শুধু বুঝিতে চায় না, বুঝাইতেও চায়। ফলে, পুনরায় জটিলতার সৃষ্টি হইল ; নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভব হইল ; আসিল ন্যায়ের প্রশ্ন, যুক্তির প্রশ্ন, বিধি-সিদ্ধতার প্রশ্ন।

অর্থাৎ রাষ্ট্র দাবি করিল,—তাহার ক্ষমতা শুধু যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাই নয়, লোকে স্বেচ্ছায় তাহার কর্তৃত্ব স্বীকার করে এবং এ ক্ষমতা বিধিসম্মত, আইন-সিদ্ধ।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সুপরিচিত কাহিনীটি এই সূত্রে স্মরণীয়। বিখ্যাত এক জলদস্যুকে বন্দী করিয়া বিচারের জন্য আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে আনা হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার প্রশ্ন করিলেন যে সে কোন্ অধিকারে অপরের সম্পত্ত অপহরণ করিয়াছে। দস্যু উত্তর করিল: "সম্রাট, আপনি বিশাল সৈন্য-বাহিনী লইয়া দেশের পর দেশ লুণ্ঠন করিতেছেন; আমি ক্ষুদ্র শক্তি হইয়া অপরের সামান্য সম্পত্তি দখল করিয়াছি বলিয়াই কি অপরাধী হইলাম?"

আলেকজাণ্ডারের পররাজ্য আক্রমণের কথা বাদ দিলেও, আধুনিক রাষ্ট্র যখন কর চাপায়, অথবা কোন আইনভঙ্গকারীকে কারারুদ্ধ করে বা প্রাণদণ্ড দেয়, তখন তাহা দস্যুতা নহে এই কারণেই যে এ কার্য করা হইতেছে আইনের বলে এবং আইনকে কার্যে পরিণত করিবার প্রক্রিয়ায়। সার্বভৌমিকতাতত্ত্বের এই সর্বাঙ্গীণ রূপটি বুঝিতে হইবে। অবশ্য নানাবিধ জটিলতা ও বিতর্কের উৎস ইহাই।

জটিলতার কিছুটা পরিচয় এখানেই দিয়া রাখা প্রয়োজন। বলা হইতেছে: রাষ্ট্রের জবরদস্তি ন্যায্য এই জন্যই যে তাহা আইনকে কার্যকরী করিতেছে। তাহা হইলে আইন কি রাষ্ট্রের উপরে? কিন্তু সার্বভৌমিকতা তো সর্বোচ্চ ক্ষমতা! 'সর্বোচ্চেরও' উপরে 'উচ্চ' আর কি থাকিতে পারে না। সর্বোচ্চকে বাঁধিবার ক্ষমতা যদি কাহারও থাকে, তবে তাহার ক্ষমতাই সর্বোচ্চ, প্রথমোক্তর নহে। সুতরাং আইন সার্বভৌমিকতার উপরে হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আইনের উদ্ভব হইল কি প্রকারে? রাষ্ট্রই আইনের জন্মদাতা। তাহা হইলে, রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছাকেই বলপ্রয়োগের সাহায্যে কার্যকরী করিতেছে। এই অবস্থায়, আইন রাষ্ট্রের নিপীড়নের ন্যায্যতা প্রমাণ করিবে কি করিয়া?

ম্যাক্আইভারের মতে আইন তো শুধু রাষ্ট্র প্রণীত কতকগুলি নিয়মকানুনের সমষ্টি নহে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের জীবনধারা প্রচলনের নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছে; রাষ্ট্র তাহার উপর আঁচড় কাটিতে পারে, তাহাকে সম্পূর্ণ বদলাইতে বা নূতন করিয়া গড়তে পারে না। নানা গোষ্ঠীর নানা স্বার্থের, সংঘাত ও টানাপোড়েনের ভিতর দিয়া জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা রাষ্ট্র প্রণীত আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে। ক্র্যাবল্কে (Krable) সমর্থন করিয়া ম্যাক্আইভার বলিতেছেন যে রাষ্ট্র বস্তুত: আইন-প্রনেতা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিধিসিদ্ধ অভিভাবক।*

* At any moment, the state is more the official guardian than the maker of the law. MacIver—The Mordern State p. 478.

ইহার প্রধান দায়িত্ব হইল আইনের অনুশাসন বজায় রাখা ; এবং তাহাতে দাঁড়ায় যে ইহা স্বয়ং আইনের আয়ত্তাধীন, আইনগত যে মূল্যবোধ ইহা বজায় রাখিতে চায় তাহার দ্বারা নিজেও আবদ্ধ।*

আসল কথা হইল, রাষ্ট্রিক সংগঠন রাখিতে এই ক্ষমতা থাকা চাই। সুতরাং যতক্ষণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাহিব, ততক্ষণ এই ক্ষমতার অনুশাসন মূলতঃ মানিয়া চলিব। অর্থাৎ, শক্তি ও সম্মতি, উভয়ের যোগফলে সার্বভৌমিকতার উদ্ভব ; ব্যবহারের ভিতর দিয়া আইনসিদ্ধরূপে তাহাই চরম কর্তৃত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

তাহা হইলে, সার্বভৌমিকতার অভিব্যক্তিরূপে যে আইন প্রণীত হইল তাহা দুর্নীতিমূলক হইতে পারে, তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন হইতে পারে। যাহারা আইন প্রণয়ন ও তাহাকে কার্যকরী করিতেছে তাহাদের পরিবর্তনও জরুরী হইয়া উঠিতে পারে। এ পরিবর্তন বিধিসঙ্গতভাবে ঘটিতে পারে, যেমন নূতন নির্বাচনের মারফত আইনসভা পাল্টানো ; অথবা, ইহা বিপ্লবের মাধ্যমে আসিতে পারে, যেমন ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব বা চীন বিপ্লবের ঘটনা। কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা পরিবর্তিত, হস্তান্তরিত বা খণ্ডিত হয় না।

আসলে রাষ্ট্র বজায় রহিল, সার্বভৌমিকতাও থাকিল, শুধু যে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠীদল ও শ্রেণী লইয়া রাষ্ট্র গঠিত, তাহাদের আপেক্ষিক শক্তি সম্পর্কের ভারসাম্য পরিবর্তিত হইল। পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতিতে ঘটিলে নূতন শাসনব্যবস্থা সহজেই স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাইয়া থাকে। বিপ্লবের ভিতর দিয়া আসিলে দেশে ও বিদেশে সে সম্মান ও কর্তৃত্বলাভ করিতে হয়ত কিছুকালের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন হয়।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে প্রচলিত তত্ত্ব তাহার যথাযথরূপ পাইয়াছে ষোড়শ শতাব্দীতে জঁা বোদাঁ (Jean Bodin), সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগো, গ্রোটিয়াস ও টমাস্ হব্‌স্ (Hugo, Grotius and Thomas Hobbes), অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশো (Rousseau) এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জন অস্টিনের (John Austin) লেখার মারফৎ।

সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের বিকাশ

প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রকে সমধিক মর্যাদা দান করিলেও, প্রথাগত আইনের স্থান ছিল

* Its chief task is to uphold the rule of law and this implies that it is itself also the subject of law, that it is bound in the system of legal values it maintain[s]. MacIver—The Modern State p. 478.

রাষ্ট্রীয় নির্দেশের উপরে। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে রাষ্ট্রিক সংগঠন গঠিত হইয়া উঠে নাই। তখন সারা পশ্চিম ইউরোপে এক খ্রীষ্টীয় সভ্যতার সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল বলিয়াই লোকে জানিত। নানা স্তরের লোকের ছিল বিভিন্ন পর্যায়ের অধিকার (Rights) ; এবং সংগঠিত নিয়ন্ত্রণাধিকার বিভক্ত ছিল নানা স্তরের কর্তৃপক্ষের মধ্যে। এই কর্তৃপক্ষের দলে পড়িতেন রোমান ক্যাথলিক চার্চ, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য, রাজা সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারী, মুক্ত শহর, (Free cities) গিল্ড্ (Guilds) প্রভৃতি। এই নানা অধিকার ও কর্তৃপক্ষের ভারসাম্যের ভিতর দিয়াই সংগঠিত সমাজ-জীবন চলিত। মধ্যযুগের সম্পর্কে বলা হয় যে তখন "রাষ্ট্রের জন্য কোন অনুভূতি ছিল না। কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের উপর একই ধরনের বশ্যতা ছিল না : সর্বময় ক্ষমতাশালী সার্বভৌমিকতা ছিল না। রাষ্ট্রীয় আইনের সমান চাপ অনুভূত হইল না, আনুষ্ঠানিক আইনসিদ্ধ নিয়মকানুনের মাধ্যমে সংগঠনের ধারণাগত ভিত্তি ছিল না, অন্ততঃ যেটুকু ছিল তাহা চার্চের এক্তিয়ারভুক্ত, "রাষ্ট্রের নহে।"*

মধ্যযুগের ক্ষয়প্রাপ্তির সাথে সাথে নূতন রাষ্ট্রশক্তি প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। একদিকে পোপ ও সম্রাটের কর্তৃত্বের অস্বীকৃতি, অপরদিকে ভূম্যধিকারী, মুক্তনগরী ও গিল্ডগুলির ক্ষমতার অবদমন, এই দুই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ এই পর্যায়ে রাষ্ট্রাধিনায়ক ছিলেন রাজা ; রাজার ক্ষমতাই ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতা। চতুর্দশ শতাব্দীতেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, এবং কোন কোন লেখকের লেখায় ইহার অস্ফুট ইঙ্গিতও দেখা যাইতেছে। আরও দুই শতাব্দী পরে বোদাঁ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'De Republica' পুস্তকে সার্বভৌমিকতার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মবিপ্লবের ফলে ধর্মান্ধ ও পরমত অসহিষ্ণু ইউরোপে শান্তিহীন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে সমাজজীবন যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সে যুগের অসামান্য চিন্তানায়ক বোদাঁর নিকট রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ক্লৈব্য ও অক্ষমতাই এ ভাঙনের আদি কারণ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। স্থতরাং তিনি ন্যায্যতঃই রাষ্ট্রকে অসাধারণ ঐক্য ও ক্ষমতার বৈভবে সজ্জিত

বোদাঁ

* There was then "no feeling for the state, no common and uniform dependence on a central power ; no omnicompotent sovereignty ; no equal pressure of civil law ; no abstract basis of association in formal and legal rules—or at any rate, so far as anything of the sort was present, it was a matter only for the Church, and, in no way for the state. Coker—Recent Political Thought—P. 499.

করিলেন। বোদাঁ বলিলেন যে রাষ্ট্র হইল নানা পরিবার ও তাহাদের সম্পত্তির মিলিত সংগঠন এবং তাহা চরম ক্ষমতা ও যুক্তি দ্বারা শাসিত। সার্বভৌমিকতা হইল সকল নাগরিক ও প্রজার উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা; আইনের বাধাবন্ধ তাহার উপর প্রযুক্ত হয় না।* বোদাঁ অবশ্য বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের বিধান বা প্রকৃতির নিয়ম রাজা-প্রজা সকলের উপরেই সমভাবে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তিনি বাস্তব মানবিক সমাজে সকল সামাজিক ইচ্ছা বা বিধানের উপর সার্বভৌমিকের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। সার্বভৌমিক সকল নাগরিক ও প্রজার জন্য আইন নির্ধারণ করিবে, স্বয়ং কোন মানবিক আইনের দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে না।

অখণ্ড, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন, সর্বপ্রকার বাধা বন্ধনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব, বোদাঁর পরবর্তী কালে, যাঁহাদের অবদানে বিশেষ করিয়া সুসংবদ্ধ রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমে নাম করিতে হয় হব্‌স, রুশো ও অস্টিনের। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে হব্‌স রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে অখণ্ড, সীমাহীন চরম ক্ষমতাশালী মানসিক সার্বভৌম কর্তৃত্ব কল্পনা করিলেন। পরবর্তী শতাব্দীতে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জর, বিপ্লবের কিনারায় দণ্ডায়মান ফ্রান্সের মনীষী রুশো প্রমাণ করিলেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি অখণ্ড, অবিচ্ছেদ্য ও অভ্রান্ত। অবশ্য রুশোর বিশেষ কীর্তি হইল যে এই সার্বভৌমিকতা তিনি এক বা কতিপয় ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না করিয়া জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছার উপর অর্পণ করিলেন।† ইহার পর সার্বভৌমিকতার এ তত্ত্ব চূড়ান্তরূপ গ্রহণ করিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে অস্টিন ও জার্মানীতে ফন গার্টার, লাবাণ্ড, জেলিনেক (Von Garter, Laband, Jellinek) প্রভৃতির হস্তে।

হবস ও রুশো

অস্টিন লিখিয়াছেন বেস্থামীয় হিতবাদী চিন্তার প্রভাবে। হিতবাদীরা (Utilitarian) ছিলেন বাস্তব সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারকামী। স্পষ্টঘোষিত সুনিশ্চিত আইন মারফৎ (Positive Law) প্রাচীন চিরাচরিত আইনের (Common Law) বহুবিধ যুক্তিহীন অবিচার দূর করা ছিল তাঁহাদের অন্যতম লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের সংঘর্ষ ছিল রক্ষণশীল চিন্তাধারার সহিত। এই দ্বিতীয় দলের অভিমত ছিল যে কোন দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমবিকাশমান

অস্টিন ও জার্মান লেখকগণ

* "A state is an association of families and their common possessions, governed by a supreme power and by reason. Sovereignty is supreme power over citizens and subjects, unrestrained by law." Bodin.

† হব্‌স ও রুশো সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অলিখিত ও প্রথাগত আইনের ভিতরে যে সর্বজনীন ও চিরস্থায়ী নীতি প্রকাশ পায় তাহাই প্রকৃত আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে হিতবাদীরা প্রচার করিলেন যে আইনের উদ্দেশ্য হইল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও সকল মানুষের হিতসাধন। সুতরাং চিরাচরিত ব্যবহার ও প্রথা যাহাতে অন্যায়ের পোষক ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে না পারে, সেজন্য সমাজ যাঁহাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, সমাজের প্রয়োজনানুযায়ী আইনের ক্রমান্বিত প্রবর্তন ও পরিবর্তনের চূড়ান্ত ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিতে হইবে বৈকি। অস্টিনও তদনুযায়ী ঘোষণা করিলেন যে আইন হইল সার্বভৌমিকের আদেশ (Law is the command of the Sovereign) এবং স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজে এক নির্দিষ্ট মানবিক সার্বভৌম কর্তৃত্ব অনিবার্য, যাহার উপরওয়ালা আর কেহ নাই এবং যাহার আদেশ সেই সমাজের ব্যাপক জনতা অভ্যাসগতভাবে পালন করিয়া থাকে।* উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে জার্মানীর ঐক্য সাধনের অপ্রতিরোধ্য চাহিদার সম্মুখে জার্মান লেখকগণও আইনের উৎস হিসাবে সর্বজনীন ন্যায় বিচার বা কল্পিত জাতীয় চেতনার সর্ববিধ ভাসাভাসা ধারণা পরিত্যাগ করিয়া জার্মান রাষ্ট্রের বাধাহীন, সীমাহীন, অখণ্ড ও চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌম কর্তৃত্বের তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উপরিউল্লিখিত লেখকগণের মৌলিক কৃতিত্ব ও অনস্বীকার্য প্রাধান্যের সাথে সাথে হুগো, গ্রেটিয়াস, ব্ল্যাক্‌স্টোন, বেন্থাম, বার্জেস প্রভৃতির অবদানও স্মরণীয়।

ইহাদের সকলের বক্তব্য হইতে সারবস্তু যাহা দাঁড়ায় তাহা হইল: রাষ্ট্র অপরিহার্য সামাজিক সংগঠন; ইহার মধ্যেই মানুষ তাহাদের সমস্বার্থ ও বিরোধী স্বার্থ লইয়া যুক্তিসঙ্গত জীবন-যাপন করিতে পারে; আইন-প্রণয়নের অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের আইনের দিক হইতে রাষ্ট্রের স্থান সর্বোচ্চ ও সীমাহীন।

বোদাঁর অর্ধশতাব্দী পরে গ্রোটিয়াস সার্বভৌমিকের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিলেন: এ "সেই ব্যক্তি যাহার হস্তে চরম রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা, যাহার কার্যকলাপ অপর কাহারও আজ্ঞাধীন নহে, যাহার ইচ্ছা কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।† ব্ল্যাক্‌স্টোন ইহাকে "চরম, অপ্রতিরোধ্য, শর্তহীন, সীমাহীন কর্তৃত্ব বলিয়া" কল্পনা করিয়াছেন।‡

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা

*অস্টিনীয় তত্ত্ব সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ের বিশদতর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

†The supreme political power vested in him whose acts are not subject to any other and whose will cannot be oves-ridden.

‡..the Supreme, irresistible. absolute, uncontrolled authority.

জেলিনেকের (Jellineck) মতে ইহা "রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যাহার গুণে নিজের ইচ্ছায় ছাড়া ইহার উপর কোন প্রকার বন্ধন আরোপিত হইতে পারে না, নিজে ছাড়া অপর কোন শক্তি ইহাকে সীমিত করিতে পারে না।"*

বার্জেস (Burgess) বলেন: ইহা হইল "প্রজাপুঞ্জ ও তাহাদের সকল সংগঠনের উপর আদি, অবিমিশ্র, সীমাহীন ক্ষমতা;† নির্দেশ দান করিবার ও তাহা মানিতে বাধ্য করিবার স্বতোৎসারিত ও স্বাধীন ক্ষমতা।"‡ উপরোক্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা হইতে সার্বভৌমিকতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়:

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য

১। স্থায়িত্ব (Permanence): ইহার অর্থ হইল, যে কোন সময়ে রাষ্ট্রের তরফ হইতে ক্ষমতার প্রয়োগকারীর মৃত্যু ঘটিলে বা অপর কাহারও হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে সার্বভৌমিকতার অবসান ঘটে না, যতক্ষণ রাষ্ট্র থাকিবে ততক্ষণ সার্বভৌমিকতাও বজায় থাকিবে।

২। একাকীত্ব (Exclusiveness): রাষ্ট্রে চরম ক্ষমতার কেন্দ্র মাত্র একটি হইবে। চরম ক্ষমতার ভাগাভাগি চলে না।

৩। সর্বাব্যাপকতা (All-comprehensiveness or Universality): রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু বা সংগঠনের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে। অবশ্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় যেটুকু তাহার এক্তিয়ার-বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিদেশী রাষ্ট্রদূত বা বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতাবাসের উপর রাষ্ট্র কর্তৃত্ব খাটানো হইবে না বলিয়া যে আন্তর্জাতিক আইন ও ব্যবহার চালু আছে, রাষ্ট্র তাহা স্বেচ্ছায় মানিয়া লয়।

৪। অবিচ্ছেদ্যতা (Inalienability): সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরযোগ্য নহে। লিবার (Lieber) বলিয়াছেন যে গাছ যেমন তাহার বাড়িবার ক্ষমতা ছাড়িতে পারে না, মানুষ যেমন তাহার জীবনীশক্তি বা ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে পারে না, রাষ্ট্রও অনুরূপভাবে সার্বভৌমিকতা হস্তান্তর করিতে পারে না; অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য। অবশ্য রাষ্ট্র তাহার অন্তর্ভুক্ত কোন অঞ্চল অপর রাষ্ট্রকে সমর্পণ করিতে পারে; ইহার ফলে, সেই পরিত্যক্ত অঞ্চলের উপর প্রথম

*That characteristic of the state in virtue of which it cannot be legally bound except by its own will or limited by any other power than itself.

†Original, absolute, unlimited power over individual subject and over all associations of subjects.

‡The underived and independent power to command and compel obedience.

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা চলিয়া গেল ও নূতন রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু তাহার ফলে প্রথম রাষ্ট্রের বাকি ভূখণ্ড ব্যাপিয়া সার্বভৌমিকতা পূর্ববৎ চরম ও অখণ্ডই থাকিয়া গেল, বিনষ্ট হইল না। আর, রাষ্ট্রাভ্যন্তরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক বা শাসকমণ্ডলীর পরিবর্তনের ভিতর দিয়া, সার্বভৌমিকতা যে ক্ষুন্ন হয় না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

৫। ইহাকে আদি, অকৃত্রিম ও অনন্ত (Original, Absolute and Unlimited) কেন বলা হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রজন্মের ইতিহাস থাকে ঠিকই; কিন্তু সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের অচ্ছেদ্য উপাদান। ইহা অপরের দান হিসাবে আসিতে পারে না; কারণ তাহা হইলে দাতাকে অধিকতর ক্ষমতাশালী বলিয়া বুঝিতে হইবে। সার্বভৌমিকতা অপর কোন শক্তির উপর নির্ভরশীল হইতে পারে না। কোনরূপ পরাধীনতার ধারণা সার্বভৌমিকতার কল্পনার সহিত মিশিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। কোনরূপ সীমা বন্ধন সার্বভৌমিকতা স্বীকার করিতে পারে না। কারণ, যে ক্ষমতা সার্বভৌমিকতাকে সীমিত করিতে পারে তাহাকে উচ্চতর ক্ষমতা বলিয়া মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সার্বভৌমিকতা ও যুক্তরাষ্ট্র

অনেকের মতে যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা বিভক্ত হইয়া যায়। তাঁহারা বলেন যে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলি তাহাদের নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ প্রশ্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। বহু বিদেশী পণ্ডিতও এ তত্ত্বকে মানিয়া লইয়াছেন।

এ প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন উইলোবি (Willoughby): "একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুইটি ইচ্ছা, দুই-ই চূড়ান্ত যে হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু, রাষ্ট্রের চরম ইচ্ছা খণ্ডিত হইতে না পারিলেও, সেই ইচ্ছা একাধিক আইন-প্রণয়নী সভা হইতে প্রকাশিত হইতে পারে এবং তাহার আজ্ঞাকে কার্যকরী করিবার ভারও বহুতর কর্মসম্পাদনী বিভাগের উপর ন্যস্ত হইতে পারে।"*

বস্তুতঃ, ঐক্য ও বৈচিত্র্য এই উভয় ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের

*That there cannot be in the same being two wills, each supreme, is obvious. But though the sovereign will or the state may not be divided, it may find expression through several mouthpieces, and the execution of the commands may be delegated to a variety of Governmental organs.

উৎপত্তি। উভয় বৈশিষ্ট্যকে মিলাইবার যে একটি ইচ্ছা তাহা হইতেই জন্ম একটি রাষ্ট্র ও একটি অখণ্ড সার্বভৌমিকতার। শাসনক্ষমতা বিভাজনের সহিত সার্বভৌমিকতা খণ্ডনের প্রশ্নকে জড়াইয়া দেখা অবান্তর। জেলিনেকও বলিয়াছেন যে আসলে যাহা ভাগ করা হয় তাহা হইল সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয় ও পদ্ধতি। রুশো বা ক্যালহুণ (Calhoun) বহু পূর্বেই অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অখণ্ড সার্বভৌমিকতাসম্পন্ন একটি রাষ্ট্র তাহাও ১৮৬১-১৮৬৫ সাল ব্যাপী গৃহযুদ্ধের মারফত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

সার্বভৌমিকতার শ্রেণীবিভাগ

সার্বভৌমিকতা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হইতেছে।

নামসর্বস্ব বা উপাধিসূচক সর্বভৌমিকতা (Titular Sovereignty)

নামসর্বস্ব সাবভৌমিকতা

অনেক সময়ে কোন নৃপতিব সম্বন্ধে 'সার্বভৌম' উপাধি যোগ করা হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে বহুদিন হইতেই তিনি সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এক্ষেত্রে 'সার্বভৌম' শব্দটিকে একটি মর্যাদাসূচক উপাধি বলিয়া ধরিতে হইবে। ইংলণ্ডের নৃপতি ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আইনসঙ্গত (Legal) ও রাষ্ট্রনৈতিক (Political) সার্বভৌমিকতা ঃ

সার্বভৌমিকতার যে রূপ আইনজীবীর চক্ষে ধরা পড়ে, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে আইনসঙ্গত সর্বভৌমিকতার ধারণায়। এই মতানুযায়ী, সার্বভৌমিকতা হইল আইন-প্রণয়নের চরম ক্ষমতা তাহা হইলে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার অবস্থান হইল সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিতে যিনি বা যাঁহারা রাষ্ট্রের চরম আজ্ঞাকে আইনরূপে ঘোষণা করিতে সক্ষম। এ ক্ষমতা সর্বোচ্চ এবং সে হিসাবে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, ন্যায়-অন্যায়ের নীতি অথবা জনমতের নির্দেশ,—সব কিছুকেই অতিক্রম করিতে ইহা সক্ষম। অন্যায় বলিয়া, জনমতবিরোধী বলিয়া, অথবা ধর্মীয় অনুশাসন খণ্ডন করিবার অভিযোগে কোন বিচারকই এই সার্বভৌমিকের বিধিসিদ্ধ আজ্ঞাকে প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিবেন না।

আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা

এ যুক্তির সারবত্তা অনস্বীকার্য। কারণ, রাষ্ট্রে ইচ্ছা যখন সর্বোচ্চ, তখন তাহাক খণ্ডন করিবার অধিকার ধর্ম, নীতি বা জনমত, অথবা অনুরূপ কিছুরই নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে তো কোনো মানুষ প্রকাশ করিবে। তাহা হইলে

সে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার দায়িত্ব কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর বিধিসঙ্গত ভাবে অর্পিত থাকিতে হইবে; নতুবা পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার সংঘাতে আইনে সঙ্গতি থাকিবে না,—বস্তুত: আইন খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না,—শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হইবে।

আইন-প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলে, সার্বভৌমিকতার এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট হইত। কিন্তু সার্বভৌমিকতা শুধু নির্দেশ দেওয়া এবং তাহা মানিতে বাধ্য করার মধ্যেই আবদ্ধ নাই। রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য যে ব্যাপক জনসম্মতি প্রয়োজন তাহার কোন ইঙ্গিত এ বক্তব্যে রহিল না। ডা: গার্ণার বলিয়াছেন: "আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকের পশ্চাতে আরও এক শক্তি দণ্ডায়মান। আইন ইহাকে স্বীকার করে না, ইহা অসংগঠিত; আইনাসিদ্ধ অনুজ্ঞার আকৃতিতে রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিতে ইহা অক্ষম, তথাপি ইহা এমন এক শক্তি যাহার নির্দেশের সম্মুখে প্রকৃতপক্ষে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিক মাথা নত করিবে এবং যাহার ইচ্ছা রাষ্ট্রে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকিবে।"* ডাইসি বলিতেছেন: সেই জনসমষ্টিই হইল রাষ্ট্রনীতিগত সার্বভৌমিক যাহার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ মানিয়া চলে।†

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা

ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা ধরিলে রাজা-সমেত পার্লামেণ্ট হইল আইনসঙ্গত সার্বভৌমিক এবং নির্বাচকমণ্ডলী হইল রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেণ্টেরই রহিয়াছে এবং যে শক্তি অবাধ ও অমোঘ। ডাইসির মতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট শিশুকে বয়:প্রাপ্ত বলিয়া নির্ধারিত করিতে পারে, মৃত্যুর পরেও কোন মানুষকে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করিতে পারে, অবৈধ সন্তানকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, অথবা, উপযুক্ত মনে করিলে, কোন ব্যক্তিকে তাহার নিজস্ব মামলার বিচারক নিযুক্ত করিতে পারে। অর্থাৎ, পার্লামেণ্টের আইনকে বে-আইনী

ইংলণ্ডের উদাহরণ

*Behind the legal sovereign is another power legally unknown, unorganised and incapable of expressing, the will of the form of legal command, yet withal a power to whose mandates the legal sovereign will in practice bow and whose will must ultimately prevail in the state. Garner, ibid, p. 160.

†That body is politically sovereign the will of which is ultimately obeyed by the citizens of the state. Dicey-Introduction to the Study of the Law of the Constitution, p. 70.

বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার অধিকার কোন আইনজীবী বা বিচারকের নাই। তেমনি পার্লামেন্টের আইন করিবার ক্ষমতায় কোনরূপ বাধা-নিষেধের প্রাচীরও নাই।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও পার্লামেন্ট কি সত্যই যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে? ডাইসি বলিতেছেন, যে কোন সার্বভৌমিকেরই প্রকৃত ক্ষমতার ব্যবহার বাহির ও অন্তর দুই দিক হইতেই সীমাবদ্ধ।* বাহিরের সীমা হইল প্রজাগণের আইন ভঙ্গ করা বা প্রতিহত করার সম্ভাবনা বা নৈশ্চিত্য। আভ্যন্তরীণ সীমা নিহিত রহিয়াছে সার্বভৌমত্বের নিজস্ব চরিত্রের মধ্যে। সার্বভৌমিক যত স্বৈরাচারীই হউক, যে সমাজে সে বাস করে, যে সমাজের সে শিরোমণি, সেই সমাজের সমকালীন নীতিবোধের বিরোধিতা করার ক্ষমতা তাহার থাকিবে না। চতুর্দশ লুইর পক্ষে হয়ত ফ্রান্সে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মমতকে জাতীয় ধর্ম বলিয়া চালু করা সম্ভব হইত না; কিন্তু তিনি এরূপ কিছু করিতে চাহিতেছেন ইহাও কল্পনা করা যায় না।

পার্লামেন্টের পক্ষেও এ বক্তব্য সমান সঠিক। কারণ আইনসভা বিশেষ সামাজিক পরিবেশের উৎপন্নফল; যে চিন্তা-চেতনা এই পরিবেশকে ঘিরিয়া আছে, পার্লামেন্টের কর্মক্ষমতা তাহার দ্বারাই সীমাবদ্ধ। পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ নির্বাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে নানাবিধ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন। আইনের চক্ষে সেগুলির কোন মূল্য নাই ঠিকই; কিন্তু এই সদস্যবৃন্দকে তো পুনরায় নির্বাচনের সময় ভোটপ্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইতে হইবে; অন্ততঃ যে সব পার্টির সমর্থনে তাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাহাদের পুনরায় প্রার্থী হইয়া জনসমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। সুতরাং সকল প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিলে পার্লামেন্ট সদস্য অথবা রাষ্ট্রনৈতিক দল, উভয়ের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নিতান্তই সীমাবদ্ধ নয় কি? প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীকে নির্বাচকমণ্ডলী পুনরায় নির্বাচিত করিবে না। নির্বাচকমণ্ডলী আশা করিবে, দাবি করিবে, যে ভোটের মাধ্যমে তাহাদের অধিকাংশের যে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইবে। বস্তুতঃ, দায়িত্বশীল গণতন্ত্রের ইহাই মূলবস্তু। সুতরাং আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকের উপর যাহার নির্দেশ শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় তাহাই হইল প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিক।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাস্তব

* "The actual exercise of authority by any sovereign whatever, and notably by parliament is bounded or controlled by two limitations. Of these the one is an external, the other is an internal limitation."—Dicey. ibid p. 74.

মনে রাখিতে হইবে যে, সার্বভৌমিকের ক্ষমতার যে সীমার কথা বলা হইতেছে তাহা মূলতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক। আইন সে সীমা স্বীকার করে না। দ্বিতীয়তঃ, বাহিরের সীমা (External limit) যে ঠিক কোথা হইতে সুরু হইবে তাহা কেহ পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না, অর্থাৎ, প্রজারা যে কখন আইনভঙ্গ বা বিদ্রোহ করিবে তাহাও ফর্মূলায় বাঁধিয়া দেওয়া নাই।

আইনসঙ্গত সার্বভৌমিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিক প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একই বস্তু। কিন্তু অন্যত্র তাহারা এক নয়, এবং তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ বাধিতে পারে। দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিরোধ বাধিলে, কাহার নির্দেশ চূড়ান্ত হইবে? স্বভাবতঃই, আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকের নির্দেশকেই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে। কারণ, রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিক আইনের রূপে নির্দেশ দান করিতে অক্ষম। সুতরাং আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকের নির্দেশ ব্যতীত অপর কোন নির্দেশই কোন বিচারশালা গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিক প্রত্যক্ষ নির্দেশদানে অক্ষম; তাহার ক্ষমতা আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করিবে, এবং তখনই তাহা আইনসিদ্ধ নির্দেশ হিসাবে মর্যাদা পাইবে।

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে সার্বভৌমিকতা দুইটি ভাগে বিভক্ত?

এক সার্বভৌমিকতার দ্বিবিধ প্রকাশ

অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই সেরূপ মত পোষণ করেন না। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা একটিই; তাহার প্রকাশের মাধ্যম দ্বিবিধ। অধ্যাপক রিচি (Ritchie) বলেন: যে "সুশাসনের সমস্যা হইল প্রধানতঃ আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতা ও চরম রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার যথাযথ সম্পর্ক নির্ণয়ের সমস্যা।"*

জনতার সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty): ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ইউরোপে অবাধ রাজতন্ত্রের বিরোধী লেখকেরা বলিতে শুরু

ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী জনগণ

করিয়াছিলেন যে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইল জনগণ। মূলকথা ছিল যে ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণেরই ছিল, রাজা এখন অবাধ ক্ষমতা ব্যবহার করা সত্ত্বেও সে অধিকার নষ্ট হইয়া যায় নাই, যাইতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশোর কণ্ঠে তূর্যধ্বনির ন্যায় ধ্বনিত হইল 'সমষ্টিগত

*The problem of good government...is largely the problem of the proper relation between the legal and the ultimate political sovereignty,

ইচ্ছার আহ্বান: সাধারণ মানুষের চুক্তির ভিতর দিয়া রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে; রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা নিহিত রহিয়াছে 'সমষ্টিগত ইচ্ছার' মধ্যে; পরে জনসাধারণের অংশগ্রহণের ভিতর দিয়াই সে ইচ্ছার প্রকাশ হয়।

রুশোর এই রণহুংকার দেশ হইতে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিপ্লবের অধিকার

বাস্তব পরিস্থিতিও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, জনগণের সার্বভৌমিক ক্ষমতার বাণী সেই বিপ্লবের তত্ত্বগত যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করিল। আমেরিকার "স্বাধীনতার ঘোষণায়" (Declaration of Independence) লিখিত হইল: "শাসিতদের সম্মতি হইতে ন্যায্য ক্ষমতা লাভ করিয়াই মনুষ্যসমাজে সরকার সমূহের পত্তন হইয়া থাকে।*" "ফ্রান্সে ১৭৯২ সালে ষোড়শ লুইকে ক্ষমতা হইতে অপসারিত করিবার সময়, ফরাসী আইনসভা ঘোষণা করিলেন: ...কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের শাসন নিশ্চিত হয়।"† তখন হইতে আজ পর্যন্ত এ তত্ত্ব হইল, লর্ড ব্রাইসের ভাষায়, "গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র" (the basis and watchword of democracy)।

বিপ্লবের অধিকারের কথা বাদ দিলে, রাষ্ট্রভুক্ত অসংখ্য জনতার ইচ্ছা বুঝা যাইবে কি করিয়া? তাহাদের ইচ্ছা প্রকাশের পদ্ধতি কি? সকলের একমত হওয়া সম্ভব কি? এইসব প্রশ্নের সম্মুখে ডাঃ গার্ণার বলিতেছেন যে, যে দেশে মোটামুটি সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রচলিত আছে, সেখানে সংখ্যাধিক্য নির্বাচকমণ্ডলী যখন আইনসিদ্ধ পদ্ধতিতে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করে ও তাহার প্রাধান্য নিশ্চিত করে, তখনই জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা কার্যকরী হইল বুঝিতে হইবে।‡

জাতীয় সার্বভৌমিকতা (National sovereignty)

বিশেষ করিয়া ফরাসী চিন্তাধারায় "জাতীয় সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে "মানুষের অধিকারের ঘোষণায়"

*...Governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed.

† ..measure..to be adopted in order to assure the sovereignty of the people and the reign of liberty and equality.

‡The sovereignty of the people, therefore, can mean nothing more than the power of the majority of the electorate, in a country where a system of approximate universal suffrage prevails, acting through legally established channels, to express their will and to make it prevail. Garner. ibid—p. 165.

(Declaration of the Rights of Man), ফ্রান্সের তদানীন্তন কতকগুলি শাসনতন্ত্রে এবং বেলজিয়াম, চিলি প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রেও ঘোষিত হইয়াছে যে জাতিই হইল সর্বপ্রকার সার্বভৌম ক্ষমতার আবাসস্থল। এই বক্তব্যের ভিতর দিয়া প্রথমতঃ নৃপতির অবাধ ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং সেই সঙ্গেই দেশবাসী অসংখ্য জনতার সমষ্টির মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা ছড়াইয়া আছে সে ধারণাও বর্জিত হইতেছে। দাবী করা হইতেছে যে 'জাতিসত্তা' বলিতে যে বিমূর্ত ধারণা বুঝায় তাহাতেই এই সার্বভৌমিকতা নিহিত আছে। প্রকৃতপক্ষে এ তত্ত্বের দ্বারা জাতীয়তার প্রাধান্য ঘোষণা করা হইতেছে। কিন্তু বিমূর্ত কল্পনা আইন-প্রণয়নে অপারগ। সুতরাং এ তত্ত্বের সাহায্যে মৌলিক সমস্যার সমাধান মিলে না।

কার্যকরী (De Facto) সার্বভৌমিকতা ও আইনসিদ্ধ বা আইনানুমোদিত (De Jure) সার্বভৌমিকতা: বাস্তবক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগের ভিত্তিতেই সার্বভৌমিকতার এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, শত্রুর আক্রমণের ফলে কোন এক দেশে আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগের অধিকারী যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি তাহাদের হয়ত সাময়িকভাবে অন্যদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। আইনের দিক হইতে ইহার বা ইহাদের নির্দেশই কার্যকরী হইবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করিতেছে অন্যেরা এবং তাহাদের নির্দেশই চালু থাকিতেছে। এ অবস্থায় প্রথমোক্ত দলের ক্ষমতাকে আইনসিদ্ধ সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয় এবং দ্বিতীয় দলের ক্ষমতাকে কার্যকরী সার্বভৌমিকতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বিপ্লবের ফলেও অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। কার্যকরী সার্বভৌমিকের ক্ষমতার ভিত্তি হইল সাময়িক শাসনগত শক্তি। অপর সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হইল আইনের যুক্তি ও রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের স্বাভাবিক বশ্যতা। আইনের দৃষ্টিতে এই ক্ষমতার অধিকারীকেই প্রকৃত সার্বভৌমিক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহার নির্দেশ বর্তমানে পালিত না হইলেও ক্ষতি নাই, কারণ ধরিয়া লওয়া হয় যে এ নির্দেশ মান্য করানো যাইতে পারে।

বাস্তব অবস্থা ও আইনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া যদি কার্যকরী সার্বভৌমিক ক্ষমতার আসনে আসীন থাকে, তবে ক্রমে তাহা জনসম্মতির ভিত্তিতে আইনসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহা ছাড়া, কার্যকরী সার্বভৌমিক বহু ক্ষেত্রে নির্বাচন বা জনসমর্থন প্রমাণ করিবার জন্য কোন আইনসিদ্ধ পদ্ধতির মারফৎ তাহার শাসনব্যবস্থাকে আইনের

কার্যকরী সার্বভৌমিকও আইনসিদ্ধ হইয়া উঠে

মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া যথাযোগ্য স্বীকৃতি আদায় করে। কারণ, শাসনব্যবস্থার মূলকে সুদৃঢ় করিতে চাহিলে, শক্তির সহিত জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি অপরিহার্য।

আইনের আপত্তি

এই সূত্রে লক্ষণীয় যে অষ্টিন সার্বভৌমিকতার এরূপ শ্রেণীবিভাগে মূলতঃ আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার মতে সার্বভৌমিকতাই আইনের উৎস, সুতরাং সার্বভৌমিকতা কখনই বে-আইনী হইতে পারে না। বে আইনী সরকার হওয়া সম্ভব, সার্বভৌমিকতা নহে।

'রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা' (External sovereignty) : 'রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা বলিতে অনেক লেখক বুঝাইতে চাহেন যে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তাহার কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এমন ক্ষমতা রাষ্ট্রের ভিতরে বা বাহিরে কাহারও নাই। এ অর্থে কথাটি নির্দোষ, যদিও সার্বভৌমিকতা মূলতঃ আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা, রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ। সুতরাং রাষ্ট্রবহিঃস্থ স্বাধীনতা না বলিয়া সরল ভাষায় 'স্বাধীন' শব্দটি প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়, তাহাতে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

অস্টিনের মতে সার্বভৌমিকতা (Austinian Theory of Sovereignty) :

১৮৩২ সালে অষ্টিনের 'Lectures on Jurisprudence' প্রকাশিত হয়। তাহাতেই তিনি প্রথম তাঁহার আইন ও সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে নিজস্ব মত উপস্থাপিত করেন। হবস্‌ ও বেন্থামের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত অষ্টিনের মতবাদ ব্যবহারশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রগাঢ়রূপে প্রভাবিত করিয়াছে।

অস্টিন বলিলেন : "যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কোন বিশেষ 'সমাজের অভ্যস্ত আনুগত্য লাভ করিতে থাকেন, অথচ সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী সমপর্যায়ভুক্ত অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করেন তবে উক্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী উক্ত সমাজের সার্বভৌম, এবং উক্ত সার্বভৌম সম্বলিত সমাজ একটি স্বাধীন এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ।" [If a determinate human superior, not in a habit or obedience to a like superior receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, and the society (including the superior) is a society political and independent.] অষ্টিনের মতে আইন হইল

প্রজাদের প্রতি সার্বভৌমিকের আজ্ঞা, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে শাস্তি-দানের ক্ষমতা। অষ্টিনের বক্তব্য হইতে আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতার যে ধারণা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার বৈশিষ্টা হইল নিম্নরূপ :

অষ্টিনীয় সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য

১। ইহা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ;

২। ইহা ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তি সমষ্টির উপর ন্যস্ত থাকে ;

৩। ইহা নির্ধারিতরূপে সংগঠিত, যথাযথরূপে নিদিষ্ট এবং আইন দ্বারা স্বীকৃত ;

৪। আইনের ভাষায় রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করা ইহারই একমাত্র অধিকার ;

৫। ইহার আজ্ঞা অমান্য করার অর্থ আইনভঙ্গ করা, এবং শাস্তিভোগ সে কার্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ;

৬। ইহাই হইল সর্বপ্রকার অধিকারের উৎস ;

৭। এ ক্ষমতা অসীম, অবাধ ও চরম।

অষ্টিনের সার্বভৌমিক হইল সর্বপ্রকার আইনগত নিয়ম-কানুনের উৎস। এই সমস্ত নিয়মকানুনকে অভ্যাসগতভাবে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা যদি বিধিবদ্ধ আইনের রূপে আসে তাহা হইলে সার্বভৌমিকের ইচ্ছা হিসাবে বুঝিতে অসুবিধা নাই। যদি বিচারকের বিচার প্রসঙ্গে সে আইনের আবির্ভাব হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে সার্বভৌমিকের বিচারবিভাগীয় প্রতিনিধি মারফৎই তাহা ঘোষিত হইল। যদি সেগুলি নিতান্ত প্রথা হিসাবেই চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে সার্বভৌমিকের আজ্ঞা হিসাবেই দেখিতে হইবে। কারণ, সার্বভৌমিক যে সেগুলিকে চালু থাকিতে দিয়াছে, তাহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে সেগুলি বজায় থাকুক ইহা তাহার অভিপ্রেত। এবং সার্বভৌমিকের ইচ্ছা যথাযথ আইনরূপে প্রকাশিত হইয়া যদি প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইলে প্রথাগুলিই নাকচ হইয়া যাইবে। অষ্টিন-বর্ণিত এই সার্বভৌম ক্ষমতা হইল চরম ও অবাধ, সর্ববিধ আইনের উর্ধ্বে, সকল আইনের স্রষ্টা ও ধাতা।

মেইন (Maine), সিজ্‌উইক (Sidgwick), ক্লার্ক (Clark), প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অষ্টিনের তত্ত্বের প্রচণ্ড সমালোচনা করিয়াছেন। সিজউইক (Sidgwick) তাঁহার Elements of Politics গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে অষ্টিন ভ্রমক্রমে ব্রিটেনের নির্বাচকমণ্ডলীকেই আইনগত

অষ্টিনের সমালোচনা

সার্বভৌমিকরূপে দেখাইয়া স্বীয় যুক্তি খণ্ডন করিয়া বসিয়া আছেন। ইহা ছাড়াও অষ্টিনের মতের তত্ত্বগত সমালোচনাগুলির সারাংশ হইল নিম্নরূপ।

১। ইতিহাসে বহু অবাধ রাজতন্ত্রের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়,—মেইন পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের উল্লেখ করিয়াছেন,—যেখানে নৃপতির অখণ্ড ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। তথাপি, সে সব রাষ্ট্রে ধর্মীয় ও প্রথাগত যে সব আইন প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে অবাধ ক্ষমতাশালী নৃপতিও ভঙ্গ করিবার কথা কল্পনা করিতে পারিতেন না। অর্থাৎ, সার্বভৌমিকের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে অবাধ নহে, সসীম। এবং এ সীমাবদ্ধতা শুধু যে নরপতিদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে তাহা নহে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ন্যায় সার্বভৌম ক্ষমতাশালী আইন-সভাও বহু বিষয়ে আইন করিতে সাহসী হইবে না।

২। প্রথাগত আইনকে কোন যুক্তিতেই সার্বভৌমিকের আজ্ঞা বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। বস্তুতঃ সে সব আইন প্রজাসাধারণ ও রাজা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য ও উভয়তঃই পালনীয়। উপরন্তু সেগুলির উদ্ভবও কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর ইচ্ছার সহিত যুক্ত করা চলে না।

৩। 'অনুমতি জ্ঞাপন সূচক' (Enabling Statutes) অনেক আইন আছে যাহাকে 'আজ্ঞা' বলিয়া গণ্য করা সম্ভব নহে।

৪। ইহা 'রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা' বা 'জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা'র তত্ত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

৫। বাস্তব রাষ্ট্রনীতির সমস্ত ঘটনাকে অস্বীকার করিয়া শুধুমাত্র পীড়নমূলক শক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই এ তত্ত্বের সর্ববৃহৎ ভ্রান্তি। বাস্তব জগৎ বহির্ভূত বিমূর্ত কল্পনা ছাড়া (abstraction) ইহা আর কিছু নয়।*

এত সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে অষ্টিনের সমালোচকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অষ্টিনের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অষ্টিনের মত অনুসারে কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ আইন (positive law) সম্পর্কেই সার্বভৌমিক

* লীকক্ মেইনের নিম্নলিখিত সমালোচনা উদ্ধৃতি করিয়াছেন :

"..it is only true as the result of a process of abstraction which 'throws aside all the characteristic and attributes of government and society except one, namely, the possession of force. Leacock : Elements of Political Science, p. 54..

Sir James Stephenএর মন্তব্যও লক্ষ্যণীয় : '-It is true like thc propositions of mathematics or political economy in the abstract only..As there is namely no such thing at a perfect circle or a completly rigid body, or a mechanical system in which there is no friction or a state of society in which men act simply with a view to gain, so there is in nature no such thing as an absolute sovereign. ibid, p, 57

চরম ক্ষমতার অধিপতি। বিধিবদ্ধ আইন ছাড়াও সমাজে যে অন্যান্য শক্তি কার্য করিয়া চলিয়াছে অস্টিন কখনও তাহা অস্বীকার করেন নাই। প্রচলিত প্রথা, শাসনতান্ত্রিক আইন বা আন্তর্জাতিক আইন,—এ সব কিছুরই প্রভাবকে তিনি মানিয়া লইয়াছেন। শুধু তাঁহার বক্তব্য হইল যে নির্দিষ্ট উচ্চতর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে সমাজ শাসিত হইতেছে বলিয়া যদি বুঝিতে হয়, তবে এই উচ্চতর ক্ষমতার স্তরভেদ বর্জন করিয়া, একটি কেন্দ্রবস্তুকে ধরিতে হইবে, যাহার ইচ্ছা লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্য নাই। অস্টিনীয় মতের সমর্থনে ব্রাইস্ বলিতেছেন: "আইনগত সার্বভৌমিক কে, এ প্রশ্নটি, কেন সে সার্বভৌমিক এবং কে বা কাহারা তাহাকে সার্বভৌমিক করিয়াছে প্রভৃতি প্রশ্ন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; যে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ সার্বভৌমিকের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে, এবং যে সকল নৈতিক কারণে তাহাকে মান্য করা কর্তব্য—সে সকল প্রশ্ন আইনের আলোচ্য বিষয়ীভূত নহে; তাহাদের স্থান ইতিহাসে, রাষ্ট্রদর্শনে বা নীতিশাস্ত্রে এবং সার্বভৌমিক ও তাহার ক্ষমতা নির্দিষ্টকরণের নিতান্তই আইনগত সমস্যার মধ্যে ঐ সকল প্রশ্নের অবতারণা কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করিবে। *

মূল্যায়ন

ডাঃ গার্ণারও বলিতেছেন যে সার্বভৌমিকতার আইনগত চরিত্র সম্বন্ধে অস্টিনের তত্ত্ব মোটের উপর সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত। † সার্বভৌমিকতার উপর আইনগত বাধা-নিষেধ আরোপ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল ও নিরর্থক।

সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব: লর্ড ব্রাইস্ বলেন যে বাস্তবজীবনে সর্বদিক দিয়া বাধাবন্ধহীন, অসীম, চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী সার্বভৌমিককে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ব্লুণ্টশলি (Bluntschli) বলিয়াছেন যে "রাষ্ট্র বাহিরের দিক হইতে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিজস্ব চরিত্র ও সাধারণ সদস্যদের অধিকারের দ্বারা সীমিত। ··It is limited externally by the right of other states and internally by its own nature and by the right of its individual members.

সার্বভৌমিকতার আভ্যন্তরীণ ও বহির্জাগতিক সীমা

*"The question who is the legal sovereign stands quite apart from the questions why is he sovereign, and who made him sovereign. The historical facts which have vested power in any given sovereign, as well as the moral grounds on which he is entitled to obedience, lie outside the questions with which law is concerned, and belong to history, to political philosophy, or to ethics; and nothing but confusion is caused by obtruding them into the the purely legal question of the determination of the sovereign and the definition of his powers." Bryce-Studies in History and Jurisprudence. Leacook-Ibid. P. 57

†...as a conception of strict legal nature of sovereignty Austin's theory is, on the whole, clear and logical. Garner Ibid. p. 181.

ব্লুণ্টশ্‌লির মতে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতাকে মূলতঃ দুইটি সীমা মানিয়া চলিতে হয়। প্রথমতঃ শাসনতন্ত্রের বাধা ও দ্বিতীয়তঃ প্রজা সাধারণের নির্দিষ্ট অধিকারের বাধা। অধিকার সম্বন্ধে বক্তব্য হইল যে অধিকার রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি। স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। সমাজ অধিকারকে মানিয়া লয়, রাষ্ট্র তাহার বিধিবদ্ধ রূপদান করিয়া রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে, তবেই অধিকার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা না হইলে অধিকার বাহুবলে পর্যবসিত হইবে এবং তখন তাহা আর 'অধিকার' রহিবে না। অন্যথায় অবশ্য সামাজিক চেতনার ভিত্তিতেও 'অধিকারের' দাবি উত্থাপিত হইতে পারে এবং ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির বিচার হইতে আইনসঙ্গত 'সার্বভৌমিক' সে 'অধিকারে' হস্তক্ষেপ না করিতেও পারে। কিন্তু তাহা হইলেও স্পষ্টতঃই এ বাধা আইনগত বাধা নহে। তাহা ছাড়া আইনগত সার্বভৌমিক সামাজিক চেতনার বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ আইনের স্থাপনা করিতেছে এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। তাহা সত্ত্বেও ল্যাস্‌কি প্রমুখ লেখকরা এই বাস্তব রাষ্ট্রনীতির বাধার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিতেছেন যে প্রতি যুগের মানুষের নিকটেই সরকারের আইন প্রণয়নের তথাকথিত 'অসীম ক্ষমতার' সীমারেখা সুপরিচিত।

প্রজার অধিকার

শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারাও সার্বভৌমিকতা সীমিত হয় না। শাসনতন্ত্র সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে ঠিকই; তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু সরকারের উপরে শাসনতন্ত্রের স্থান নির্ধারিত হইল কোন্ শক্তির ভিত্তিতে? রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার প্রকাশ হইয়াছে শাসনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্থান নির্দেশের ভিতর দিয়া এবং সেই শাসনতন্ত্রের বিশেষ রূপ ও সংশোধনের নির্দিষ্ট নিয়মের মারফত। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা যদি না থাকিত তাহা হইলে শাসনতন্ত্রকে মানিবার বা সংশোধন করিবার প্রয়োজন হইত না।

শাসনতন্ত্র

আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমিত হইতে পারে এ যুক্তি সার্বভৌমিকতার প্রচলিত তত্ত্ব গ্রহণ করে না। ইহার মতে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা হইতেই প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্র বাহিরের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ভব বিভিন্ন স্বতন্ত্র ও সমপর্যায়ভুক্ত রাষ্ট্রের সহযোগিতার মাধ্যমে। এ আইনের স্রষ্টা কোন উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্তৃত্বও নহে; আইনভঙ্গকারীর

আন্তর্জাতিক আইন

প্রতি দণ্ডদানের জন্যও এরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নাই। আইনভঙ্গকারীর উদ্দেশ্যে অন্যান্য রাষ্ট্র স্বতন্ত্র বা মিলিতভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করে মাত্র। রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া থাকে, আবার ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেও পারে। আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ না মানা এবং যুদ্ধ ঘোষণার বহুতর ঘটনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রের ইচ্ছা সেই রাষ্ট্রাভ্যন্তরস্থ সব কিছুর উপর চূড়ান্ত ইচ্ছা এ কথা স্বীকার করিলেও, অন্য রাষ্ট্রের সহিত যেখানে তাহার সম্পর্ক সে বিষয়ে তাহার ইচ্ছাই চূড়ান্ত ইচ্ছা এ যুক্তি কি করিয়া মানা যাইবে? তাহা হইলে, ইহাই মানিতে হয় যে এ ক্ষেত্রে যুক্তি, ন্যায় ও নীতির কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে যেমন যে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাই চূড়ান্ত নয়, তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলাইয়া যে বৃহৎ মানবসমাজ ও রাষ্ট্রগোষ্ঠি, সেখানেও একটি রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে চূড়ান্ত বলিয়া মানা চলে না। বস্তুতঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসীম ও অবাধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের পিছনে রহিয়াছে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভিতরে শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পর্কের অস্তিত্ব বা প্রয়োজনের অস্বীকৃতি।

ব্যবহারিক জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্রও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী ভাবে চলে না, এরূপ চলা সম্ভবও নহে। তথাপি, তত্ত্বের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার মতবাদ এখনও প্রবল ও প্রামাণ্য, যদিও মানব সভ্যতার আধুনিক পর্যায়ে এ তত্ত্বের মধ্যে প্রচণ্ড বিপদের বীজ নিহিত রহিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ সার্বভৌমত্বকে খণ্ডিত অবস্থায় দেখিতে স্বীকৃত না হইলেও, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্তরের আংশিক-সার্বভৌমত্ব-সম্পন্ন রাষ্ট্রের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে তাহারই কতকগুলির বিবরণ দেওয়া হইল:

১। অনুগত রাজ্য (Vassal State): এই ধরনের রাজ্য অপর কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের (Suzerain State) অনুগত থাকে। সাধারণত: সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারগুলিই এ রাজ্য ভোগ করে বলিয়া ধরা হয়, যদিও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইহার সম্পূর্ণ বা আংশিক সার্বভৌমত্ব থাকে। পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সার্বভৌম রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ অধিকার ভোগ করে। পূর্বে বুলগারিয়া, রুমানিয়া, মিশর বা সার্বিয়া তুর্ক সাম্রাজ্যের অনুগত ছিল, পরে সাম্রাজ্যের পতনের সহিত সকলেই স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয়।

২। আশ্রিত রাজ্য ((Protectorate): কোন দুর্বল রাজ্য যখন

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অপর কোন রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, অথবা একাধিক রাষ্ট্র কোন দুর্বল রাষ্ট্রের উপর এই অবস্থা চাপাইয়া দেয় তখন আশ্রিত রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বলা যায়। অনুগত রাজ্যের মত আশ্রয়দানকারী ও আশ্রিত রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক অবস্থাভেদে পৃথক হয়। তবে ইহার ক্ষমতা আশ্রয়দানকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত নয় বলিয়া পূর্ববর্তী ক্ষমতার অবশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হয়। অধিকাংশ ব্যাপারেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং অবস্থাভেদে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও সমর বিভাগ, বিচার বিভাগ ও কর আদায় বিভাগের উপর, আশ্রয়দানকারীর ক্ষমতাই বজায় থাকে। মোনাকো (Monaco) ফ্রান্সের সহিত এইরূপ সম্পর্কে আবদ্ধ।

৩। আজ্ঞাধীন বা অছি ব্যবস্থাধীন রাজ্য (Mandated Territory or Trust Territory): প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিগত তুর্ক সাম্রাজ্যের অংশ প্যালেস্টাইন, ইরাক, প্রভৃতি এলাকাকে লীগের তরফ হইতে ব্রিটেনের শাসনাধীন হিসাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাদিগকে ক্রমে আধা-সার্বভৌম রাজ্য বলিয়া স্বীকার করা হইতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও অনুরূপভাবে কিছু কিছু এলাকার উপর কয়েকটি বৃহৎ শক্তিকে অছি (Trustee) নিযুক্ত করা হইয়াছে।

নিরপেক্ষীকৃত রাষ্ট্র (Neutralised State): ইহার অতি পরিচিত উদাহরণ হইল সুইজারল্যাণ্ড। নিজস্ব নিরাপত্তার খাতিরে অথবা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের চাপে অনেক সময়ে কোন রাষ্ট্র চুক্তি মারফৎ নিজেকে 'নিরপেক্ষ' বলিয়া ঘোষণা করে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে এ রাষ্ট্র কখনও প্রবৃত্ত হইবে না, ইহাই তাহার প্রতিশ্রুতি। ফলে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কোন চুক্তি বন্ধনে সে আসিতে পারিবে না যাহাতে তাহাকে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে হইতে পারে।

একত্ববাদ (Monism) বনাম বহুত্ববাদ (Pluralism)

অবাধ, অসীম, অখণ্ড সার্বভৌমিকতার যে প্রচলিত তত্ত্ব লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করা হইতেছিল, তাহাই 'একত্ববাদ' নামে পরিচিত। সামাজিক নীতি ও যুক্তির দিক হইতে রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আছে—একত্ববাদের তত্ত্ব তাহা দাবি করে না। এমন কথাও বলা হয় না যে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ অযৌক্তিক বা অন্যায় অথবা অসামাজিক আচরণ। রাষ্ট্রের কোন্ কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত বা অনুচিত সে বিষয়ও একত্ববাদী

একত্ববাদী যুক্তির নির্যাস

তত্ত্বের আলোচ্য নহে। একত্ববাদ শুধু বলিতে চায় যে, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং যে ধরণের বাধানিষেধ অপরের উপর আরোপের নিমিত্ত ইহার জন্ম, অনুরূপ বাধা-নিষেধ, ইহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। রাষ্ট্র দায়িত্বহীন একথা একত্ববাদের বক্তব্য নহে; তাহার বক্তব্য এই যে, রাষ্ট্র অনুরূপ অপর কোন কর্তৃত্বের অধীন থাকিতে পারে না। এক কথায় যে-কোন ভূখণ্ডে আইন প্রণয়নের সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের স্থান স্থানীয় সমাজের অপর সকল সংগঠনের উপরে *

বহুত্ববাদী সমালোচনা

একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মেইট্‌ল্যাণ্ড (Maitland), গিয়ের্কে (Gierke), ফিগিস (Figgis), লিণ্ড্‌সে (Lindsay), ল্যাস্কি (Laski), বার্কার (Barker), ডুগো (Duguit) প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা লেখক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লিণ্ড্‌সে বলিতেছেন: "ঘটনার দিকে তাকাইলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাষ্ট্র-সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ল্যাস্কি বলিয়াছেন: "সার্বভৌমিকতার সম্পূর্ণ ধারণাটিই বিসর্জন দিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ ঘটিবে।"**

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব এক্তিয়ারের মধ্যে সার্বভৌম

বহুত্ববাদীর বক্তব্য হইল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্যান্য অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও কর্মধারা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী নহে এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রানুমোদিত ক্ষমতাই তাহারা ব্যবহার করিতে পারে, ইহাও সত্য নহে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক ও স্বতোৎসারিতরূপে জন্মায় এবং নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে কার্য করিয়া যায়। সুতরাং স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠা স্বতন্ত্ররূপে কর্মরত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরে রাষ্ট্রের স্থান নির্দেশ করা চলে না।

* The Monist holds that the state exists to enact and apply law and that the state cannot itself be subjected to limitations of the same character as those which it itself is established to formulate and apply. He does not represent the state as irresponsible; he does maintain, that it cannot be responsible to any authority of like character to itself. In brief, the state, as an organisation for law within any given territory, is superior to all other social groups within such territory—Coker. Meiriam and Barnes—A History of Political Theories, P. 89.

If we look at the facts, it is clear enough that the theory of the Sovereign State has broken down. Coker—Recept Political Thought Pp. 503-504.

**It would be of lasting benefit to political science if the whole concept of sovereignty were surrendered Laski—Grammar of Politics, Pp. 44 45.

গিয়ের্কে ও মেইট্‌ল্যাণ্ড বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেগুলি কিভাবে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের আওতার বাহিরেই জন্মলাভ করিয়াছে ও বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব সংগঠনের প্রকৃত সত্তা রহিয়াছে; তাহা কল্পিত বস্তু নহে। ইহাদের চিন্তা বা চেতনা সদস্যদের ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা হইতে স্বতন্ত্র। পল বঁকুর (Paul Boncour) বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ মারফত প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ধরণের বহু সংগঠন উদ্ভূত হইয়াছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে; রাষ্ট্রের সে বিষয়ে কিছুই করিবার ছিল না। ক্রমে তাহারা নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও কার্যক্রম নিজেরাই নির্ধারিত করিয়াছে, সংগঠনের বাহিরে অন্যান্যদের তাহা মানিতে বাধ্য করিয়াছে, অভ্যন্তরেও,—যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে নিতান্তই স্বেচ্ছামূলক যোগদানের ভিত্তিতে সেগুলির জন্ম,—ক্রমেই সদস্যদের উপর বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ চাপাইতে সক্ষম হইয়াছে। আইনের দিক হইতেও এই অবস্থা ক্রমেই স্বীকৃত হইয়াছে।

রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী নহে

উপরন্তু গণতন্ত্রের নিয়মে সংখ্যাধিক্যের আদেশ মানা হয় এই বিশ্বাসেই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বজনীন স্বার্থ-রক্ষার্থে উপরোক্ত নির্দেশ প্রদান করিতেছে। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতা শুধু সকল নাগরিকের স্বার্থজড়িত এমন বিষয়বস্তু লইয়া নির্দেশ দান করিতে পারে এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বার্থের ব্যাপারে সেই গোষ্ঠীই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এক সময়ে ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে এই কথাই বলিতেন। বলা হইত যে, ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপারে স্বাধীনতা অখণ্ড; শুধু যে-সকল কার্যের মধ্যে অপরের স্বার্থ জড়াইয়া যাইতেছে সেগুলির বেলায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকিতে পারে। অনুরূপ যুক্তিই এখন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, দল, গোষ্ঠী, ইংরেজীতে এক কথায় Group বলিতে-যাহা বুঝায়, তাহার সম্পর্কে প্রয়োগ করা হইতেছে। এই জন্যই কথা উঠিয়াছে যে, আজকাল আমরা আর ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র (Man versus the State) বলি না, আমরা বলি গোষ্ঠী বনাম রাষ্ট্র (Group versus the State)।

নয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

এমিল্ ডুর্কহাইম (Emi'e Durkheim) বলিতেছেন, আধুনিক অর্থনৈতিক জীবন এত জটিল যে, রাষ্ট্রের পক্ষে তাহার ভিতরে পৌছান সম্ভব নহে। সুতরাং অর্থনৈতিক পেশা বা কর্মিগোষ্ঠীগুলিকে (Professional Groups) অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধিত্বভার

পেশাগত প্রতিনিধিত্ব

অর্পণ করা হউক। বস্তুতঃ, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা আর সামাজিক স্বার্থের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের রূপদান সম্ভবপর নহে।

বার্কার বলিতেছেন: "রাষ্ট্রকে প্রধানতঃ এমন সংগঠন হিসাবে দেখি না—যেখানে সাধারণ মানুষ যৌথ জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়াছেন, বরং দেখি ব্যক্তিসাধারণের এমন সংগঠন হিসাবে—যেখানে তাহারা ইতিমধ্যেই আরও অগ্রসর ও আরও অন্তরঙ্গ সম উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘবদ্ধ হইয়াছে।'*

নাগরিক ব্যক্তিমাত্র নহে, সে গোষ্ঠিভুক্ত ব্যক্তি

বেশ কিছুকাল হইতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে শ্রমজীবি সংস্থার উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা দাবি-দাওয়ার সংগ্রাম ছাড়াও, প্রতিষ্ঠান সুপরিচালনার জন্য নিয়ম-কানুন এবং কার্যব্যবস্থায় শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণের সুকল্পিত পরিকল্পনা লইয়া উপস্থিত হইতেছে। শ্রমিক-সংস্থা মালিক-সংগঠন, উৎপাদক ও ক্রেতাদের সমবায় সংস্থা ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, প্রভৃতি নির্ণয় তো করিতেছেই, উপরন্তু বিভিন্ন আইন-কানুনের প্রস্তাব লইয়াও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে এবং অনেক সময়ে সাফল্য লাভও করিতেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে শ্রমিক-সংগঠন, মালিক-সংগঠন, বাণিজ্য সভা, পেশাগত সংগঠন, কৃষিজীবী সংগঠন, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতির মালিক সম্প্রদায়, ক্রেতা-সমবায়-গোষ্ঠী (Labour organisations, Associations of Industrial employers, Chambers of commerce, Professional associations, Farming, Banking, and Insurance groups, Consumers' societies) প্রভৃতির প্রতিনিধিমণ্ডলী লইয়া কমবেশী ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিষদ (National Economic Councils) গঠন করিবার নীতি গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল বাস্তব অভিজ্ঞতাও বহুত্ববাদীদিগকে রাষ্ট্র-সার্বভৌমিকতাকে বহুরূপে বিভক্ত দেখিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

সাম্প্রতিক বাস্তব অভিজ্ঞতা

ইতিহাসের নজির ও বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেরণা ছাড়াও বহুত্ববাদীরা সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে নীতিগত আপত্তি উত্থাপন করেন।

*We see the State less as an association of individuals in a common life, we see it more as an association of individuals, already united in various groups for a further and more embracing common purpose. Coker—Ibid. P. 507.

এ আক্রমণের অন্যতম নেতা ল্যাস্কি ব্যক্তিগত বিবেক ও গোষ্ঠীগত আনুগত্যের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ল্যাস্কি বলেন: "বিবেকের অনুশাসন মানাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য (Our first duty is to be true to our conscience)*

নীতির আপত্তি: রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও ব্যক্তিগত বিবেকের প্রশ্ন

সুতরাং রাষ্ট্রের নির্দেশ ততটুকুই মানা যাইতে পারে—যতটুকুর প্রতি আমাদের বিবেকের সম্মতি রহিয়াছে। তাহার অধিক দাবি করিবার অধিকার রাষ্ট্রের নাই। অর্থাৎ, প্রতিটি ব্যক্তির নিকট হইতে রাষ্ট্র যে চূড়ান্ত আনুগত্য ও বশ্যতা দাবী করে, তাহার নীতিগত কোন ভিত্তি নাই।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র বহু সংগঠনের অন্যতম। মানুষের নানা সংগঠনের ভিতর আত্মপ্রকাশের যে প্রেরণা তাহা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সংগঠনে আসিয়াই ফুরাইয়া যায় না। সুতরাং রাষ্ট্র আমার জীবনে যতটা বাস্তব, অন্য সংগঠনগুলিও ততটাই বাস্তব। কোন একটি সংগঠনই আমার সামগ্রিক সত্তার প্রয়োজনকে তাহার আইন ও কার্যক্রমের মাধ্যমে মিটাইতে পারে না। সুতরাং সামাজিক কর্তৃত্বকে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির (Authority as Federal) ভিত্তিতে গঠিত বলিয়া বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ, ক্ষমতা এখানে একটিমাত্র স্থানে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে না, বিভিন্ন সংগঠনের ক্ষমতার এক্তিয়ার সুনির্দিষ্টরূপে বিভক্ত থাকিবে। কোন একটি সংগঠন অপর সংগঠনের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

আত্মপ্রকাশের বিচিত্র প্রেরণা,—আনুগত্যও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতি

ইহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ আইনের বাধা ও আন্তর্জাতিকতার আইনের নিষেধমূলক শক্তির দিক হইতে বহুত্ববাদীরা সমালোচনা করিয়া থাকেন। এই দুইটি বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি অপ্রয়োজনীয়।

আন্তর্জাতিকতা ও আইনের পক্ষ হইতে সমালোচনা

বহুত্ববাদীরা

কিন্তু নৈরাজ্যবাদী বা সিণ্ডিক্যালিস্টদের (Syndicalists) মতো, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না। মেইটল্যাণ্ড রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠনের উপর স্থান দিয়াছেন। পল বঁকুর রাষ্ট্রকে জাতীয় ঐক্য ও সাধারণ স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। ডুর্কহাইম সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। অন্যান্য সংগঠন তাহার অধীনে চলিবে। ডাঃ ফিগিস্ রাষ্ট্রকে "সব সংগঠনের সংগঠন" (Society of societies)

বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন

*Laski—Ibid. P. 289.

বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বার্কারের মতে রাষ্ট্র অন্যান্য সংগঠনগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, তাহাদের নিজ নিজ সংগঠনের সদস্যদের সহিত সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের শেষ নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করবে। এমন কি ল্যাস্‌কিও রাষ্ট্রের হস্তে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিতে চাহেন তাহা বহু একত্ববাদীও করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

বহুত্ববাদীরা প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বের বিতর্কের সময় রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন, বা তাহাকে সংরক্ষিত ও সুদূর পরাহত হিসাবে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তব কার্যক্রম নির্ধারণ করিতে গিয়া পুনরায় সেই চূড়ান্ত ক্ষমতা সর্বদা ব্যবহারের পর্যায়ে ফিরাইয়া আনেন। কারণ, প্রথমতঃ শ্রমিকদের শিল্পসংগঠনের কর্তৃত্বের ভাগীদার করিতে গেলে আইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সে ব্যবস্থা সৃষ্টি করা ও বজায় রাখা দুষ্কর দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ কার্য সুরু হইয়া গেলেও দেখিতে হইবে সেই গোষ্ঠী' অন্যান্য গোষ্ঠী ও বিশেষ করিয়া ক্রেতাদের উপর জুলুম না করে। তৃতীয়তঃ, ইহার উপরোক্ত কেন্দ্রীয় সংযোগ ও তত্ত্বাবধানের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ স্বার্থের দ্বন্দ্ব 'মটাইবার জন্য সকলের উপরিস্থ কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে এড়াইয়া যাইবার কোনই উপায় নাই।

এ স্বীকৃতির মারফত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলির সামাজিক মূল্য উপেক্ষা করা হইতেছে না। রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা মানিয়া লওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের সকল কার্যকে নীতিগত সমর্থন জ্ঞাপন করাও নহে। বস্তুত', বহুত্ববাদ একত্ববাদকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলেও বহু ত্রুটি ও দুর্বলতা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

ই. এম. বার্ন্‌স্ (১) বলিতেছেন যে বিশ বছরের উপর হইল বহুত্ববাদ কার্য্যতঃ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। হয়ত বহু প্রশ্নের জবাব দিয়া উঠিতে পারে নাই, হয়ত বহু ফাঁক থাকিয়া গিয়াছিল যে পথ দিয়া অবাধ ও চরম সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব পুনরায় হাজির হইয়াছে। নৈরাজ্যবাদের আশঙ্কায় বেশ কিছু লোককে নিসন্দেহে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, আক্রমণের আশঙ্কা এবং রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যাপক জনকল্যাণ-মূলক কার্য্যক্রম গ্রহণের দাবি বহুত্ববাদের তত্ত্ব অতীতের বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলিয়া দিল। যতদিন দুনিয়াজোড়া "ঠাণ্ডা লড়াই" চলিবে, অপরের দ্বারা নিজ-রাষ্ট্র আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে, ততদিন বহুত্ববাদের পুনরায় আসর পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবু বহুত্ববাদ কিছু অবদানও রাখিয়া গিয়াছে যাহার আরও সোচ্চার স্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল

বহুত্ববাদ
সর্বজনীন
বাস

সার্বভৌম আইনের যেমন উৎস তেমনি আবার আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ,—আইনগত তত্ত্বের এই স্বতঃবিরোধিতা বহুত্ববাদীরা উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে।

শক্তি হইল রাষ্ট্রের চরম সারাৎসার এবং যত যুক্তিহীন বা পাশবিক হইক না কেন রাষ্ট্রের আদেশ অমোঘ ও দুর্বার—এই অসুস্থ চিন্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে বহুত্ববাদ।

যুক্তি, ন্যায়, মানুষের অধিকার বা মহৎ সামাজিক উদ্দেশ্যকে ভিত্তি হিসাবে খাড়া করিয়া আইন মান্য মানুষের বিবেকাসদ্ধ করিয়াছে।

মনুষ্যধর্মকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়া বিশ্বলোকতান্ত্রিক সরকারের আবাহন করিয়াছে।

ক্যাবিয়েল

ক্যারিয়েল্ (২) স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে বহুত্ববাদের তত্ত্ব সুরু হইয়াছিল এক বিশেষ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন ধরণের সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিজ্ঞানী, অপরাধবিজ্ঞানী, সিণ্ডিক্যালিষ্ট ও সোশ্যা লষ্ট চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন যে আধুনিক শিল্পায়নের যুগে সার্বভৌম জাতীয়রাষ্ট্র ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিসত্ত্বাকে গুঁড়াইয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এমনই যে মানুষ একদিকে যেমন পরস্পরের উপর প্রাগাঢ়ভাবে নির্ভরশীল তেমনি মনন ও অনুভূতির দিক হইতে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন। সমাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বহু মানুষের যোগফল মাত্র, আত্মিক নৈকট্যে ঘনিষ্ঠ সমষ্টিগত জীবনের ধারক ও বাহক নহে। অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল অর্থনীতি ও রাজনীতির কৃত্রিমতা এড়াইয়া দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসা স্বতোৎসারিত ও স্বেচ্ছাসৃষ্ট সংস্থা সমূহের মধ্যে প্রকাশিত গোষ্ঠিজীবন। ব্যক্তি তাহার স্বাতন্ত্র্যকে উপলব্ধি করে, সার্থক করিয়া তুলে, গোষ্ঠির মধ্যে,—রাষ্ট্রীয় লেভায়াথানের মধ্যে নহে।

ল্যাস্কি

ল্যাস্কি (৩) ১৯৩৭ সালে ঘোষণা করিয়াছেন যে বহুত্ববাদের সঠিক বক্তব্য ছিল তিনটি :

১। রাষ্ট্রের আইনগত তত্ত্ব রাষ্ট্রে সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বের স্থান গ্রহণ করিতে পারেনা;

২। নৈতিক অধিকার বা রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার দাবি হইতে রাষ্ট্র সকলের আনুগত্য চাহিতে পারেনা;

৩। সার্বভৌমত্বের ধারণা মূলে ক্ষমতার ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত, নীতির দিক হইতে নিরপেক্ষ মাত্র।

ল্যাস্কি আরও বলিতেছেন যে বহুত্ববাদের মূল ত্রুটী হইতেছে যে রাষ্ট্রকে শ্রেণী সম্পর্কের প্রকাশ হিসাবে বুঝিতে পারে নাই। রাষ্ট্র যদি উৎপাদনের উপাদানের মালিকশ্রেণীর অস্ত্রই হয়, তবে শ্রেণীহীন সমাজ হইবে বহুত্ববাদীর প্রারব্ধ লক্ষ্য। সংঘাতের মূল কারণ দূরীভূত হইলে সমাজের প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র সংস্থা সমূহের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে। রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ল্যাস্কির নিকট ঐসম্পর্কে মার্ক্সীয় মতবাদ গ্রহণের পথে একটি স্তর মাত্র। 4

অধ্যাপক ল্যাস্কির মত প্রণিধানযোগ্য, সন্দেহ নাই। বহুত্ববাদী মতবাদ আজ আর কেহ প্রচার করিয়া বেড়ায় না; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমতবাদ গভীর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে।

1. Edward McNall Bdurns Ideas in conflict. p. 120.
2. Karil. In search of Authority. p. 96-97.
3. H. J. Laski. Grammar of Politics. Introductory Chapter—The crisis in the Theory of the State p, xi.
4. Ibid. p. xi-xii.

.....I now recognise (so far at least us I am concerned) that the pluralist attitude to State and law was a s'age on the road to an acceptance of the Marian attitude to them.

অতিরিক্ত পাঠ্য

1. GARNER—Political Science and Government
2. MACIVER—The Modern State
3. LASKI—Grammar of Politics
4. COKER—Recent Political Theories

নবম অধ্যায়

আইন (Law)

বিশ্বব্যবস্থা নিয়মাধীন। মনুষ্যসমাজও তেমনি। পরিবর্তনশীল মানবসমাজের নিয়মাবলী বহুমুখী ও বিচিত্র। নিয়ম নীতির মধ্য দিয়াই মানুষ অভীষ্ট লাভ করে। রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীকে আইন বলে। আইনের মাধ্যমে মানুষের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য লাভ হয়। আইন রাষ্ট্রের মানুষকে একসূত্রে একতাবদ্ধ করে, প্রতিটি মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশ করিয়া নাগরিকদের নিজ নিজ জীবনের আদর্শলাভের সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে আইনের মধ্য দিয়া বৃহত্তর সামাজিক জীবনের প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়। আইনের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তি আইনকে কার্যকরী শক্তি দান করে।

বিভিন্ন মতাবলম্বীরা আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। বিশ্লেষণবাদী মতানুযায়ী আইন সার্বভৌমের আদেশ। ঐতিহাসিক সম্প্রদায় বলিতেছেন যে, আইনে ইতিহাসেরই প্রকাশ হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে আইন সমাজ হইতে উদ্ভূত নিয়ম। দার্শনিক মতবাদীগণ আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছেন। অ্যারিস্টটল আইনকে সামাজিক প্রজ্ঞার প্রকাশরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রীক স্টোয়িকেরা প্রাকৃতিক বিধানকে (Natural Law) আইনের আদর্শ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। হেগেল বলিতেন যে, আইন সমাজের স্বচ্ছ পত্র। ইহা সর্বোচ্চ নীতির প্রতীক। মার্কস আইনকে শ্রেণী প্রভুত্বের প্রতীক বলিয়া গণ্য করিতেছেন।

প্রথা, ধর্ম, বিচারের মীমাংসা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ন্যায়, নীতি ও আইন পরিষদ আইনের উৎস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনের প্রয়োজন, তাহাকে রাষ্ট্রবিষয়ক আইন বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রবিষয়ক আইন আধুনিক রাষ্ট্রে বিদ্যমান—জাতীয় আইন, আন্তর্জাতিক আইন, সরকারী আইন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইন, সাংবিধানিক আইন, শাসনবিভাগীয় আইন ও ফৌজদারী আইন। ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডের চিরাচরিত প্রথাগত আইন (Common Law) বিধানমণ্ডলী প্রণীত আইন (Statute Law) প্রাকৃতিক বিধান (Natural Law) এবং নূতন আইন প্রভৃতিও (Ordinance) স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অনেকের মতে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিয়া গণ্য করা যায় না, কারণ আইন সার্বভৌমের আদেশ। আন্তর্জাতিক সার্বভৌম নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন আইন পর্যায়ভুক্ত নয়। অন্যপক্ষে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক আইন ন্যায় নীতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে, ইহা সাধারণতঃ প্রতিপালিত হয়। তাহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গ করিলে রাষ্ট্রসংঘ ও জাতিপুঞ্জের নিয়মানুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল এবং আছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন আইন-পদবাচ্য।

আইন জনমতকে অনুসরণ করিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। আইনসভায় জনপ্রতিনিধিগণ রহিয়াছেন; তাই আইনসভা কর্তৃক জনমত অনুসৃত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইনের জনমতের অগ্রবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আইনের প্রকৃতি (Nature of Laws)—বিশ্বব্যবস্থা যেমন নিয়মাধীন,

মনুষ্যসমাজও তেমনি বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম দেশ-কালাতীত, অব্যয়, অপরিবর্তনশীল। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের বিধানাবলী নিয়ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে; কারণ, মানুষের জীবন ও সমাজ সদা বিবর্তনশীল। তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে বিভিন্নকালে মানুষের জীবন বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য মনুষ্যসমাজের বিধি-বিধানও বিচিত্র এবং বহুমুখী। জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সেইগুলি নানা আকার ধারণ করিয়াছে, দেশ-কাল ভেদে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মনুষ্যসমাজ নিয়মাধীন

নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া মানুষ আপন অভীষ্ট লাভ করে। নিয়ম বা বিধি-নিষেধ তাই মানুষের জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রায় প্রতি পদে, প্রতি ক্ষেত্রে, মানুষকে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। তাহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য তাহাকে বিধিনিষেধের বশবর্তী হইতে হয়। রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে যে সকল বিধিনিষেধ বা নিয়মাবলী মানুষকে মানিয়া চলিতে হয়, তাহাকে আইন বলে।

নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়া মানবসমাজের অভীষ্ট লাভ

মানুষের জীবনের যে অংশটুকু রাষ্ট্রের পরিধির ভিতর আসিতেছে, সেইটুকু সম্বন্ধে রাষ্ট্রের যে বিধান, তাহাই আইন। রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের যে সকল বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের সহিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাই আইনের বিষয়বস্তু। মানুষের আত্মিক জীবন, ভাবনা চিন্তা, অনুভূতির সহিত আইনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহাদের বাহ্যিক প্রকাশ আইনের বিষয়ীভূত হইতে পারে। বাস্তবজীবনের বাহ্যিক প্রকাশ লইয়াই আইনের কারবার।

আইনের ক্ষেত্র

আইনকে রাষ্ট্রের একজন মানুষের সহিত অন্য সমস্ত মানুষের যোগসূত্র বা বন্ধনসূত্র হিসাবে গণ্য করা চলে। রাষ্ট্রের বাহ্যিক ঐক্য আইনের মারফতই রক্ষিত হয়। আইনের অভাবে রাষ্ট্রের শিথিল, বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ ক্ষেত্রে মানুষের জীবন-ধন বিপন্ন হয় এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নামে মাত্র পর্যবসিত হয়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে আইনই রাষ্ট্রের জীবন ও ধারক।

আইন রাষ্ট্রবন্ধনের সূত্র।

রাষ্ট্রান্তর্গত প্রতিটি মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ দেওয়াই আইনের উদ্দেশ্য। এই নির্দেশ দ্বারা মানুষের রাষ্ট্রান্তর্ভুক্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিটি মানুষকে কোন পথে চলিতে হইবে আইন সেই নির্দেশ দেয়। যদি সকলেই রাষ্ট্রনির্দিষ্ট পথে আপন আপন কর্মপদ্ধতি পরিচালনা করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা রক্ষা হয় এবং নাগরিকদের নিজ নিজ উদ্দেশ্যলাভের সুযোগ ঘটে।

আইন প্রতিটি মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের সংজ্ঞা দেয়

আইনের দ্বারা রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে সুখী করিতে পারে না। আইন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র। যে রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ সুখী হইতে পারে, আইনের মারফত সেই আবহাওয়া সৃষ্টি রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্গত। নাগরিকেরা সুখী হইবে, কি অসুখী হইবে, তাহা তাহাদেরই উপর নির্ভর করে। কারণ,—সুখ অন্তরগত (subjective) অনুভূতির উপর নির্ভর করে। যদি রাষ্ট্র আইন দ্বারা নাগরিকদের সুখলাভের অনুকূল পটভূমি সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলেও আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। ঠিক তেমনি, মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন আইনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নয়। আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের মারফত নৈতিক উন্নতির আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয় মাত্র। মানুষের সুখ বা নৈতিক উন্নতির সহিত আইনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই।

আইন নাগরিকগণের আদর্শ লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে

আইনের আপেক্ষিকতাতত্ত্ব (Theory of Relativity of Law) ইহার প্রকৃতি আর একটি দিকে আলোকপাত করে। আইন রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রান্তর্গত সমাজের সর্বাঙ্গীণ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যে সকল জড় উপাদান (ভৌগোলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি) ও বস্তুনিরপেক্ষ বা অমূর্ত উপাদান (নীতি, ধর্ম প্রভৃতি) সমাজের মধ্যে সক্রিয় হইয়া বিরাজ করিতেছে, আইনের উপর তাহাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। আইনে সমসাময়িক এই সকল উপাদানই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আইন বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রকাশ বই কিছু নহে। এই কারণে আইন বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রের চরিত্র ও আদর্শ বুঝিতে পারা যায়। রাশিয়ার আইন ঐ দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের হদিশ দেয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইন বিশ্লেষণে আমরা ঐ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের সন্ধান পাই। দুইটি দেশের আইন

আইনে মানুষের বৃহত্তর সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হয়

অর্থ মনেই বোঝা যায় যে রাশিয়া সমাজবাদী রাষ্ট্র আর যুক্তরাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। ভারতীয় আইনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ভারত এই দুই আদর্শের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আইনকে তাই সমাজ-দেহের দর্পণ বলিয়া গণ্য করা যায়।

রাষ্ট্রশক্তি আইনের পশ্চাতে প্রয়োজন-বোধে সক্রিয় হয়

আইনের জন্য একটি দিকও লক্ষণীয়। গণতান্ত্রিক দেশে আইনের পশ্চাতে জনসমর্থন থাকে; স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে তাহা থাকে না। কিন্তু আইন কার্যকরী করিতে হইলে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। আইনভঙ্গ হইলে রাষ্ট্রের শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠে ও আইনের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। সুতরাং শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তি আইনকে রক্ষা করে।

আইনের সংজ্ঞা: আইন সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্যই এই মতভেদ ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে যে সকল সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইরূপ:

আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

(১) আইন সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারীর আদেশ: (২) আইন ইতিহাসের ফল; ইতিহাস হইতেই উদ্ভূত। (৩) আইন সমাজ-বিবর্তনের ফল; সমাজদেহ হইতে উদ্ভূত। (৪) আইন সর্বোচ্চ নীতির প্রকাশ; (৫) আইন শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ।

উডরো উইলসনের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্যমূলক সংজ্ঞা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উড্রো উইল্‌সন্ আইনের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে মোটামুটিভাবে উপরোক্ত বিভিন্ন মতগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন যে, সমাজে যে সকল ক্রিয়া-কলাপ বা চিন্তাধারা স্থির নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রচলিত রীতি অনুসারে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি ও রাষ্ট্র-শক্তির সমর্থন লাভ করিয়াছে, তাহাকে আইন বলে। "Law is that portion of established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government." উড্রো উইলসন এই সংজ্ঞায় সার্বভৌমত্ব, ইতিহাস, সমাজদেহ, সামাজিক চিন্তাধারা, রীতিনীতি, কার্যাবলী ও জনমতের স্থান করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই সংজ্ঞাটি একটি গ্রহণযোগ্য

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। কিন্তু আইন সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা করিতে হইলে বিভিন্ন তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের (Schools) মতবাদ পরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক।

আইন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায় (Schools of Thought):

(১) বিশ্লেষণমূলক মতবাদ (Analytical School of Law)

বিশ্লেষণী মতবাদ

এই শ্রেণীর মতবাদীগণ বলিতেছেন, আইনকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শেষ পর্যায়ে ইহা সার্বভৌমত্বের অধিকারীর আজ্ঞা বই কিছুই নহে। সার্বভৌম বা sovereign আইন গঠিত করেন এবং আইনের পশ্চাতে যে শক্তি প্রয়োজন তাহা সরবরাহ করেন। আইনের আইনত্ব সার্বভৌম হইতেই উৎপন্ন ও উদ্ভূত হয়। সার্বভৌমই আইনের প্রত্যক্ষ উৎস, ধারক ও বাহক। মেকিয়াভেলি, হব্‌স্‌, অষ্টিন এবং আধুনিক কালের ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ হল্যাণ্ড প্রভৃতি এই মতাবলম্বী।

এই মতবাদের দুর্বলতা

সমালোচনা: এই মতবাদের সমালোচকরা তীব্রভাবে আইনের বিশ্লেষণ মূলক চিন্তাধারাকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই মতটি ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তন প্রভৃতি আইনের যে সকল উৎস রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া সার্বভৌমের হুকুম বলিয়াই আইনকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিহাস ও সামাজিক রীতি-নীতি যে আইনকে প্রভাবিত করে, এই মতবাদের মধ্যে তাহার স্বীকৃতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আরও বলা হইয়াছে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে আইন প্রধানত: ধনিক শ্রেণীরই স্বার্থবাহী। আইনের এই চরিত্রটিও বিশ্লেষণমূলক মতবাদে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া আইনের মধ্যে যে আদর্শের প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে, আইনের ভিতর দিয়া যে সমাজকে উচ্চতম নীতিবোধের দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে, সেই আদর্শবাদিতারও কোন ইঙ্গিত মেলে না। সর্বশেষে বলা হইয়াছে যে এই মতবাদ শক্তির উপর অযথা জোর দিতেছে। আইনের কার্যকারিতা জনসাধারণের সম্মতির উপর নির্ভরশীল, শক্তির উপর নহে। সুতরাং এই মতবাদটি গ্রহণযোগ্য নহে।

সমালোচনার উত্তর

এই সমালোচনার মধ্যে সত্য নিহিত রহিয়াছে। তথাপি এই মতবাদের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। ব্যবহারিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আইনভঙ্গ হইলে রাষ্ট্র-শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য। তাহা ছাড়া সার্বভৌমের এই শক্তি আইনের পশ্চাতে

আছে বলিয়াই আইনের মর্যাদা দেশে দেশে স্থাপিত হইয়াছে। এবং জনসাধারণকে আইনভঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিতেছে। ইতিহাস, সমাজ, শ্রেণীস্বার্থ জনসমর্থন, আদর্শ প্রভৃতি আইনের পটভূমি হিসাবে মানিয়া লইয়াও আইনের বিশ্লেষণী ব্যাখ্যার আবশ্যকতা আছে। কারণ, ইতিহাস প্রভৃতি আইনের উৎস হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাকে সার্বভৌমের আদেশ ও শক্তির প্রকাশ বলিয়া স্বীকার না করিলে অরাজকতার শৃঙ্খলাহীনতার দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে।

(২) আইনের ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical School of Law)

এই শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ব্যবহারশাস্ত্রীদের মতে কোন রাষ্ট্রের আইন সেই রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সুতরাং ইতিহাসের বিরাট ও সর্বাঙ্গীণ পরিপ্রেক্ষিতে আইনকে বুঝিতে হইবে। জার্মান মনীষী স্যাভিগনী আইনের এই ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্রিটেনে হেনরী মেইন, মেইটল্যাণ্ড, পলক্ প্রভৃতি এই মতের সমর্থন করেন।

ঐতিহাসিক মতবাদ

সমালোচনা : বিশ্লেষণবাদী ব্যবহারশাস্ত্রীগণ ঐতিহাসিক মতবাদের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইতিহাসের সহিত আইনের সম্বন্ধ স্বীকার করার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না সত্য; ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে আইনের উৎস তাহাও ঠিক; কিন্তু আইনের পশ্চাতে যে সার্বভৌম শক্তি সক্রিয় রহিয়াছে, যাহার ফলে আইনানুবর্তিতা সত্য হইয়া উঠে তাহার কোন ইঙ্গিত এই মতবাদের মধ্যে নাই। এইজন্য এই নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না; সমাজতান্ত্রিকেরা বলিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক মতবাদ সংকীর্ণ। সমাজ-মন, সমাজের আদর্শ ও স্বার্থ প্রভৃতির স্বীকৃতি ঐতিহাসিক মতবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। শ্রেণীস্বার্থবাদীগণ এবং আদর্শবাদীগণ যথাক্রমে বলিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক মতবাদীরা শ্রেণীস্বার্থ ও আদর্শকে উপযুক্ত মর্যাদা দেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই মতও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। তবে এই মতের মধ্যেও গ্রহণযোগ্য উপাদান রহিয়াছে।

ইহার দুর্বলতা

(৩) আইনের সমাজ-বিজ্ঞানী মতবাদঃ (Sociological School of Law)

এই মতবাদটি সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) এবং সমাজ বিবর্তনের দিক হইতে আইনের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করিতেছে। এই মতবাদীরা বলেন যে, সমাজ-মন বলিয়া একটি পদার্থ রহিয়াছে। আইন এই সমাজ-মনের প্রতিফলন। দ্বিতীয়তঃ সমাজবির্তনের ফলে সমাজের কতকগুলি স্বার্থ রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃতি লাভের জন্য সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজ-মন তাহা ন্যায্য বলিয়া গ্রহণ করে। সেইজন্য তাহার স্বীকৃতি অনিবার্য হইয়া পড়ে। সার্বভৌম রাষ্ট্র কেবলমাত্র তাহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মানিয়া লয়। এমনি করিয়া আইনের সৃষ্টি হয়। আইন সমাজ-মনের ন্যায়বিচারের প্রকাশ। সমাজতাত্ত্বিক মতবাদীগণ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন যে ঐ ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। দুগুই (Duguit) ক্রাব্ (Crabbe), প্রভৃতি লেখকেরা আইনের সমাজবিজ্ঞানী মতবাদের পোষকতা করেন।

সমাজবিজ্ঞানী মতবাদ

ইহার দুর্বলতা

সমালোচনা: এই মতবাদের সমর্থকেরা সমাজ-মন বলিয়া একটি বস্তু কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। ইহা ঘোর বিতর্কমূলক। সমাজ-মন বলিয়া কোন পদার্থ কল্পনায় মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু তাহার উপর ভিত্তি করিয়া মতবাদ গড়িয়া তোলা অবৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয়তঃ বিশ্লেষণমূলক মতবাদের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রায় পুরাপুরিভাবে উড়াইয়া দিতেছেন। এইরূপ করাও ভ্রমাত্মক। কারণ, পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আইন বলিতে আমরা নেহাৎ বাস্তব জগতের নিয়মাবলীই বুঝি। এই নিয়মাবলীর পশ্চাতে সার্বভৌমের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লওয়া অযৌক্তিক নয়। *

(৪) আইনের দার্শনিক ব্যাখ্যা: (Philosophical Theory of Law

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে দার্শনিক ব্যাখ্যা বিভিন্নরূপে দেখা দিয়াছে। দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যবশত: আইন সম্বন্ধে নানা প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সকল দার্শনিক মতবাদিগণই আইনকে আদর্শের প্রকাশ হিসাবে বিবেচনা

আইন সামাজিক প্রজ্ঞার প্রকাশ

*এই বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক মতবাদের সপক্ষে যুক্তিগুলি পুনরায় দ্রষ্টব্য।

করিতেছেন। আইনের স্বরূপ বস্তুনিরপেক্ষ (abstract); আইন ভাব বা আদর্শের প্রকাশ।

(ক) অ্যারিস্টটল্ আইনকে সামাজিক প্রজ্ঞার (Reason) প্রকাশরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দার্শনিকভাবে বিবেচনা করিলে এই সামাজিক প্রজ্ঞা সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের (highest good) সহিত যুক্ত। আইন সমাজকল্যাণ ইচ্ছার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

প্রাকৃতিক বিধানবাদ

(খ) খ্রীঃপূঃ তৃতীয় শতকে গ্রীক স্টোইক সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা প্রাকৃতিক বিধানবাদ (Theory of Law of Nature) প্রবর্তন করেন। তাহারা বলেন যে, বিশ্ববিধানের মধ্যে কতকগুলি সত্য ও ন্যায়-নীতি নিহিত আছে। এইগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনের বাস্তব সত্তারূপে অবস্থিত। ইহারা অক্ষয়, অব্যয় ও অমোঘ। এই সত্য ন্যায়-নীতিগুলিকে প্রাকৃতিক বিধান বলা হইয়াছে। গ্রীক্ স্টোইকেরা আরও বলেন যে, এই প্রাকৃতিক বিধানই আদর্শ ন্যায়-নীতি। এই ন্যায়-ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও বস্তুনিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনাশক্তির প্রয়োগে বুঝিতে পারা যায়।

রোমক স্টোইকগণ, মধ্যযুগীয় লেখকেরা ও ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকবৃন্দ প্রাকৃতিক বিধানবাদ স্বীকার করিয়া লন। তাঁহারা বলেন যে, মানুষ আপন প্রজ্ঞাশীল বিচারক্ষমতা দ্বারা প্রাকৃতিক বিধান উপলব্ধি করিতে পারে। এই প্রাকৃতিক বিধানের মানদণ্ড প্রয়োগে তাহারা বাস্তব আইনের ন্যায্যতা বিচার করেন। যে বাস্তব আইন যত বেশী প্রাকৃতিক বিধানানুগ, তাহা ততই গ্রহণযোগ্য।

আইন সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশরূপ

(গ) অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো আইনকে রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে সত্য দৃষ্টিতে আইন বস্তুগ্রাহ্য নয়। রাষ্ট্রের সম্মিলিত শুভবুদ্ধিপ্রসূত নিয়ম-কানুনই আইন।

গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক হইতে এই মতবাদ গ্রহণ করায় কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু কেবল আদর্শগতভাবেই ইহার মূল্য আছে। বাস্তবতার ক্ষেত্রে ইহা গ্রহণ করা সুকঠিন। কারণ, রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছা অনেকটা কল্পনা প্রসূত। দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই আইনের প্রণেতা; তাহারা

অনেক সময় আপন স্বার্থদ্বারাই পরিচালিত হয় সুতরাং সাধারণ ইচ্ছা বাস্তব-ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তথাপি এই মতবাদ যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহার মূল্য অসামান্য। রাষ্ট্রের জনসাধারণের সম্মিলিত শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত ইচ্ছা বাস্তব আইনের মধ্যে যত পরিমাণে প্রকাশমান হইবে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ততই আদর্শানুগ হইয়া উঠিবে। গণতন্ত্রের পক্ষে এই আদর্শ অপেক্ষা অন্য গ্রহণযোগ্য নীতি আজও কোন দার্শনিক গঠিত করিতে পারেন নাই।

হেগেলের মত

(ঘ) উনিশ শতকে দার্শনিক হেগেল বলিলেন যে, সত্যদৃষ্টিতে রাষ্ট্রের আইন সমাজের স্বচ্ছ প্রজ্ঞা ও সর্বোচ্চ নীতির প্রতীক।*

দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা: আইনের দার্শনিক ব্যাখ্যা অনেকাংশে কল্পনাভিত্তিক। ইহার সহিত বাস্তবতার সম্পর্ক ঘণিষ্ঠ নহে এইজন্য এই মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা আইনের আদর্শের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং মনে করাইয়া দিতেছে যে, বাস্তব আইনই আইন সম্পর্কে শেষ কথা নয়। আইন প্রণেতাগণকে সর্বদা আদর্শের কথা চিন্তা করিতে হইবে এবং আদর্শের আলোকে যথাসম্ভব আইনের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। এই কারণে আদর্শবাদী ব্যাখ্যা মূল্যহীন নহে।

দার্শনিক মতবাদ বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন

দার্শনিক মতবাদের মূল্য

আইনের মার্কস্‌বাদী ব্যাখ্যা: মার্কসের মতে আইন ধনিক বা অধিকারী শ্রেণীর স্বার্থবাহী নিয়মকানুন। ধনোৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বিভিন্নযুগে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। প্রতি অর্থনৈতিক যুগে একটি বিশেষ শ্রেণী ধনোৎপাদনের উৎসগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পশুপালনের যুগে বৃহৎ পশুপালনের মালিক, কৃষি বা সামন্তযুগে জমিদার এবং শিল্পযুগে শিল্পপতিগণ অর্থবলে সমাজে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছেন। আপন আপন স্বার্থরক্ষাকল্পে তাহারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং পুলিশ, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে, সেই ক্ষমতা প্রয়োগে নিজ নিজ স্বার্থের অনুকূল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্থাৎ আইন শ্রেণীস্বার্থের দ্যোতক। বলাবাহুল্য ইতিহাসেরও সমাজ বিবর্তনের সাধারণ ধারা লক্ষ্য করিয়া মার্কস্ এই নীতি

* রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিষয়ক ভাববাদী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

গঠিত করেন। এই নীতির মৌলিক সত্য আজকাল ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক লাস্‌কি এই মত গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন: "The state ......expresses the wants of those who dominate the economic system. The legal order is a mask behind which a dominant economic interest secures the benefit of political authority"*. ইহার মূল কথা হইতেছে যে, যাহারা অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্ষমতাশালী শ্রেণী, তাহাদেরই স্বার্থ রাষ্ট্রের আইনের মধ্য দিয়া রক্ষা করা হইয়া থাকে। আইন মূলতঃ শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ।

সমালোচনা: মার্কস্‌ আইনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। সমালোচকেরা বলিয়াছেন যে, আইনকে শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিলে আইনের সত্য পরিচয় দেওয়া হয় না। আইনের এই সংজ্ঞার মধ্যে ভ্রান্তি রহিয়াছে। প্রথমতঃ, মার্কসের মতে সমাজ কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীশ্রেণী দ্বারা গঠিত। সমাজের এই বিশ্লেষণ স্বীকার করা যায় না। কারণ সমাজ একতাবদ্ধ জনসমষ্টি দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন স্বার্থ সমাজে বর্তমান রহিয়াছে সত্য কিন্তু এই সকল বিভিন্নতা অতিক্রম করিয়া, সমাজ শেষ পর্যায়ে, একটি সুমহান একতায় উপনীত হইয়া থাকে। আইন এই একতাবদ্ধ সমাজদেহ হইতে উদ্ভূত। সমাজ-বিজ্ঞানী ও ভাববাদীগণ এই সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাহারা আরও বলেন যে, মার্কস্‌ অর্থনৈতিক স্বার্থের আলোকে আইনকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাও ভ্রমাত্মক। কারণ সমাজে কেবলমাত্র শ্রেণীস্বার্থকে তিনি মানিয়া লইয়াছেন। নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি আদর্শ বর্তমান। এই সকল আদর্শ আইনকে প্রভাবিত করে। মার্কস্‌ সেই সকলই অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র শ্রেণীস্বার্থকে মানিয় লইয়াছেন। সুতরাং মার্কসের আইন সম্বন্ধীয় ধারণা গ্রহণযোগ্য নহে।

মার্কসবাদিগণ এই সমালোচনার উত্তরে বলেন যে সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে শ্রেণী স্বার্থ স্পষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা আরও বলেন যে নীতি, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক আদর্শ স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল আদর্শ অর্থনৈতিক শ্রেণী-স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হয়। সুতরাং আইনকে শ্রেণীস্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ বলিয়া গণ্য করা সমীচীন।

*Introduction to Politics—P. 21

আইনের উৎস (Sources of Law)

আইনের পশ্চাতে যে শক্তি ও মঞ্জুরী (Sanction) আবশ্যক তাহা রাষ্ট্রান্তর্গত সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারী দিয়া থাকেন। আইনকে সার্ব-ভৌমের আদেশ হিসাবে গণ্য করা যায় কিন্তু আইন বিশ্লেষণ করিলে যে-সকল উপাদান পাওয়া যায়, তাহার উৎস সার্ব-ভৌমকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সমাজদেহে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সকল উৎসের সন্ধানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মানবসমাজ বিবর্তনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এইজন্য সার্বভৌমকে অনেকে আনুষ্ঠানিক (formal) উৎস বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে প্রকৃত (real) উৎস রহিয়াছে। তাহার আলোচনা আইনের প্রকৃতি, উপলব্ধি করিবার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়।

আনুষ্ঠানিক (formal) উৎস এবং প্রকৃত (real) উৎস

প্রথা (Custom) : প্রাচীনযুগে প্রথাই তৎকালীন বিধিনিষেধের প্রধান উৎস ছিল। ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে প্রথার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল (সমাজ ও রাষ্ট্র প্রথার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। আধুনিককালে প্রথার সেই প্রতিপত্তি নাই বটে, কিন্তু প্রায় সকল দেশের আইন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহা অনেকাংশে প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান আইন, ব্রিটেনের প্রথাগত আইন (Common Law) এই সত্য প্রতিপন্ন করিতেছে। অত্যাধুনিক কালেও যে নূতন প্রথা আইনের পর্যায়ে উন্নীত হইতেছে না এমন নহে। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল প্রথা প্রচলিত, তাহার অনেকগুলি আইনে স্থান পাইয়াছে।

প্রাচীন আইনে প্রথারপ্রভাব প্রবল ছিল

প্রথা সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিদ্বারা দীর্ঘকাল পালিত আচার-ব্যবহার। প্রাথমিক, স্তরে আচার কোন বিশিষ্ট পরিবারে বা গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। পরে তাহা বিস্তার লাভ করে। এই আচার ব্যবহারগুলি তিনটি কারণে ক্রমশঃ সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠে। প্রথমতঃ যে আচার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা যুসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আচার সমসাময়িক সামাজিক ধর্ম ও নীতির (morality) সহিত সুসমঞ্জস্ হওয়া আবশ্যক। তৃতীয়তঃ সমাজের অনেক মানুষের দ্বারা আচারটি অনুসৃত হওয়া দরকার। এই তিনটি গুণ যে আচারে

মিলিত হয় সেইগুলি আইনের মর্যাদা লাভ করিলে শাস্তির ভয়ে তাহা সকলেই পালন করিতে থাকে।

ধর্ম (Religion): প্রথার ন্যায় ধর্মও প্রাচীনকালে আইনের একটি প্রধান উৎস ছিল। আদিম ও প্রাচীন সমাজের বিবর্তনে ধর্ম সংস্কার একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। আদিম ও প্রাচীন বিধিনিষেধ ধর্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আদিমযুগে সর্বপ্রথম যে সকল সমাজিক নিয়ম আবির্ভূত হইয়াছিল তাই অধিকাংশই নেতিবাচব (Negative Commands) বা নঙর্থক। ইহা করিও না, তাহা হইলে অমুক দেবতা অসন্তুষ্ট হইবেন এবং সমাজের দারুণ ক্ষতি করিবেন'—এইরূপ ছিল নিয়মের প্রকৃত। অর্থাৎ ধর্ম নিয়মের উৎসরূপে দেখা দেয়। হিন্দু ও মুসলমান আইন ধর্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। মিশরের আইনের উপর ধর্মের প্রভাব প্রবল ছিল। ইউরোপের প্রতি দেশের আইন যে খ্রীষ্টানধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। প্রাচীন ইহুদিদের রাষ্ট্র ছিল ধর্মরাষ্ট্র। সেখানে ধর্মব্যবস্থা ও আইন ব্যবস্থায় বিশেষ তফাৎ ছিল না।

প্রাচীনকালে আইনের উপর ধর্মের প্রভাবও ছিল বেশি

(৩) বিচার মীমাংসা Judicial Decisions): সর্বোচ্চ আদালতের বিচার মীমাংসা বা রায় অনেক সময়ে আইনের উৎস হিসাবে কাজ করিয়াছে। মোকদ্দমার বিচারকালে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য প্রচলিত আইনের যে ব্যাখ্যা করেন তাহাতে মাঝে মাঝে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায় এবং সংশ্লিষ্ট আইনটি বিচারপতির বিচার-মীমাংসার মাধ্যমে পুষ্টিলাভ করে; অর্থাৎ মূল আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নূতন নীতির উদ্ভব হয়। এইরূপ বিচার-মীমাংসাকে আইনের উৎস হিসাবে গণ্য করা যায়।

আইনের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া বিচারালয় কর্তৃক আইনের প্রসার

বিচার মীমাংসার দ্বারা আইনের নিঃশব্দ পরিবর্ধন দুই কারণে আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ, প্রায়শঃ দেখা যায় যে আইন সমাজের জীবনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া বদলায় না। এইরূপ অবস্থায় বিচারপতিগণ মূল আইনের সহিত সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দ্বারা আইনের একটু মোড় ফিরাইয়া দেন। ইহাতে আইন সমৃদ্ধ হইয়া জীবন-ধর্মী হয়। দ্বিতীয়তঃ, সর্বাবস্থা কল্পনা করিয়া লিখিত আইন ভবিষ্যতে সকল মোকদ্দমার ঘটনাবলী সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারে না।

তাহা করা মানুষের অসাধ্য। মোকদ্দমার বাদী-বিবাদীগণ অনেক সময় নূতন ঘটনা ও পরিস্থিতি আদালতের সম্মুখে আনয়ন করে, যাহা লিখিত আইনের কথার উপর নির্ভর করিয়া বিচার করা যায় না। তখন সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ আইনের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন ন্যায্য ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া নূতন নীতির প্রবর্তন করেন। এইরূপে বিচার-মীমাংসা আইনের উৎস হিসাবে কাজ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল, ব্রিটেনের জেসেল প্রভৃতি আপন আপন রায়ের মাধ্যমে আইন সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৪) **বৈজ্ঞানিক আলোচনা** (Scientific Discussion): ব্যবহার শাস্ত্র-বিদ্‌গণ (Jurists) পুস্তক বা প্রবন্ধের ভিতরে আইনের এমন সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেন যে বিচারালয় সেই সকল ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া বিচার মীমাংসা করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহার-শাস্ত্রীগণ (Imperial Jurists) যে মতামত প্রকাশ করিতেন বিচারালয় তাহাই গ্রহণ করিতেন। এই সূত্রে গায়েস (Gaius) বা আল-পিয়ানের (ULPIAN) নাম করা যাইতে পারে। ব্রিটেনের কোক্ ও ব্ল্যাক্‌স্টোন্, যুক্তরাষ্ট্রের স্টোরী, কেণ্ট প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রীগণ আইনের বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্য দিয়া আইনকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের দেশে রাসবিহারী ঘোষের মর্গেজ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীধন সম্পর্কীয় পুস্তক বিচার-মীমাংসার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারতের আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে।

আইনে বৈজ্ঞানিক ভাষ্যদ্বারা পরিবর্ধিত হইয়াছে

(৫) **ন্যায়নীতি** (Equity): রাষ্ট্রের সমসাময়িক আইনের ঊর্ধ্বে কতকগুলি নীতি আছে যাহা শুধু প্রজ্ঞা ও যুক্তিসঙ্গত নয়, তাহা শাশ্বত। এই নীতির প্রয়োগে বিচারপতিগণ অনেক সময় সত্য ও ন্যায় বিচার করিয়া থাকেন। প্রচলিত আইনানুযায়ী এই বিচার কিন্তু সম্ভব হয় না। প্রাচীন রোমে রোমক আইনের যখন সংশোধন বা পরিবর্তনের অভাবে সেই আইন মানুষের জীবন ধারার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিল না, তখন চিরাচরিত রোমক আইন অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম বা Natural Law-এর অনুপ্রেরণায় রোমক প্রেটারগণ (বিচারপতি) ঘোষণা করিলেন যে তাহারা Natural Law-এর অক্ষয় অব্যয় নীতিগুলি প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করিবেন। এইরূপে সর্ব প্রথম রোমে শাশ্বত

শাশ্বত ন্যায় নীতির বিচারালয়ের মাধ্যমে আইনের উপর প্রভাব

নীতির প্রবর্তন হইল। ব্রিটেনে লর্ড চ্যান্সেলার এই শাশ্বত নীতি (Equity) প্রয়োগ করিয়া ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পূর্বে বিচার মীমাংসাকে আইনের অন্যতম উৎস হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার সহিত ন্যায়নীতি (Equity) অনুযায়ী বিচারের প্রভেদ আছে। বিচার মীমাংসার ক্ষেত্রে বিচারকগণ প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা (interpretation) করিয়া উহার সহিত সুসঙ্গত নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন। কিন্তু যখন প্রচলিত আইন বিচার কোন বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব, যখন দেখা যায় যে প্রচলিত আইন অনুসারে ন্যায় বিচার সম্ভব নয় তখন ন্যায়নীতি (Equity) কার্যকরী হয়। কিন্তু ন্যায়নীতি ও বিচারপতি কৃত আইন (Judge made Law); এই দুই-এর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

(৬) **আইন প্রণয়ন** (Legislation): আধুনিক কালে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত আইনসভাই আইনের সর্বপ্রধান উৎস।

বর্তমানে বিধান-মণ্ডলী আইনের প্রধান উৎস

উপসংহার: উডরো উইলসন আইনের বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উৎসগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য। তিনি বলিতেছেন যে প্রথা আইনের সর্বাপেক্ষা পুরাতন উৎস, ধর্মও একই সময়ে প্রথার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া আইন সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রাথমিক স্তরে প্রথা ও ধর্মের মধ্যে খুব একটা তফাৎও ছিল না। যখন সমাজবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেখা দিল তখন বিচার নিষ্পত্তির উদ্ভব হইল। ইহারই সহিত এবং একই সময়ে ন্যায়নীতির সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতেই (যথা রোমে) এইরূপ ঘটিতে দেখা যায়। যখন রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির ধরণ অনেকটা উন্নতিলাভ করিয়াছে তখনই আইন প্রণয়ন ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনা আইনের উৎস হিসাবে কার্যকরী হইতে থাকে।

আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Law)

বিষয়বস্তু ও প্রকৃতিভেদে আইনের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু আইনের শ্রেণীবিভাগ লইয়া মতবিরোধ আছে। হল্যাণ্ড তাহার Jurisprudence বা ব্যবহারশাস্ত্রগ্রন্থে বলিতেছেন যে আইনের যে অংশটিকে সরকারী

আইন (Public Law) আখ্যা দেওয়া যায়, তাহার শ্রেণীবিভাগ পাকাপাকিভাবে এখনও সাধারণ স্বীকৃতিলাভ করে নাই।*

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাক্‌আইভার নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন।

ম্যাক্‌আইভারের শ্রেণী বিভাগের সমালোচনা
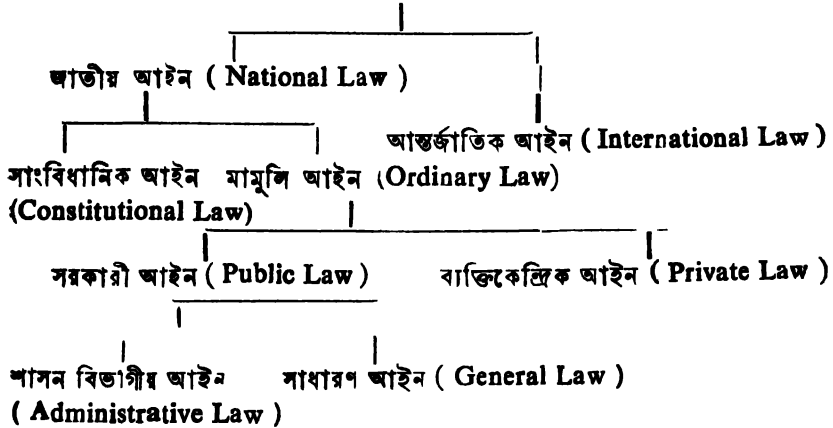
ম্যাক্‌আইভারের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমতঃ তিনি সাংবিধানিক বা [Constitutional] আইনকে সরকারী আইন [Public Law] বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু ইহা মানিয়া লওয়া যায় না। সাংবিধানিক আইন রাষ্ট্রগঠন পদ্ধতি বিষয়ক আইন। ইহা সর্বসাধারণের রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করে এবং বিশেষতঃ সরকারের শাসন ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়। Public Person বা রাষ্ট্রসত্তার সহিত ইহার যোগ ঘনিষ্ঠ। তাই সাংবিধানিক আইন বা Constitutional Law-কে সরকারী আইনের পর্যায়ভুক্ত করা উচিত। ম্যাক্‌আইভার তাহা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ শাসন-বিভাগীয় আইন [Administrative Law] যদি সরকারী আইন বলিয়া পরিগণিত হয় তবে সাংবিধানিক [Constitutional] আইন কেন হইবে না ম্যাক্‌আইভারের আলোচনায় তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, সাংবিধানিক আইন এবং শাসন বিভাগীয় আইনের মধ্যে যথেষ্ট নৈকট্য রহিয়াছে। এইজন্য এই দুই শ্রেণীর আইনকেই সরকারী আইনের পর্যায়ে ফেলা উচিত। তৃতীয়তঃ Ordinary Law বা মামুলি আইন এবং General Law বা সাধারণ আইন বলিয়া যে দুটি শ্রেণী ম্যাক্‌আইভার সৃষ্টি করিতেছেন, তাহারও কারণ অস্পষ্ট। চতুর্থতঃ ম্যাক্‌-আইভার আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেণীবিভাগের নির্দেশ দেন নাই।

*হল্যান্ড—Jurisprudence [Tenth Edition] P. 58

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া এবং আইনের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতিভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

রাজনৈতিক আইন (Political Law)

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জীবন ও বহিঃরাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ নিয়ামক আইন-কানুনকে রাজনৈতিক আইন বলে।

রাজনৈতিক আইন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক হইতে পারে। জাতীয় আইনকে আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ Municipal Law আখ্যা দিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহার সহিত পৌর শাসনের কোন সম্পর্ক নাই। এখানে Municipal কথাটি রাষ্ট্রিক বা জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় আইন (State, National or Municipal Law) : জাতীয় আইন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জীবনের নিয়ামক। বলাবাহুল্য রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষেরা শুধু বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক হল্যাণ্ড এই জন্য এই আইনের সংজ্ঞা দিয়াছেন: "general rule of external human action enforced by a sovereign political authority" অর্থাৎ মানুষের বাহ্যিক ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণমূলক যে সাধারণ নিয়ম সার্বভৌম কর্তৃক প্রণীত হয় তাহাকেই জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় আইন বলে।

সরকারী আইন (Public Law) : জাতীয় আইনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—সরকারী আইন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক আইন।

রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের কোন অংশ যে আইনের বিষয়বস্তু বা রাষ্ট্র যে আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাহাকে সরকারী আইন বলা হইয়া থাকে।* সরকারী আইন তিন প্রকারের হইতে পারে: যথা, সাংবিধানিক আইন, শাসনবিভাগীয় আইন ও ফৌজদারি আইন।

সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law): রাষ্ট্রের মৌলিক গঠন ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে সর্বপ্রকারের আইনকে সাংবিধানিক আইন বলা যায়। সাংবিধানিক আইন রাষ্ট্রের বিধানমণ্ডলী, সরকার ও বিচার বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্র ও সরকারের সহিত নাগরিকদের সম্বন্ধ নির্ণয়ও সাংবিধানিক আইনের অংশীভূত। এই সূত্রেই নাগরিকদের অধিকার বিধিবদ্ধ হয়, যাহা মৌলিক অধিকার Fundamental Rights) নামে পরিচিত। অনেক সময় সাংবিধানিক আইনকে ইংরেজীতে Fundamental Law (মৌলিক আইন) বা Constituent Law (গঠন-পদ্ধতিমূলক আইন) বলা হইয়া থাকে।

সকল দেশেই সংবিধান সম্বন্ধীয় আইনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ সাংবিধানিক আইন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে। এই ভিত্তি দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে বারংবার সংশোধন বা পরিবর্তন করিলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়। এইজন্য অনেক দেশে সাংবিধানিক আইন সংশোধন বা পরিবর্তনের পদ্ধতি কঠিন করিয়া রাখা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত ইউনিয়ন এই শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু যে সকল দেশের আইন প্রণয়নের সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে সাংবিধানিক আইনও পরিবর্তিত করিতে পারা যায় (যেমন ব্রিটেন) সেখানেও যে সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা সাধারণ আইন অপেক্ষা বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তাহা স্বীকার করা হয় না।

শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative Law): এক এক প্রকার সরকারী কার্য পরিচালনা করিবার জন্য রাষ্ট্রের মধ্যে এক এক রকমের বিভাগ সৃষ্টি করিতে হয়। যেমন পুলিশ বিভাগ, আয়কর বিভাগ, অর্থ বিভাগ। এই সকল বিভাগের কর্তব্যাদি সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য খুঁটিনাটি আইন প্রয়োজন। এই

*"In private Law the parties concerned are Private individuals, alone and between them stand the State as an impartial arbiter. In Public Law also the State is present as arbiter, although it is at the same time one of the parties interested." HOLLAND—Jurisprudence.

আইন বা নিয়মাবলীকে শাসন বিভাগীয় আইন বলে। শাসনব্যবস্থায় এই আইনগুলির আবশ্যকতা সর্বজনস্বীকার্য। এই আইন সরকারী আইনের অন্তর্ভুক্ত।

শাসন বিভাগীয় আইন কথাটি অন্য আর একটি অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফ্রান্সে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইনভঙ্গের দরুণ বিচারের জন্য যে আইন প্রযুক্ত হয় তাহাকেও Administrative Law বা শাসন বিভাগীয় আইন বলে। এই আইন প্রয়োগ করিবার জন্য যে আদালত রহিয়াছে তাহাকে Administrative Tribunal বা শাসন বিভাগীয় আদালত আখ্যা দেওয়া হয়। এই আইন ও আদালত অপরাধী সরকারী কর্মচারীগণের বিচারের জন্য পৃথকীকৃত; বেসরকারী সাধারণ নাগরিকেরা এই আদালত বা আইনের আওতায় আসেন না।

ফৌজদারী আইন (Criminal Law): ফৌজদারী আইন সরকারী আইনের অন্তর্ভুক্ত কারণ আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য। ফৌজদারি আইনের দ্বারা অপরাধের সংজ্ঞা ও বিচারপদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া হয়।

ব্যক্তিকেন্দ্রীক আইন (Private Law): এই আইন ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তি সমষ্টির অধিকার ও কর্তব্যের নির্দেশ দান করে। এই আইনানুযায়ী কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পক্ষভুক্ত হয় না। এই কারণে ইহাকে ব্যক্তি-কেন্দ্রীক আইন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law): এক জাতি বা রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্র বা জাতির ব্যবহার সম্পর্কীয় নিয়ম-কানুনকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। প্রচীনকাল হইতেই দেখা যাইতেছে যে কোন জাতি বা রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি বিনিময়, যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তিকালীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দূত বিনিময় প্রভৃতির মধ্য দিয়া নানা ধরণের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। বর্তমান যুগে যান-বাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হেতু জাতিগুলি আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই রামসে ম্যুর বলিয়াছেন যে বর্তমান পৃথিবীকে Interdependent World বলা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা আজ নানাভাবে নানাদিকে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু রাষ্ট্রের ইতিহাসে ইহা বরাবরই অল্পবিস্তর বাস্তব রূপে দেখা গিয়াছে।

সংজ্ঞা ও স্বরূপ

বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক ব্যবহারিক প্রথা, আন্তর্জাতিক বৈঠক, শাশ্বত ন্যায়নীতির আদর্শ, আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচার মীমাংসা, আন্তর্জাতিক আইনের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এই আইনের উৎস হিসাবে কার্যকরী হইয়াছে। আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক আইন বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। বর্তমান জগতের রাষ্ট্রগুলি যাহাতে যুদ্ধকালে এবং শান্তির সময় মানবতা ও সভ্যতা সম্মত উপায়ে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারে, তাহার জন্য তিন প্রকারের আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে, যথা শান্তিকালীন আইন, যুদ্ধের আইন ও নিরপেক্ষতা আইন। শান্তির সময় দূত বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান, কূটনৈতিক পরামর্শাদি সংক্রান্ত আইন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যুদ্ধের সময়ও প্রাচীনকাল হইতে যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়াছে। আধুনিককালে এই নিয়মগুলি বিস্তৃততর হইয়াছে। শত্রুরাষ্ট্রে নিরস্ত্র শহরগুলিতে বোমা নিক্ষেপ যুদ্ধবন্দীগণকে অযথা কষ্ট দেওয়া, বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। নিরপেক্ষতা আইন অনুসারে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যুধ্যমান জাতিগুলি সম্পর্কে সর্বতো-ভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে, এই নিয়ম করা হইয়াছে। আবার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে যুধ্যমান রাষ্ট্রের সহিত সীমিত ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষার অধিকার দেওয়া আছে।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস ও বিভাগ

আন্তর্জাতিক আইনকে কি আইন বলা যায়? :—যে সকল রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও ব্যবহার শাস্ত্রবিদ্‌গণ আইনের বিশ্লেষণ মূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, (যথা হব্‌স্‌, অস্টিন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি) তাঁহারা আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাদের মতে আইন সার্বভৌমের আদেশ। আন্তর্জাতিক আইন কোন নির্দিষ্ট সার্বভৌমের দ্বারা সৃষ্ট ও ব্যবহারিকভাবে প্রযুক্ত নয়। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন সার্বভৌম নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের পর্যায়ে ফেলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বলেন যে রাষ্ট্র-আইন ভঙ্গ হইলে তাহার আইনানুযায়ী প্রতিকার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার পশ্চাতে সার্বভৌম শক্তি সক্রিয় থাকে। আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ হইলে আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্রের কোন শাস্তি বিধান হইতে পারে না। কারণ এই আইনের পশ্চাতে আন্তর্জাতিক সার্বভৌম নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা দেওয়া ঠিক নহে। তৃতীয়তঃ আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষতঃ যুদ্ধসংক্রান্ত আইন প্রায়শঃই

আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় আইন

আইনের বিশ্লেষণবাদী ব্যাখ্যাতাদের মত

ভঙ্গ হইয়া থাকে। যে আইন সাধারণভাবে প্রতিপালিত হয় না তাহাকে আইনের সংজ্ঞা দেওয়া ভ্রমাত্মক। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আন্তর্জাতিক নীতি বলাই সমীচীন।

বিরুদ্ধমত

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের আইনের ন্যায় কতকগুলি প্রথা ও শাশ্বত ন্যায় নীতি প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত: এই আইন প্রায়শ:ই প্রতিপালিত হয়। মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ হয় বলিয়া ইহাকে আইনের মর্যাদা দান না করা অযৌক্তিক। কারণ রাষ্ট্রের মধ্যেও প্রায়শ: রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ হয়। সেই জন্য রাষ্ট্রীয় আইনকে অপাংক্তেয় করা হয় না। তাহা হইলে আন্তর্জাতিক আইনকেই বা কেন আইন বলিয়া অভিহিত করিতে আপত্তি উঠিবে? তৃতীয়ত: আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলে ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের যে একেবারেই শাস্তি হয় না তাহা বলা ভুল। রাষ্ট্রসংঘের (League of Nations) সনদে কতকগুলি ক্ষেত্রে সনদভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল। যখন ইটালী রাষ্ট্র সংঘের সনদ অগ্রাহ্য করিয়া আবিসিনিয়া আক্রমণ করিয়াছিল তখন রাষ্ট্রসংঘ এই নিয়মানুযায়ী ইটালীর বিরুদ্ধে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। জাতিপুঞ্জের সনদেও আন্তর্জাতিক শান্তি ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। চতুর্থত: সার্বভৌমই আইনের কর্তা, আন্তর্জাতিক সার্বভৌম নাই, সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন আইনই নহে,—এরূপ ধারণা ভুল। কারণ আইনকে সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করার মধ্যে অযৌক্তিকতা রহিয়াছে। আইন ইতিহাস ও সমাজ হইতে উদ্ভূত। সার্বভৌম কেবল তাহা স্বীকার করিয়া লন; এই বিষয়ে সার্বভৌমের গত্যন্তর নাই। ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে সত্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করিলে ইহাও দেখা যায় যে আন্তর্জাতিক আইনও বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অর্থাৎ ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সমাজই আন্তর্জাতিক আইনের উৎস। এইদিক হইতে রাষ্ট্রীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা দেওয়া সমীচীন।

এই দুই মতের সামঞ্জস্য সাধন অসম্ভব। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আন্তর্জাতিক আইনকে Law in the making অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন আইনের মর্যাদা লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। বলা বাহুল্য এই

মতটি সামঞ্জস্যমূলক নহে। এই শ্রেণীর লেখকেরা মূলতঃ বিশ্লেষণী মতবাদই মানিয়া লইতেছেন এবং কার্যতঃ, আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করিতেছেন। বস্তুতঃ এই মতবিরোধের মূল অন্যত্র নিহিত রহিয়াছে। তাহা হইতেছে আইনের সংজ্ঞা লইয়া মতান্তর। আইনের সংজ্ঞা কি হইবে—তাহা লইয়াই যদি মতবিরোধ ঘটে তবে—আন্তর্জাতিক আইন আইন কি না—এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন হওয়া অনিবার্য।

অন্যান্য আইন

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে নিম্নলিখিত অর্থেও আইন শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে :

(১) **ইংলণ্ডের প্রথাগত চিরাচরিত আইনকে** Common Law বলে। আইনের বিশ্লেষণবাদী ব্যাখ্যাতাগণ বলেন যে যদিও এই আইন সমাজ হইতেই প্রয়োজনের তাগিদে জন্মলাভ করিয়াছে তথাপি পরোক্ষভাবে ইহার পশ্চাতে সার্বভৌমের শক্তি সক্রিয় রহিয়াছে। অষ্টিন্ বলিয়াছেন "What the Sovereign permits he commands."। অর্থাৎ যে সকল নিয়ম কানুন জনসাধারণ পালন করে এবং যাহা পালন করিলে সার্বভৌম বাধা দেন না, তাহার পিছনে সার্বভৌমের সমর্থন রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যপক্ষে হেনরী মেইন্ প্রভৃতি আইনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকারীগণের মত এই যে Common Law কে সার্বভৌমের অনুজ্ঞা বলা যায় না ; ইহা ইতিহাসের দান।

(২) **বিধান মণ্ডলী কর্তৃক যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহাকে** Statute Law বলা হয়।

(৩) Ordinances বা **হুকুম আইন :** সংবিধানের নিয়মানুযায়ী শাসনযন্ত্রে সর্বোচ্চ পদাধিকারী যে আইন প্রণয়ন করেন তাহাকে হুকুম আইন বলে। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

প্রাকৃতিক বিধান (Natural Law)**:** খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর গ্রীক স্টোইক দার্শনিক জেনো (Zeno) মনে করেন যে বিশ্ববিধানে কতকগুলি শাশ্বত নীতি নিহিত রহিয়াছে। তাহা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিচ্ছন্ন প্রজ্ঞার সাহায্যে এই নীতির মর্ম উপলব্ধি করা যায়। মনুষ্য সমাজে সর্বাঙ্গীন সাম্য নীতি প্রাকৃতিক বিধানের (Natural Law) মূল সূত্র। এই মতবাদীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে অতীতে এক স্বর্ণযুগ ছিল, তখন মানব সমাজে

প্রাকৃতিক বিধান প্রচলিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। মানুষ অন্যায়ের আশ্রয় লইবার ফলে সেইযুগ অনিবার্য ভাবে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। প্রাকৃতিক বিধান বা Natural Law সমস্ত মনুষ্য সমাজের ও রাষ্ট্রের আদর্শ হওয়া উচিত, কারণ এই বিধান সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই নীতি সিসেরো, সেনেকা প্রভৃতি রোমক দার্শনিকগণ গ্রহণ করেন। মধ্যযুগে খ্রীষ্টান পুরোহিত সম্প্রদায় প্রচার করেন যে প্রাকৃতিক বিধান ঐশ্বরিক আইন (Law of God) অর্থাৎ খ্রীষ্টানধর্মের অনুশাসন ব্যতীত অন্য কিছু নহে। মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে প্রাকৃতিক বিধানকে (Natural Law) ইউরোপের পণ্ডিত-সমাজ আইনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক বিধানের অপ্রতিহত প্রতাপ চলিতে থাকে। বোদাঁ, হবস, লক্, রুশো প্রভৃতি ইহাকে বিভিন্নরূপে আপনাপন চিন্তাধারায় স্থান দিয়াছেন। আমেরিকা ও ফরাসীদেশের বিপ্লবেও এই মতবাদ অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে।

যাঁহারা এই মতবাদের সমালোচক তাঁহারা বলেন যে Natural Law বা প্রাকৃতিক বিধান যদিও বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী, তথাপি বলিতে হইবে যে ইহা কল্পনাপ্রসূত। বস্তুত: ঐতিহাসিক চিন্তাধারার উদ্ভবের দরুন এই মতবাদটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়। কিন্তু এই নীতির অনুপ্রেরণায় দেশে দেশে, চিন্তাজগতে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী, গণতন্ত্র ও গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে এই নীতির ঐতিহাসিক মূল্য অতুলনীয়।

আইনানুবর্তিতার ভিত্তি (Basis of Obedience) : এই বিষয়েও নানা মতের উদ্ভব হইয়াছে। অষ্টিনপন্থী বিশ্লেষণবাদীগণ বলিতেছেন যে আইন সার্বভৌমের আদেশ। এই আদর্শের পশ্চাতে সার্বভৌমের শক্তি রহিয়াছে। আইন ভঙ্গ হইলে শাস্তি হইবে। ইহাই আইনানুবর্তিতার ভিত্তি। হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেন যে ভাবগতরূপে আইন সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞামূলক (Reason) নীতির প্রতীক। এই কারণেই আইন মান্য করা হয়। রুশো বলিতেছেন যে দার্শনিক ভাবে দেখিতে গেলে আইন সমাজের মঙ্গলের (Common good) প্রতীক। সমাজমঙ্গল জনসাধারণের সম্মিলিত শুভ ইচ্ছারই প্রকাশমাত্র। জনসাধারণ তাই আইন মানিয়া চলে। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন

বিশ্লেষণবাদী মত

অন্যান্য মত

যে আইন যখন ইতিহাস ও সমাজদেহ হইতে উদ্ভুত, তখন সমাজ যে আইন মান্য করিবে তাহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কিছুই নাই। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন যে সাধারণ মানুষের মনে রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় রহিয়াছে। তাহারা রাষ্ট্র সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্তভাবেই চলে এবং যন্ত্রের মত আইন পালন করিয়া যায়। আবার অনেকে মনে করেন যে আইন পালন না করিলে অরাজকতা আসিবে, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি হইবে। এই বিচারবুদ্ধিও আইনানুবর্তিতার অন্যতম ভিত্তি। ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে সমাজে বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আইনকে জনমতের অভিব্যক্তি এবং জনকল্যাণের আকর বলিয়া মনে করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই জটিল প্রশ্নের কোন সহজ সমাধান নাই। যে সকল বিভিন্ন মত আলোচিত হইল তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছুটা সত্য নিহিত আছে। আইনানুবর্তিতার ভিত্তি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। জাতির সমগ্র ইতিহাস সমাজ ও জনমনের মধ্যে যে চেতনা সক্রিয় তাহাই জনসাধারণকে আইন মান্য করিতে প্রণোদিত করে।

আইন ও নীতি (Law and Morality) : আইন মানুষের রাষ্ট্রপরিধিভুক্ত বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের মন, ভাবনা, অনুভূতি প্রভৃতির সহিত আইনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু মানুষের মন ভাবনা প্রভৃতির বাহ্যিক প্রকাশ দ্বারা যদি রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ হয় তাহা হইলে রাষ্ট্র আইনের মর্যাদা রক্ষাকল্পে সক্রিয় হইয়া উঠে। মানুষের চিত্তশুদ্ধি নীতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের আইন প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অন্তরের উন্নতিসাধন করিতে অসমর্থ।

আইন ও নীতি

নীতিগত হিসাবে যাহা অকর্তব্য আইনের চক্ষে তাহা শাস্তিযোগ্য নাও হইতে পারে। মদ্যপান অনেক দেশে নীতিগতভাবে নিন্দনীয়, কিন্তু বে-আইনী নহে। তবে মদ্যপান করিয়া যদি কেহ শান্তিভঙ্গ করে তবে আইনানুযায়ী সে শাস্তি পাইবে। আবার বে-আইনী কার্য, নীতিগতভাবে দূষনীয় নাও হইতে পারে। হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দাবি করিয়া মহাত্মা গান্ধী ইংরেজ আমলে সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন। নীতিগতভাবে তাহা কর্তব্য ও সমর্থনীয়। কিন্তু তাহাতে যখন বর্ণহিন্দুদের আইনগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইল, তখন আইন সক্রিয় হইয়া উঠিল।

আইনের পশ্চাতে সার্বভৌম রাষ্ট্রের শক্তি রহিয়াছে। আইনভঙ্গে শাস্তি

বিধান হয়। কিন্তু নৈতিক আদর্শ লঙ্ঘন করিলে সংগঠিত শক্তির নিকট হইতে কোন বাহ্যিক শাস্তিভোগ করিতে হয় না।

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, নীতি আইনের মত কোন নির্দিষ্ট পন্থার ইঙ্গিত করে না। নীতির অর্থ ও প্রসারতা মানুষের ও সমাজ-মনের উপর নির্ভর করে। তাই ইহা নির্দিষ্ট নহে।

কিন্তু আইনের সহিত নীতি সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আইনের মধ্য দিয়া দেশের নৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্যপান নিবারণ করিয়া বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে জনগণের নৈতিক মান উন্নীত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ বে-আইনী করায় ও বিবাহবিচ্ছেদ আইন প্রবর্তিত হওয়ায় দেশের নৈতিক অবস্থার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই সমস্ত আইনের সাফল্য জনমতের উপর নির্ভর করে। আইনের মধ্য দিয়া দেশের নৈতিক মান উন্নতি করিবার প্রচেষ্টা যদি জনমতকে প্রভাবিত না করে, তাহা হইলে সেই প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে এই কারণেই মদ্যপান নিরোধ আইন বাতিল করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আইনের দ্বারা বর্ণহিন্দুর সহিত হরিজনের সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের নৈতিক আবহাওয়ার উন্নতি হইয়াছে। অর্থাৎ, নীতি আইনকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে ও দেশের মঙ্গল সাধনে সহায়ক হয়।

দুই-এর সম্বন্ধ

সর্বোচ্চ নীতিগুলি জনমতানুযায়ী আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রাষ্ট্র নীতিমূলক প্রতিষ্ঠান নহে। দুই-এর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে নীতি বা আইনের ক্ষেত্র বিভিন্ন। কিন্তু যে রাষ্ট্রনীতির আদর্শ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া আপন পথে অগ্রসর হয় সেই রাষ্ট্র তাহার মূল আদর্শ (অর্থাৎ জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন) লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

রাষ্ট্রের আদর্শ ও সর্বোচ্চ নীতি

আইন ও জনমত (Law and Public Opinion): আধুনিক যুগে বিধানমণ্ডলী বা আইনসভাই আইনের প্রধানতম উৎস। আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গঠিত। প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। যদি তাহারা সেইরূপ না করেন, তবে তাহাদের পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সেই আশঙ্কায় আইনসভার জনপ্রতিনিধিগণ সর্বদা জনমতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এইরূপ অবস্থায় আইনের মধ্য দিয়া

জনমত প্রতিফলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইহা ব্যতীত অনেক সময় আইনসভায় কোন আইনের আলোচনার পূর্বে আইনের খসড়া প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মতামত গণতান্ত্রিক সরকার শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করেন। এইরূপেও জনমতের সহিত আইনের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ আইনের খসড়া যখন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়, তখন যে কোন ব্যক্তির সরকারের নিকট সেই খসড়া সম্বন্ধে মতামত প্রেরণ করিবার অধিকার আছে। এইভাবেও গণতন্ত্রে জনমত ও আইনের নৈকট্য স্থাপন সম্ভব হয়।

জনমতের সহিত আইনের ব্যবধান সৃষ্টি হইলে গণতন্ত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই ব্যবধান বিরাট হইলে ব্যাপক আইনভঙ্গ এবং বিদ্রোহও উপস্থিত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের চাপে মদ্যনিবারণ আইন বাতিল করিতে হইয়াছিল। কারণ, দেখা গিয়াছিল যে ঐ আইন প্রণীত হইবার পরে চোরাকারবার, গোপনে আইনভঙ্গ প্রভৃতি ব্যাপকভাবে চলিতেছে। তাহা ব্যতীত সংবাদপত্র প্রভৃতি জনমতের মুখপত্রগুলিতেও ঐ আইনের তীব্র সমালোচনা হইতে থাকে। ভারতে ব্রিটিশ যুগে সাংবিধানিক আইনের সহিত জনমতের কোন সম্বন্ধ ছিল না। জনমত গণতন্ত্র দাবি করিয়াছিল, ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা চালাইতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইহার ফলে ব্যাপক আইন অমান্য ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণে গণতন্ত্রে জনমতের সহিত আইনের সামঞ্জস্য সাধন একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

অন্যপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে আইন জনমত মানিয়া চলিবে বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জনমতের অগ্রবর্তী হওয়াও আইনের কর্তব্য। শিশুবিবাহ নিবারণের জন্য যে আইন ইংরেজ আমলে প্রণীত হইয়াছিল তখন তাহার পশ্চাতে ভারতের অধিকাংশ লোকের সমর্থন ছিল না সত্য, তথাপি সেই আইনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই ক্ষেত্রে আইন সমাজ সংস্কারকল্পে জনসাধারণের সম্মুখে একটি আদর্শ উপস্থাপন করিয়াছিল। জনমত লইয়া যদি বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ আইন প্রণয়নের প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে ঐ আইন বিধিবদ্ধ করা তখন সম্ভব হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মানবিক অধিকার প্রভৃতি রক্ষাকল্পে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন জনমতের অগ্রবর্তী হইয়া জনমত সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

আইন ও অধিকার (Law and Liberty) : আইন অধিকারের উৎস।

আইন অধিকারের উৎস ও প্রাণস্বরূপ

আইনের দ্বারা অধিকার সৃষ্টি করা হয়। অধিকারের সংজ্ঞা ও সীমানির্দেশ আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের দ্বারাই হইয়া থাকে। আবার অধিকার ভঙ্গ হইলে কিভাবে তাহার মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহাও আইন নির্দেশ করে। সুতরাং অধিকার আইনের উপর নির্ভরশীল। আইন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে অধিকার সৃষ্টি করে রাষ্ট্র-শক্তি তাহার পশ্চাতে সদা সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ অধিকার ভঙ্গ বা ভঙ্গের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে রাষ্ট্রশক্তি বাধাদান করিবার জন্য অগ্রসর হয় এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আইনই অধিকারের প্রাণস্বরূপ। ইহাই আইনের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী।

অধ্যাপক ল্যাস্কি অধিকারের দিক হইতে আইনকে বিবেচনা করিয়াছেন।

অন্য মত—আইন সমাজে স্বীকৃত দাবি মানিয়া লয় মাত্র

তিনি বলিতেছেন যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে দেশকালভেদে কতকগুলি দাবি স্বীকার করা রাষ্ট্রের পক্ষে অনিবার্য হইয়া পড়ে। সামন্ততান্ত্রিকযুগে জমিদার-শ্রেণীর দাবি, শিল্পযুগে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর দাবিগুলি এমনভাবে সমাজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল যে রাষ্ট্র সেইগুলিকে স্বীকৃতি না দিয়া পারিল না। আইন অধিকার সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সমাজের দ্বারা বিশেষভাবে প্রার্থিত নীতিগুলিই মানিয়া লয়। তিনি লিখিয়াছেন: "The State briefly does not create but recognises rights, and its character will be apparent from the rights that, at any given period, receive recongnition." অর্থাৎ, রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকার সৃষ্টি করে না, সময়ে সময়ে যে সকল দাবি সমাজের স্বীকৃতিলাভ করে, রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া তাহাই মানিয়া লয়। অনেক সময় দেখা যায় যে জনসাধারণের কোন বিশেষ দাবি আইন সৃষ্টির মাধ্যমে স্বীকৃতি দান করা উচিত, অর্থাৎ, সেই দাবিকে অধিকারে পরিণত করা উচিত, কিন্তু তাহা হইতেছে না, তাহার কারণ এই যে সেই দাবির পশ্চাতে যতটুকু সামাজিক শক্তি রহিয়াছে তাহা রাষ্ট্রক্ষমতাধিকারীদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারিতেছে না।

মার্কস্ বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র আইনের মধ্য দিয়া প্রধানতঃ সেই সকল দাবিকে অধিকারে পরিণত করে যাহা শাসকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল। আইন ও অধিকার দুই-ই শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশরূপ, একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভাববাদী দার্শনিকেরা বলেন যে দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে মনে হয় যে, আইন ও অধিকারের মধ্যেই সমাজের সর্বোচ্চ নীতি ও স্বাতন্ত্র্য রূপ লাভ করে।

মার্কস্—আইন শ্রেণী স্বার্থকেই অধিকারে পরিণত করে

উপসংহার : বাস্তবভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে আইন ব্যতীত অধিকার থাকিতে পারে না। প্রথমতঃ আইন যদি অধিকারগুলি রক্ষা না করে তাহা হইলে অরাজকতার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। আবার আইন যদি অধিকার সৃষ্টি করিয়া প্রতি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির পথ নির্দেশ না করে তবে নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ অধিকারের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়াই নাগরিকগণ আপনাপন জীবনের বৃহত্তম সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করিতে পারে; অধিকারের সাহায্যেই তাহারা অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি পূর্ণভাবে বিকশিত করিবার সুযোগ পায় ও মানব-কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। রাষ্ট্র আইনের অধিকারগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানব কল্যাণের এই সুযোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং আইন রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ লাভের প্রধানতম যন্ত্র। এই জন্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

অধিকার সৃষ্টি ও রক্ষার মধ্য দিয়া আইনের বিরাট ভূমিকা—মানব কল্যাণ

অতিরিক্ত পাঠ্য

DICEY—Law and Public Opinion Lecture 1.

HOLLAND, T.E.—Jurisprudence, pp. 122, 142, 358—67

MACIVER—The Modern State, Ch. VIII

SIDGWICK, H.—Elements of Political Science, Ch. XIII.

WILSON, W.—The State, Ch. V.

দশম অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

নাগরিক রাষ্ট্র-সংস্থার সদস্য। সে রাষ্ট্রের প্রতি তাহার পূর্ণ আনুগত্য জানায় ও দায়িত্ব পালন করে, এবং রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সদস্যপদ বা নাগরিকত্বের মর্যাদায় সে প্রতিষ্ঠিত। নিছক আইনের চোখে নাগরিকত্ব বলিতে এই পদমর্যাদাটুকু বুঝায়। কিন্তু ইতিহাসগতভাবে নাগরিকতার ধারণার সহিত রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি কতকগুলি বিশেষ অধিকারও জড়িত। রাষ্ট্রের চরিত্রভেদে নাগরিকের এই অধিকারের তারতম্য হয়। রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন অনুযায়ী নাগরিকদের উপভোগ্য অধিকারের স্তরভেদ হয়।

বিদেশী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অন্য রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। এ রাষ্ট্রে বসবাস কালে সে আইন-কানুন মানিয়া চলে এবং অধিকাংশ নাগরিক অধিকার ভোগ করে। প্রজা নামটি গণতান্ত্রিক মেজাজের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে ; 'নির্বাচক' ও 'নাগরিক' শব্দ দুইটিও সর্বত্র সমার্থসূচক নহে।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি মূলত দুইটি : (১) জন্মসূত্রে এবং (২) অনুমোদনের মারফত। জন্মসূত্রে অর্জিত নাগরিকতা দুই ধরনের হইতে পারে : (ক) পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত, অথবা (খ) জন্মস্থানের অধিকারে প্রাপ্ত। অনুমতিসিদ্ধ নাগরিকতা অর্জিত হইতে পারে নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতির মারফত : (ক) আবেদনের আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী, (খ) স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ (ব্যতিক্রম আছে) (গ) নির্দিষ্টকালের জন্য বসবাস, (ঘ) সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ, (ঙ) যুদ্ধ অথবা সন্ধিচুক্তির ফলে একটি বিশেষ এলাকার সকল নাগরিকের সমষ্টিগতভাবে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা প্রাপ্তি, (চ) স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, (ছ) অবৈধ সন্তানের বৈধকরণ প্রভৃতি।

ইহারই বিপরীত পদ্ধতিতে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিলে প্রাক্তন নাগরিকতার অবলোপ ঘটে। নারীর পক্ষে অপর রাষ্ট্রের নাগরিকের সহিত বিবাহ, সৈন্যদল হইতে পলায়ন, বিশেষ অপরাধীর শাস্তি, বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ, দীর্ঘকালের জন্য দেশান্তরে বাস, প্রভৃতি কারণেও নাগরিকতার অবলুপ্তি ঘটিতে পারে। অবশ্য অবলুপ্তির পর নাগরিকতা পুনঃপ্রাপ্তিও সম্ভব।

জনকল্যাণে পরিমার্জিত বিচারবুদ্ধির নিয়োগই হইল নাগরিকতার আদর্শ। সুতরাং নাগরিকের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি, সজাগ মনোভাব, আত্মসংযম ও বিবেকবোধ প্রভৃতি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। ইহার বিপরীত, আলস্য ও আগ্রহ-হীনতা, অজ্ঞতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলীয়-মনোভাব হইল সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক। এই সকল প্রতিবন্ধক দূর করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন ও শিক্ষার প্রসারের প্রস্তাবই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

'নাগরিক' শব্দের ভাষাগত অর্থ হইল নগরবাসী। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইহাকে বিশিষ্ট অর্থে মণ্ডিত করিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'নাগরিক' বলিতে বুঝি,—'রাষ্ট্র সংস্থার সদস্য'—অর্থাৎ, প্রথমতঃ, নাগরিকের সম্পর্ক 'রাষ্ট্রের' সহিত ; তিনি নগরবাসী কি গ্রামবাসী, সে প্রশ্ন অবান্তর।

নাগরিক কে ?

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিক রাষ্ট্রের 'সদস্য', অধিবাসীমাত্র নহে। বস্তুতঃ ইউরোপীয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পত্তন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা হইতে, যখন রাষ্ট্র বলিতে নগররাষ্ট্রই বুঝাইত। 'নাগরিক' শব্দটি সেই উত্তরাধিকার আজও বহন করিতেছে।

যে কোন একটি সাধারণ সংগঠনের উদাহরণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে 'সদস্য' শব্দটির তাৎপর্য সহজে বুঝা যাইবে। ধরা যাক, কিছু লোক মিলিয়া একটি সমিতি গঠন করিল। যাহারা এই সমিতির সদস্য তাহারা এই সমিতির যাবতীয় কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারী; আবার যাহাতে এই সমিতি চালু থাকে সেজন্য তাহারা চাঁদা দেয়, আইন-কানুন মানিয়া চলে। অর্থাৎ এই সংগঠন হইতে সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সদস্যরা ভোগ করে এবং তাহারই সাথে সাথে সমিতির সম্পর্কে তাহাদের নির্দিষ্ট কর্তব্যও আছে। কিন্তু এই সমিতির কার্য-পরিচালনার সুবিধার জন্য হয়তো কোন বেতনভোগী কর্মচারী রাখা হইল যে এ সমিতির 'সদস্য' নহে। কর্মচারী হিসাবে সে এই সমিতির অঙ্গ; কিছু কিছু নির্দিষ্ট অধিকারও তাহার আছে; কিন্তু 'সদস্য' না হওয়ার ফলে সমস্ত অধিকার সে ভোগ করিতে পারে না। আবার, সমিতির কোন সদস্য হয়তো কোন অতিথিকে আনিয়া হাজির করিল। সমিতি ভদ্রতা করিয়া যতটুকু অনুমতি দেয় ততদূর পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে সাময়িকভাবে এই অতিথি, যোগদান করিতে পারে, কিন্তু সদস্যদের সমিতির উপর যতখানি অধিকার, অতিথির তাহা নাই; অবশ্য তাহার দায়ও অতদূর বিস্তৃত নহে। তাহা হইলে, দেখা গেল,—এই সংগঠনের মধ্যে তিন স্তরের মানুষ থাকিতে পারে: প্রথমতঃ সদস্যবৃন্দ,—তাহারা সর্বপ্রকার অধিকার ভোগ করে; দ্বিতীয়তঃ সমিতির অন্যান্যরা,—তাহাদের অধিকার সদস্যের অপেক্ষা কম, সমিতির নিয়মকানুন সম্পূর্ণই মানিয়া চলিতে হয়; তৃতীয়তঃ, বাহিরের অতিথি,—যাহার অধিকার নির্দিষ্ট, সাধারণভাবে সমিতির নিয়মকানুন মানিতে হয়, কিন্তু সমিতির সর্বপ্রকার দায়িত্ব তাহাদের উপর বর্তায় না।

একটি তুলনামূলক উদাহরণ

তুলনা তুলনাই, বাস্তবের নিখুঁত বিবরণ নহে। তাহা হইলেও নাগরিকতা সম্পর্কে খানিকটা হদিশ এই বর্ণনা হইতে মিলিবে।

সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের জনসমষ্টি রাষ্ট্রের নাগরিক নহে। রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন দ্বারা তাহা শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকুক, বা বিশেষ আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হউক, যাহাদের নাগরিকত্বের মর্যাদা দান করা হইয়াছে, তাহারাই সে রাষ্ট্রের নাগরিক। স্বভাবতঃই রাষ্ট্রীয় সংগঠনের যাহারা পূর্ণ সদস্য

তাহারাই এ মর্যাদা লাভ করিবে। নিছক আইনের দৃষ্টিতে, আইন যাহাকে সদস্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, সে নাগরিক, অন্যেরা নাগরিক নহে। কিন্তু নাগরিকতা অর্জন ও অর্পণের ভিতর যে দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিচার্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে নাগরিকের দায়,—রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য; এবং রাষ্ট্রের দায়,—নাগরিকের রক্ষা ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের যাহা দায়, নাগরিকের তাহা অধিকার। এক কথায় বলিতে গেলে নাগরিকত্ব এক দায়িত্ব ও অধিকারের সৃষ্টি। কোন বিশেষ রাষ্ট্রে নাগরিকগণ কতখানি অধিকার ভোগ করিবে এবং তাহাদের দায়িত্বই বা কি কি তাহা সেই রাষ্ট্রের বিশেষ চরিত্র দ্বারা নির্ণীত হইবে।

অধিকারের প্রশ্ন

প্রাচীন গ্রীসে বিদেশী, নারী ও ক্রীতদাস হইতে তফাত করিয়া নাগরিকদের বিশেষ অধিকারে মণ্ডিত করা হইত। রোমান লোকতন্ত্রেও সাম্রাজ্যের রোমান নাগরিকতা বিশেষ অধিকার বহন করিয়া আনিত। রেনেসাঁসের (Renaissance) যুগে স্বাধীন শহরগুলির নাগরিকতা সামন্ততান্ত্রিক শাসন হইতে অব্যাহতির অধিকার অর্পণ করিত। ক্রমে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব ঘটিলে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে গড়িয়া উঠা আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্র তাহার নাগরিকদের জীবন, সম্পত্তি ও কর্মধারার স্বাধীনতা দান করিয়াছে। সুতরাং নাগরিকতার ধারণার সহিত রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত অধিকার, উভয় বিষয়ই অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িত *

আধুনিক যুগে নির্দিষ্ট ভূপৃষ্ঠে সীমাবদ্ধ, জাতিভিত্তিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিকাশের সাথে সাথে তাহা প্রতিটি দেশবাসীর নিকট ব্যক্তি হিসাবে সর্বগ্রাসী আনুগত্য দাবি করিয়াছে। রাষ্ট্রের মঙ্গলের সহিত ব্যক্তির মঙ্গল অভিন্ন ইহা বুঝাইয়াছে। পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের প্রকল্পের ভিতর যে ব্যক্তির মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশের দাবিও প্রকট হইয়াছে। এক কথায় আনুগত্য

---

*'Citizens are those who possess full membership in a political community. They are differentiated from aliens, who do not have all the rights which go with their full membership'—Munro. The Government of the United States. p. 81.

"...Citizens enjoy a certain reciprocity of rights against, and duties toward the community." Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 3-4. p. 471.

"Under International Law, citizenship means the particular legal link between a physical person and a definite State, expressed in the aggregate of his rights and obligations to that State. The rights and duties of the citizen of any state are laid down by its legislation—by its constitution, its citizenship laws and other regulations.—K. Y. Chizhovin. International law (Moscow Publication). p. 143.

প্রদানের পাশাপাশি উঠিয়াছে অধিকারের দাবি। সে অধিকার নিজেকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার, শ্রেষ্ঠ পন্থায় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবার অধিকার। এক কথায়, রাষ্ট্রকর্তৃক শুধু প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতিই নাগরিকের নিকট যথেষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই; নাগরিকের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের দাবি ঘোষিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ও আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে নাগরিক ক্রমেই ব্যাপক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারে ভূষিত হইয়াছে।

তথাপি বাস্তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার বিভিন্ন। এমন কি, একই রাষ্ট্রে দুই ধরনের নাগরিকের মধ্যে অধিকার ভোগে পার্থক্য করা হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদন প্রাপ্ত নাগরিকের (Naturalised Citizens) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হইবার অধিকার নাই। বহুরাষ্ট্রে, এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও, নাগরিক হইলেই যে ভোটের অধিকার পাওয়া যায়, তাহা নহে। ফলে, কিছু নাগরিক ভোটের অধিকার ভোগ করে, অন্যান্যরা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকে। নাগরিকদের মধ্যে এই বৈষম্য থাকা উচিত কিনা তাহা রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের বিচার্য বিষয়, গণতন্ত্রের সমস্যা। নাগরিকতার আদর্শের বিচারে এ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ; নাগরিকতার বাস্তব আইনগত বিশ্লেষণে তাহার স্থান নাই।

নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য

নাগরিকতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় (১) নাগরিকতা ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণীত করে; (২) ইহা এক আইনগত পদমর্যাদা নির্ধারিত করিতেছে; (৩) ইহার মধ্যে এক সমমর্যাদার ধারণা নিহিত রহিয়াছে; (৪) নাগরিকতা বলিতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের যে সম্পর্ক চিহ্নিত হয় তাহা বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিজস্ব আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বিদেশী (Alien): নাগরিকের সহিত বিদেশীর (Alien) তুলনা করিলে উভয়কে বোঝা সহজ হইবে। বিদেশী অপর রাষ্ট্রের নাগরিক; অন্যরাষ্ট্রের প্রতি তাহার আনুগত্য। আধুনিক সভ্য যুগে অপর-রাষ্ট্রে বসবাস করিবার সময় সাধারণ নাগরিকের অধিকার হইতে বিদেশীকে বঞ্চিত করা হয় না; কিন্তু তাহাকে

বিদেশী

এ রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়; এখানে বসবাস করাই রাষ্ট্রের অনুমতিসাপেক্ষ এবং রাষ্ট্র ইচ্ছামত তাহার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারে,—যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকা এশীয়দিগের

সম্পত্তির অধিকার সংকুচিত করিতেছে, প্রয়োজন বোধ করিলে বসবাস করিবার অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া দেশত্যাগ করিবার নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু এ রাষ্ট্রের প্রতি তাহার আনুগত্য নাই বলিয়াই, যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র তাহাকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করিতে পারে না। তাহার নিজ রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ বাধিলে, তাহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখিতে পারে। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এ রাষ্ট্রে তাহার সাধারণ অধিকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে, তাহার নিজস্ব রাষ্ট্র কূটনৈতিক (Diplomatic) সূত্রে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাপ সৃষ্টি করিতে পারে। অর্থাৎ, বিদেশে বসবাসকালীনও রাষ্ট্র তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, নাগরিকের এ অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করে।

রাষ্ট্রের প্রতি প্রজার আনুগত্য লইয়া কোন প্রশ্নই উঠে না। স্বভাবতঃই রাষ্ট্র প্রজার রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেই হিসাবে 'প্রজা' ও 'নাগরিক' সমার্থক। কিন্তু 'প্রজা' শব্দটিতে রাজতন্ত্র বা সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যধর্মী শাসনেব যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা আধুনিক গণতান্ত্রিক মেজাজের সহিত অসমঞ্জস বলিয়া অনেকেই শব্দটিকে বর্জন করিবার পক্ষপাতী। ইঁহারা মনে করেন 'নাগরিক' শব্দটিতে অধিকার সম্বলিত পদমর্যাদার ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। ব্রিটেনে অবশ্য বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক ঐতিহ্যপ্রসূত His (Her) Majesty's Subject—মহান্ নৃপতির প্রজা—সম্ভাষণে সকল নাগরিককেই ভূষিত করা হয়।

প্রজা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকের সহিত 'স্বজাতি' বা National এর পার্থক্য করা হয়। ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ (Vinrgin Islands), গুয়াম (Guam) সামোয়া ((Samoa), প্রভৃতি অঞ্চল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত করা হইলেও, তাহাদের আদি অধিবাসিদিগকে নাগরিকতার মর্যাদা দান করা হয় নাই ; তাহারা 'স্বজাতি' বা National বলিয়া অভিহিত হয়। এ হিসাবে আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে বিদেশে তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ পাইবে ; কিন্তু নাগরিকতার সম্পূর্ণ অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত।

স্বজাতি বা National

নির্বাচক (elector) বলিতে বুঝি যাহার নির্বাচন করিবার, অর্থাৎ, ভোট দানের অধিকার আ.ছ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক ভোটের অধিকার সমেত, নাগরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক, সর্ববিধ অধিকার-সম্পন্ন হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে নাগরিকের ভোটের অধিকার থাকে না। রাজতন্ত্র

নির্বাচক

ও একনায়কতন্ত্রে এ অধিকার অনুপস্থিত। আবার কোন কোন রাষ্ট্রে বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীকেও ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। সেইজন্য নাগরিক ও নির্বাচকের মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য।

নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি নিম্নলিখিত ছকে সাজান চলিতে পারে।
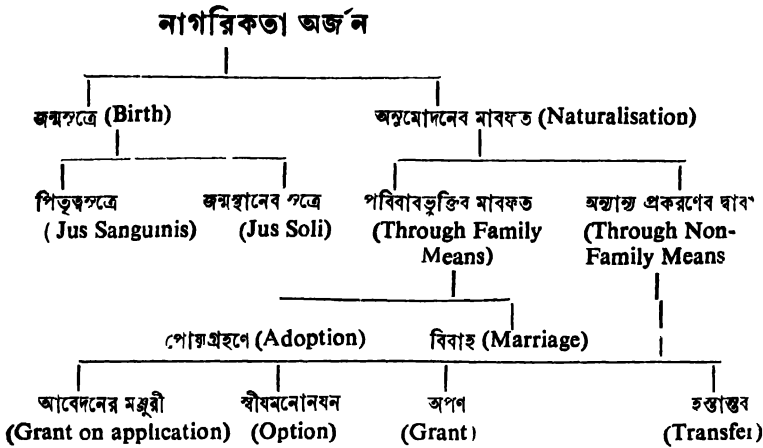
নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি মূলতঃ দুইটি: ১। জন্মসূত্রে (By Birth) এবং (২) বিশেষ রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের মারফত (By Naturalisation) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের সাহায্যে নাগরিকতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (Naturalised Citizen) বলিয়া গণ্য করা হয়।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের মূল নীতি হইল দুইটি: (১) পিতামাতার নাগরিকতার নীতি (Jus Sanguinis) এবং জন্মস্থানের নীতি (Jus Soli)। পিতামাতার নাগরিকতার নীতির অর্থ হইল,—সন্তানের জন্ম যেখানেই হউক না কেন, পিতামাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক সন্তানও সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইবে। জার্মানী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশে এই

(১) পিতৃত্ব সূত্রে অর্জিত

নীতি প্রচলিত। জন্মস্থানের নীতি গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে যাহারই জন্ম হউক না কেন, তাহার পিতামাতা বিদেশী হইলেও, তাহাকে রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা

হইবে। আর্জেন্টিনা এ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উভয় নীতিই স্বীকৃত। ফলে, নাগরিকের সন্তান মাত্রেই নাগরিক, বিদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও সে-অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না; আবার বিদেশীর সন্তান এদেশে জন্মগ্রহণ করিলেই সে নাগরিক, যদিও তাহার পিতামাতার নাগরিকতা স্বতন্ত্র।

(২) জন্মস্থানের সূত্রে অর্জিত

দুইটি নীতির মধ্যে পিতামাতার নাগরিকতার সূত্রটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, সন্তানের আসল স্থান পরিবারের মধ্যে। পিতামাতাই তাহাকে লালন-পালন করিবেন। তাঁহাদের ভাষায় সে কথা বলিতে শিখিবে, তাঁহাদের দ্বারা সে শিক্ষিত হইবে; তাঁহাদের সম্পত্তি সে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবে। সুতরাং, পিতামাতার নাগরিকতাই সন্তানের পাওয়া উচিত। বিচিত্র নয়, সে অবস্থায় পিতামাতার এক নাগরিকতা ও তিন সন্তানের তিন পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিকতার ন্যায় অসম্ভব পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। সাধারণত: দ্বৈত নাগরিকতার ক্ষেত্রে সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে ইচ্ছামত একটি নাগরিকতা গ্রহণ করিবে এবং অন্য রাষ্ট্রের সম্মতি না মিলিলে তাহার দ্বৈত নাগরিকতা থাকিয়াই যাইবে এবং সে রাষ্ট্রে পদার্পণ করিলে নাগরিকতার দায়িত্ব লইতে হইবে।

অনুমতিসিদ্ধ নাগরিকতা অর্জনকে সাধারণতঃ দুই অর্থে বোঝা হয়। সংকীর্ণ অর্থে অনুমতিসিদ্ধ নাগরিকতা বলিতে বুঝায় কোন ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক আবেদন বিধিমতে মঞ্জুরীকরণ। কিন্তু ব্যাপক অর্থে অন্যান্য বহু পদ্ধতিতে অনুমতিসিদ্ধ নাগরিকতা অর্জন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

অনুমতিসিদ্ধ নাগরিকতাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়: (১) পরিবার ভুক্তির মারফত ও (২) অন্যান্য পদ্ধতিতে। পরিবারভুক্তি দুই পদ্ধতিতে হইতে পারে,—(১) রাষ্ট্রহীন বা বিদেশী শিশুকে পোষ্য গ্রহণ করিলে; (২) বিবাহের দ্বারা।

(১) যখন কোন নাগরিক বিদেশী বা রাষ্ট্রহীন (Stateless) শিশুকে পোষ্য গ্রহণ করে, তখন শিশু নূতন পিতামাতার নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবাহের বিষয়ে আইন আরও জটিল।

(২) সাধারণ স্বীকৃত নিয়ম হইল—দুই রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিবাহের ফলে

স্ত্রী স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্থক্য রহিয়াছে। কোন মার্কিনী পুরুষ অন্য রাষ্ট্রের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে সে আপনা হইতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবে না। তাহাকেও আবেদন করিতে হইবে, যদিও এক্ষেত্রে শর্তগুলি পূর্বের ন্যায় অত কঠিন নহে। অপর পক্ষে কোন মার্কিনী স্ত্রীলোকও অপর রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করিলে তাহার মার্কিন নাগরিকত্ব নষ্ট হয় না। অবশ্য সে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বতন নাগরিকতা ত্যাগ করিয়া স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কেবলমাত্র বিবাহের দ্বারা নাগরিকতা অর্জিত হয় না। স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও এ নীতি সমান প্রযোজ্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান সম্বন্ধে পিতামাতার নির্দিষ্ট ব্যবস্থাই কার্যকরী হয়। চৌদ্দ বৎসর অতিক্রম করিলে পর সন্তান স্বেচ্ছায় নাগরিকতা বাছিয়া লইতে পারে।

বিবাহ

(৩) আবেদনের আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরীকরণ। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এ ব্যবস্থা রহিয়াছে। আবেদনকারীকে সাধারণতঃ কয়েকটি শর্ত পালন করিতে হয়; যেমন (ক) রাষ্ট্রান্তর্গত এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাস, (খ) নাগরিক হইবার ইচ্ছার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা; (গ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথগ্রহণ; (ঘ) নৈতিক সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবেদনকারীকে উপরন্তু ঘোষণা করিতে হয় যে, সে নৈরাজ্যবাদী নহে, অথবা সংগঠিত সরকারের বিরুদ্ধাচারী কোন দলের সদস্য নহে। ইহা ছাড়াও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনে শ্বেতচর্মবিশিষ্ট অথবা আফ্রিকাবাসী বা ইহাদের বংশোদ্ভূত পাশ্চাত্যের মানুষ ব্যতীত অন্যান্যদের অনুমতি-সিদ্ধ নাগরিকতা অর্জনের আবেদন করিবার অধিকার সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এশিয়ার অধিকাংশ দেশের অধিবাসীরাই বাদ পড়িয়াছে।

আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরীকরণ

কোন কোন রাষ্ট্রে বসবাসের (Domicile) অধিকারে বিদেশী নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইন মারফত বিভিন্ন প্রকারের বসবাসকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বসবাস

(৪) সামরিক বা বেসামরিক বিভাগে সরকারী চাকুরী করিবার ফলে কোন কোন রাষ্ট্র বিদেশীকে নাগরিকতা প্রদান করে।

সরকারী চাকুরী

মেক্সিকো (Mexico), পেরু (Peru), প্রভৃতি রাষ্ট্রে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের (Purchase of Real Estate) ফলে বিদেশীদের নাগরিকতা প্রদান করা হইয়া থাকে।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়

অবৈধ সন্তানের বৈধকরণ

কোন কোন রাষ্ট্রে নাগরিক পিতা ও বিদেশিনী মাতার অবৈধ সন্তানকে বৈধ ঘোষণা (Legitimation) করিয়া নাগরিকতা প্রদান করা হয়।

অর্পণ (Grant)

উপরোক্ত বিভিন্ন শর্তাধীনে সাধারণতঃ আবেদনকারীর নাগরিকত্ব মঞ্জুর করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা বা কীর্তির জন্য রাষ্ট্র বিদেশীকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। অবশ্য বিদেশীর সম্মতি গ্রহণ করা হয়।

নাগরিকতার হস্তান্তর (Transfer)

রাজ্যজয় বা সন্ধিচুক্তি মারফত নূতন এলাকা যদি কোন রাষ্ট্রে সংযোজিত হয় তবে এই এলাকার নাগরিকেরা নূতন রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিবে ; যেমন, ফ্লোরিডা (Florida), লুইসিয়ানা Louisiana), টেকসাস্ (Texas), প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিয়াছিল। এক্ষেত্রে নাগরিকতার পরিবর্তন বা হস্তান্তর হইয়াছে।

মনোনয়ন (Option)

স্বেচ্ছায় মনোনয়নে (Option)-র সুযোগও কখনও আসে, যেমন আসিয়াছিল ভারত ও পাকিস্তানের বিভাগের সময়। সাধারণতঃ দুই রাষ্ট্রের মতৈক্যের ভিত্তিতে কোন বিশেষ অঞ্চলের সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরিবর্তনের সময় নাগরিকদের বাছাই করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

অনুমতিসিদ্ধ নাগরিকরাও সাধারণতঃ জন্মস্বত্বাধিকারী নাগরিকদের অনুরূপ অধিকারাদি পাইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমতিসিদ্ধ নাগরিক কখনও রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির পদপার্থী হইতে পারে না।

নাগরিকতার অবলোপ (Loss of Citizenship)

নাগরিকতার অবলুপ্তি ঘটে, (ক) বিচারালয় বা অনুরূপ কোন বিশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করিলে, অথবা, (খ) কোন কারণে নাগরিকতা পরিবর্তনের ফলে।

সাধারণতঃ নূতন রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণের ফলে পূর্বতন রাষ্ট্রের নাগরিকতার অবলোপ ঘটে। নাগরিকতা যে ত্যাগ করা যায় এ তত্ত্ব পূর্বে স্বীকৃত হইত না। তবে ১৮৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ১৮৭৯ সালে গ্রেট ব্রিটেন আইনের মারফত নাগরিকতা ত্যাগ করিয়া অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিবার অধিকার স্বীকার করিয়াছে।

বিবাহের ফলে নাগরিকতা পরিবর্তনের বিষয়টি ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সৈন্যদল হইতে পলায়ন, বিশেষ কতকগুলি গুরুতর অপরাধের শাস্তি, বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ, দীর্ঘকালের জন্য দেশান্তরে বাস প্রভৃতি কারণে নাগরিকতা অবলুপ্ত হইতে পারে। অবশ্য অনেক দেশেই নাগরিকতা পুনঃপ্রাপ্তির ব্যবস্থাও রহিয়াছে কোথাও দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দ্বারাই পুনঃপ্রাপ্তি সম্ভব, অন্যত্র অনুমতিসিদ্ধ নাগরিকের পদ্ধতিতে আবেদন করিয়া আসিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ও নাগরিকতা (Citizenship in a Federation)

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকতার কিছুটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু একটি রাষ্ট্র, সেজন্য সকলেই সে রাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু তাহারা আবার নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যেরও নাগরিক। অনেক সময় প্রশ্ন উঠিয়াছে কোন নাগরিকত্ব প্রাধান্য পাইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধনীর ফলে বর্তমান পরিস্থিতি হইল নিম্নরূপ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন নাগরিকই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং যে অঙ্গরাজ্যে সে বসবাস করে তাহার নাগরিক। সে আদিতে এই অঙ্গরাজ্যের নাগরিক ছিল কি না, তাহা বিবেচিত হইবে না। সুইজারল্যাণ্ডে অনুমতিসিদ্ধ নাগরিক হইতে গেলে প্রথমে কোন ক্যান্টনের নাগরিক হইতে হইবে এবং সেই অধিকারে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। ভারতবর্ষে নাগরিকতার দ্বৈত পর্যায় নাই, সকলেই ভারতীয় ইউনিয়নের নাগরিক।

সুনাগরিকের গুণ (Virtues of a Good Citizen)

ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে, নাগরিককে তাহার পরিমার্জিত বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করিতে হইবে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে (Citizenship has been defined as the contribution of ones instructed judgment to the public good)* অর্থাৎ, উদ্দেশ্য হইল সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ, ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা দলগত স্বার্থ নহে। এই উদ্দেশ্যে নিজস্ব বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে সর্বদা পরিমার্জিত অবস্থায় রাখিতে হইবে ও তাহা জনকল্যাণে প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা হইল, নাগরিকতার দায়িত্বের কথা। যে সমাজজীবন হইতে আমি আমার দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক জীবনীশক্তি আহরণ করিতেছি, তাহার মঙ্গলচেষ্টা আমার পবিত্র দায়িত্ব, তাহার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের মাধ্যমেই আমার চরম আত্মবিকাশ সম্ভব। এই দায়িত্ব

*Laski—A Grammar of Politics, p. 113.

পালনের জন্য নাগরিকের যে গুণগুলি থাকা প্রয়োজন, তাহা হইল,—১। বুদ্ধি ও বিচারশক্তি, ২। সজাগ মনোভাব, ৩। আত্মসংযম ও ৪। বিবেকবোধ। স্বভাবতঃই যে নাগরিক নিজে চিন্তা করে না, বিচার করে না, অপরের কথায়, বিশেষ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে সায় দিয়া চলে, সমাজ তাহার নিকট হইতে বেশী হইলে শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই আশা করিতে পারে না। সামগ্রিক কল্যাণে তাহার ব্যক্তিগত অবদান তাহার বুদ্ধি ও বিচার শক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে আসিতে পারে। এবং প্রতিটি ব্যক্তির বুদ্ধি ও বিবেচনা হইতে সমাজ কিছু পাইতে পারে, এই বিশ্বাসই হইল গণতন্ত্রের ভিত্তি। মানুষের সদা-জাগ্রত চেতনাই স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকর্তা। সুতরাং নাগরিককে ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এ দায়িত্ব তাহার পক্ষেই পালন সম্ভব যে বিবেকদান ও আত্মসংযম অভ্যাস করে।

নাগরিকতার প্রতিবন্ধক

সুনাগরিকের পক্ষে বিঘ্ন কোন্ দিক হইতে আসে তাহা আলোচনা করিলে উপরিলিখিত গুণগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হইবে। সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক (Hindrances to Good Citizenship) হিসাবে নিম্নলিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয়: ১। আলস্য ও আগ্রহহীনতা (Indolence and Indifference) ২। অজ্ঞতা (Ignorance), ৩। ব্যক্তিগত স্বার্থ (Private Self-interest) ও ৪। দলীয় মনোভাব (Party Spirit)। এগুলির বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

আলস্য ও আগ্রহহীনতা

আলস্য ও আগ্রহহীনতাই সুনাগরিকতার চরম শত্রু। কারণ, ইহার অর্থ হইল নাগরিকতার কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি। কারণ, অজ্ঞ মানুষ যে তাহার শ্রেষ্ঠ বিচারবুদ্ধির ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে না তাহা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু অজ্ঞব্যক্তির আগ্রহ ও চেষ্টা থাকিলে, সে নিজেকে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু যে অলস ও আগ্রহহীন সে তো কোনপ্রকার চেষ্টাই করিবে না। নির্বাচনের সময় সে ভোট দিবে না, দায়িত্বশীল পদ কখনও গ্রহণ করিতে চাহিবে না, নিজেকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টাও সে করিবে না। এমন কি মূল্যবান অধিকার নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিলেও বিরোধিতা করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে রাজি হইবে না। সমাজ জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে যেটুকু আদায় করিয়া লইল তাহার অধিক সামান্যতম অবদানও সমাজকে দিতে সে প্রস্তুত নহে।

এ মনোভাবের কারণ মূলত: দুইটি,—(১) স্বার্থপরতা ও (২) হতাশা। চূড়ান্ত স্বার্থপরতা হইতে এরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। যে বিষয়ে একান্তভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নাই, সে সম্পর্কে কিছুই করিব না। হতাশা আসে নানাবিধ কারণে। প্রথম হইল, নিজেকে সামান্য বলিয়া বোধ করা। অর্থাৎ, বিশাল রাষ্ট্রের অসংখ্য জনমণ্ডলীর ভিতর একজন ব্যক্তির কার্যের উপর কিছুই নির্ভর করে না। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যক্রম এত জটিল ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ মানুষ ইহার রহস্যোদ্‌ঘাটনে অক্ষম বলিয়া মনে করে। ইহা হইতে স্বকীয় মতামত দিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে হতাশা আসে। তৃতীয়তঃ দৈনন্দিন জীবনযাপনের সমস্যাও মানুষকে অনেক সময়েই অভিভূত করিয়া রাখে এবং চতুর্থতঃ, জীবনের নানাবিধ আকর্ষণও সামাজিক কর্তব্য হইতে মনকে দূরে সরাইয়া রাখে।

আগ্রহহীনতার কারণ

সুনাগরিকতার গুণ হিসাবে আত্মসংযমের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। লোভ ও উত্তেজনা, এই উভয়বিধ রিপু হইতেই সংযম প্রয়োজন। এই সংযমের অভাবে অপর দুটি মারাত্মক প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। কারণ, নাগরিকতার পবিত্র অধিকার যদি নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়, যদি ভোট দেওয়া হয় চাকুরী, কনট্রাক্ট, লাইসেন্স পাইবার মোহে, যদি ক্ষমতার ব্যবহার হয় উৎকোচ গ্রহণ বা অন্য কোনপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, তাহা হইলে নাগরিকতার সমাজকল্যাণের আদর্শের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অনুরূপ বিপদ আসিতে পারে যদি মানুষের নিকট দলীয় স্বার্থ ব্যাপক সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষাও বৃহত্তররূপে দেখা দেয়। যে বুদ্ধি, সংযম ও বিবেকবোধ থাকিলে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ অপেক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থকে বরণ করিতে সক্ষম হয়, তাহারই অভাবে দলীয় স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ব্যক্তিগত স্বার্থানুসন্ধান

দলীয় স্বার্থবোধ

মানসিক প্রবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাস্তব সামাজিক অবস্থাও অনেক সময়েই সুনাগরিকতার পথে গুরুতর বাধা হিসাবে দেখা দেয়। বাস্তব জীবনে দারিদ্র্য, বেকারী, নৈশ্চিন্ত্যের অভাব মানুষকে এমন বিচলিত করিয়া তুলে যে, তখন তাহার পক্ষে সামাজিক কল্যাণের সামগ্রিক চিন্তা ও আত্মসংযম অত্যন্ত দুঃসাধ্য। নিজের ও পরিবারের

সামাজিক প্রতিবন্ধক

অনিশ্চিত জীবন কোন ব্যক্তিরই সুচিন্তার সহায়ক নহে। অপরদিক হইতে বিশাল জনসমুদ্রে একটি ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব অর্জন করা সম্ভব মূলতঃ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। সুতরাং রাজনৈতিক দলের বিবেকবর্জিত কর্তৃত্বে তাহার সাধারণ সদস্যগণকে বিভ্রান্ত করিতে পারে। তৃতীয়তঃ সংবাদপত্র, বেতার প্রভৃতি জনমতগঠনের সমস্ত উপায়গুলিই যদি সাধারণ নাগরিকগণকে ভুল পথে চালনা করে তাহা হইলেও সুনাগরিক হইবার বাস্তব অবস্থা থাকে না।)

প্রতিকার

উপরোক্ত সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাবকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—১। শাসনতান্ত্রিক : নির্লিপ্ততা ও হতাশা এড়াইবার জন্য দুইটি প্রস্তাব আসিয়াছে : (ক) আইনের সাহায্যে প্রত্যেকটি নির্বাচককে ভোট দিতে বাধ্য করা হউক, কিন্তু জোর করিয়া মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত সুচিন্তিত মত পাওয়া সম্ভব নহে ; (খ) আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি মারফত সংখ্যালঘিষ্ঠদেরও রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগদান করা হউক। এ পদ্ধতির গুণাগুণ লইয়া নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কিত অধ্যায়ের আলোচনা করা হইবে। দলীয় রাজনীতির অপকীর্তির উপর জনসাধারণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আনয়নের জন্য গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) ও প্রত্যাহার আজ্ঞা (Recall), প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রস্তাব আসিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার শিক্ষা হইতেছে যে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির মারফত দলীয় রাজনীতি বর্জন করা সম্ভব নহে ; কারণ, প্রতিক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ অনিবার্য। তাহা ছাড়া, বিশেষ করিয়া নির্বাচনগত দুর্নীতির শাস্তিবিধানের আইনসঙ্গত ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই গৃহীত হইতেছে।

আইনগত ব্যবস্থা

সামাজিক উন্নয়ন

(২) সামাজিক : যে সামাজিক সমস্যাগুলি মানুষের সুনাগরিক হইবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার প্রতিকার সামাজিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই আসিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেই জন্যই ক্রমে সমাজতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ বা সামাজিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শের দিকে ঝুঁকিতেছে। (৩) নৈতিক শিক্ষার মারফত বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করার দ্বারাই নৈতিক চেতনা সজীব হইয়া উঠিতে পারে। তবে নীতিবোধ বহুলাংশে সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং শিক্ষা ও সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমেই নাগরিকের শুভবুদ্ধি ও কর্তব্যস্পৃহা কার্যকরী হইয়া উঠিবে।

শিক্ষার প্রসার

একাদশ অধ্যায়

অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্য

(Rights, Liberty and Equality)

[একমাত্র সমাজের অভ্যন্তরেই মানুষ অধিকার ভোগ করিতে পারে; কারণ অধিকারের অর্থ স্বত্ব, যাহা অপরে মানিবে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ যে স্বত্বের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

স্বাধীনতা ও অধিকার সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তথাপি, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকার হইল কতকগুলি বাস্তব সুযোগ-সুবিধা এবং এই সুযোগ-সুবিধা মিলিয়া যে পরিবেশ সৃষ্টি হইল তাহাই স্বাধীনতা।

অবাধ স্বাধীনতা অবাস্তব কল্পনা। একের স্বাধীনতা,—অপরের স্বাধীনতা, তথা সমগ্র সমাজের স্বাধীনতা বা স্বার্থদ্বারা সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র এই সামগ্রিক পটভূমিকায় স্বাধীনতা নির্ধারিত করে; সুতরাং রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অর্থ স্বাধীনতার অস্বীকৃতি নয়।

অন্যত্র বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রিক-জীবনের অর্থই হইল স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের ভারসাম্য নির্দিষ্ট করা। সুতরাং স্বাধীনতার ইতিহাস মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনে ইতিহাসের সমসাময়িক। প্রাচীন গ্রীস হইতে মধ্যযুগের অন্তে বিপ্লবী জনজাগরণ পার হইয়া আধুনিক যুগ পযন্ত স্বাধীনতার তাৎপয ক্রমান্বয়ে বিকাশ-লাভ করিয়াছে। মূল অর্থ হইল: ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ সাধন করিয়া দেওয়া। ইহারই প্রকাশ দ্বিবিধ—নেতিবাচক ও ইতিবাচক: নেতিবাচক এই অর্থে যে, ব্যক্তিত্ববিকাশের পথে যাহা বাধা তাহাকে অপসারণ করিতে হইবে; ইতিবাচক এই অর্থে যে ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে যে পরিবেশ প্রয়োজন তাহা সৃষ্টি করিতে হইবে

এই দীর্ঘ ইতিহাস হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমাজের স্বল্প-সংখ্যক লোক কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবে স্বাধীনতার অর্থ ইহা নয়; বরং তাৎপয ইহাই যে, ব্যাপক মানব-সমাজ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সমান-অধিকার ভোগ করিবে। সেইজন্যই স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সাম্য অর্থে সমানাধিকার বুঝিতে হইবে।

স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব লইয়া যথেষ্ট বিতর্ক রহিয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে মানুষ প্রকৃতি হইতে কোন অধিকার পায় নাই ইহা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে, মানুষ হিসাবে তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং সেই অধিকারেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার বলা যাইতে পারে; তাহা রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাঙ্গিবার অধিকার নয়, রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিবেশ সৃষ্টির অধিকার।

অধিকারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১। নাগরিক অধিকার,—যেমন, জীবনধারণের অধিকার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাধীন চলা ফেরার অধিকার, সুনামের অধিকার, ধর্মসাধনের অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার। সম্পত্তির অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, সমব্যবহার পাইবার অধিকার, প্রভৃতি।

২। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার,—যেমন, ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার, আবেদন করিবার অধিকার, প্রবাসী নাগরিকের নিরাপত্তার অধিকার ইত্যাদি।

৩। অর্থ নৈতিক অধিকার, যেমন—কর্মের অধিকার; উপযুক্ত বেতন পাইবার অধিকার; পরিশ্রমের যুক্তিসঙ্গত সময় নির্ধারণের অধিকার, শ্রমিকের শিল্প-পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার, ইত্যাদি।

৪। শিক্ষার অধিকার—কর্তব্যের কথা বাদ দিয়া অধিকারের কথা চিন্তা করা যায় না। সমাজের দায় প্রত্যেককেই বহিতে হইবে। মূল কর্তব্যগুলি হইল: রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, আইন মানিয়া চলা, কর প্রদান, সৎভাবে ভোটের অধিকার ও সরকারী পদের ব্যবহার ইত্যাদি।

স্বাধীনতা ও অধিকার যে বজায় থাকিবে, তাহার নিশ্চয়তা প্রয়োজন। সেজন্য বিধিবদ্ধ আইন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বিচারকমণ্ডলীর নিরপেক্ষতা, শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ প্রভৃতি প্রয়োজন, কিন্তু সবাপেক্ষা প্রয়োজন জনতার সজাগ সাবধানতা ও অধিকার রক্ষাতে দৃঢ় পণ।]

অধিকারের (Rights) অর্থ হইল,—স্বত্ব, দাবি। তাহা হইলে, যে বিষয়ে আমার অধিকার তাহা অপরের নিকট ভিক্ষার বস্তু নহে; অপরের করুণার দানও নহে। আমি যখন আমার স্বত্বের ব্যবহার করিব, তখন আমার অধিকারের উপভোগে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না; বরং অন্যান্যদের সচেষ্ট থাকিতে হইবে যাহাতে আমার সেই উপভোগে কোন বাধা সৃষ্ট না হয়।

সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকারের প্রশ্ন কেবলমাত্র সমাজের অভ্যন্তরেই উঠিতে পারে। জনশূন্য দ্বীপবাসী রবিন্‌সন্‌ ক্রুশোর (Robinson Crusoe) কোন অধিকার ছিল না; তাহার শক্তি ছিল, বুদ্ধি ছিল। শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগে সে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, যথাসম্ভব সুখেরও ব্যবস্থা করিয়াছিল; কিন্তু অন্ততঃ প্রথমে তাহার পার্শ্বে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না যাহার নিকট সে দাবি জানাইবে বা অধিকার খাটাইবে।

অতএব 'অধিকার' একটি সামাজিক ধারণা। সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষেই 'অধিকার ভোগ করা সম্ভব। সামাজিক জীবন হইতেই অধিকারের উৎপত্তি; মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কে ভিতর হইতে কোন অধিকার উদ্ভূত হইতে পারে না।

অধিকার সামাজিক ধারণা

দ্বিতীয়তঃ, একের অধিকার স্বীকার করার অর্থই হইল অপরের সেই নির্দিষ্ট ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার অস্বীকার করা। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারের অর্থ হইল আমাকে হত্যা করিবার অধিকার অপরের নাই। আমার পথে চলা-ফেরা করার অধিকার অপরকে আমাকে রাস্তায় ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে। সুতরাং, কোন অধিকার স্বীকার করায় অর্থ হইল সেই অধিকারের সীমার মধ্যে সমাজের প্রতি মানুষের হস্তক্ষেপের সুযোগ নির্ধারিত হইল, এবং

একের অধিকার অপরের অধিকারের সীমা

সমাজকে সামগ্রিকভাবে দায়িত্বগ্রহণ করিতে হইল—যাহাতে অধিকার লঙ্ঘিত না হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে—

মূল প্রশ্ন

অধিকার ভোগ করিবে কে বা কাহারা ?

কি কি অধিকার তাহারা ভোগ করিতে পারিবে ?

কেনই বা তাহারা ঐসকল অধিকার ভোগ করিবে ?

এই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে গিয়া আবার যে দুইটি বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইল 'স্বাধীনতা' (Liberty) ও 'সাম্য' (Equality)।

স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতার অর্থ হইল অপরের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্তি। অধিকারের তাৎপর্যও হইল অপরের হস্তক্ষেপ নিরোধ। সেইজন্য অনেক সময়েই 'স্বাধীনতা' ও 'অধিকার' সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তথাপি বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিতে দেখিলে, সামাজিক কতকগুলি অধিকার সৃষ্টির মারফতেই কোন একটি বিশেষ ধরনের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারা যায়। অধিকার হইল কতকগুলি বাস্তব সুযোগ-সুবিধা ; সেই সুযোগ-সুবিধা মিলিয়া যে সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হইল তাহাই স্বাধীনতা। অধিকারের অস্তিত্বের ভিতর দিয়াই স্বাধীনতার সৃষ্টি (Liberty is the product of rights)। সুতরাং কেন, কোন অধিকার, কে ভোগ করিবে তাহা বুঝিতে গেলে স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।

অবাধ স্বাধীনতা অবাস্তব কল্পনা

প্রথমেই বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন যে, সকলেরই সব বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা (Absolute freedom) থাকিতে পারে না। কারণ সকলেরই সব কিছু করিবার স্বাধীনতার তাৎপর্য হইল প্রত্যেকেই অপরের যে কোন স্বাধীনতা ভঙ্গ করিতে পারিবে। এ অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে কাহারও স্বাধীনতা নাই, আছে শক্তির প্রাধান্য। সুতরাং সে স্বাধীনতা শূন্যগর্ভ-ধ্বনি মাত্র। স্বাধীনতার অর্থই হইল রাষ্ট্রের দ্বারা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা। রাষ্ট্র ঘোষণা করে যে এই স্বাধীনতা রাষ্ট্র বজায় রাখিবে ; অর্থাৎ সেই স্বাধীনতা খর্ব করিবার সমস্ত প্রয়াসকে রাষ্ট্রের সংগঠিত শক্তির দ্বারা ব্যাহত করিবে। রাষ্ট্র তাহা করে বলিয়াই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব। সুতরাং রাষ্ট্রের শক্তি ও কর্তৃত্বের সহিত ধারণার কোন মৌলিক বিরোধ নাই।† প্রশ্ন হইল,—রাষ্ট্র কাহার স্বাধীনতা বজায় রাখিবে, কাহার স্বাধীনতাই বা খর্ব করিবে।

*Laski—A Grammar of Politics, p. 142

† "The unlimited Sovereignty of the State is not hostile to individual liberty but is its source and support."—Burgess.

প্রাচীন গ্রীসে, তদানীন্তন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চরম শিখর হইতে এথেন্স এ প্রশ্নের জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন স্বাধীনতার অর্থ ছিল: ১। গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা, অর্থাৎ, নগররাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং অ-গ্রীকদিগের হস্ত হইতে গ্রীসের স্বাধীনতা; ২। ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা, যাহার তাৎপর্য হইল, অপরের হস্তক্ষেপ সীমাবদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেকের রাষ্ট্র-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক কার্যনির্বাহের ক্লেশ ও দুর্ভাবনা ক্রীতদাস ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতি সৃষ্টিশীল কার্যে আত্মনিয়োগ করা। এ ব্যবস্থায় একদিকে বিদেশীর, রাজার বা কতিপয় শাসকের শাসনের অধিকার অস্বীকৃত হইল, অপরদিকে ক্রীতদাস ও নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বঞ্চিত করা হইল উন্নততর জীবনযাত্রার সুযোগ হইতে, অ্যারিস্টট্‌ল্ যাহাকে বলিয়াছিলেন "সুখী ও সম্মানিত জীবন" (a happy and honourable life)।* এথেন্সের জবানবন্দী হইতে বুঝা যায়,—স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের ব্যক্তি হিসাবে সুখী ও সম্মানজনক জীবনধারণের সুযোগ করিয়া দেওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হইত।

প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহ্য

কিন্তু ইহারই অপর তাৎপর্য হইল যে এই অধিকার ভোগের ব্যাপারে সকল নাগরিকই সমান, কেহ বেশী কেহ কম নহে। সুতরাং যাহারা স্বাধীন, তাহারা সকলেই অধিকারভোগী। স্বাধীনতা ও সাম্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। প্রাচীন গ্রীসে স্বাধীনতা ও সাম্য ছিল কিছু লোকের জন্য; অন্যেরা ছিল বঞ্চিত। তত্ত্বগতভাবে এই বঞ্চনার সমর্থনে স্বয়ং অ্যারিস্টট্‌ল বলিয়াছেন সে ক্রীত দাস হস্তপদাদিসম্বলিত যন্ত্র মাত্র, স্বাধীনতা ভোগ করিবার যোগ্যতা তাহার নাই।

স্বাধীনতা ও সাম্য

স্বাধীনতার অর্থ খুঁজিতে গিয়া এখন দেখা যাইতেছে যে প্রথমে শুধুই যে বাধা-নিষেধের হাত হইতে মুক্তি বলিয়া ভাবা গিয়াছিল তাহাই যথেষ্ট নহে; ইহার অর্থ হইল এমন বিশেষ কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি যাহাতে স্বাধীনতা-ভোগকারীর জীবন সার্থক ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; তাহার অন্তর্নিহিত সকল ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ বিকাশের ভিতর দিয়া সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারে। এই ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপাদান রহিয়াছে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এবং ইহার প্রকাশ ঘটিতেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবস্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতার সহিত ব্যক্তির সম্পর্কের মাধ্যমে।

স্বাধীনতার ইতিবাচক অর্থ

---

* Delisle Burns—Political Ideals. Athenian Liberty,-শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্বাধীনতার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা গেল। কি ধরণের অধিকারের ভিতর দিয়া স্বাধীনতার প্রকাশ তাহারও আভাস পাওয়া গিয়াছে। এইবার, স্বাধীনতার অধিকার কাহাদের জন্য—এই প্রশ্নটির জবাব দিতে হইবে।

রাজার স্বাধীনতা প্রজার স্বাধীনতার বিপরীত। অভিজাতদের স্বাধীনতা সাধারণের স্বাধীনতা স্বীকার করে না। নাগরিকের স্বাধীনতার মধ্যে অপরের এ স্বাধীনতা খণ্ডনের অধিকারের অস্বীকৃতি রহিয়াছে।

সকলের সমান স্বানধীতার অধিকার

সকল মানুষেরই সমান স্বাধীনতার অধিকার রহিয়াছে,—এই ধ্বনি প্রথম উত্থিত হইল সামাজিক চুক্তির ভাষ্যকার লক্ ও রুশোর লেখনীতে এবং সেই বাণীই স্থায়ী আসন পাইল উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় (Declaration of Independence by North American Colonies) এবং ফরাসী বিপ্লবের মানুষের অধিকারের প্রতিজ্ঞাতে (Resolution on the Rights of Man)। রুশো বলিয়াছেন, "স্বাধীন হইয়া মানুষের জন্ম, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে বাঁধা (Man is born free, but everywhere he is in chains)।" জেফারসন (Jefferson) বলিলেন: "স্রষ্টা মানুষকে কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকারে মণ্ডিত করিয়াছেন।" (Men are 'endowed by thoir Creator with certain inalienable rights')।" ফরাসী বিপ্লবের "মানুষের অধিকারে" লিখিত হইল: "মানুষ জন্ম হইতেই স্বাধীন ও সমানাধিকারসম্পন্ন" (Men are from birth free and equal in rights)। সকল মানুষের স্বাধীনতার অধিকার আর দার্শনিকের চিন্তার এবং নিষ্পিষ্ট মানুষের ক্রুদ্ধ হুংকারে আবদ্ধ নাই, সভ্য মানুষের রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে স্থান পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কি করিয়া এই তত্ত্বের আবির্ভাব সম্ভব হইল? দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখা যাইতেছে আকৃতিতে, শক্তিতে, বুদ্ধিতে অথবা চরিত্রবলে কোন একজন মানুষ অপরের সমান নহে। তবে কি করিয়া বলা যায় যে সব মানুষই সমান?

এ প্রশ্নের জবাব অবশ্য বক্তব্য উপস্থাপনের ভিতর দিয়াই করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, স্বাধীনতায় মানুষ মাত্রেরই "সমান অধিকার।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লবী ও চিন্তানায়কগণ এ তত্ত্বের যুক্তি হাজির করিয়াছেন কল্পিত 'প্রাকৃতিক' অবস্থার তত্ত্ব হইতে। ইহার বহু পূর্ব হইতে মানুষের সাম্যের কথা ঘোষিত হইয়াছে। অ্যারিষ্টটল দাসত্বপ্রথায় সমর্থন জানাইলেও, তাঁহার অল্পদিন পরেই প্রাচীন গ্রীসের স্টোইক্ (Stoic) দার্শনিকগণ বলিতে আরম্ভ করেন যে মানুষ মাত্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লবী চিন্তা

নহে, জন্তুও নহে; বুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসাবে সকল মানুষই সগোত্র। মানুষের এই সমতাকে অস্বীকার করা। ভিত্তি নাই; সকল মানুষেরই মানুষ হিসাবে সমপর্যায়ে স্থান পাইবার অধিকার আছে।

গ্রীস

রোমানরা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; বিচিত্র আইন-কানন, প্রথা, আচার ব্যবহারের মানুষকে শাসন করিতে গিয়া তাহাদের বিচার করিবার সময়ে ন্যায় ও ঔচিত্যবোধের ভিত্তিতে রায় দিতে হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে এই ধরণের রায়ের সিদ্ধান্তগুলি হইতে সাধারণ আইনের নীতি প্রতিষ্ঠিত হইল, যাহার নামকরণ হইল Jus Gentium বা মানব সম্প্রদায়ের আইন (Law of the peoples)। ক্রমে এ ধারণা জন্মাইতে লাগিল যে স্টোইকরা যে যুক্তিবোধের ভিত্তিতে মানবিক সাম্যের কথা বলিয়াছিল তাহাই এই আইনে রূপ পাইয়াছে। শেষ পর্যায়ে আসিল ব্যাপকভাবে রোমান নাগরিকতার অধিকার অ-রোমকদের (Non-Romans) মধ্যে বিতরণ। অর্থাৎ সব মানুষেরই এক পর্যায়ে রোমান নাগরিক হইবার অধিকার আছে।

রোম

খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। পরের যুগে তাঁহার শিষ্যবর্গ বৈষম্যমূলক সমাজে প্রাধান্য বিস্তারের অভিলাষে এ উক্তির ব্যাখ্যা করিলেন যে মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান, সমাজের দৃষ্টিতে নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলেই এক ধর্মাবলম্বী ছিল বলিয়া দীর্ঘ মধ্যযুগের চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক সমাজেও সাধারণভাবে সমতার একটা ধারণা বর্তমান ছিল।

কিন্তু, আসল কথা হইল মানুষের সমতার কথা জোর করিয়া ঘোষণা করার প্রয়োজনের উদ্ভব হয় বাস্তব বৈষম্যের, জবরদস্তি ও জুলুমের প্রতিবাদের প্রয়োজন হইতে। দার্শনিক, আইনগত, ধর্মীয় তত্ত্ব ছাড়াও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সব মানুষের সমান অধিকারের দাবী দরদী সাহিত্যিকদের সৃষ্টির মাধ্যমে উঠিয়াছে। স্যার টমাস্ মোর (Sir Thomas More) লিখিয়াছেন 'ইউটোপিয়া' (Utopia)। হ্যারিংটন (Harrington) লিখিয়াছেন 'ওসিয়ানা' (Oceana)। জন বল (John Ball) ইংরেজ কৃষক বিদ্রোহীদের নিকট প্রচার করিয়াছেন সমান অধিকারের কথা।

সাহিত্যিকের স্বপ্ন

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'অধিকার', 'দাবি', 'স্বত্বে'র কথা সজোরে বিঘোষিত হইল লক্, রুশো, টম্ পেইন, জেফারসন, প্রভৃতির লেখায় ও ইংরেজ, মার্কিন ও ফরাসী বিপ্লবের মারফৎ।

যুগ পরিবর্তিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'প্রাকৃতিক অবস্থা', 'সামাজিক

চুক্তি', 'স্বাভাবিক অধিকার', প্রভৃতি তত্ত্ব আজ অবৈজ্ঞানিক ও অসত্য বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। কিন্তু সেই ব্যাপক আন্দোলন সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমন এক পর্যায়ে তুলিয়া দিয়া গেল যে মানুষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অধিকার আজ আর অস্বীকৃত হওয়া সম্ভব নহে। গিডিংস্ (Giddings) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকরা আজ বলিতেছেন,—প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক অধিকার অলীক বটে, কিন্তু যে সমাজে মানুষ বাস করে সেই সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রয়োজনে মানুষের পারস্পরিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত যে সম্পর্ক স্বাভাবিক, তাহাই হইল তাহার স্বাভাবিক অধিকার।

সমাজতান্ত্রিক গিডিংস্

'স্বাভাবিক' শব্দটিকে প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শব্দটি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন লোক ব্যবহার করেন; 'ফলে স্বাভাবিক অধিকার যে কি' সে সম্বন্ধে মতৈক্য কঠিন। দ্বিতীয় সমালোচনা হইল অধিকার কখনই 'স্বাভাবিক' নহে, অধিকার রাষ্ট্রপ্রদত্ত। তৃতীয়তঃ, 'অধিকারে'র ধারণা স্থান ও কালের সীমায় আবদ্ধ; অথচ যাহা 'স্বাভাবিক' তাহা চিরন্তন। সুতরাং স্বাভাবিক অধিকার অর্থহীন ধ্বনিমাত্র।

স্বাভাবিক অধিকারের সমালোচনা

সমালোচনা যতই হউক, সব মানুষই যে ব্যক্তি হিসাবে অধিকারের দাবিদার তাহা আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মানুষের অন্তর্নিহিত যে ক্ষমতাবলী আছে তাহার যথাযথ বিকাশের স্বাধীনতা আজ প্রতিটি মানুষেরই প্রাপ্য হিসাবে ঘোষণা শুধু অধ্যাপক ল্যাস্কির সুসংহত ভাষায় সীমাবদ্ধ নাই।* ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N. O.) সাধারণ সভার পূর্ণ অধিবেশনে যে 'মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইতেছে "...মানব পরিবারে সকল সদস্যের স্বভাবজ মর্যাদা এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি পৃথিবীতে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তিমূল ....."†

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা

অন্তিম পর্যায়ে অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষকে যদি বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইতে না হয়, তবে মানবিক অধিকারকে আইনের নিয়ম দিয়া রক্ষা করা

*"By Liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves".—Laski, A Grammar of Politics. p. 142.

† recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable right of all members of the human family is the foundation of freedon, justice and peace in the world..." Universal Declaration of Human Rights.

অপরিহার্য।* আমাদের প্রাথমিক দুইটি মূল প্রশ্নের উত্তর এতক্ষণে মিলিয়াছে :

অধিকার ভোগ করিবে সকল মানুষ···

অধিকারের মূল উদ্দেশ্য হইল প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশ সাধন করা·······

কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে অগ্রসর হইবার পূর্বে আরও দুইটি পরস্পরজড়িত সমস্যার নিষ্পত্তি করিয়া যাইতে হইবে।

১। রাষ্ট্র স্বীকৃতির বাহিরে কোন অধিকার থাকিতে পারে কি না?

২। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার থাকিতে পারে কি না?

আইন-তাত্ত্বিকমত

বার্জেস বলিয়াছেন,—অধিকারের উৎপত্তিসূত্র হইল রাষ্ট্র। অর্থাৎ রাষ্ট্র অধিকার ঘোষণা করে এবং অধিকার রক্ষা করে। অধিকার হইল সেই দাবি যাহা সকলে স্বীকার করে এবং যাহার অস্বীকৃতি দণ্ডনীয় হইবে। স্বীকার করা ও দণ্ডদানের মালিক রাষ্ট্র, সুতরাং রাষ্ট্রের স্বীকৃতির বাহিরে অধিকারের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। বস্তুতঃ আইনজ্ঞের দৃষ্টিতে ইহাই হইল অধিকারের রূপ এবং ইহাই হইল আইন সম্মত অধিকারতত্ত্ব (Legalistic Theory of Rights)।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার

কিন্তু মানুষের জীবন তো আইনের মারফতেই সম্পূর্ণ প্রস্ফুট নহে। কোন বিশেষ রাষ্ট্রে কোন্ কোন্ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা সেই রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে অবগত হইতে পারি। কিন্তু যে অধিকারগুলির স্বীকৃতি পাওয়ার প্রয়োজন ছিল সেগুলিই যে স্বীকৃতি পাইয়াছে, ইহা হইতে তো সে কথা জানিতে পারিলাম না। অর্থাৎ, যাহা আছে তাহাই যে যথেষ্ট সে বিষয়ের প্রমাণ কি? তাহা হইলে, যে অধিকার প্রথম চার্লস, ষোড়শ লুই অথবা জার নিকোলাস স্বীকার করিয়াছিলেন, সে অধিকার ব্যবস্থা (System of Rights) সমূলে উৎপাটন করিয়া নূতন ব্যবস্থার পত্তন করিবার প্রয়োজন পড়িয়াছিল কেন? আইনের

---

* "It is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protectd by the rule of law..."

১ "A legal theory of rights will tell us what in fact the character of a State is; it will not tell us, save by the judgement we express upon some particular State whether the rights there recognised are the rights which need recognition." Laski—Ibid. p. 91.

চশমার সীমিত দৃষ্টিতে রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকারের বেশী আর কিছু নজরে আসে না। রাষ্ট্রদর্শনের প্রসারিত দৃষ্টিতে বিচার করিলে রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকারের পার্শ্বে মানুষের বিকাশের জন্য অবশ্যস্বীকার্য অধিকারগুলির বিচার করিতে হয়।

রাষ্ট্রের পরম লক্ষ্য যদি হয় ব্যক্তির স্বাধীনতা, যে মুক্তির মাধ্যমে সে আপনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভব করিবে, তাহা হইলে ব্যক্তির পক্ষে সেই নিরিখে রাষ্ট্রকে যাচাই করিবার প্রশ্নও উপেক্ষা করা যায় না। মানুষ সমাজের ভিতরেই স্বকীয় সত্তাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে সুতরাং কাহারও পক্ষে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করা বা ভাঙ্গিবার প্রয়াস পাওয়া অযৌক্তিক। অতএব, বলা হইয়া থাকে, মানুষের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু, সমাজকে ভাঙ্গিতে না চাহিয়াও পরিবর্তন করিতে চাওয়া অন্যায় নহে। রাষ্ট্র একটি বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাকে ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। রাষ্ট্রের নির্দেশ, এবং রাষ্ট্রের শক্তি লইয়া শাসকশ্রেণী এই বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিধানের জন্য দণ্ডায়মান আছে। এখন যে কোন নাগরিকেরই এই সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট চাহিদা থাকিতে পারে যে তাহার আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক।* সুতরাং, আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিবার দাবি রাষ্ট্রের নিকট, বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। উহা হইতেই মৌলিক অধিকার বলিয়া কতকগুলি বিশিষ্ট অধিকারকে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মধ্যে স্থান করিয়া দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। যে অবস্থা নাগরিকের আত্মবিকাশের জন্য মৌলিক প্রয়োজন, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্যও সেই অবস্থার মৌলিক চাহিদা।

এইবার তৃতীয় প্রশ্নে আসা যাক—

মানুষের অধিকার কোনগুলি ?

উত্তর আমেরিকার বিপ্লবীরা জবাব দিয়াছিলেন: "জীবন, স্বাধীনতা ও আনন্দানুসন্ধান" ("Life Liberty and Pursuit of Happiness") এবং পরে যোগ করিয়াছিলেন, "সম্পত্তি অর্জন ও দখলে রাখার উপায়" ("the means of acquiring and possessing property)।

স্বাধীনতার রূপ

এবং ফরাসী বিপ্লবীরা ঘোষণা করিলেন: "স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও

* "The citizen has claims upon the Sate. It must observe his rights. It must give him those conditions without which he cannot be that best self that he may be.—Laski. Ibid p. 93

নিপীড়নের প্রতিরোধ" ('Liberty, Property, Security and Resistance to Oppression")।

সীলী (Seeley) তাঁহার "Introduction to Political Science" গ্রন্থে সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্বাধীনতা মূলতঃ তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—

(১) জাতীয় স্বাধীনতা,—যাহার উদাহরণ ম্যারাথন বা থার্মোপাইলির ইতিহাসে এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে লিখিত হইয়াছে; (২) সরকারকে প্রজাসাধারণের প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন করা (Responsibility of Government). যাহার উদাহরণ হইল ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের প্রাধান্য বিস্তারের সংগ্রাম এবং (৩) সরকারের হস্তক্ষেপের এক্তিয়ারকে সীমাবদ্ধ করা (Limitation of the Province of Government)। গোঁড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর হস্তে স্বাধীনতার এই তৃতীয় অর্থ বহুল প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, বর্তমান চিন্তাধারায় সরকারের উপরই দায়িত্ব পড়িতেছে, শুধু নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত হইয়া সরিয়া থাকাই নহে, বাস্তবে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। অর্থাৎ শুধু নেতিবাচক নহে; স্বাধীনতা রক্ষায় সরকারের দায়িত্ব ইতিবাচক।

আধুনিক মত

স্বাধীনতাকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা হয়: (১) সামাজিক বা নাগরিক অধিকার, অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতা (Civil Liberty), (২) রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Liberty) এবং (৩) অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Liberty):

এই স্বাধীনতার বিচিত্র বিকাশ হইতে যে বিশিষ্ট অধিকারের সৃষ্টি হয়, নিম্নে সেগুলি বর্ণিত হইল:

নাগরিক অধিকার (Civil Liberty): ১। জীবনধারণের অধিকার। ইহা মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার। ইহার তাৎপর্য হইল প্রতিটি ব্যক্তির জীবন আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্য যথোপযুক্ত সামরিক ও পুলিশ শক্তির সমাবেশ করিতে হইবে, বিচারশালার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার সাথে সাথে দেখিতে হইবে যে রাষ্ট্র কর্তৃত্বে যাঁহারা আসীন তাঁহারা যেন খুশিমত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিতে না পারেন। কেবলমাত্র গর্হিত অপরাধের জন্য যথোপযুক্ত ন্যায়সঙ্গত বিচারের পরে বিচারকের দণ্ড হিসাবেই 'কোন ব্যক্তির জীবন নাশ' সম্ভব।

এই ধারণা হইতেই সভ্যরাষ্ট্রে মানুষের আত্মহত্যার প্রয়াস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। তাহা ছাড়া প্রাণদণ্ডের সাজা থাকা উচিত কিনা সে প্রশ্নও ইহার সহিত জড়িত।

২। **ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও চলাফেরার স্বাধীনতা:** বন্দী মানুষ, গণ্ডীঘেরা মানুষের পক্ষে জীবনের বিকাশ অসম্ভব। ইহা হইতেই আসিয়াছে বিনা বিচারে বন্দী না থাকার অধিকার ও Writ of Habeas Corpusএর অধিকার। গৃহের নিরাপত্তা, বিশেষ করিয়া বে-আইনীভাবে পুলিশী অনুসন্ধান হইতে নিরাপত্তা, ও চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম টেলিফোন সম্পর্কে সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে নিরাপত্তাও ইহার অঙ্গ বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাও স্বীকৃত যে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে আইনসম্মত পদ্ধতিতে ন্যায় বিচারের দ্বারা মানুষকে বন্দী করিবার অধিকার রাষ্ট্রের রহিয়াছে।

৩। **সুনামের অধিকার (Right of Reputation):** কাহারও সুনামকে অন্যায়ভাবে কলঙ্কলিপ্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এইরূপ প্রয়াস দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু বিচারশালায় বা আইনসভায় ন্যায্য সংবাদ দানে বাধা নাই, তেমনই বাধা নাই জননেতার কার্যকলাপ বা শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির ন্যায়সঙ্গত সমালোচনায়।

৪। **ধর্মসাধনের অধিকার (Religious Freedom):** প্রতিটি ব্যক্তিরই নিজের বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণের স্বাধীনতা রহিয়াছে। অপর কাহারও বা রাষ্ট্রের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার নাই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জার্মানীর শাসনতন্ত্রে ইহার তাৎপর্য হিসাবে নিম্নরূপ ধারাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল:

(ক) ধর্মবিশ্বাসের উপর নাগরিক বা রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার অথবা সরকারী চাকুরী পাওয়া নির্ভর করিবে না।

(খ) নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস অপরের নিকট ঘোষণা করিতে কেহ বাধ্য নহে।

(গ) কাহাকেও কোন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(ঘ) রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া কিছু থাকিবে না।

(ঙ) ধর্ম সম্প্রদায়ের সংগঠন গড়িবার স্বাধীনতা থাকিবে। ধর্মীয় সংগঠন নিজস্ব কার্যক্রম নিজেরাই নির্ধারণ করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

৫। **পরিবার গঠন অধিকার (Family Rights):** ব্যক্তির জীবনকে সফল ও পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত সকল রাষ্ট্রেই বিবাহ করিবার, সন্তান-সন্ততি

জন্মদানের এবং সপরিবারে বসবাস করা ও সংসারী জীবন-যাপন করিবার অধিকার স্বীকৃত হয়। ইহার তাৎপর্য হইল পারিবারিক জীবন যাপনে কেহ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না; সন্তান প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিরাপদ হইবে এবং পরিবারের ভিতর উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত হইবে। অবশ্য এ অধিকারও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্যই রাষ্ট্র আইনের দ্বারা বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। রাষ্ট্র বহু বিবাহ প্রথা বা সাময়িক বিবাহ বেআইনী করিতে পারে; স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহারের মান ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিতে পারে। অনুরূপভাবেই পুত্র কন্যাদের বয়ঃপ্রাপ্তির বয়স নির্ধারিত করিতে পারে, যে বয়সে তাহাদের স্বাধীনতা আইন মানিয়া লইবে।

৬। **চুক্তি ও সম্পত্তির অধিকার (Right to Contract and to Property):** ইহার অর্থ হইল প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখল, বিনিময় বা দান করিবার অধিকার থাকিবে, এবং স্বাধীনভাবে সে অপরের সহিত চুক্তি করিতে পারিবে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রয়োজনেই এ অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু এ অধিকারও সীমাহীন নহে। প্রথমতঃ চুক্তি আইন-বিরোধী, শ্লীলতা বিরোধী অথবা রাষ্ট্র ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টামূলক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য প্রত্যেকের নিকট হইতে একটি আইন-সঙ্গত ও নির্দিষ্ট অংশ কর হিসাবে আদায় করিবার অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে। তৃতীয়তঃ, কোন ব্যক্তিরই অধিকার-ভোগ এ প্রকারের হইবে না, যাহাতে অপর কাহারও অধিকার ক্ষুণ্ণ বা খণ্ডিত হয়। এই উভয় যুক্তি হইতেই সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজতান্ত্রিকগণের অভিমত হইল, সমাজের সকলের সর্বাঙ্গীণ কুশলের জন্য, সমাজের সমতা আনয়নের জন্য, ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে:

(ক) সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির রূপ হইতেছে রাষ্ট্রীয়, সমবায়িক ও যুক্ত-খামারের সম্পত্তি (State, Co-operative and Collective Farm Property—শাসন তন্ত্রের ৫নং ধারা)। অর্থাৎ উৎপাদন ও বণ্টনের মূল ক্ষমতা ব্যক্তির হস্ত হইতে সমাজের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

(খ) ক্ষুদ্র কৃষকের ও ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পীর উৎপাদনের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু সে শ্রমিক হিসাবে অপরকে খাটাইয়া উপার্জন করিতে পারিবে না (শাসনতন্ত্রের ৮নং ধারা)।

(গ) নিজস্ব উপার্জন, সঞ্চয়, ব্যক্তিগত আবাসগৃহ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দ্রব্যাদি ব্যবহারে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারে সোবিয়েত নাগরিকের সম্পূর্ণ অধিকার আইনের দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত হইয়াছে। (শাসনতন্ত্রের ১০নং ধারা)।

৭। **বাক্‌স্বাধীনতা, সভা করিবার ও সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রকাশনের স্বাধীনতা (Freedom of Speech, Public Meeting and Publication):** মনের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি। নিজেকে প্রকাশ করিবার এই প্রাথমিক অধিকার ব্যতীত ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নহে। ইহার উপরেও, এ অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আত্মরক্ষার উপায়। কারণ, যথাযথ প্রকাশ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের দ্বারা অভিযোগ দূরীভূত করা সম্ভব। তাহা ছাড়া, এ সুযোগের ব্যবহারে রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষও জনসাধারণের মানসিক গতিধারা বুঝিতে পারে; সুশাসনের জন্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য। সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি খর্ব করা হয়, তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যাহা করিতেছে তাহাই সর্বত্র সঠিক। অথচ সেরূপ ধারণা করার কোন যুক্তি নাই। উপরন্তু জনতার নিকট দায়িত্বশীল সরকার হিসাবে গণতন্ত্রকে জনমতের সরকার বলা হয়। জনমতের মত প্রকাশের স্বাধীনতাই যদি না থাকে, তাহা হইলে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হইতে বাধ্য। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রশক্তির ভয় দেখাইয়া মানুষের মত পরিবর্তিত করা যায় না, তাহাকে বাহ্যত: চাপা দিয়া গোপনে বাড়িতে সাহায্য করা হয় মাত্র। উপরন্তু, মতের সংঘর্ষে শক্তি-প্রয়োগ সম্পূর্ণ অবান্তর; কারণ তাহাতে যুক্তির দৌর্বল্যই প্রমাণিত হয়, মতের নৈতিক প্রাধান্য অস্বীকৃত হয়। ইতিহাস আরও প্রমাণিত করিয়াছে যে আজিকার বিদ্রোহী মত পরবর্তী যুগে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে * সুতরাং সবদিক দিয়াই বাক্‌-স্বাধীনতাকে খণ্ডিত না করাই বাঞ্ছনীয়।

বাকস্বাধীনতার যৌক্তিকতা

কিন্তু বাকস্বাধীনতার প্রথম সীমা হইল অপরের সুনামের ও ধর্ম বিশ্বাসের অধিকার। দ্বিতীয় সীমা হইল সামাজিক শালীনতাবোধ। তৃতীয় সীমা, রাষ্ট্র-সংগঠন, সরকার ও আইন-শৃংখলা ভাঙ্গিবার সক্রিয় প্রচেষ্টা ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রতিরোধ ব্যবস্থা। বিষয়টি জটিল। কারণ, সরকারী ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধীয় প্রচার শুরু করার

বাক্‌স্বাধীনতার সীমা

*Socrates, Jesus, Roger Bacon, Copernicus, Galileo. Darwin ও Spinoza'র কথা স্মরণীয়।

অর্থ গণতন্ত্র ও প্রগতির পথ রুদ্ধ করা। অথচ, সক্রিয় আইনভঙ্গ প্রচেষ্টা নিরোধ না করার অর্থ হইল সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে অস্বীকৃতি। সুতরাং, সরকারের পক্ষে অত্যন্ত সন্তর্পিত পদক্ষেপ ব্যতীত এ অধিকার বজায় রাখা সম্ভব নহে। সরকারী হুকুম ও নির্দেশ ঘোষণা দ্বারাই নহে; নিরপেক্ষ বিচারশালায় প্রমাণ করিতে হইবে যে শুধু মতপ্রচার ছাড়াও কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে আইনভঙ্গ করা হইয়াছিল, অথবা ঐ উদ্দেশ্যে জনতাকে উত্তেজিত করা হইয়াছিল। সুতরাং সভার সমর্থক অথবা বিরোধীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে পারে এই যুক্তিতে সভা নিষিদ্ধ করা উচিত নহে।*

যুদ্ধ ও বাক্‌স্বাধীনতা

যুদ্ধের সময় বাক-স্বাধীনতার অবস্থা কি হইবে তাহাও একটি গুরুতর প্রশ্ন। স্বাভাবিক সময়ে যতখানি স্বাধীনতা থাকে, স্বভাবতঃই যুদ্ধের প্রয়োজনে তাহা নানা দিক দিয়া সংকুচিত হয়। বিশেষ করিয়া নজর রাখিতে হয় যাহাতে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ শত্রুপক্ষের নিকট পৌঁছাইয়া না যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কেই যদি কাহারও সমালোচনা থাকে, তবে সে মতের স্বাধীন প্রকাশ খর্ব করা চলিতে পারে না। যদি কেহ নীতিগতভাবে যুদ্ধের বিরোধী হয় সেও নিশ্চয়ই সে মত প্রকাশ করিতে পারিবে।১ তাহা ছাড়া, সরকারের যুদ্ধ-পরিচালনা-পদ্ধতি অথবা কূটনৈতিক কার্যকলাপ নিশ্চয়ই সমালোচনার বিষয়ীভূত। যুদ্ধের লক্ষ্য ও শান্তির প্রস্তাবসমূহকেও আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমেই যাচাই করিয়া লইতে হইবে। বাস্তব জীবনে অবশ্য যুদ্ধের সময়ে অথবা যুদ্ধের সম্ভাবনায় সরকারের তরফ হইতে অনেক সময়েই বিরোধীসত্তাকে দেশদ্রোহী ও জাতিদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া দমিত করিবার প্রচেষ্টা চলে; কিন্তু সেইরূপ ব্যাপক দমন-প্রয়াস অনেক সময়েই শুধু ব্যক্তি-স্বাধীনতাই নহে, জাতীয় স্বার্থকেও বিপন্ন করে।২

* To prohibit a meeting on the ground that the peace may be disturbed is, in fact, to enthrone intimidation in the seat of power.—Laski—A Grammar of Politics p. 122.

১ If a man think, like James Russell Lowell, that war is but an alias for murder, it is his duty to say so, however inconvenient be the time of his pronouncement. —Laski-Ibid.—P. 125.

২ "No one who has watched at all carefully the process of Government in time of war can doubt that criticism was never more necessary...An executive in war-time is, in fact, moralised only to the degree to which it is subject to critical examination in every aspect of its policy. And to penalise the critic is, if the struggle be severe, to poison the moral foundation of the State"—Laski—Ibid P. 126.

বাক্‌স্বাধীনতার আর দুইটি সীমাও সংঘিত হওয়া উচিত নহে। প্রথমতঃ বিচারাধীন মামলা চলাকালীন সে সম্পর্কে মন্তব্যের অধিকার থাকিতে পারে না। কারণ ঐরূপ আলোচনার ফলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার ক্ষুণ্ণ ও খর্বিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মন্তব্য প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং সর্বপ্রকার প্রকাশনেই লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর প্রভৃতির নামোল্লেখ প্রয়োজন।

৮। **সংগঠনের স্বাধীনতা (Right of Association) :** মানুষ শুধু রাষ্ট্রের নাগরিক নহে, শুধু পরিবারভুক্ত জীব নহে, অগণিত জনতার মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র নহে। রুজি-রোজগারের জন্য সে ব্যবসা করে, চাকুরী করে; বুদ্ধিবৃত্তির পিপাসা মিটাইতে সে সাহিত্য সভা বা বৈজ্ঞানিক বৈঠক বসায়, আলোচনা ও বিতর্কের আসর পাতে; আনন্দের তাগিদে সে খেলার দল গড়ে, সঙ্গীতের আসর জমায়, যাত্রা নাটকের দল বাঁধে; আত্মিক প্রয়োজনের প্রেরণায় সে ধর্মসভায় আসিয়া হাজির হয়। এক কথায়, মানুষের জীবনের বিচিত্র প্রেরণা, বহুমুখী চাহিদা, রূপায়িত হইতে চায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও নানা সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়া, স্থায়ী-অস্থায়ী নানাবিধ সংগঠনের মধ্যে। ব্যক্তিত্বের বিকাশই যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হয়, তাহা হইলে মানুষের এই অসংখ্য ও বিচিত্র সংগঠন গড়া ও নিজস্ব রীতি-পদ্ধতিতে নিজের কার্য-পরিচালনার স্বাধীনতা অগ্রাহ্য করিবার কোন উপায় নাই। বহুত্ববাদী দৃষ্টি হইতে এই সব সংগঠনকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। সে দাবী কোন রাষ্ট্রই স্বীকার করে না। কিন্তু সংগঠনের অধিকারও অন্যতম মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়।

৯। **সমব্যবহার পাইবার অধিকার (Right to Equality of Treatment) :** স্বাধীনতার সহিত সাম্যের অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্বোল্লিখিত অধিকারগুলি যদি সকলের পক্ষে সমান উপভোগ্য না হয়, তাহা হইলে সে সমাজে স্বাধীনতা খর্ব, খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ। সুতরাং, সে অবস্থা ধরিয়া লওয়ার পরে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইতেছে :

(ক) আইনের চক্ষে সমব্যবহার পাইবার অধিকার।

(খ) নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের মধ্যে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সর্ববিধ সুযোগ সুবিধার সম্বন্ধে সমান অধিকার।

(গ) জাতি, ধর্ম, কুল, বর্ণ, বাসস্থান, জন্মস্থান, পুরুষ-রমণী নির্বিশেষে সকলেরই এ অধিকার প্রাপ্য।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Rights): রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধাকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা যাইতে পারে। ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণ বা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের স্বাধীনতার সূত্র হইতে এ অধিকার স্বতঃসিদ্ধ-ভাবেই আসিয়া পড়ে। রাষ্ট্র তাহার আইন-কানুনের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-জীবনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাতে রাষ্ট্রের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং সেই কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। নিম্নে মূল রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারগুলি উল্লিখিত হইল:

১। ভোটদানের অধিকার (Right to Vote): আইনসভার সদস্যগণকে এবং তাহারই মাধ্যমে অথবা স্বতন্ত্রভাবে, (মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত অথবা রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে) শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে ভোটের দ্বারা নির্বাচিত করিয়া, শাসন ক্ষমতার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাহাদের অধিষ্ঠিত দেখিতে চান সে সম্পর্কে জনগণ মত প্রকাশ করেন। বৃহদাকার রাষ্ট্রে শাসকমণ্ডলীকে জনসাধারণের কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। জনসাধারণের রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণ ব্যাপকতম করিবার জন্য এ অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ, এমন কি শিক্ষা বা সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে সংকুচিত করা উচিত নহে।

২। নির্বাচিত হওয়ার অধিকার (Right to be Elected): ভোটদানের অধিকারের সাথে সাথে রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকারেরই অপর অংশ হইল নির্বাচিত হইবার অধিকার। এ বিষয়ে সকলের সমান অধিকার না থাকিলে ধরিয়া লইতে হইবে যে রাষ্ট্র পরিচালনা শুধুমাত্র বিশেষ ধরণের নাগরিকের সম্পত্তি। অবশ্য অনেক রাষ্ট্রে সরকারের সহিত ব্যবসায় সম্পর্কে জড়িত সরকারী চাকুরিয়া, বিশেষ করিয়া সামরিক বিভাগের কর্মচারীবৃন্দকে, নির্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হয় না। তাহার কারণ, সরকারী ক্ষমতার আসন হইতে তাহারা নিজস্ব সুখ-সুবিধা বাড়াইয়া লইতে তৎপর হইতে পারে। সামরিক কর্মচারীদের এ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার মূল যুক্তি হইল যে সামরিক শক্তিকে নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের সেবা করিবার নিমিত্ত, রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি ও বিবাদ বিসংবাদ হইতে সম্পূর্ণ দূরে রাখা প্রয়োজন। সোবিয়েত ইউনিয়নে এবিষয়ে কিছুটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ব্যক্তিগত ব্যবসার সেখানে স্থান নাই এবং সমাজের একটা বিরাট অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। সুতরাং সরকারী কর্মচারীকে নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা চলে না। সামরিক কর্মচারীরাও

সেখানে আইনসভায় নির্বাচিত হইবার অধিকারী। সোবিয়েত রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সামরিক বাহিনীর নিরপেক্ষতা ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী বলিয়া গণ্য করা হয়। ঐ মতে সামরিকবাহিনী মূলতঃ শোষক, তথা শাসকশ্রেণীর প্রতি প্রচণ্ড পক্ষপাতিত্বপুষ্ট; নিরপেক্ষতা নিতান্তই শাসকদিগের অন্তর্দ্বন্দ্বতার বিষয়ে প্রযোজ্য এবং এই তথাকথিত নিরপেক্ষতার নামে সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রনীতি হইতে বিভিন্ন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য হইল সামরিক বাহিনীর সাধারণ কর্মচারীকে দেশের দরিদ্র ও শোষিত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা হইতে দূরে রাখা। সুতরা সোবিয়েত ইউনিয়নে যেহেতু এই শ্রেণীবিভেদ নাই এবং যেহেতু জনসাধারণের সহিত সামরিক বিভাগের স্বাভাবিক ঐক্য রহিয়াছে, সেজন্য সৈন্যবাহিনীর কর্মচারীদিগের নির্বাচিত হইবার পথে বাধা নাই।

৩। **সরকারী চাকুরীতে নিয়োগাধিকার (Right to Public Office) :** পূর্ববর্তী যুক্তির অনুসরণেই এ অধিকার স্বীকৃত হয়। যুক্তির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

৪। **আবেদন করিবার অধিকার (Right to Petition):** আইন প্রণয়ন বিভাগ অথবা কার্যকরী বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্তিগতভাবে অথবা যৌথভাবে আবেদন করিবার অধিকারও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হিসাবে দীর্ঘকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

৫। **প্রবাসী নাগরিকের নিরাপত্তার অধিকার (Right to Protection in a foreign Country):** নিজ রাষ্ট্রে বাস করিবার সময়ে নিরাপত্তার অধিকারের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু, রাষ্ট্রের দায়িত্ব ঐখানেই সমাপ্ত হইয়া যায় না। বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি অন্যায় বা অবিচার ঘটিলে সরকার তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করিবে—প্রবাসী নাগরিকগণের এ অধিকার স্বীকৃত হয়।

৬। **অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার (Economic and Cultural Rights):** যুগে যুগে অধিকার সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। অধিকারকে আইনসঙ্গত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার প্রথম যুগে মানুষ স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার কথাতেই সন্তুষ্ট ছিল। পরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইল রাষ্ট্রের তথাকথিত কর্মনাশা হস্তক্ষেপ হইতে মুক্তির অধিকারের উপর। কিন্তু ক্রমেই যত দরিদ্র জনসাধারণের বক্তব্য রাষ্ট্রনীতিতে সোচ্চার হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই দাবি উঠিতে লাগিল,—

রাষ্ট্রকে সক্রিয় হইয়া সমাজ-জীবনের অন্তঃপ্রবিষ্ট অন্যায়কে দূর করিয়া মানবতা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। প্রথম পর্যায়ে ছিল স্বাধীনভাবে নিজস্ব রুজি-রোজগারের বিঘ্ন অপসারিত করিতে হইবে। ইহা মূলতঃ ফিউডাল ও মার্কেণ্টাইলিস্ট (Feudal and Mercantilist) বাধা নিষেধের অপসারণের দাবি ছিল। পরের পর্যায়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার শোষণ ও অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে দাবি নূতন অধিকারের রূপ লইয়া আবির্ভূত হইল। এই অধিকারগুলির প্রধান কয়েকটি নিম্নে আলোচিত হইল।

১। কর্মের অধিকার (Right to work): ইহার নেতিবাচক দিক হইল, স্বাধীন-রুজি রোজকারের প্রতিবন্ধক দূর করা। কিন্তু অস্তিবাচক দিক হইতে ইহা প্রত্যেকের কর্ম পাইবার অধিকারে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে নিজ দায়িত্বে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, দেখিতে হইবে যেন কেহ বেকার না থাকে। যদি প্রত্যেকের জন্য কর্মের ব্যবস্থা সম্ভব না হয়, তবে বেকারদিগকে ভাতা দিতে হইবে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেককেই তাহার অভীপ্সিত কর্মসংস্থান করিয়া দিতে হইবে, কারণ, বিশেষ ধরণের কার্যে বিশেষ যোগ্যতার প্রশ্ন সর্বদাই থাকিবে। লক্ষ্যণীয় বিষয়, যে এ অধিকার সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক দেশেই আইনসঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

২। উপযুক্ত বেতন পাইবার অধিকার (Right to an Adequate Wage): শুধু কর্মসংস্থানই যথেষ্ট নহে, সভ্য মানুষের জীবন ধারণোপযোগী যথোপযুক্ত বেতনেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। সপরিবারে ক্ষুধার্ত মানুষের নিকট ব্যক্তিত্ববিকাশের কাহিনী পরিহাসমাত্র। মানুষ বলিয়াই শ্রমিককে কর্মে নিয়োগ করা হয়; মানুষ হিসাবে থাকিবার মত বেতন তাহার নিশ্চয়ই প্রাপ্য।*

৩। পরিশ্রমের যুক্তিসঙ্গত সময় নির্ধারণের অধিকার (Right to Reasonable Hours of Work): পূর্ববর্তী যুক্তির অনুসরণেই এ দাবির আবির্ভাব।

৪। শ্রমিকের শিল্প পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার (Right of Labour to participate in Management): ল্যাস্কি বলিতেছেন যে আধুনিক শিল্প জগতে এ অধিকার প্রয়োজন দুই কারণে : প্রথমতঃ, শিল্প পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার তাৎপর্য হইল যে শ্রমিকের ভাগ্যনির্ধারণের ব্যাপারে তাহার নিজস্ব করণীয় কিছু করিবার সুযোগ সে পাইল এবং এ সুযোগের মাধ্যমে স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়া তাহার

*The labourer is worthy of his hire because he is a human being. He must receive the reward which makes possible the realisation of humanity, —Laski—Ibid. P. 110

পক্ষে সম্ভবপর হইল ; দ্বিতীয়তঃ, সম্পত্তির মালিকানা আধুনিক শাসন ব্যবস্থার উপর যেরূপে প্রভাব বিস্তার করে, তাহাতে এই সম্পত্তি পরিচালনায় শ্রমিকেরও কিছু অংশ থাকা প্রয়োজন *

৫। **শিক্ষার অধিকার (Right to Education) :** শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবাস্তব হইয়া দাঁড়ায়। সকলের এক শিক্ষা নহে, কিন্তু গুণ অনুযায়ী শিক্ষা এবং সকলের সর্বনিম্ন শিক্ষা (সে মান যথাসম্ভব উচ্চ হয়, ততই মঙ্গল), ইহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা সকল রাষ্ট্রেরই কর্তব্য।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

একের অধিকার অপরের অধিকার খর্ব করে ; এমন কি একটি নির্দিষ্ট অধিকার অপর এক জাতীয় অধিকারকে খণ্ডিত করিতে পারে। যেমন—নিম্নতম মজুরির আইনের মারফত শ্রমিককে যেমন সর্বনিম্ন মজুরী দাবি করিবার অধিকার দেওয়া গেল, তেমনি সেই সঙ্গে শ্রমিক ও মালিকের স্বাধীন চুক্তি মারফত নিম্নতর মজুরী স্থির করিবার অধিকার অস্বীকৃত হইল। সুতরাং কোন্ রাষ্ট্রে কোন্ অধিকার রক্ষিত হয়, তাহা জানিলে পর সেই রাষ্ট্রের চরিত্র, শাসক সম্প্রদায়ের সামাজিক বিবেকের সীমা ও জনচেতনার ব্যাপ্তি পরিমাপ করা সম্ভব। ইহা সম্ভব আরও এই কারণে যে অধিকার উপরতলার দান হিসাবে আসে না ; রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকার স্বীকৃতির পশ্চাতে থাকে এই অধিকারের অনুপস্থিতির ফলস্বরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অসুবিধা, জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর অভাববোধ এবং ইহার স্বীকৃতির জন্য দীর্ঘকালীন সংগ্রামের ইতিহাস। সেইজন্যই অধিকারকে শুধুই রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও রক্ষিত সুবিধা বলিয়া বিচার করা যথেষ্ট নহে, গতিশীল সমাজে পরিবর্তনশীল অধিকারের সমন্বয় হিসাবে ইহাকে দেখিতে হইবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অধিকারগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় : : প্রথমতঃ, কতকগুলি অধিকার, যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এইগুলি সাধারণতঃ লিখিত বা অলিখিত শাসনতন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। কোথাও বা এইগুলি বিশেষ সনদ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। (Charter of Rights or Bill of Rights)। মূলকথা হইল এই যে রাষ্ট্র ইহাকে

*The right to a representative government in industry is the right to channels through which, in the necessary toil of life, the personality of the worker may find expression. In a democratic system it is impossible to maintain political freedom with industrial autocracy. Laski—Ibid P. 113

নাগরিকের জীবনের মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ব্যতীত এই অধিকারে হস্তক্ষেপ সম্ভব নহে; আইনসভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার খেয়ালে ইহাকে পাল্টানো যাইবে না। দ্বিতীয়, গোষ্ঠীর অধিকারগুলি মৌলিক অধিকারের মর্যাদা না পাইলেও আইনের দ্বারা স্বীকৃত ও বিচারশালার মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য। তৃতীয়, গোষ্ঠীর অধিকারগুলিকে অনেকে অধিকার বলিয়াই স্বীকার করিবেন না; কারণ, এইগুলি এখনও দাবি হিসাবেই সমাজ জীবনে উদ্ভূত হইয়াছে, আইন রূপে রাষ্ট্রে স্বীকৃতি লাভ করে নাই, আইনজ্ঞর দৃষ্টিতে ইহারা অপাংক্তেয় থাকিলেও ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য ইহাদের প্রয়োজন আছে কি না —এই নিরিখে বিচার করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করিবেন, এগুলি অধিকারের মর্যাদা পাইতে পারে কি না।

ব্রিটেনে শাসনতন্ত্র অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয়। অন্যান্য আইনের সহিত শাসনতান্ত্রিক আইনের পার্থক্য না থাকিলেও, সেখানে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়: (১) জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনপরিষদের প্রাধান্য; (২) বিচারকমণ্ডলীর নিরপেক্ষতা, (৩) জুরী প্রথার সাহায্যে বিচার (Trial by Jury); (৪) Habeas Corpus আইন দ্বারা বিনাবিচারে বন্দী না করিবার নিরাপত্তা, বিধিসঙ্গত হুকুমনামার (Legal Warrant) সাহায্যে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা, দ্রুত বিচারপদ্ধতি; (৫) পুলিশী কর্তৃত্বের আইনসঙ্গত প্রয়োগ, ইত্যাদি।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল না; কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে একসঙ্গে দশটি সংশোধনীর দ্বারা এ ভ্রম সংশোধন করিতে হয়। এ দশটি অধিকারের প্রথম আটটিই ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত। এই সংশোধনীগুলির সাহায্যে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে; ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশের স্বাধীনতা, অভিযোগ নিরাকরণের জন্য আবেদন করিবার অধিকার, অস্ত্রধারণের স্বাধীনতা (Right of the people to keep and bear arms), সামরিক বাহিনীর বে-আইনী হস্তক্ষেপ হইতে নিরাপত্তা, বে-আইনী অনুসন্ধান বা দখলীকরণ হইতে নিরাপত্তা, বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত অধিকার, সম্পত্তির নিরাপত্তা, জুরীপ্রথার বিচারব্যবস্থা, প্রভৃতি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনীর দ্বারা নাগরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা আরও সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত হইয়াছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রের দশম অধ্যায়ে শুধুই নাগরিকদের মৌলিক

অধিকার ও কর্তব্য বর্ণিত হইয়াছে এবং অধিকারগুলি কোন ব্যবস্থার সাহায্যে সংরক্ষিত হইবে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকারগুলি মূলতঃ নিম্নরূপ : কর্মের অধিকার, কর্মানুযায়ী বেতনের অধিকার, বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকার, বার্ধক্য অসুস্থতা ও শারীরিক অক্ষমতায় (Disability) রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্ত্রীলোকের সর্বব্যাপারে সমানাধিকার, জাতি ও কুল নির্বিশেষে সমানাধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-শোভাযাত্রার স্বাধীনতা, সংগঠনের অধিকার, ব্যক্তিগত ও পরিবারের নিরাপত্তার অধিকার (Inviolability of person and homes of citizens), প্রভৃতি।

ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে শুধু মৌলিক অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে। বিশদ আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া যে প্রধান সাতটি বিভাগে এই অধিকারগুলি লিখিত হইয়াছে তাহারই উল্লেখ করা হইল : (১) সমব্যবহারের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার, (৫) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত অধিকার, (৬) সম্পত্তির অধিকার ও (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

কিন্তু শাসনতন্ত্রে কোন কোন অধিকার লিপিবদ্ধ হইল তাহা দিয়াই অধিকারসমূহের পবিত্রতা যাচাই হয় না। আইনের আসল বিচার তাহার ব্যবহারে। সুতরাং স্বাধীনতা ও সাম্য কোথায় কতটুকু বজায় রহিয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে শাসনব্যবস্থার জীবন্ত রূপের বিশ্লেষণ দ্বারা।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty)

যে স্বাধীনতা বা সাম্যের উপর এতখানি গুরুত্ব অর্পণ করা হইল, রাষ্ট্রের মধ্যে কি করিয়া তাহার নিরাপত্তা বিধান করা যাইবে তাহা দীর্ঘকাল হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণকে চিন্তান্বিত করিয়াছে। লক্, মঁতেস্কো প্রভৃতি লেখকগণ ক্ষমতাবিভাজনের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া দেখা গিয়াছে যে, এ বিভাজন সম্ভব নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। সে কারণে আধুনিক চিন্তানায়কগণ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির উপরই প্রাধান্য দিয়া থাকেন :

১। আইন হিসাবে অধিকারের স্বীকৃতি প্রয়োজন। কারণ, বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে আইনকে কার্যকরী করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করা সম্ভব।

২। ঐ যুক্তিতেই মৌলিক অধিকারগুলির শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি অপরিহার্য। শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলে সাময়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অধিকারগুলির বিপদাপন্ন

হইবার আশঙ্কা থাকে না। বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘুদিগের নিরাপত্তাবিধানের জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৩। আইনের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত বিচার ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী ও ন্যায্য বিচারপদ্ধতি। ক্ষমতা বিভাজন সামগ্রিকভাবে সম্ভব না হইলেও, বিচারবিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ অপরিহার্য। একই ব্যক্তির হস্তে যদি শাসন পরিচালনা ও বিচারের ভার থাকে তাহা-হইলে ন্যায় বিচার পাওয়া দুঃসাধ্য। শাসকের অন্যায়ের প্রতিকার হইবে না; উপরন্তু তাহার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী শাসকের মনোভাব দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিবে। শুধু স্বতন্ত্রীকরণ নহে, চাকুরির নিরাপত্তা, (খ) তাহাদের বেতন ও পদোন্নতির নিশ্চয়তা। কারণ, বিচারক যদি তাঁহার চাকরি সম্বন্ধে আইনসভা, শাসনমণ্ডলী বা জনমতের ক্রোধ উপেক্ষা করিবার অবস্থায় না থাকেন, তাহা হইলে নির্ভীক ন্যায়বিচার আশা করা চলে না। এই যুক্তিতে অনেকের মতে চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর বিচারককে অন্য কোনরূপ লাভজনক কাম্য পদে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

৪। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসক জনতার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। সুতরাং জনসাধারণের অধিকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই সর্বোৎকৃষ্টরূপে রক্ষিত হইবে বলিয়া ধরা যায়। কারণ, যাঁহাদের ক্ষমতার আসনে স্থান পাইবার জন্য বারবার জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে, তাঁহারা পারতপক্ষে নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা জনসাধারণের বিক্ষোভ জাগাইবেন না।

৫। তথাপি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রেও জনসাধারণের অধিকার রক্ষিত হইবে না, যদি সজাগ, সচেতন জনমত সর্বদা এই অধিকার রক্ষার জন্য উদ্যত না থাকে। নিরন্তর নিদ্রাহীন সাবধানতার দ্বারাই স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয়। এই সজাগ সাবধানতার প্রয়োজন আরও এই কারণে যে, স্বাধীনতা কখনও খণ্ডিতভাবে উপভোগ করা যায় না। সমাজের কিছু অংশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত যদি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে, তবে বাকি অংশের স্বাধীনতাও ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইবে। লিংকন (Lincoln) বলিয়াছিলেন, "আধা-স্বাধীন ও আধা-ক্রীতদাস সরকার স্থায়ী হইতে পারে না"—"**I believe this government cannot endure permanently half-slave and half-free...It will become all one thing or all the other.**")। লিংকনের সে সাবধানবাণী আজও সমান সত্য ও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ল্যাস্কির মতে জনসাধারণের স্বাধীনতার নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত তিনটি বিশেষ ব্যবস্থা অপরিহার্য।

(ক) সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধা বা স্বত্বের (Special privilege) অবসান ঘটাইতে হইবে।*

(খ) অর্থনৈতিক অধিকারের অভাবে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন, অবাস্তবতায় পরিণত হইতে পারে ; সুতরাং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব যাহাদের হস্তে তাহাদের উপর যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।**

(গ) সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মধারা পক্ষপাতশূন্য হওয়া অপরিহার্য।†

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য (Duties to the State)

দায়িত্ব বা কর্তব্যের কথার উল্লেখ না করিয়া স্বাধীনতার আলোচনার সমাপ্তি টানা সম্ভব নহে। কারণ, আমার স্বাধীনতা অপরে মানিয়া চলিবে—ইহা ধরিয়া লওয়া যায় তখনই, যখন আমিও অপরের স্বাধীনতার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান দেখাইতে প্রস্তুত। ইহা আমার দায়, সকলের দায়। অনুরূপভাবে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আমার এই অধিকার বজায় রাখিতেছে, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বজায় রাখাও আমার দায়িত্বের অন্তর্গত। আমি যদি রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করি, তবে অপরে আমার অধিকার রক্ষার্থ নির্দেশনামা মানিবে তাহা বিশ্বাস করিবার কি কারণ আছে? আমি যদি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করি, তবে সেই দুর্বল রাষ্ট্র আমার অধিকারকে অপরের বিরুদ্ধে বজায় রাখিতে পারিবে তাহাই বা কি করিয়া চিন্তা করা যায়? সমাজবদ্ধ মানুষ হিসাবে, যে সমাজ আমাকে লালিত, পুষ্ট ও বর্ধিত করিয়া আসিল, আমার জীবন, আমার পরিবার, আমার ভাষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা যে সমাজজীবনের রসে সঞ্জীবিত, তাহার সম্বন্ধে দায়িত্ব শুধু উপকারিতার প্রতিদান হিসাবেই

*Freedom..for the mass of men..can never, firstly, exist in the presence of special privilege. Laski—Ibid. p. 149.

**.."While I seem to enjoy political freedom, the absence of economic freedom may in fact, render illusory my hope of a harmony of group of impulses. At every point, therefore, where the action of a man or group of men may impinge upon the exercise of rights, a control is wanted which will frustrate their power so to impinge." Laski—Ibid—P. 151.

†"All this is to assume, thirdly, that the incidence of State action is unbiassed. Laski—Ibid. p. 151.

মাপা চলে না, সে দায়িত্ব আরও মহৎ ও গভীর। সমাজ ও রাষ্ট্র এক না হইলেও, সমাজের প্রতি দায়িত্ব হইতেই রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব উদ্ভূত হয়। সুতরাং দায়িত্ব বা কর্তব্যের ভার প্রত্যেকটি মানুষের উপরেই বর্তাইয়াছে। মূল দায়িত্বগুলি নিম্নরূপ।

১। আইনের অনুবর্তিতা: আইন নাগরিকের অধিকারকে ও রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মধারাকে রূপ দেয়। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিককেই আইন মানিয়া চলিতে হইবে।

২। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য: রাষ্ট্রব্যবস্থা এই আনুগত্যের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে। আনুগত্য বাস্তবে নিম্নরূপ দাবির আকারে নাগরিকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে: (ক) যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের পক্ষে সৈন্যদলে যোগ দান; (খ) সরকারী কর্মচারীবৃন্দের কর্তব্যপালনে সহায়তা; (গ) সৎভাবে ভোট প্রদান, সৎভাবে রাষ্ট্রীয় পদের ব্যবহার, প্রভৃতি কর্তব্য পালন।

৩। যথাযথ কর প্রদান: সরকারী কর্মধারায় ব্যয় নির্বাহার্থ জনসাধারণের কর প্রদান অপরিহার্য।

পূর্বে শাসনতন্ত্রে সাধারণতঃ কর্তব্যের কথা লিখিত হইত না। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ রহিয়াছে। উপরোক্ত কর্তব্যের উপরেও সেখানে শ্রম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক নিয়ম মানিয়া চলা ও সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করার বিধান স্থান পাইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, অথবা দেশদ্রোহিতার জন্য গুরুতর দণ্ডের নির্দেশ রহিয়াছে।

অতিরিক্ত পাঠ্য

LASKI :—A Grammar of Politics.

,, —Liberty in the Modern State.'

MACIVER—The Modern State.

LIPSON—The Great Issues of Politics.

GETTELL—Readings in Political Science.

J. S. MILL—On Liberty.

দ্বাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

(End and Purpose of the State)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ভাববাদী (Idealists) ও রাষ্ট্রের জীববাদী ব্যাখ্যাতাগণ রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতেছে জাতীয় সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ। এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিকে ও তাহার স্বাধীনসত্বাকে অস্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় উন্নতির সহিত বিশ্বের অন্যান্য জাতির মঙ্গলসাধনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। উপরোক্ত মতবাদ আন্তর্জাতিকতার দাবি, যথা—বিশ্বশান্তি ও অন্য জাতির উন্নতির দাবি মানিয়া লইতেছে না। সুতরাং ভাববাদিগণের মতবাদ অপরিবর্তিতভাবে মানিয়া লওয়া যায় না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা ও ব্যক্তির উন্নতির অনুকূল সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। এই মতবাদটিও ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমতঃ, এই নীতির সমর্থকেরা সমষ্টি অথবা রাষ্ট্র ও জাতীয় দাবীকে উপযুক্ত মূল্য, দিতেছেন না। তাহারা ব্যক্তিসর্বস্ব স্বার্থপর নীতির প্রবর্তক। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিকতা আধুনিক জগতে বাস্তব সত্য। তাহারও স্বীকৃতি এই নীতির মধ্যে পাওয়া যায় না।

এই দুইটি মতবাদের সামঞ্জস্য সাধন করিলে এবং আন্তর্জাতিকতার দাবি স্বীকার করিয়া লইলে আমরা একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ গঠন করিতে পারি।

মানব স্বাধীনতা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্বীকার করিয়া যদি রাষ্ট্র জাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলে অগ্রসর হয়, তবেই রাষ্ট্র আদর্শ লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবে। ইহাই আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।]

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উচ্চস্তরের আলোচনা। এই আলোচনার সহিত রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও স্বরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। শেষ বিশ্লেষণে রাষ্ট্রের যে প্রকৃতি ও স্বরূপ আমাদের কাছে ধরা দেয় তাহারই উপর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ভর করে। প্রতি ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য যেমন তাহার প্রকৃতি বা স্বভাবের উপর নির্ভরশীল, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও স্বরূপের সহিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও স্বরূপ' অধ্যায়ে এই বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ আলোচিত হইয়াছে। তাহার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। এইটুকু বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সেই মতবাদগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত। প্রকৃতির উপর উদ্দেশ্য নির্ভরশীল

(১) এক শ্রেণীর লেখকগণ রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দিয়া ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করিতেছেন। তাহাদের মতে একমাত্র রাষ্ট্রেরই চরম মূল্য আছে। রাষ্ট্রই মনুষ্যজীবনের চরম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ইহাকে সেবা করিয়া, ইহার অঙ্গ-রূপে সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই ব্যক্তি আপন জীবনের সম্ভাবনাকে পরিস্ফুটিত করিতে এবং সত্যকার মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেগেল প্রভৃতি ভাববাদী দার্শনিকেরা ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জীববাদ তত্ত্বে বিশ্বাসিগণের মধ্যে অনেকে (শাফ্‌ল, গাম্‌প্লাউইটস্‌ প্রভৃতি) রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রই একমাত্র সত্য, তাহারই সত্তা আছে। ব্যক্তি রাষ্ট্রের অংশ ব্যতীত কিছুই নহে, বৃক্ষপত্র যেমন বৃক্ষের অংশ। তাহারা আরও বলেন যে, সমগ্র বৃক্ষের জীবনধারণ ও পরিপুষ্টির অনুকূল খাদ্য ও পরিবেশ যেমন বৃক্ষপত্রের পক্ষেও সর্বাংশে উপকারী, তেমনি রাষ্ট্রের রক্ষা, সমৃদ্ধি ও আদর্শলাভের পরিপোষক আইন-নীতি ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। ব্যক্তির রাষ্ট্র হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের মঙ্গলেই তাহার মঙ্গল। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি জাতীয় রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্রের বা জাতির সামগ্রিক সম্ভাবনা ও জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং সম্পূর্ণতা সাধন রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য।

জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

এই আদর্শটি দুইদিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ। (ক) প্রথমতঃ ইহার মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার স্থান নাই। জাতি অথবা সমষ্টি ব্যক্তি বা ব্যষ্টিকে গ্রাস করিয়াছে। তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে এই শ্রেণীর মতবাদীরা পরাঙ্মুখ নহেন। জাতীয় রাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন সময় আসিতে পারে,যখন ব্যক্তিকে সানন্দে তাহার জীবন-ধন পরিত্যাগ করিতে হইবে দেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বিষয়ক আলোচনায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা অযৌক্তিক। ব্যক্তির ন্যায্য স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়া জাতীয় উন্নতি, জাতীয় সম্ভাবনার পরিপূর্ণ পরিস্ফুরণ সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বিষয়ক পূর্বোক্ত আদর্শ এই কারণে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতা অপরিহার্য। জাতীয় উন্নতি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এই আদর্শে জাতির জীবন-বিকাশের কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আন্তর্জাতিকতার উদার ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। ইহার ফলে জাতি-

এই আদর্শের সমালোচনা: (ক) ইহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নাই।

(খ) ইহাতে আন্তর্জাতিকতার স্থান নাই

বিরোধ ও সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। এই জন্য উপরোক্ত আদর্শটি অপরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা যায় না।

(২) রাষ্ট্রের স্বরূপ বিষয়ে আর একদল মতবাদিগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। তাঁহারা বলেন যে, বুদ্ধি ও চেতনশীল মানুষই রাষ্ট্রে একমাত্র সত্য, এবং সবার উপরে সত্য। রাষ্ট্র ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র; রাষ্ট্রের পৃথক সত্তা নাই। তাই রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা; ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিয়া, ব্যক্তির স্বার্থে তাহার জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ পরিবেশ প্রস্তুত করাই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। হব্‌স্‌, লক্‌, হামবোলড্‌, বেন্‌থ্যাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বিষয়ক এই মতবাদও ত্রুটিপূর্ণ। ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য অপরিসীম। কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতার সংকীর্ণ স্বার্থে রাষ্ট্রের সামগ্রিক জীবনকে বিসর্জন দেওয়া চলে না। ব্যষ্টির মূল্য আছে সত্য, কিন্তু সমষ্টিকেই বা অস্বীকার করা যায় কি হেতুতে? জাতীয় সংকট মুহূর্তে, এমন কি তাহা ব্যতীত শান্তির সময়েও রাষ্ট্র বা জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তিকে নানা অসুবিধা ও অভাব মানিয়া লইতে হয়। যুদ্ধের সময় জাতীয় সম্মান, মর্যাদা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে ব্যক্তিকে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়। ভারতবর্ষে পরিকল্পনাগুলি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নানা ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা সীমিত হইয়াছে। এই মতবাদটি জাতি বা রাষ্ট্রের সমষ্টিগত সত্তা অস্বীকার করিতেছে। ইহা জাতীয় অধিকার ও দাবি মানিয়া লইতেছে না বলিয়া ইহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না।

সমালোচনা: (ক) এই মত রাষ্ট্রের সামগ্রিক জীবন সম্বন্ধে উদাসীন

দ্বিতীয়তঃ, প্রথমোক্ত নীতিটির মত এই মতবাদেও আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনীয়তা সর্বক্ষেত্রে সম্যকরূপে স্বীকৃত হইতেছে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে আধুনিক কালে মানব-অধিকারগুলি রক্ষা করিতে হইলে যেমন রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তেমনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তিও অপরিহার্য। আধুনিক সভ্যতার যুগে প্রতি ব্যক্তি জাতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক বটে, কিন্তু বিশ্বের সহিত তাহার যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই দিক হইতেই রাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদ্দেশ্য পুরাপুরি মানিয়া লওয়া যায় না।

(খ) এই মতবাদে আন্তর্জাতিকতার দাবি স্বীকৃত হয় নাই

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, উপরোক্ত দুইটি মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিত রহিয়াছে। মানবসভ্যতার বিবর্তন হেতু তিনটি সত্তা আজ বাস্তবরূপে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। (১) জাতীয় রাষ্ট্র; (২) ব্যক্তি; (৩) আন্তর্জাতিক জীবন। এই তিনটিকে এবং এই তিনের সহিত সংশ্লিষ্ট অধিকার ও দাবিগুলিকে স্বীকার করিতে হইবে। রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধীয় নীতির মধ্যে এই ত্রিয়ার অধিকার ও চাহিদাকে স্থান দিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিব।

রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের তিনটি উপাদান

এই দৃষ্টিকোণ হইতে নিম্নলিখিত নীতি স্বীকৃত হইতে পারে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ন্যায্য অধিকার মানিয়া লইয়া জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন সাধনই আধুনিক রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বর্তমান পৃথিবীতে এই মতবাদ নীতিগতভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম যে আধুনিক যুগে দেখা যায় না তাহা নহে। ইটালী ও জার্মানীর ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী দল যথাক্রমে দুইটি দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি পদদলিত করিয়া স্বৈরাচার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিকতার আদর্শ তাঁহারা সরাসরি অগ্রাহ্য করিতেন এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের জন্য তাঁহারাই প্রধানতঃ দায়ী। যে আদর্শ আলোচিত হইল, তাহা রাষ্ট্র দর্শনের অন্তর্গত; বাস্তবক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইলেও নীতি হিসাবে এই মতবাদ গ্রহণে কোন বাধা নাই। বর্তমান জগতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। আণবিকযুগে শান্তি বিঘ্নিত হইলে মানব সভ্যতা বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। জাতিসমূহের পরস্পর নির্ভরতার জন্য আধুনিক যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় কোন দেশ আপন সম্ভবনাকে পরিপূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে পারে না। তাই শান্তির জন্য উদগ্র প্রচেষ্টা প্রতি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতি পরস্পর নির্ভরশীল। এইরূপ অবস্থায় কোন রাষ্ট্রই অবশিষ্ট পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সুতরাং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও প্রতিরাষ্ট্রের কাম্য। তৃতীয়তঃ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতা মানুষের নৈতিক উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ। যে রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় না, সেখানে মানুষ নিজের সৃজনী ক্ষমতাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে না; স্বাধীনতার অভাবে তাহার মধ্যে

বাস্তব প্রকৃত হিসাব

দাস-সুলভ মনোভাব প্রবল হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে সুখী জীবন ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ অসম্ভব হইয়া উঠে। তাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া প্রয়োজন।

প্রতি দেশে রাষ্ট্র রাষ্ট্রান্তর্গত নাগরিকগণের জীবনকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের হস্তে বিরাটক্ষমতা রহিয়াছে। এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বা জাতির সামগ্রিক জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। আধুনিককালে রাষ্ট্র নাগরিক জীবনে নানা ক্ষেত্রে উন্নতিবিধানকল্পে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করিতেছে। অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ —সকল ক্ষেত্রই রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধির মধ্যে আসিয়াছে। রাষ্ট্রকে এই সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার দ্বারা জাতীয় জীবন সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। আন্তর্জাতিকতা ও স্বাধীনতার ন্যায্য দাবি স্বীকার করিয়া রাষ্ট্র যদি জাতীয় জীবনকে সব দিক দিয়া বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে, তবেই বলিতে হইবে রাষ্ট্র তাহার আদর্শ লাভ করিয়াছে। বর্তমানকালে মানব সভ্যতার ইহাই দাবি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র

(The Theory of the Sphere of State Action or the Theory of State Functions)

[রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষ যেমন ব্যবহারিক জীবনে উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইয়া, সেই অনুযায়ী কর্ম করিয়া যায়, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রও তাহার উদ্দেশ্য অনুসারে কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর উদ্দেশ্য নির্ভর করে। আবার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র স্থির হয়। তাই রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) প্রাথমিক বা অপরিহার্য কর্মক্ষেত্র এবং (২) ইচ্ছাধীন কর্মক্ষেত্র। আইনশৃঙ্খলারক্ষা রাষ্ট্রের-প্রাথমিক কর্তব্য। রেল, বন্দর নির্মাণ, শ্রমিক কল্যাণ সাধন প্রভৃতি ইচ্ছাধীন কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রের কর্মপন্থার পরিসর বিভিন্ন প্রকারের ছিল। রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্নতার দরুণই এই পার্থক্য দেখা গিয়াছে। গ্রীকযুগে রাষ্ট্র ছিল সমাজ-কল্যাণধর্মী; ব্যক্তির অস্তিত্ব সেখানে প্রায় বিলুপ্ত। রোমক যুগে আইনতঃ কতকগুলি ব্যক্তি-অধিকার মানিয়া লওয়া হইল। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিশেষ সঙ্কুচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে রাষ্ট্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিস্তার লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাধীনতার তাগিদে পুনরায় রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সঙ্কুচিত হইতে থাকে। আবার উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বাড়িতে থাকে। কারণ, দেখা যায় যে রাষ্ট্রের কর্মপরিধির সঙ্কোচনের ফলে সমাজে শোষিত শ্রেণীর দুর্দশার অন্ত নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও পরে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিশেষ বিস্তৃত লাভ করে এবং ক্রমে রাষ্ট্র কল্যাণধর্মী সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে সমাজে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহার দরুণ রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপন কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তার করিতে হয়।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতিগুলি প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) নৈরাজ্যবাদ (২) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, (৩) ভাববাদ, (৪) সমষ্টিবাদ। সমষ্টিবাদকে (১) জনকল্যাণ নীতি; (২) ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ ও (৩) সমাজতন্ত্রবাদ—এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্বশেষে সমাজতন্ত্রবাদকে: (১) খ্রীষ্টিয় সমাজতন্ত্রবাদ; (২) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ; (৩) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ; (৪) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ; (৫) সমিতিমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, এবং (৬) রাষ্ট্রহীন সংঘ-ভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ—এই ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।]

মানব সভ্যতার নিরন্তর বিবর্তন চলিতেছে। তাহার সহিত তাল রাখিয়া রাষ্ট্রও

বিবর্তিত হইতেছে। ইহার ফলে রাষ্ট্র মানবসমাজে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছে। রাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি ইতিহাসের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবীকালে পরিবর্তিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাষ্ট্র বর্তমান পৃথিবীতে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, রাষ্ট্রের যে রূপ ও প্রকৃতি ইতিহাসে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহারই সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচিত হইতে পারে।* আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি অর্থাৎ ব্যক্তি ও রাষ্ট্র অথবা জাতি এবং সমগ্র মানবসমাজের পরম কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের চরম আদর্শ ও লক্ষ্য।

ব্যক্তি জাতি ও মানব-কল্যাণ সাধনের পরিবেশ সৃষ্টি রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য

এই আদর্শলাভ করিবার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ নানা পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। এই পন্থাসংক্রান্ত নীতিসমূহকে Theory of State Functions বলে। বিকল্পে ইহাকে The Theory of the Sphere of State Action বা Theory of State Intervention অথবা Theory of State Interferenceও বলা হইয়া থাকে।

এই আলোচনার তিনটি দিক লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক কালে রাষ্ট্র কার্যতঃ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশুদ্ধ আদর্শ ও নীতির আলোচনা।

রাষ্ট্রের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ

রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) মৌলিক কার্যাবলী: কতকগুলি কর্তব্য রহিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এই সকল কর্তব্য সম্পাদনের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সেইজন্য মৌলিক কর্তব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উড্রো উইল্‌সন্ ইহাকে Constituent Functions আখ্যা দিয়াছেন। আবার অনেকে ইহাকে Primary (প্রাথমিক) অথবা Essential (অপরিহার্য) বা Fundamental (মৌলিক) Functions আখ্যা দিতেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই কর্তব্যগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন, কারণ এই কর্তব্যগুলি সুসম্পন্ন না হইলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। তাই এই কার্যাবলী রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই কর্তব্যগুলি (ক) এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

(১) মৌলিক কার্যাবলী

* এই সূত্রে সপ্তম অধ্যায়ে রাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সম্পর্ক, (খ) রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ ও (গ) ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ক। আধুনিক জগতে প্রতিটি রাষ্ট্রের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করা প্রয়োজন। যুদ্ধকালে শত্রুর আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য। শান্তির সময়েও অন্য রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন বাঞ্ছনীয়। ইহা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্যের অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি রাষ্ট্রে নাগরিকগণের অধিকার রহিয়াছে। এই সকল অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করা ও রক্ষা করার জন্য সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রণয়ন রাষ্ট্রের কর্তব্য। তৃতীয়তঃ ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির অধিকারগত সম্বন্ধ নির্ধারণও রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য।

এই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে পুলিশ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকে, আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, দেওয়ানী (Civil Law) ও ফৌজদারী (Criminal Law) আইন ও অন্যান্য আইন প্রস্তুত করিয়া ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি রক্ষার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী। এই সকল কর্তব্যগুলি সার্বভৌমত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সকল কার্য যদি সার্বভৌমিক রাষ্ট্র সুসম্পন্ন না করেন তাহা হইলে সার্বভৌমত্ব বৃথা হইয়া যায়। যদি প্রয়োজনমত যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা দেশকে রক্ষা করা না যায়, যদি দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সার্বভৌম (Sovereign অপারগ হয়, যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দৈনন্দিন জীবন পদে পদে বিঘ্নিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। সুতরাং সার্বভৌম রাষ্ট্রের পক্ষে উপরোক্ত মৌলিক কর্তব্য সম্পাদন অপরিহার্য।

(২) ইচ্ছাধীন কার্যকলাপ (Optional Functions) : এই কার্য্যাবলী রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। ইহা জনকল্যাণমূলক। এই কার্য্যাবলীর উদ্দেশ্য হইতেছে জনগণের নৈতিক, মানসিক সামাজিক ও অর্থ নৈতিক মানের উন্নতিসাধন। উড্রো উইল্‌সন্ এই কার্য্যাবলীকে Ministrant Functions আখ্যা দিয়াছেন। বিকল্পে ইহাকে Optional অথবা Secondary Functions ও বলা হইয়াছে।

(২) ইচ্ছাধীন কাযকলাপ

রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন কার্যকলাপ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) ইচ্ছাধীন অ-সমাজতান্ত্রিক কার্য্যাবলী : দরিদ্র ও আতুর সেবার ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা, শিক্ষা, সামাজিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ, পোস্টাফিস স্থাপন, রাস্তা খাল বন্দর নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য

অসমাজতান্ত্রিক ইচ্ছাধীন কার্য্যাবলী

সম্বন্ধে কল্যাণকামী ব্যবস্থা প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। এই সকল কার্যের ভার যদি রাষ্ট্র গ্রহণ না করে, তবে তাহা জনসাধারণের চেষ্টায় বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করা সুকঠিন হইয়া উঠে। এই কারণে প্রায় সর্বদেশেই রাষ্ট্র এই কার্য্যাবলীর দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া থাকে।

ইচ্ছাধীন সমাজতান্ত্রিক ধরনের কায্যাবলী

(খ) **ইচ্ছাধীন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কার্যকলাপ :** যথা—রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন পরিচালন, বাষ্প (gas) ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন, সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security), শ্রমিক কল্যাণ আইন প্রণয়ন, নিম্নতম বেতন নির্ধারণ। সরাসরি সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ না করিয়াও আধুনিক রাষ্ট্র এই শ্রেণীর কার্যকলাপে লিপ্ত হইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য আধুনিক অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও উপরোক্ত কর্তব্যগুলি রাষ্ট্রে গ্রহণ করিয়াছে ও অল্পবিস্তর যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতেছে। আজ কাল প্রায় প্রতিটি অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কতকগুলি মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সরাসরি ভাবে শুধু যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহা নহে, নির্দিষ্ট শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া তাহা পরিচালনা করিতেছে। ভারত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য (U. K.) এই শ্রেণীভুক্ত। যদি রাষ্ট্র মনে করে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে উপরে উল্লিখিত কোন কার্য সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য রাষ্ট্র আপন হস্তে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

উপসংহার : মৌলিক ও ইচ্ছাধীন রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের মধ্যে যে বিভেদ রহিয়াছে তাহা খুব বড় করিয়া দেখা উচিত নহে। এক যুগে যাহা ইচ্ছাধীন, একই দেশে অন্য যুগে তাহা মৌলিক বলিয়া মনে হইতে পারে। আর এক রাষ্ট্রে যাহা ইচ্ছাধীন কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, অন্য রাষ্ট্রে তাহা মৌলিক ও অপরিহার্য মনে হইতে পারে। ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশে রাষ্ট্রকে অনেক দায়িত্ব লইতে হয়, যাহা পাশ্চাত্য দেশে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হইতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে রাষ্ট্র এমন সকল ক্ষেত্রে তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিস্তৃত করিয়াছে, যাহা উনবিংশ শতাব্দীতে অভাব্য ছিল। উদাহরণ হিসাবে দুইদেশের সামাজিক নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার পরিমাণ আজকাল কম নহে, বিবর্তনশীল রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সহিত, তাহার কর্মক্ষেত্রের পরিধিও

পরিবর্তিত হইতে থাকে। ভারতেও শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রের ইতিহাস

গ্রীকযুগে রাষ্ট্র মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া নাগরিকদের জীবন সুখী ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইত। রাষ্ট্র ছিল নাগরিকদের friend, guide and philosopher অর্থাৎ বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও নাগরিক কল্যাণ ভাবনার ভাবুক। তাই সেইখানে সমাজ ও রাষ্ট্রে তফাত ছিল না। নাগরিক-সাধারণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, মানসিক ও পারত্রিক উন্নতি সাধনই ছিল রাষ্ট্রের কর্তব্য। তাই রাষ্ট্রের কর্মপরিধি মানুষের সমগ্র জীবন জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। গ্রীক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব ছিল না; ব্যক্তি রাষ্ট্রের একটি অংশমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। প্লেটো, অ্যারিস্টটল্ তাহাদের রাষ্ট্রদর্শনের মাধ্যমে এই নীতিই প্রচার করিয়াছিলেন।

গ্রীক যুগের সমাজ কল্যাণকামী রাষ্ট্র—ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রায় অলুপ্ত

রোমক যুগে রোমক আইনের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট অধিকারভোগী ব্যক্তিসত্তাকে মানিয়া লওয়া হয় হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে প্রাকৃতিক নিয়মের (Natural Law) দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অর্থাৎ সমাজের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

রোমকযুগে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিকে আইনগত স্বীকৃতি দান

মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের উত্থানের ফলে সামন্তবর্গ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। তাহারা রাষ্ট্রের অনেক ক্ষমতা ব্যবহার করিতে থাকে। ইহার ফলে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সঙ্কুচিত হয়। ধর্মের নামে খ্রীষ্ট ধর্মগুরু পোপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন খ্রীষ্টান জনসাধারণের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ইহার ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার হ্রাস হয়। এতদ্ব্যতীত নানা প্রতিষ্ঠানও স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠে; তাহারাও স্বাধীনভাবে আপনাপন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালন করিতে থাকে। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি তাই লক্ষণীয় ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কেবলমাত্র কর স্থাপন ও পরিমিতক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা রাষ্ট্রের কর্তব্য হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে সামন্ততন্ত্রের লক্ষণীয় পতন ঘটে। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মগুরুগণ ঘোষণা করেন যে,

মধ্যযুগে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সংকোচন

ষোড়শ শতাব্দীর শক্তিশালী রাষ্ট্র—রাষ্ট্রের কর্মপরিধির বিস্তার

রাজন্যবর্গ ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (Divine Right of kings নীতি।) । জনসাধারণ এই নীতি অনেক পরিমাণে মানিয়া লয়। এই সময়ে প্রতি রাজ্যে স্বাজাত্যবোধও দানা বাঁধিতে থাকে। ইহার ফলে ইউরোপে শক্তিশালী জাতীয় রাজতন্ত্র (absolute national monarchy) উত্থিত হয়। রাষ্ট্রের শক্তি ও কর্মক্ষেত্র আবার বিস্তৃত হইতে থাকে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা এমন কি ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও রাজা হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হল্যাণ্ডে এবং সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সুস্পষ্ট সূচনা দেখা দেয়। কিন্তু ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড ব্যতীত ইউরোপের সর্বত্র শক্তিশালী স্বেচ্ছাচারী রাজ-

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি—রাষ্ট্রের কর্ম-পরিধি সঙ্কোচ নীতির উদ্ভব

তান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িতে থাকে। ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইউরোপের রাজন্যবর্গ রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করিতে থাকেন। ব্যবসা-বাণিজ্যও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের কর্ম-পরিধির মধ্যে আসিতে থাকে। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবি উত্থিত হয় এবং রাষ্ট্রের কর্মপরিধি পুনরায় সঙ্কুচিত হইতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে ব্যক্তিস্বাধীনতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ দেখা গেল যে, শিল্প ও বাণিজ্যে অপ্রতিহত

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

ব্যক্তিগত অধিকার সাধারণ মানুষের নিম্নতম স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক ও শ্রমিক শোষিত হইতেছে। তখন রাষ্ট্র পুনরায় তাহার কর্মপরিধি বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করিল। শিল্প বিপ্লবের পর যে সকল সামাজিক অন্যায় শোষিত জনতাকে নিষ্পেষিত করিতেছিল তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্র অগ্রসর হইয়া আসিল। খনি, কারখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইন দ্বারা মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা দিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে মহাযুদ্ধ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্মপরিধির ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও অন্যান্য কল্যাণকামী কর্মপদ্ধতি রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিস্ময়করভাবে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বিপুল প্রসারলাভ

বাড়িয়াছে। পৃথিবীর যে এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুধু সেখানে নহে, তথাকথিত ব্যক্তিতান্ত্রিক পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও রাষ্ট্র আজ সমাজকল্যাণকামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থনীতি, সমাজ, ব্যক্তি ও সমষ্টির সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নয়ন, দুঃস্থের সেবা, রোগীর চিকিৎসা, প্রতি মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা, নারী ও শিশুর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্র তাই Social Service State বা কল্যাণরাষ্ট্র হইয়া উঠিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর Police State অথবা পুলিশ রাষ্ট্র—যাহার কর্তব্য ছিল পুলিশের ন্যায় কেবলমাত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, তাহা—আজ সমাজসেবী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তন সত্যই বিস্ময়কর। মনে হয় প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পুনরাবর্তন ঘটিতেছে।

এই অভাবনীয় পরিণতি অল্প দিনে হয় নাই ; দীর্ঘ সময় লাগিয়াছে। শিল্পবিপ্লবের দরুন সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনই এই বিবর্তনের প্রধান কারণ। শিল্পবিপ্লবের ফলে বস্তি-সমস্যা, (Slum Problem) শ্রমিক শোষণ, শিশু ও নারীর স্বাস্থ্যহানিকর শিল্পে নিয়োগ, বেকারী, একচেটিয়া ব্যবসা, মুনাফাবাজি, একশ্রেণীর মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র ও অসহায়তা প্রভৃতি গুরুতর সমস্যা সমাজকে পঙ্কিল করিয়া তোলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই এই সমস্যাগুলি ইউরোপে বিরাট আকারে দেখা দেয়। এই সময় সাধারণ মানুষ ভোটাধিকার লাভ করিতে থাকে এবং তাহারা এই সমস্ত গুরুতর সমস্যার সমাধান দাবি করে।

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের কর্মপরিধির বিস্তারের কারণ
(১) শিল্পবিপ্লব

(২) সাধারণের ভোটাধিকার প্রাপ্তি

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এই অনুকূল পরিবেশে শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাই রাষ্ট্র ধীরে ধীরে সমাজসেবার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয় এবং তাহার কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে। প্রথম বিশ্ব মহাসমরের সময় যুদ্ধায়োজনের তাগিদে অর্থনীতি, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আইনের মারফত ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে যুদ্ধের সময় যে সুফল পাওয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিয়া রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ-নীতি অনেক ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপিত হইবার পরে স্থায়ী ভাবে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিয়ন্ত্রণ নীতি পুনরায় ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রের কর্মপরিধি

(৩) নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা উপলব্ধি

আরও বিরাট আকার ধারণ করে। শান্তি স্থাপিত হইবার পর রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। তথাকথিত পাশ্চাত্য ব্যক্তিতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এই নীতি কার্যকরী হইয়া মানুষের জীবনধারাকে সামাজিক বিপর্যয় হইতে অনেক পরিমাণে সংরক্ষিত করিতে সমর্থ হয়।

(৪) পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

দুই মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে সাধারণ মানুষ যে সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করিল, তাহার প্রভাব ধনতান্ত্রিক দেশেও অনুভূত হইতে লাগিল। শেষোক্ত দেশের দরিদ্র জনসাধারণ সামাজিক অবিচার ও অব্যবস্থায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এই অসহিষ্ণুতা উপেক্ষা করিতে পারিল না। এই সকল দেশেও তাই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়া অসহায় শ্রেণীকে সামাজিক সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইল। এমনি করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র আজ সকল দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্র আজ মানুষের Friend, Guide and Phiiosopher অর্থাৎ বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও সুখ-দুঃখের ভাবুক—ইহাই নূতন রাষ্ট্রের ভূমিকা।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রনীতির শ্রেণীবিভাগ

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি: রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রনীতিকে প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত করা চলে। (১) নৈরাজ্যবাদ, (২) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, (৩) ভাববাদ, (৪) সমষ্টিবাদ। তিন প্রকারের সমষ্টিবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে: ক) ধনতন্ত্রমূলক সমষ্টিবাদ। ইহাকে জনকল্যাণনীতি বলিতে পারা যায়; (খ) ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ; (গ) সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতান্ত্রিকেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। (ক) খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Christian Socialism); (খ) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ (Utopian Socialism; (গ) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ (Scientific Socialism) বা মার্কসবাদ বা সাম্যবাদ (Communism); (ঘ) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Democratic Socialism বা Fabianism); (ঙ) সমিতিমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socalism); (চ) রাষ্ট্রহীন সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism)
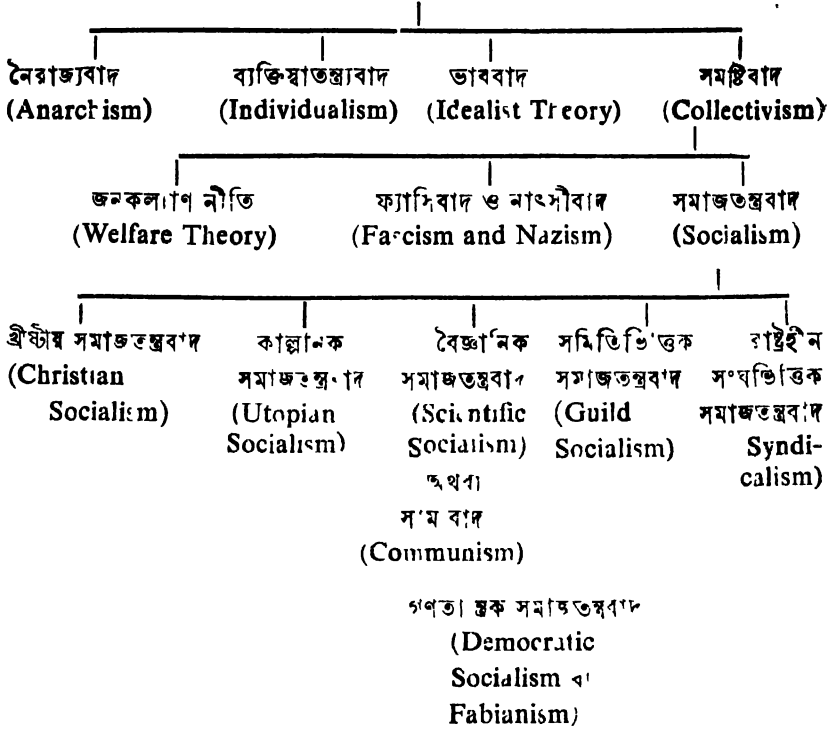
নৈরাজ্যবাদ (Anarchism): নৈরাজ্যবাদীগণের মতে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়াই রাষ্ট্রপ্রসূত বিষময় সমস্যাগুলির সমাধান করা যাইতে পারে। রাষ্ট্র এবং তাহার সহিত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বিনাশই তাহাদের কাম্য। বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদীগণের মধ্যে মতৈক্য নাই। তবে কতকগুলি বিষয়ে তাহারা মোটা-মুটিভাবে একই মত পোষণ করেন। নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন যে রাষ্ট্রই বর্তমান পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক দোষসমূহের উৎস। রাষ্ট্র ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীগত স্বেচ্ছাচারের প্রতীক। ইহা মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে দাসে পরিণত করিয়াছে। অনেক নৈরাজ্যবাদী বলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানিয়া লইয়া রাষ্ট্র মানব সমাজে অসাম্য ও দারিদ্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে ও সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীর অত্যাচারী শাসন কায়েম করিয়াছে। রাষ্ট্রের বিনাশ সাধনই সেইজন্য অত্যাবশ্যক। মানুষের প্রকৃতি মূলতঃ সৎ ও কল্যাণধর্মী। কিন্তু রাষ্ট্রে ধর্ম ও কোন কোন

নৈরাজ্যবাদ

নৈরাজ্যবাদীগণের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনুষ্যচরিত্রে অবনতি আনিয়া দিয়াছে। রাষ্ট্র বিনষ্ট হইলে মানুষ তাহার স্বাভাবিক সততা ও উপচিকীর্ষা ফিরিয়া পাইবে। তখন প্রতি ব্যক্তি স্বেচ্ছায় শ্রমবিভাগ, পরস্পর সহযোগিতা ও সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবে, এমনি করিয়া অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে। সাংস্কৃতিক উন্নতি ও সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মঙ্গল সাধনের জন্যও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তাহারা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে। এইভাবে আদর্শ মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিবে। রাষ্ট্র পশুশক্তির প্রভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া থাকে। নৈরাজ্যবাদী সমাজে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনই হইবে না। প্রতি ব্যক্তির কার্য্যাবলীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজ কল্যাণই প্রতিফলিত হইবে।

বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী সম্প্রদায়

একশ্রেণীর নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। তাহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাসী; আর একশ্রেণীর নৈরাজ্যবাদী সাম্যবাদে বিশ্বাসী; তাহারা সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা স্বেচ্ছা-প্রসূত সমিতি বা সমবায়ের হস্তে দিতে চান। ম্যাক্স ষ্টারনার প্রথম শ্রেণীর এবং উলিয়াম গড্উইন, প্রুধঁ, ব্যাকুনীন ও ক্রপটকিন্ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নৈরাজ্যবাদী ছিলেন। যে পন্থায় নৈরাজ্যবাদী সমাজ গঠিত হইবে সে বিষয়েও ইহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। গড্উইন, প্রুধঁ, টলষ্টয় ও গান্ধী প্রভৃতি অহিংসা ও ভ্রাতৃত্বের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। তাহারা বিশ্বাস করিতেন যে ধীরে ধীরে মানব সমাজ পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রের বিষময় ফল উপলব্ধি করিবে; তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মানুষ নৈরাজ্য স্থাপন করিবে। কিন্তু ব্যাকুনীন্ ও ক্রপটকিন্ মনে করিতেন যে বিপ্লব ও বল প্রয়োগের দ্বারাই নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

সমালোচনা: নৈরাজ্যবাদীগণ বর্তমান সভ্যতার ও রাষ্ট্রের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার ভিতর সত্য নিহিত আছে। কিন্তু তাহাদের আদর্শ কল্পনা-ভিত্তিক। (১) যদি রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয় তাহা হইলে কোন না কোন শক্তি বল-প্রয়োগে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবে সন্দেহ নাই; অর্থাৎ অন্য নামে রাষ্ট্রক্ষমতাই কায়েম থাকিবে। (২) রাষ্ট্র বিনষ্ট হইলে মানুষ পূর্ণমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে, ইহা মনে করাও ভ্রম। রাষ্ট্র যদি সত্যই অবলুপ্ত হয় তাহা হইলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে মানুষ আধুনিককালে যে অধিকার ও স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে তাহাও হারাইবে। অধিকার রক্ষার জন্য স্থায়ী শাসন প্রয়োজন। নৈরাজ্য স্থাপিত হইলে শাসকের অভাবে অধিকার বিনষ্টই হইবে। (৩) মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে নৈরাজ্যবাদীগণ যে ধারণা করিয়াছেন তাহার সত্যতা

সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। মানুষ স্বভাবতঃ সততাপ্রবণ এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায় না। (৪) আদর্শ নৈরাজ্যবাদী সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা কার্যতঃ পরিচালনা করিতে হইলে মানুষের যে উচ্চস্তরের শুভবুদ্ধি ও মনীষার প্রয়োজন তাহা মানব সমাজে অতিশয় দুর্লভ। এইকারণেও নৈরাজ্যবাদী সমাজ সফলতা লাভ করিতে পারে না।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism): নৈরাজ্যবাদীগণ ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের বিলুপ্তি দাবি করিয়াছেন; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পরাষ্ট্রকে দোষ-পূর্ণ কিন্তু আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানিয়া লইতেছেন। মানব চরিত্রের নানা অসম্পূর্ণতা বশতঃই রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রের কর্ম-পরিধি তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত করিয়া, কেবল ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি, অধিকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিতে চান। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্মক্ষেত্র যত বৃদ্ধি পাইবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের-বিকাশের সম্ভাবনা সেই পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের আশঙ্কা। তাহারা বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্বীয় ক্ষমতা আবদ্ধ রাখে তাহা হইলে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ একমত নহেন। কিন্তু ছোট-খাট পার্থক্যসত্ত্বেও তাহাদের মূল বক্তব্যের ঐক্য বর্তমান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তাহাদের মত সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

(১) নৈতিক যুক্তি (Ethical Argument): এই মতাবলম্বী দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে মানুষ আপন প্রচেষ্টায় স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশ করিয়া উন্নত হইবে ইহাই স্বাভাবিক ও সমীচীন। রাষ্ট্র যদি আইনের দ্বারা নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়াস পায় তাহা হইলে ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা হ্রাস পাইবে, আত্মবিশ্বাস দমিত হইবে, প্রাথমিক প্রচেষ্টা নিরুদ্ধ হইবে এবং ব্যক্তির চারিত্রিক দুর্বলতা দেখা দিবে। সেই জন্য রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র অতিমাত্রায় সীমিত করা প্রয়োজন, যাহার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আপন উন্নতি সাধন করিতে পারে। এইরূপ হইলেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। আরও বলা হইয়া থাকে যে প্রতি ব্যক্তি তাহার স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন। কিরূপে তাহার স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে সে তাহা অন্যের

নৈতিক যুক্তি

অপেক্ষা বেশী বুঝিতে পারে। সুতরাং প্রতি ব্যক্তিকে তাহার আপন মঙ্গলের জন্য প্রচেষ্টার স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সাহায্য এখানে সম্পূর্ণ অবাস্তব। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিলে অতি-শাসন (over-government) আসিয়া পড়ে। মানব-সভ্যতার পক্ষে তাহা হানিকর।

(২) দার্শনিক যুক্তি (Philoaophical Argument): ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি মাত্র। রাষ্ট্রের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তির মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। রাষ্ট্র শাসনযন্ত্র ব্যতীত কিছু নহে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যক্তির উন্নতির যন্ত্র বা উপায় বিশেষ। যদি রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, তাহার কর্মপরিধি যদি বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে সমাজে যন্ত্রেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং মানুষের মর্যাদার অপমান করা হয়। ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নহে। তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সঙ্কুচিত করিয়া ব্যক্তির স্বাধীন কর্ম প্রচেষ্টার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। মানুষকে তাহার স্বাভাবিক মানবীয় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ইহা অপরিহার্য।

দার্শনিক যুক্তি

(৩) রাজনৈতিক যুক্তি (Political Argument): এই সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণ আরও বলিয়াছেন যে ব্যক্তিগত (Civil Rights) ও রাজনৈতিক অধিকার (Poli'ical Rights) অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা বাঞ্ছনীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অপ্রতিহত ও সর্বত্রগামী ছিল, ইহার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। বর্তমান রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান কার্যাবলী যাহাতে ব্যক্তির অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করে, সেইজন্য আধুনিক রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) লিখিত সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের কর্ম-পরিধির বিস্তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে। কারণ এইরূপ অবস্থায় অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়।

রাজনৈতিক যুক্তি

(৪) অর্থনৈতিক যুক্ত (Economic Argument): অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে ফরাসী অর্থনৈতিক ফিজিওক্রাটগণ (Physiocrats) Laissezfairie অথবা স্বেচ্ছানীতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে প্রতি ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে; রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। যে সকল কারণে ফরাসী দেশে

অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের মার্ক্যান্টাইলিস্ট (Mercantilist) নামক অর্থনৈতিক সম্প্রদায় যে নীতি প্রচার করেন তদনুযায়ী আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয়। রাষ্ট্র সফলতার সহিত এই সকল ক্ষেত্রে আইন মারফত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই জাতীয় আর্থিক উন্নতি সম্ভব হইয়া উঠিবে। ইহাই ছিল মার্ক্যান্টাইলিস্টগণের মত। ফিজিওক্র্যাট সম্প্রদায় ইহারই বিরুদ্ধে আপনাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মত জনসমাজে উপস্থাপিত করেন। তাহারা দাবি করেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অব্যাহত স্বাধীনতা দান করিতে হইবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে সরিয়া দাঁড়ান উচিত। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক এ্যাডাম স্মিথ এই নীতির পোষকতা করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই মতবাদ বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি ব্রিটেনের ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ রাজনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-নীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

অর্থনৈতিক যুক্তি

রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক ক্ষতি অপরিহার্য। ব্যক্তিগত পরিচালনায় স্বল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব। সরকার হস্তক্ষেপ করিলে আর্থিক অপচয় এড়ানো যায় না; ব্যয় বেশি উৎপাদন কম হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনুচিত। ইহাই অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য বক্তব্য।

বৈজ্ঞানিক যুক্তি (Scientific Argument): হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণ বলিয়াছেন যে জীবজগতে বাঁচার প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া যাহারা পরিবেশের সহিত মানাইয়া চলিতে পারে, তাহারাই বাঁচে, অন্য জীব নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানব সমাজেও এই নিয়ম যাহাতে অব্যাহতভাবে সক্রিয় থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে যাহারা অকর্মণ্য তাহারা নিশ্চিহ্ন হইবে; সমাজ এইরূপ মূল্যহীন মানুষের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইবে না। মানব সমাজ উন্নততর হইবে। এই আদর্শ লাভ করিবার জন্য রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচার ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে রাষ্ট্রকে অপসৃত হইতে হইবে। শ্রমিক কল্যাণ আইন প্রণয়ন, হাসপাতাল স্থাপন, দরিদ্র

বৈজ্ঞানিক যুক্তি

আতুরগণের সাহায্যার্থ ভবন নির্মাণ প্রভৃতি তথাকথিত জন হিতকর কার্য হইতে রাষ্ট্রকে বিরত থাকিতে হইবে। তাহা হইলে যাহারা অকর্মণ্য, যাহারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না, তাহারা সমাজকে তাহাদের মূল্যহীন জীবনের দ্বারা ভারাক্রান্ত ও পশ্চাদগামী করিয়া তুলিবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের সংকোচন মানব সমাজের উন্নতির অনুকূল।

সমালোচনা: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুক্তিমূলক ভিত্তি উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু এই নীতির বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও কিছুমাত্র মূল্যহীন নহে। সমালোচকেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈতিকযুক্তি বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে প্রতি বা অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতে পারে এবং তাহার ব্যক্তিগত চেষ্টায়, প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়া সে তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে পারে—এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক জটিল, সমস্যাসঙ্কুল সমাজে ব্যক্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের দাস। অধিকাংশ নাগরিক আজকাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসহায়তা বোধ করিতেছে। রাষ্ট্রই ব্যক্তিকে এই দাসত্ব ও অসহায়তা হইতে উদ্ধার করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা অসমীচীন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তির বিরুদ্ধতা

দার্শনিক যুক্তির বিরুদ্ধতা করিয়া সমালোচকেরা মন্তব্য করিয়াছেন যে ব্যক্তির সমষ্টিগত জীবনকে উপেক্ষা করা অনুচিত। রাষ্ট্র ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত হয় সত্য কিন্তু রাষ্ট্রেরও এক হিসাবে অস্তিত্ব আছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে এক একটি বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র লাভ করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র রক্ষাকল্পে ব্যক্তি সানন্দে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের সত্যকার অস্তিত্ব নাই, ব্যক্তির স্বার্থলাভের যন্ত্র মাত্র—এইরূপ মনে করা ভ্রম।

রাজনৈতিক যুক্তি বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচকেরা মন্তব্য করিয়াছেন যে রাষ্ট্রই ব্যক্তি অধিকার ও স্বাধীনতার জনক, ধারক ও বাহক। আধুনিক যুগে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র অর্থনীতি, সমাজ-মঙ্গল প্রভৃতির দিকে বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি ব্যক্তিস্বাধীনতা কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সঙ্কুচিত করিতে হইবে, এইরূপ যুক্তি গ্রাহ্য করা যায় না।

অর্থনৈতিক যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে শিল্পবিপ্লব হইয়াছে। তাহার ফলে শ্রমিক সমস্যা উপস্থিত হইয়া শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক-

নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় কার্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। একচেটিয়া ব্যবসায় দোষমুক্ত নয়। রাষ্ট্র তাহাও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্মদক্ষতা দেখাইতে পারিবে না মনে করাও ভ্রমাত্মক। ব্রিটেনে কতিপয় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। তাহা ছাড়া আধুনিক শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্যাসঙ্কুল। রাষ্ট্রের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত কাঁচামাল সংগ্রহ, বিক্রয়, আমদানী, রপ্তানী প্রভৃতি বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তাহার কার্যাবলী আবদ্ধ রাখে, তাহা হইলে শুধু যে ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহা নহে, জাতীয় আর্থিক অবনতির সূচনা হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

সর্বশেষে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীগণের বৈজ্ঞানিক যুক্তির খণ্ডনে বিরুদ্ধবাদীগণ বলিয়াছেন যে struggle for existence ও survival of the বা fittest নিষ্ঠুর নিরবচ্ছিন্ন নীতিজ্ঞানহীন জীবন সংগ্রাম পশুজগতে সত্য হইতে পারে। উদ্ভিদ জগতেও ইহার মূল্য আছে। কিন্তু নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানবসমাজে তাহার প্রয়োগ মানুষকে পশুর স্তরে অবনমিত করিবে। পরস্পর সহযোগিতা জীবনের মূল্য বোধ, নৈতিক চেতনা উপচিকীর্ষা প্রভৃতি মানুষের সহজাতবৃত্তি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীগণের বৈজ্ঞানিক যুক্তি এই মৌলিক সত্যকে অস্বীকার করিতেছে। নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম মানুষের সত্যকার প্রকৃতি বিরোধী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণের এই যুক্তি পশু ও উদ্ভিদ্‌জগতের সহিত মনুষ্য সমাজকে সমপর্যায়ে ফেলিয়া মানবতাবিরোধী একটি ভ্রমাত্মক ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে!

উপসংহার : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুক্তির মধ্যে সারবত্তা নাই বলিলে ভুল হইবে। তবে তাহা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। যে সকল যুক্তি তর্কের দ্বারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন করা হয় তাহা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলে কিছুটা অচল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে সময়ে এই নীতি প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল তখন রাষ্ট্র কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করিয়া ব্যক্তির ও দেশের ক্ষতি সাধন করিতেছিল। সেই যুগে ব্যক্তি স্বাধীনতা আদর্শের উপকারিতা ছিল। তাহা ছাড়া ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তির আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য মানবিক মর্যাদা প্রভৃতি চিরন্তন আদর্শের উপর এই নীতি আলোকপাত করিয়াছে। যদিও মানব সভ্যতার বিবর্তন হেতু রাষ্ট্রের রূপরেখা পরিবর্তিত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বহু বিস্তৃত হইয়াছে তথাপি এখনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতির মানবিক মূল্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মানবিকতার

আদর্শ যে সকল দার্শনিকেরা লোক সমাজে প্রচার করিয়াছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ তাহাদের অগ্রগণ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে এই নীতি সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভাববাদী মত : (Idealist Theory of State Functions) : রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ভাববাদী মত হেগেল-দর্শন হইতে সূচনা হইয়াছে। ব্রিটিশ ভাববাদী দার্শনিক গ্রীণ, ব্রাড্‌লী ও বোসাঙ্কেট মূলত: হেগেলকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে তাহারা হেগেলীয় ভাববাদের কিছুটা পরিবর্তন করিতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। মোটামুটি স্বীকার করিতে হইবে যে ভাববাদী দর্শনের ক্ষেত্রে হেগেলের একাধিপত্য মানিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং হেগেলীয় নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই বিবেচ্য। হেগেল রাষ্ট্রকে একটি দেশ কালাতীত, অক্ষয় ও অব্যয় ভাবের প্রকাশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই মহান ভাবকে তিনি ঈশ্বরের সহিত এক করিয়া দেখিয়াছেন, তাই রাষ্ট্রকে "God's march on earth"—পৃথিবীতে মঙ্গলময় ঈশ্বরের জয়যাত্রার অন্যতম প্রকাশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

ভাববাদী দর্শনের মূল কথা

রাষ্ট্র মনুষ্য সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, চরম নৈতিক বিকাশের মূর্ত বিগ্রহ।[1] ব্যক্তি রাষ্ট্রের অংশমাত্র; ব্যক্তি দ্বারা অনুসরণীয় সর্বোচ্চ নীতি রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ব্যক্তি রাষ্ট্রদেহে যত সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইবে ততই সে নৈতিক উন্নতিলাভ করিবে। রাষ্ট্রদেহে লয়প্রাপ্তির মধ্য দিয়াই ব্যক্তি নৈতিক বিকাশের সর্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধৃত। হেগেলীয়গণ জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে ব্যক্তি জীবদেহের অঙ্গবিশেষ। তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মধ্যেই ব্যক্তি আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের মঙ্গলই ব্যক্তির মঙ্গল। রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত অংশ হিসাবে ব্যক্তিকে সকল রাষ্ট্রীয় আদেশ চরম সত্যের ন্যায় পালন করিতে হইবে। তাহাতেই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, সেই পথই ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পথ।

রাষ্ট্র ও নীতি

হেগেল এইখানেই রাষ্ট্রপ্রশস্তি সমাপ্ত করেন নাই। তিনি রাষ্ট্রকেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূর্ত প্রকাশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যতক্ষণ মানুষ প্রকৃত বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কাজ করে ততক্ষণই সে সত্যকার স্বাধীনতা উপলব্ধি করে।

রাষ্ট্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

মানুষ ব্যক্তি হিসাবে রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যদি কোন কাজ করে, বা কোন কিছু দাবি জানায় তাহা হইলেই সে স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইতে থাকে। অর্থাৎ সে তাহার স্বাধীনতা হারায়। সেই কারণে স্বাধীনতা উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃত বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। একমাত্র রাষ্ট্রই এই নৈর্ব্যক্তিক প্রজ্ঞার অধিকারী। সুতরাং রাষ্ট্রই ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতীক। অতএব দেখা যাইতেছে যে হেগেলের মতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সর্বব্যাপী। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, মানসিক, নৈতিক, পারত্রিক অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের সকল ক্ষেত্রই রাষ্ট্রের কর্মপরিধির অন্তর্গত।

ভাববাদ ও সাকল্য নীতি

হেগেলীয় ভাববাদী নীতির মধ্যেই আধুনিক Totalitarianism অথবা সাকল্য নীতির মূল নিহিত রহিয়াছে। সাকল্যনীতি অনুসারে মানব-জীবনের কোন অংশই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকিতে পারে না। রাষ্ট্র মানুষের জীবন সামগ্রিকভাবে বা অংশতঃ শাসন-ব্যবস্থার পরিধির মধ্যে আনিতে পারে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ এবং বলশেভিজম্, সাকল্যবাদ বা Totalitarianism-এ বিশ্বাসী। তবে বলশেভিজমের সাকল্যনীতি মধ্যবর্তীকালীন ব্যবস্থা মাত্র। ধনতন্ত্র ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ধ্বংসের জন্যই তাহা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে ধীরে ধীরে সাকল্যবাদের অবলুপ্তিই বলশেভিজ্‌মের চরম আদর্শ।

সমালোচনা: ভাববাদী নীতি কাল্পনিক ভিত্তির উপর গঠিত। মহৎ-ভাব অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এই মহৎভাব বা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ হইয়াছে—এই দুইটি আপ্তবাক্যের নীরব স্বীকৃতির উপর হেগেলীয় যুক্তি নির্ভর করিতেছে। ঐ দুইটি ভার স্বীকার না করিলে হেগেলীয় নীতি দুর্বল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ভাববাদী নীতি অনুসারে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার কোন স্থান নাই। ইহাও মানিয়া লওয়া যায় না। ভাববাদী নীতি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। সমষ্টিগত জীবন সত্য; সমষ্টির জন্য ব্যক্তিকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে তাহাও স্বীকার্য; কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিনাশ মানব সমাজে অবনতির সূচনা করিবে বলিয়া তাহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। তৃতীয়তঃ, ভাববাদী নীতির পরিণতি হইয়াছে আধুনিক সাকল্যবাদে (Totalitarianism। যাহারা সাকল্যবাদী রাষ্ট্রগুলির গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারাই স্বীকার করিবেন যে এই নীতি মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে। ভাববাদী নীতি যদি কঠোরভাবে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র

নিরূপণে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে আশঙ্কা করিবার কারণ আছে।

কিন্তু রাষ্ট্রের সমষ্টিগত রূপের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই নীতি চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভ্রমাত্মক অতিশয়োক্তির বিরুদ্ধতা করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন সমাজের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে রাষ্ট্রের নির্লিপ্ততা মানুষ ও মানবসভ্যতাকে অবনমিত করিয়াছিল, তখন হেগেল সমাজের সকল সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের আবশ্যকতার দিকে আলোকপাত করিয়াছিলেন। অতএব ভাববাদী নীতির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে।

উপসংহার : ভাববাদী ব্যাখ্যাব মূল্যাযন

সমষ্টিবাদ (Collectivism) : সমষ্টিবাদীনীতি ব্যষ্টি ও সমষ্টি অর্থাৎ ব্যক্তি (Individual) বা রাষ্ট্র (State) এই দুই-এর মধ্যে সমষ্টি অথবা রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেয়। সমষ্টিবাদীগণ সেই জন্য রাষ্ট্রের কর্ম-পরিধির কোন সীমা নির্দেশ করেন না। অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কার্যাবলী আবশ্যক মত বিস্তৃত হইতে পারে।

সমষ্টিবাদ-সংজ্ঞা

সমষ্টিবাদ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কে. সি. হুইয়ার বলিতেছেন :

"Collectivism is the name given to the belief that the action of intervention of the state in matters often left to the regulation of private individuals is desirable.

সমষ্টিবাদের ব্যাখ্যা

It would include socialism and it is opposed to the doctrine of individualism···Collectivism can cover a wide variety of forms of state action and is indeed the vaguest term in use to cover the many forms of socialism and co-operation."

অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সাধারণতঃ তাহার কার্যাবলী বিস্তার করে না, যেগুলি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিধির অন্তর্গত, সমষ্টিবাদ নীতি অনুযায়ী সে সকল ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদ এই নীতির অন্তর্গত এবং ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী। রাষ্ট্রান্তর্গত সমষ্টিগত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ভাবে রাষ্ট্র অল্পপরিমাণে অথবা ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এইরূপ সকল প্রকার হস্তক্ষেপই সমষ্টিবাদ নীতিগ্রাহ্য। এই হস্তক্ষেপ পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদের আকার ধারণ করিতে পারে অথবা ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

রাষ্ট্রের ইতিহাসে তিন প্রকার সমষ্টিবাদ দেখা দিয়াছে। দুই শ্রেণীর সমষ্টিবাদ অনুযায়ী ধনতন্ত্রকে মানিয়া লইয়া রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগে ধনতন্ত্রের কতকগুলি অবাঞ্ছিত বিশেষত্ব যথাসম্ভব দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা হয়। তদনুযায়ী দুইটি নীতি গঠিত হইয়াছে। একটি জনকল্যাণ নীতি ও অন্যটি ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদ। প্রথমটি গণতন্ত্রভিত্তিক; ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ গণতন্ত্র বিরোধী। কিন্তু কল্যাণ রাষ্ট্রনীতি এবং ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ ধনতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর সমষ্টিবাদ হইতেছে সমাজতন্ত্রবাদ। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাতিল করিয়া অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই ইহার আদর্শ।

তিনপ্রকার সমষ্টিবাদ
(১) জনকল্যাণ নীতি
(২) ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদ
(৩) সমাজতন্ত্রবাদ

জনকল্যাণ নীতি (Welfare Theory): এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের কোন পরিধি নির্ধারণ সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুযায়ী সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে। যদি রাষ্ট্র মনে করে যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ জনকল্যাণ সাধন করিবে তাহা হইলে আইন মারফত সরকারী ক্ষমতা ঐ ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতে পারে। আবার যদি রাষ্ট্র দেখিতে পায় যে কোন বিষয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার অনধিকার চর্চা হইবে, অথবা তাহা জনমঙ্গলের অনুকূল হইবে না তাহা হইলে সরকারী ক্ষমতা ব্যবহারে রাষ্ট্র বিরত থাকিবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ম পরিধি কোন অনড় অপরিবর্তনীয় নীতি দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে না। জনকল্যাণই কর্ম-পরিধির একমাত্র নিয়ামক হইবে। এই জন্য এই মতবাদকে জনকল্যাণনীতি বলা চলে। এই নীতির প্রয়োগে যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহাকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। ভারতে এই জনকল্যাণনীতিই প্রযুক্ত হইতেছে। Socialistic Pattern of Society বা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ কল্যাণরাষ্ট্র বই কিছু নহে। বলা বাহুল্য আজকালকার পাশ্চাত্য সমস্ত গণতন্ত্রগুলিই জনকল্যাণনীতি মানিয়া চলিতেছে। ব্রিটেন, ফরাসীদেশ, পশ্চিম জার্মানী এমন কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও আধুনিক কালে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে। অর্থনীতি সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সকল রাষ্ট্র সংখ্যাতীত আইনের মাধ্যমে জন-সাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়া চলিয়াছে। একচেটিয়া ব্যবসা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, কাঁচামাল সংগ্রহ, আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের চলাচল, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, মূলধন সরবরাহ প্রভৃতি সংখ্যাতীত বিষয়ে আধুনিক যুগে সর-কারের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে। ১০৩০-৩১ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের

জনকল্যাণ নীতি

যুগে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র তখন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষেত্রে বেকারী দূরীভূত করিবার জন্য সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সেই সময় হইতে ধীরে ধীরে আমেরিকায় এইজনমঙ্গলনীতি প্রসার লাভ করিয়াছে। ব্রিটেনে এই নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই লক্ষণীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এবং সেখানে আজকাল রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিপুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনকল্যাণনীতির সমালোচনা

সমালোচনা: জনকল্যাণনীতির সমালোচকরা মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা কোন দার্শনিক মতবাদ নহে। সুবিধাবাদী কর্মপন্থা মাত্র। ইহাকে Political Pragmatism বা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমষ্টিবাদের মধ্যে মধ্যপন্থা এই মতবাদ অনুসরণ করিয়াছে। এই মধ্যপন্থী নীতির নিজস্ব দার্শনিক ভিত্তি নাই। সুতরাং ইহা মূল্যহীন।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে জনকল্যাণনীতি অনেক রাষ্ট্রে কার্যকরী হইয়াছে। এই নীতির প্রয়োগে জনগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই এই মতবাদের সত্যতা ও শক্তি প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তিগুলিই এই নীতির ভিত্তি স্বরূপ। দুয়ের মিশ্রণেই জনকল্যাণনীতি গঠিত হইয়াছে। এই দুই মতের অতিশয়োক্তি পরিত্যাগ করিয়া ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া জনকল্যাণনীতির সমর্থকগণ দুই মতের গ্রহণযোগ্য অংশটুকু আত্মসাৎ করিয়াছেন, দোষ-ত্রুটি এড়াইয়া গিয়াছেন; সুতরাং এই নীতি গ্রহণযোগ্য।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ: প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে ইউরোপে নূতন এক ধরণের সমষ্টিবাদ উত্থিত হয় যাহাকে পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইটালীর ফ্যাসীবাদ ১৯২২ সালে ফ্যাসিস্ট দলের সর্বাধ্যক্ষ মুসোলিনীর নেতৃত্বে আবির্ভূত হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাহার পতন ঘটে। ফ্যাসিবাদ ইটালীর ফ্যাসিস্ট দলেরই নীতি। ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে National Socialist (সংক্ষেপে নাৎসী) দল জার্মানীতে ক্ষমতা অধিকার করে এবং অপ্রতিহতভাবে যুদ্ধাবসান পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। নাৎসীবাদ জার্মানীর নাৎসীদলের মূল নীতি।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের মূল নীতিগুলি সমষ্টিবাদের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। এই দুইটি রাজনৈতিক আদর্শ রাষ্ট্রকে অর্থাৎ জাতীয় রাষ্ট্রকে দেবতার আসনে

বসাইয়াছে। রাষ্ট্র অভ্রান্ত ও সত্যের প্রতীক। জাতি, রাষ্ট্র ও দল অভিন্ন। এই রাষ্ট্রের ইচ্ছা দলের (ইটালীতে ফ্যাসিস্ট দল এবং জার্মানীতে নাৎসী দল) মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দলের (ইটালীতে ফ্যাসিস্ট দল এবং জার্মানীতে নাৎসী দল) অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ও একদলীয় স্বেচ্ছাতন্ত্র (Despotism) ফ্যাসিবাদ ও নাৎসী-বাদের মূলনীতি। রাষ্ট্রের অর্থাৎ দলের ইচ্ছাই প্রতি ব্যক্তি বা সমিতির পক্ষে চরম আইন এবং সর্বদা পালনীয়। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র বা দলের ইচ্ছাধীন। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। গণতন্ত্রের ধ্বংসের মধ্য দিয়াই মানুষ সত্যপথ অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের পথ খুঁজিয়া পাইবে; সেই পথই মানব সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রকৃতি ও ঈশ্বর অভিপ্রেত। সেই কারণে ধনতন্ত্র সমর্থনীয়। কিন্তু ধনতন্ত্রকে জাতির স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। রাষ্ট্র বা দলই এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করিবে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ সমাজে শ্রেণী বিভেদ স্বীকার করিয়া লয়, কারণ তাহাদের মতে শ্রেণী প্রকৃতিগত। গণতন্ত্রে শ্রেণীসংঘর্ষ আছে; কিন্তু ফ্যাসিবাদী বা নাৎসীবাদী দেশে বিভিন্ন শ্রেণী আপন আপন কর্তব্যে সচেতন। তাহারা পরস্পরের সহিত সহযোগিতার ভিতর দিয়া জাতির সেবা করিয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্র বা দলই রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি ও সমাজের রক্ষক, পরিবর্ধক ও পরিচালক।

আন্তর্জাতিক আদর্শ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জাতীয় রাষ্ট্র মনুষ্য সভ্যতার সর্বোচ্চ বিকাশের নিদর্শন। শান্তি কোন উচ্চাদর্শ নহে। যুদ্ধের ভিতর দিয়াই জাতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী বিকশিত হইয়া উঠে।

ইটালীতে মুসোলিনী প্রতি শিল্পে একটি করিয়া শ্রমিকদের ও একটি করিয়া মালিকগণের সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। তেমনি কৃষকদের ও জমিদারগণেরও পৃথক সমিতি স্থাপিত হয়। এই সকল সমিতির সাহায্যে কৃষিশিল্পের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। কারণ এই পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে হইলে সমিতিগুলিকে যে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন তাহা মুসোলিনী কোন দিনই দেন নাই। রাষ্ট্র অর্থাৎ দল বা মুসোলিনী স্বয়ং কৃষি-শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিতেন। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা ও ইহুদী উৎসাদন নীতি হিটলার এবং নাৎসীদল গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসোলিনী রোম সাম্রাজ্যের ছাঁচে ইটালীর রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

ফ্যাসিবাদী ও নাৎসীবাদী দার্শনিকেরা দাবী করেন যে এই বিরাট আদর্শ রূপায়িত করিতে হইলে রাষ্ট্রকে অর্থাৎ দলকে সর্বময় ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে হইবে। এই মতানুযায়ী রাষ্ট্রের কর্মপরিধির সীমা নাই।

সমালোচনাঃ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ তীব্রভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। (১) প্রথমতঃ, বলা হইয়াছে যে এই নীতিদ্বয় গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের পরিপন্থী। (২) দ্বিতীয়তঃ, এই দুইটি মতবাদ ধনতন্ত্রকে মানিয়া লইয়া সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্য সৃষ্টি করে। (৩) তৃতীয়তঃ, এই নীতি দুইটি সমাজকে সচেতনভাবে শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া শ্রেণীহিংসা ও সংঘর্ষের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। (৪) ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ যথাক্রমে ইটালীয় ও জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। Racism বা জাতীয়ভাব-মত্ততা এই নীতিদ্বয়ের একটি প্রধান ত্রুটি। ইহার ফলে অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ ইটালী ও জার্মানীর রাজনীতি কলঙ্কিত করিয়াছে। (৫) এই দুইটি মতবাদ জাতি, রাষ্ট্র ও দলকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া দলকেই কার্যকরী ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়াছে। ইহার দ্বারা মূলগত ও ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। (৬) এই দুইটি মতবাদ জাতিদ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধে বিশ্বাসী। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বারংবার বিঘ্নিত হইয়াছে। (৭) ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ নির্লজ্জভাবে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন করিয়াছে; ইহারই জন্য পশ্চাদপদ জাতির রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে। (৮) সর্বশেষে বলা যাইতে পারে যে এই নীতি দুইটি অনেক পরিমাণে অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কারের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ যুক্তিবাদী নহে। এই সমস্ত কারণে এই নীতিদ্বয় গ্রহণ করা বিপজ্জনক ও অনুচিত।

সমাজতন্ত্রবাদ Socialism): সমাজতন্ত্রবাদ সমষ্টিবাদের আর একটি রূপ। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সীমাহীন। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রই রাষ্ট্রের ন্যায্য কর্মক্ষেত্র। সমাজতন্ত্রের মূল নীতিগুলি ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। ধনতন্ত্রে ধনোৎপাদনের উৎসগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ ধনোৎপাদনের উৎসের মালিকগণ, দ্বিতীয়তঃ, যাহারা তাহাদের অধীনে জীবিকার্জনের জন্য পরিশ্রম করে। এই দুই শ্রেণীকে ধনিক ও শ্রমিক বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। প্রথমোক্ত শ্রেণী যত অল্প মজুরীতে দ্বিতীয় শ্রেণীকে নিয়োগ করিতে পারিবে তাহাদের মুনাফা ততই বৃদ্ধি পাইবে। ধনিক শ্রেণী স্বভাবতঃ

সমাজতন্ত্রবাদ

সেই চেষ্টাই করিবে। দ্বিতীয়োক্ত শ্রমিক শ্রেণী তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য উৎপন্ন ধনের আরও বেশি অংশ আদায় করিবার প্রয়াস পাইবে। ইহার ফলে দুই শ্রেণীতে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, যেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সেখানে সংঘর্ষ অনিবার্য। ধনোৎপাদনের উৎসগুলির উপর ধনিকের একাধিপত্য থাকায় ধনিকেরা প্রভূত অর্থের মালিক হইবার সুযোগ পায়। সেই অর্থ তাহারা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা লাভের জন্য ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রে ও সমাজে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। রাষ্ট্রশক্তি তাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অধিকার করিয়া লয় এবং আইন, পুলিস, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি তাঁহারা আপন স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োগ করে। এমন অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী ধনিক শ্রেণীর সহিত স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। তাহারা দরিদ্র সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। শিল্পবিবর্তনের ফলে ধনোৎপাদনের উৎস অর্থাৎ কলকারখানা ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতি ধীরে ধীরে স্বল্পসংখ্যক ধনিকের হাতে চলিয়া আসে। মুষ্টিমেয় লোকের শাসন সমাজে কায়েম হয়। অধিকাংশ মানুষ সর্বহারা শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। অসাম্য, অন্যায় অত্যাচার অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে' প্রকাশিত ১৮৭৫) 'বিড়াল' শীর্ষক রস-রচনায় সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি সাম্যনীতির সমর্থন করিয়া তাহার 'সাম্য' (১৮৭৩-৭৫) প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন: 'সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই একজন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং শোষিত অত্যাচারিত জনতার অভ্যুত্থান কামনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাহারাই ভাবী ভারতের ভরসাস্থল।* রবীন্দ্রনাথ "রাশিয়ার চিঠিতে" (১৯৩১) লিখিয়াছেন —"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে কম শিখে, বাকী সকলের পরিচর্যা

* "The only hope of India is from the masses The upper classes are physically and morally dead."

"I am a socialist, not because I think it is a perfect system, but half loaf is better than no bread."

"The other systems have been tried and found wanting. Let this one be tried .."

করে, সকলের চেয়ে বেশী তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশী তাদের অসম্মান, কথায় কথায় তা'রা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপর-ওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যতকিছু সুযোগ সুবিধে সবকিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত, তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাঁড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" রবীন্দ্রনাথ মর্মস্পর্শভাবে সর্বহারার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থার অবসান করিতে হইলে ধনোৎপাদনের উৎসগুলি রাষ্ট্র বা সমাজের মালিকানায় আনিতে হইবে। শ্রেণী সমাজ বিনাশ করিয়া শ্রেণীহীন সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রতি ব্যক্তি আপন শক্তিসামর্থ অনুযায়ী ধনোৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করিবে এবং তাহার প্রয়োজন মত উৎপাদিত ধনের অংশ ভোগ করিবে। ইহাই সমাজতন্ত্রের মূলকথা।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো: দেশের সমগ্র ধনোৎপাদনের উৎস অর্থাৎ শিল্প-কারখানা, ভূসম্পত্তি, নদী, খাল, হ্রদ প্রভৃতি, রেল, পোস্টাফিস, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, ট্রাম, যাত্রীবাস, মালবাহী লরি, জাহাজ, সর্বপ্রকার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান; যথা, ব্যাঙ্ক, দোকান, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কারবার প্রভৃতির মালিকানা রাষ্ট্রে বা সমাজে ন্যস্ত করা সমাজতন্ত্রের মূল কথা। দেশের সকলেই রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মী হিসাবে যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজ করিয়া যাইবে। প্রতি সক্ষম ব্যক্তি আপন কর্মক্ষমতা অনুসারে উৎপাদনে সাহায্য করিবে এবং আপন প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগদ্রব্য পাইবে। শিক্ষা হাসপাতাল স্থাপন, শিশু, নারী ও আতুরজনের সেবা, প্রতি ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক সরকারই গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জনসেবা—সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সংঘবদ্ধ সমাজই একমাত্র নিয়ন্ত্রণাধিকারী হিসাবে বিরাজ করিবে। ইহাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপরেখা।

সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি: সমাজতন্ত্রের সমর্থকেরা একদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও পুঁজিবাদকে আক্রমণ করিয়া তাহার দোষত্রুটি উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের সুবিধাগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

(১) **নৈতিক যুক্তি:** অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই পুঁজিবাদের ভিত্তি। এই নীতি অনুসারে মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটে। ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য নানা

নীতি-বিরুদ্ধ পন্থা ধনিকেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কালো-বাজারি, অধিক লাভের আশা,. দারুণ প্রতিযোগিতা ও মুনাফাবাজির ফলে সমাজে পাপের স্রোত প্রবল হয়। নারী, শিশু, অসহায় ব্যক্তি অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আওতায় নিষ্পেষিত হয়। দরিদ্রের ক্রন্দনে সামাজিক আবহাওয়া মর্মন্তুদ হইয়া উঠে। পুঁজিবাদ বা অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া সামাজিক সাম্য বিনষ্ট করে এবং মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর তুলিয়া দেয়। পুঁজিবাদের অবসান এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় এই সকল পাপ দূরীভূত হইবে। শোষণের অবসান ঘটিবে ও মানুষের নৈতিক মান উন্নত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ধনতন্ত্রের আওতায় সমাজের অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিক অসহায়তার মধ্যে জীবনযাপন করে। ইহার ফলে তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ হয় না। দারিদ্র্যদোষের জন্য তাহাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিনষ্ট হইয়া যায়। সমাজের সামগ্রিক উন্নতির প ক্ষ ইহা অতিশয় হানিকর। এইরূপ অবস্থায় জাতীয় অবনতির সূচনা হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

(২) রাজনৈতিক যুক্তি: সমাজতন্ত্রের সমর্থনে আরও বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, পুঁজিবাদে যাহার আধুনিক পরিণতি হইয়াছে, তাহা রাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি করে। যাহারা ধনী, তাহারাই সমস্ত প্রকার সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়। যাহারা দরিদ্র, তাহারা জীবনে সুযোগ পায় না। দরিদ্র জনসাধারণের ব্যক্তিগত অধিকার ধনীদের করতলগত হয়, কারণ অর্থবলে ও উৎকোচদানে পুঁজিপতি সমাজে সবই সম্ভব। এইরূপে অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ যে সমাজে ধনী ও দরিদ্র—এই দুই শ্রেণী রহিয়াছে, সেখানে গণতন্ত্রও সফল হইতে পারে না। অর্থবলে ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্রের উপর অন্যায্য ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। গণতন্ত্র মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন, যে, এক রাষ্ট্রের ধনিকগণের সহিত অন্য রাষ্ট্রের ধনিকগণের তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে অতীতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে; ভবিষ্যতেও হইতে পারে। চতুর্থতঃ ধনতন্ত্র মুনাফার লোভে অনগ্রসর দেশসমূহের উপর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ঔপনিবেশিকতা কায়েম করিয়াছে এবং নিষ্ঠুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ চালাইতেছে। সমাজতন্ত্রের আওতায় এই অত্যাচারের অবসান সম্ভব। পঞ্চমতঃ, বলা হইয়া থাকে যে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে। কারণ অর্থনৈতিক সাম্যই প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের অপরিহার্য ভিত্তি।

(৩) দার্শনিক যুক্তি: দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে মানব সমাজে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সমষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হইবে। সমাজ ও রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষের যে সামগ্রিক জীবন তাহার উন্নতি হইলেই ব্যষ্টি বা ব্যক্তির উন্নতি হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ সমগ্রের উপর অংশের উন্নয়ন নির্ভর করিতেছে। সমাজ সমগ্রতার প্রতীক, ব্যক্তি তাহার অংশ মাত্র। সমগ্রের কল্যাণে অংশের কল্যাণ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যনীতি-ভিত্তিক ধনতন্ত্র ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করে, সমগ্র সমাজের নহে। সেই জন্য ধনতন্ত্র সমাজের ক্ষতিকারক। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র সমাজ সুখী ও সুন্দর হইয়া উঠিবে।

(৪) বৈজ্ঞানিক যুক্তি: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থকেরা বলিয়া থাকেন যে, পরস্পর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া জীবজগতে যোগ্যতমের বিবর্তন হয়। এই নিয়ম মনুষ্য সমাজের পক্ষেও সত্য। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মনুষ্যসমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তাই প্রতিযোগিতায় বাধা দেওয়া সমীচীন নহে। এই যুক্তি মনুষ্য সমাজে প্রযোজ্য নহে। Survival of the fittest অথবা যোগ্যতমে উদ্বর্তন নীতি জীবের কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকার ক্ষমতাকেই লক্ষ্যবস্তু করিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যসমাজ কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকার সামর্থ্যকেই প্রাধান্য দেয় না। মনুষ্যত্বের বিকাশই মানব সভ্যতার লক্ষ্য। বুদ্ধি, মনীষা, হৃদয়বত্তা, নৈতিক উন্নতি—এই সকল গুণাবলীর পরিবর্ধনের ভিতর দিয়া মানুষ সত্যরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করে। জীবজগতের ন্যায় প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। প্রতিযোগিতা নহে, পরস্পর সহযোগিতা ও সহধর্মিতার মাধ্যমেই মনুষ্যসমাজ আত্মিক ও মানসিক উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিবে। সেই জন্যই ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ভিত্তিক ধনতন্ত্রের পরিবর্তে সহযোগিতাভিত্তিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

(৫) অর্থনৈতিক যুক্তি: ধনতান্ত্রিক সমাজে মূলধন সংগ্রহ, কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন, বিক্রয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে দারুণ প্রতিযোগিতা হয় তাহার ফলে সমাজের দারুণ আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই প্রতিযোগিতা থাকে না। তাই প্রতিযোগিতার দরুণ সমাজের আর্থিক ক্ষতিও হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে মুনাফা একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়; মানুষ ও তাহার অভাব-অভিযোগ নগণ্য হইয়া যায়। চাহিদাপূরণই ধনতন্ত্রে প্রধানতম লক্ষ্য নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে, মূলধন চাহিদাপন্থী নহে, মুনাফাপন্থী। দ্বিতীয়তঃ, ধনতন্ত্রের বিবর্তনের ফলে একচেটিয়া শিল্প-বাণিজ্য দেখা দেয়। একচেটিয়া পুঁজি-

পতিগণ জনসাধারণের নিকট হইতে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের জন্ম মূল্য নির্ধারণ করে এবং নিজেদের মধ্যে আপস-রফা করিয়া অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচার প্রবর্তন করে। তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করা হয়, ফলে তাহারা ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের পথে নিমজ্জিত হয়। শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হইয়া উঠে।

এই সকল যুক্তিবলে সমাজতান্ত্রিকেরা ব্যক্তিস্বাধীনতাভিত্তিক ধনতন্ত্রকে আক্রমণ করিয়াছেন। তাহারা দাবি করেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ধনতন্ত্রের বিষময় ফলগুলি দূরীভূত হইবে। সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করিবে, মানবসমাজের নৈতিক উন্নতি হইবে, দারিদ্র্যের অবসান হইবে, গণতন্ত্র সত্য হইয়া উঠিবে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সম্ভাবনা লোপ পাইবে। এই আদর্শে পৌঁছিতে হইলে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিস্তৃত করিতে হইবে। ইহাই মানব সমাজের মুক্তির পথ।

বলা বাহুল্য, সমাজতন্ত্রও তীব্রভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দার্শনিক যুক্তি প্রযোগ দ্বারা ধনতান্ত্রিকতার সমর্থকেরা সমাজতান্ত্রিক মতকে অগ্রাহ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সমালোচনা: সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচকগণ নানা দিক হইতে এই আদর্শটি আক্রমণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা বলিয়াছেন যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ হয় না। ব্যক্তিস্বাধীনতাই মানব জাতির উন্নতি ও সুখের ভিত্তি। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু একটি সমাজতান্ত্রিক দেশেও ব্যক্তিস্বাধীনতা নাই। সুতরাং সমাজতন্ত্র মানবসভ্যতার পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ, বলা হইয়াছে যে, ঐ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নাই, একনায়কত্বই কায়েম হইয়া আছে; সমাজতন্ত্র একনায়কত্বকে ডাকিয়া আনে; সুতরাং সমাজতন্ত্র বিষবৎ পরিত্যজ্য। তৃতীয়তঃ, সমালোচকেরা আরও বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বর্তমান পৃথিবীতে শ্রেণী-যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রতি দেশের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা আনিয়া দিয়া আর্থিক উন্নতির বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। চতুর্থতঃ, সমালোচকেরা বলেন যে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্পসংস্থাগুলি সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্পসংস্থা হইতে অনেক বেশি কর্মদক্ষ। অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ব্যক্তিগত শিল্পে যে উৎপাদন হইবে, তদনুরূপ উৎপাদন করিতে হইলে সরকারী শিল্পসংস্থাকে অনেক বেশি খরচ করিতে হইবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃক ও পরিচালনা জাতির আর্থিক ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য সমাজতন্ত্র গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্চমতঃ, বলা হইয়া থাকে যে, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন

প্রতিযোগিতা নাই ; ধনতন্ত্রে প্রতিযোগিতা বর্তমান। প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া উৎপাদন পদ্ধতির বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে। সমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবনতির সূচনা করিবে। ষষ্ঠতঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ধনতন্ত্র শ্রমিকের উন্নতিকল্পে নানা ভাবে প্রচেষ্টা করিয়াছে, এবং এই ক্ষেত্রে ইহার সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। ধনতন্ত্রের সমর্থকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকের জীবনমান খুবই উন্নত ; তাহার সহিত তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক-সাধারণের জীবনমান নিম্নতর স্তরে অবস্থিত। সুতরাং ধনতন্ত্রে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা ক্রমে অবনত হইতে থাকে—সমাজতন্ত্রবাদীদের এই যুক্তি সম্পূর্ণ মূল্যহীন। সপ্তমতঃ, পৃথিবীর বর্তমান সমৃদ্ধি ও নানা দিকে উন্নতির মূলে রহিয়াছে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। সুতরাং সমাজতন্ত্র গ্রহণ করিবার কোন হেতুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অষ্টমতঃ সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার বিরুদ্ধে যাইতেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভের স্পৃহা মানুষের প্রকৃতিগত। এইরূপ অবস্থায় সমাজতন্ত্রের নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। নবমতঃ, জেম্‌স্ বার্ণ-হাম তাঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক The Managerial Revolution এ বলিয়াছেন যে পুঁজিপতি শ্রেণী সমাজতন্ত্রে বিলুপ্ত হইলেও তাহার স্থলে ম্যানেজার, পরিচালক, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের শাসন প্রবর্তিত হইবে। রাশিয়াতে এক শ্রেণীই আধিপত্য করিতেছে। ঐ দেশে এক শ্রেণীর পরিবর্তে অন্য শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহারাই রাষ্ট্র ও সামাজিক ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছে। সর্বশেষে বলা হইয়া থাকে যে, সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিরাট আকার ধারণ করিবে বিভিন্ন বিভাগে ইহার ফলে কর্ম-কুশলতার অভাব দেখা দিবে ; দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ প্রভৃতি দোষগুলি অতিমাত্রায় রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করিবে।

উপসংহার: সমাজতন্ত্রের সপক্ষে যে সকল যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া মন্তব্য করা যাইতে পারে যে, সমাজতন্ত্র ভাল কি মন্দ তাহার বিচার চুলচেরা সূক্ষ্ম তত্ত্বের দ্বারা শেষ করা অসমীচীন। প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে ইহারই যাচাই হওয়া প্রয়োজন। এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের সাফল্য দোষত্রুটিহীন না হইলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাশিয়াতে দারিদ্র দূরীভূত হইয়াছে, অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশের ন্যায় দরিদ্রের মর্মভেদী ক্রন্দন সেখানে শোনা যায় না। ধীরে ধীরে মানুষের জীবনমান সেখানে উন্নীত হইতেছে। রাষ্ট্র প্রতি ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তার ভার লইয়াছে।

বেকারির অবসান হইয়াছে। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাশিয়া মাত্র ৪৮ বৎসরে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যে অবদান পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। রাশিয়ার কৃষি ও শিল্প পৃথিবীর সর্বোন্নত দেশের কৃষি ও শিল্পের সহিত তুলনীয়। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিপ্লবের সূচনা হইতে রাশিয়ার নূতন ব্যবস্থাকে প্রতি বিপ্লবের আগুনে দগ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। রাশিয়া হিটলারী বর্বর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল বিরুদ্ধ শক্তির অপচেষ্টা সত্ত্বেও রাশিয়ার রাষ্ট্রকৃতি খুবই লক্ষ্যণীয়।

কিন্তু যে বিস্ময়কর উন্নতি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে সংঘটিত হইয়াছে, তাহার জন্য রাশিয়াকে গভীর বেদনাদায়ক মূল্য দিতে হইয়াছে। বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনহানি হইয়াছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অধিকার বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা ঘোর পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিপ্লবের জন্য মানুষকে নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। নানা অন্যায়কেও এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। ইহা দুঃখজনক কিন্তু অপরিহার্য। সুখের বিষয় এই যে রাশিয়ার বর্তমান কর্ণধার গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন।

রাশিয়ার শ্রেণী একনায়কত্বকেও সমালোচকেরা আক্রমণ করিয়াছেন। মার্কস্‌-বাদীগণ বলিতেছেন যে, আন্তর্বর্তীকালে অর্থাৎ বিপ্লব ও সাম্যবাদের চরম আদর্শ লাভ—এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে ইহা অপরিহার্য। কিন্তু একনায়কত্বের যত শীঘ্র অবসান হয় ততই হয় মঙ্গল। এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রেণীর একনায়কত্ব যাহাতে ব্যক্তির একনায়কত্বে পর্যবসিত না হয় সেইজন্য রাশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলের অন্যান্য নেতৃবর্গ ব্যক্তিগত একনায়কত্বের স্থলে Collective Leadership বা সংঘবদ্ধ নেতৃত্বের উপর জোর দিয়াছেন এবং তাঁহারা এই নীতি কার্যকরী করিবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করিয়াছেন।

সমাজতন্ত্রবাদের যে সকল সমালোচনা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মূল্যবান বটে, কিন্তু তাহা সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শকে দুর্বল করিতে পারে নাই। সমাজতন্ত্রে যাহারা বিশ্বাসী, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যাহারা প্রচেষ্টা করিতেছেন অথবা যাহারা বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিক—তাহাদের সকলেই ঐ মূল্যবান সমালোচনাগুলি হইতে লাভবান হইতে হইবে এবং তদনুসারে সমাজতন্ত্রের গতির মোড় ফিরাইতে হইবে। যে সকল দোষত্রুটি বর্তমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যাইতেছে তাহার দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। তবে ধনতান্ত্রিক দেশের বিশেষতঃ জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর যুগে উন্নতির মানও বিস্ময়কর। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে দাবি করা হইয়াছে যে, ধনতন্ত্র কর্মকুশলতার দিক হইতে সমাজতান্ত্রিক দেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী হইয়াছে। তাহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। কিন্তু কর্মকুশলতাই শেষ কথা নয়। সাম্য, মানুষের অধিকার, সুযোগের সমতা প্রভৃতি নীতির মূল্যও কম নহে। অসাম্য যেখানে সমাজ-ব্যবস্থাকে বিষায়িত করিতেছে সেখানে কেবল কর্মকুশলতার নজির গ্রাহ্য নহে। এই দিক দিয়াই সমাজতন্ত্রের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে।

ইহাও স্বীকার্য যে, সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ধনতন্ত্রের রূপ বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সমাজতন্ত্রের শক্তিরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান জগতে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। ইতিহাসের পরীক্ষাগারে তাহাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে পৃথিবীর জনগণ উন্মুখ আগ্রহে আজ তাহা লক্ষ্য করিতেছে। এই দুই ব্যবস্থার সহ অবস্থানের ভিতর দিয়া ভবিষ্যতের পটভূমিকায় আগামী দিনের মানব সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ (Types of Socialism) : সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে নানা ধরনের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ উত্থিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে সকল আদর্শেরই মূল কথা ধনতন্ত্রের অবসান, শ্রেণীর বিনাশ, রাষ্ট্র বা সমাজের হস্তে ধনোৎপাদনের উৎসগুলির মালিকানা হস্তান্তর এবং সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রমদান ও প্রয়োজনানুযায়ী ভোগ। তথাপি পন্থা (Means) ও আদর্শ সমাজের গঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে মতান্তরের ফলে সমাজতান্ত্রিকেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যে সকল সম্প্রদায়ের মতাবলী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত মতবাদসমূহ প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে। (১) খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Christian Socialism) : (২) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ (Utopian Socialism) ; (৩) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসবাদ বা সাম্যবাদ (Scientific Socialism Marxism or Communism) ; (৪) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Democratic Socialism বা Fabianism) ; (৫) সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) ; (৬) রাষ্ট্রহীন সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) ।

সমাজতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Christian Socialism): এই মতবাদটি প্রধানতঃ পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকেরাই লোকসমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সমাজবাদিগণের মতে যীশুখ্রীষ্টের অমরবাণীর মধ্যেই সমাজতন্ত্রের মূলকথা নিহিত রহিয়াছে। যীশুখ্রীষ্ট দরিদ্র, শোষিত ও হতভাগ্য মানুষের বন্ধু ও ত্রাণকর্তা।

খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তিতে এই নীতি গঠিত হইয়াছে

তিনি বলিয়াছেন যে, দরিদ্র মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাইয়াছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য যীশুখ্রীষ্ট অস্বীকার করিয়াছিলেন। বরং তিনি বলিয়াছেন যে, ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা সুকঠিন। ঈশ্বর ও কুবের (Mammon) দুইকেই পূজা করা অসম্ভব। খ্রীষ্টীয় সমাজতান্ত্রিকগণের মতে বাইবেলের মধ্যে শক্তিমত্ততা ও ধনোন্মত্ততার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঘোর পরিতাপের বিষয় এই যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে বাইবেল দরিদ্র ও সর্বহারাদিগকে বশে রাখিবার যন্ত্র-হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে মিথ্যাচার ও পাপাচার চলে, তাহার উল্লেখ করিয়া খ্রীষ্টীয় সমাজবাদিগণ মন্তব্য করেন যে, এই পাপের স্রোত বন্ধ করিতে হইলে Kingdom of Christ (যীশুখ্রীষ্ট কর্তৃক উল্লিখিত ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের রাজ্য) স্থাপন করিতে হইবে। মানুষে মানুষে বিভেদ দূরীভূত করিতে হইবে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য মুছিয়া ফেলিয়া সাম্যের ভিত্তিতে খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ঈশ্বরের সর্বজনীন পিতৃত্ব (Fatherhood of God) ও সর্বমানবের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বই (Brotherhood of man) এই নীতি নূতন সমাজের ভিত্তি হইবে।

ফরাসী ধর্মযাজক দ্য লামানে (De Lamannais) খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক। ইংলণ্ডের ফ্রেডেরিক মরিস, চার্লস্ কিংগ্‌স্‌লী প্রভৃতি এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন।

সমালোচনা: শিল্পায়নের ফলে ধনতন্ত্রের যে সকল দোষত্রুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইউরোপের সমাজদেহকে কলঙ্কিত করিয়াছিল, খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রীগণ সার্থকভাবে তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা গঠনমূলক কোন যুক্তিসহ আদর্শ গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে তাহাদের প্রচার সমাজে ধনিকতন্ত্রের শোষণ ও ধনমত্ততার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে শক্তিশালী করিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রের মূল্য

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ : (Utopian Socialism) : টমাস মোরের Utopia ১৫১৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে দার্শনিক মোর একটি কাল্পনিক রাজ্যের বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন যে, এই রাজ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই ; সকলেই সমান, সকলেই রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আত্ম নিয়োগ করে। সাম্যবাদই এই আদর্শ রাজ্যের মূলমন্ত্র। এই সময় হইতেই কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের নীতি চলিয়া আসিতেছে।

টমাস মোর

ফরাসী জননায়ক ব্যাবিউফ্ সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধনীসমাজকে পশুশক্তি বলে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠান স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ব্যাবিউফের লেখার মধ্যে পরবর্তী কালের মার্কসকথিত শ্রেণীসংগ্রামের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ফরাসী দার্শনিক স্যাঁ সিমঁ (Saint Simon) ধনতন্ত্রের বিলোপ সাধনের পর খ্রীষ্টীয় প্রেমবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সেবাধর্মের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার আদর্শ সমাজে প্রতি ব্যক্তি আপন সামর্থ অনুযায়ী উৎপাদন করিবে এবং গুণানুযায়ী ভোগদ্রব্য পাইবার অধিকারী হইবে। ফরাসী দার্শনিক ফুরিয়ে (Fourier) সমবায় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া ধনতন্ত্রের অবসান সম্ভব মনে করিতেন। ইংরেজ সমাজসেবী রবার্ট ওয়েন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ইহার দ্বারাই সমাজে অসাম্য ও তজ্জনিত সংকট উপস্থিত হয়। ধনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়া ওয়েন সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক লুই ব্লাঁর অবদান তিনটি হইতে বিশেষ লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ, তিনি তৎকালীন শাসনপদ্ধতির সাহায্যই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস ছিলেন। তৃতীয়তঃ, তিনি শোষিত শ্রেণীকে শ্রেণীসচেতন করিয়া তুলিতে প্রয়াস পান। তৃতীয়তঃ, তিনি প্রথম ঘোষণা করেন যে, সমাজতন্ত্রের আদর্শ শ্রম ও বণ্টন নীতি অনুযায়ী প্রতি মানুষকে সামর্থমত উৎপাদন করিতে হইবে এবং প্রতিব্যক্তি তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদিত ধনের অংশ পাইবার অধিকারী হইবে। আরও চারজন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী ছিলেন। তাহারা হইতেছেন উইলিয়াম গড্-উইন্, প্রুদঁ, ব্যাকুনীন, ও ক্রপট্‌কীন্। ইঁহাদের মতামত সংক্ষেপে নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে।

ব্যাবিউফ

স্যাঁসিমঁ

ফুরিঁয়ে

রবার্ট ওয়েন

লুই ব্লাঁ

নৈরাজ্যবাদী কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীগণ—গড্উইন্, প্রুদঁ, ব্যাকুনীন ও ক্রপট্‌কীন

সমালোচনা: কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীগণ ধনতন্ত্রের দোষক্রটিগুলি সুন্দরভাবে তাঁহাদের লেখার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইদিক হইতে তাঁহাদের মতবাদের মূল্য আছে। কিন্তু গঠনমূলক ক্ষেত্রে তাঁহাদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। তথাপি সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে।

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের মূল্য

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যবাদ অথবা মার্কস্‌বাদ (Scientific Socialism or Communism or Marxism) :

১৯৪৮ সালে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ Communist Manifesto সাম্যবাদী ইস্তাহার) প্রকাশ করেন। ঐ সময় হইতেই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সূত্রপাত হয়। ১৮৬৭ সালে মার্কস্ তাঁহার Capital নামক যুগান্তকারী পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে ও কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ ও কাল্পনিক সমাজবাদ মানব ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের আদর্শের সমর্থনে সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত কোন নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ধনতন্ত্রের বাস্তব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও ঐ দুই মতবাদী দার্শনিকেরা বহুল পরিমাণে হৃদয়াবেগ দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা তাঁহারা ধনতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় সম্পর্কেও কোন law বা সূত্র নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। তৃতীয়তঃ, মার্কস্-পূর্ব সমাজতন্ত্রীগণ গঠনমূলক কোন কর্মপন্থাও নির্দেশ করেন নাই। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাঁহাদের ধারণা আবছা ও অস্পষ্ট থাকিয়া গিয়াছে। সমাজবাদের ইতিহাসে মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের সূত্র অবলম্বন করিয়া, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ-বিবর্তনের ধারা অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তিনি কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই সিদ্ধান্তগুলিই আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা সাম্যবাদের মূলসূত্র।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ ও কাল্পনিক সমাজবাদ

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মূলসূত্র

(১) প্রথমতঃ মার্কস্ সিদ্ধান্ত করেন যে, ইতিহাস মূলতঃ অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে অবলম্বন করিয়া বিবর্তিত হইতে থাকে। প্রতি যুগে এক একটি ধনোৎপাদনের পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। সমাজের গঠন, সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই ধনোৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই নীতিকে Historical Materialism বা ঐতিহাসিক জড়বাদ বলে। হেগেল বলিয়াছিলেন যে, Idea বা ভাবের বিবর্তনের ফলে

ইতিহাসে নব নব ফল ফলিতে থাকে। মার্কস বলিলেন যে, তথাকথিত ভাব সমাজের সর্বাঙ্গীণ পরিবেশ হইতে সৃষ্ট হয়; আর এই আর্থিক পরিবেশের পশ্চাতে রহিয়াছে ধনোৎপাদন পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতি হইতে উদ্ভূত মানুষে মানুষে সম্পর্কের বাস্তব রূপ।

(২) ধনোৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন কালে সমাজে, মানুষে-মানুষে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, এক শ্রেণী ধনোৎপাদনের উৎসগুলি দখল করিয়া থাকে; অন্য শ্রেণী পেটের দায়ে আপন জীবিকার্জনের তাগিদে প্রথমোক্ত শ্রেণীর নিকট নিজেদের শ্রম বিভিন্ন ভাবে বিক্রয় করে। অর্থাৎ মোটামুটি দুই শ্রেণী সমাজে উত্থিত হইয়াছে। প্রথম মালিক শ্রেণী, দ্বিতীয় মেহনতী মানুষের শ্রেণী সকল ঐতিহাসিক যুগেই এই দুই শ্রেণীর ধনোৎপাদনের উৎসগুলি অবলম্বন করিয়া পরস্পরের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে এই সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের সহিত তুলনীয়। সামন্ত যুগে জমিদার শ্রেণী ধনতান্ত্রিক যুগে পুঁজিপতি বা ধনিকশ্রেণী ধনোৎপাদনের উৎসগুলি দখল করিয়াছে। ঐ দুই যুগে ভূমিদাস ও শ্রমিকশ্রেণী যথাক্রমে শ্রমের ভিতর দিয়া ধনোৎপাদন করিয়াছে। শ্রেণীর উত্থান নীতি মার্কসবাদের দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয়তঃ, দার্শনিক মার্কস বলিতেছেন যে, এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ মালিক শ্রেণীর স্বাভাবিক লক্ষ্য। এই জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাহাদের ভাগীদার, মেহনতী মানুষকে তাহারা বঞ্চিত করে, যথাসম্ভব অল্প মূল্যে তাহাদের শ্রম ক্রয় করে, অর্থাৎ যথাসম্ভব কম মজুরী দেয়। মেহনতী মানুষ শ্রমের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইয়া দারুণ দুঃখ দুর্দশায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে শ্রেণী সংঘর্ষ শুরু হয়। শোষক মালিক ও শোষিত মেহনতী জনতা পরস্পরের স্বাভাবিক শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এই সূত্রটিকে শ্রেণী সংগ্রামের সূত্র বলে। ধনিক শ্রেণী আপন স্বার্থ রক্ষা কল্পে সমাজের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অর্থবলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শাসনব্যবস্থার উপর প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করিতে থাকে। পুলিস, সৈন্যদল প্রভৃতি তাহারা শ্রমিকদলনে প্রয়োগ করে। শ্রমিকশ্রেণীও যথাসাধ্য সংঘবদ্ধ হইতে প্রয়াস পায়।

(৪) উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus value): কলকারখানা, ক্ষেত-খামারে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় শ্রমিক শ্রেণীই তাহা উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের

সম্পূর্ণ বাজারমূল্য শ্রমিক শ্রেণীরই প্রাপ্য। কিন্তু মালিক শ্রমিকগণকে তাহার প্রাপ্য পুরা-মূল্য হইতে বঞ্চিত করে এবং পুরা-মূল্যের সামান্য অংশমাত্র মজুরী হিসাবে শ্রমিকগণকে প্রদান করে। মালিক শ্রেণী মেহনতী মানুষের প্রাপ্য যে পাওনাটুকু নিজেরাই অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে তাহাকে **Surplus value** বা উদ্বৃত্ত মূল্য বলে। এই অন্যায়ের প্রতিকার করাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

(৫) পঞ্চমতঃ, মার্কস বলেন যে, ধনতন্ত্রের মধ্যেই ধনতন্ত্রের বিনাশের বীজ লুকায়িত রহিয়াছে। ধনতন্ত্রের বিবর্তনের ফলে মূলধন কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। মাৎস্য-ন্যায় কার্যকরী হয়। ধীরে ধীরে বৃহৎ শিল্পপতি, ছোট শিল্পের মালিককে গ্রাস করিতে থাকে। সমাজে একচেটিয়া শিল্পপতির আধিপত্য অপ্রতিহত হইয়া উঠে। অসহায় ও মেহনতী মানুষের শ্রেণী বাড়িয়া যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও অর্থনৈতিক চাপে শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। একদেশের শিল্পপতিগণের সহিত অন্য দেশের শিল্পপতিদের প্রতিযোগিতার ফলে জাতীয় বিদ্বেষ বাড়িয়া চলে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সাধারণ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়া ওঠে। উচ্চ মুনাফার লোভে শিল্পপতিগণ অনগ্রসর দেশের দিকে দৃষ্টি দেয়। অনগ্রসর দেশে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ, খুব কম মজুরী দিয়া শ্রমিক নিয়োগ এবং প্রতিযোগিতা মুক্ত বিক্রয়ের বাজার লাভ সম্ভব। এই তিনটির সুবিধা হইলে যথেষ্ট মুনাফা লুণ্ঠন করা যাইতে পারে। তাই শিল্পোন্নত দেশগুলি ঐ দেশস্থ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে অনগ্রসর দেশে পশুশক্তি বলে আধিপত্য বিস্তার করিয়া অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করে।

(৬) ধনোৎপাদনের বিবর্তন হেতু মালিক শ্রেণী যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতেছে তাহা তাহারা কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে চাহে না। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অন্যদিকে শোষিত শ্রমিক সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। ক্রমবর্ধমান দুঃখ দুর্দশার দরুণ তাহারা মরিয়া হইয়া উঠে। দীর্ঘকালব্যাপী অবিচ্ছিন্ন ধনিক শাসন ও শোষণের ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রেণীসচেতন হইয়া উঠে। মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধিকারীর শ্রেণীকে তখন শোষিত জনতা বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করিতে সমর্থ হয়।

(৭) ক্ষমতাধিকারী ধনিক শ্রেণীর পতনের পর সর্বহারা শোষিত জনতার একনায়কত্ব কায়েম করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ধনতন্ত্রের বিলুপ্তি শ্রেণী সমাজের ধ্বংস ও রাষ্ট্রাধীনে সমাজতন্ত্র স্থাপন সর্বহারা শোষিত শ্রেণীর মৌলিক কর্তব্য হইয়া

দাঁড়ায়। এই স্তরে ধনোৎপাদনের সমস্ত উৎসগুলি রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা এবং রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিপুলভাবে বর্ধিত করা আবশ্যক হয়।

(৮) সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে যখন ধনতন্ত্র ও শ্রেণী-বিন্যাস সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে এবং যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সমাজ ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদ বা কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হইবে। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্র লোপ পাইবে।

(৯) শেষ পর্যায়ে যে বণ্টন নীতি প্রচলিত হইবে তাহার নৈতিক মূল্য অনস্বীকার্য। প্রতি ব্যক্তি আপন যোগ্যতা অনুসারে উৎপাদন করিবে এবং প্রতি ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনানুযায়ী ভোগ করিবে।

(১০) সংঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী বিপ্লব সংগঠনের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে। ইহাও স্বাভাবিক, কারণ সকল দেশের শ্রমিকদের স্বার্থ একই। প্রতি রাষ্ট্রেই মূলতঃ একইভাবে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়া ধনতন্ত্র পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে। তখন শ্রেণীবিভেদ, অসাম্য ও শোষণের অবসান হইয়া জগৎ জুড়িয়া স্বাধীন সাম্যবাদী সমাজে মানুষ ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিবার সুযোগ পাইবে।

১৯১৭ সালে মার্কস্‌পন্থী বলশেভিক দল কর্তৃক রাশিয়াতে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। লেনিন এই দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন। আধুনিক কালে রাশিয়াতে যে ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে State Socialism বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র বলে। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি এই ধরনের সমাজতন্ত্রে পরিত্যক্ত হয়। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র পূর্ণ ক্ষমতা আপন হস্তে রাখিয়া ধনতন্ত্র ও শ্রেণী বিনাশের কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি সমস্ত অর্থনৈতিক কর্তব্য (function) প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদন করে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (State Socialism)

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, State Socialism শব্দটি বিকৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মান সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বিস্‌মার্ক শ্রমিকদের কল্যাণকল্পে রাষ্ট্র-আইন দ্বারা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দিয়াছিলেন। এই সুযোগ-সুবিধাগুলি সমাজতান্ত্রিক ধরনের। এই কারণে তিনি দাবি করিয়াছিলেন যে, তিনি State Socialism বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিসমার্কের নীতির সহিত সমাজতন্ত্রের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। কারণ,

সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইতেছে—উৎপাদনের উৎসগুলি রাষ্ট্র বা সমাজের আয়ত্তে আনিতে হইবে এবং শ্রেণী বিন্যাসের অবসান ঘটাইতে হইবে। কিন্তু জার্মানীতে সেরূপ পরিবর্তন বিসমার্কের সময় ঘটে নাই।

১৯১৭ সালে রাশিয়াতে যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইল, মার্কস্‌বাদ তাহার অনুপ্রেরণার উৎস সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপ্লবের নেতা লেনিন বাস্তবতার চাপে মার্কস্‌বাদের দুইটি লক্ষণীয় পরিবর্ধন করিয়াছিলেন। মার্কস্‌ শ্রমিকের শ্রেণী সচেতনতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। কিন্তু লেনিন শ্রমিক ও সবহারা শ্রেণীর মুখপাত্র কমিউনিষ্ট (সাম্যবাদী) দলকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে দলের একনায়কত্ব সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার একমাত্র শক্তিশালী অস্ত্র। এই অস্ত্র কুশলতার সহিত ব্যবহারের উপর শ্রমিক বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে। তাই জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি দলকে দ্বিধাহীনভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। দলকে বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সংগঠন কার্যে নিপুণতার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে কমিউনিজমের নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর লেনিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয়তঃ বাস্তবপন্থী লেনিন N. E. P. (New Economic Policy) অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। লেনিনের সমালোচকরা বলিয়াছেন যে, ইহা মার্কসীয় বিশুদ্ধ নীতি হইতে বিচ্যুতির পরিচায়ক। এই ব্যবস্থা দ্বারা রাশিয়াতে ছোটখাট শিল্প ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এখানে স্পষ্ট ভাবে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে স্বয়ং লেনিন এই দুইটি নীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা মার্কস্‌বাদের পরিবর্তন নহে—বিবর্তন বা নূতন প্রকাশ মাত্র। মার্কস্‌বাদে যাহা ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, তিনি তাহা ব্যবহারিক নীতিতে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। এই নীতি মার্কস্‌বাদ হইতে বিচ্যুতি সূচিত করে না।

লেনিনবাদ

এতদ্ব্যতীত লেনিন আরও কয়েকটি বিষয়ে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করেন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) তাঁহার মতে শ্রেণী সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য মার্কস্‌ কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর উপরই বিপ্লব সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। (২) মার্কসীয় অর্থনীতির সহিত লেনিনের আর একটি সংযোজন যুগান্তকারী। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ধনতান্ত্রিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্র হইতেই উদ্ভূত এবং ধনতন্ত্রেরই চরম

প্রকাশ। (৩) তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে বিপ্লব ব্যতীত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। মার্কসীয় নীতি অনুযায়ী সমাজতন্ত্র সকল দেশেই একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই সংঘটিত হওয়া সম্ভব। (৪) সর্বশেষে লেনিন অন্তবর্তী কালের জন্য ও ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের সহাবস্থান নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন।

লেনিনের আরও তিনটি নীতি আলোচনার যোগ্য ; কারণ, অনেকের মত সেই নীতিগুলি পরবর্তী কালে স্ট্যালিন কর্তৃক পরিবর্তিত হইয়াছিল। (১) লেনিন মার্কস-এর ন্যায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবে বিশ্বাস করিতেন এবং তদনুসারে তাঁহার নেতৃত্বে Third International বা তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক বিপ্লব অনুষ্ঠান এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল। (২) লেনিন আমলাতন্ত্রকে দারুণ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, আমলা-তন্ত্র পুঁজিবাদী সমাজের হস্তে শ্রমিক দমনের যন্ত্র। সমাজতন্ত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা নাই। (৩) লেনিন বিশ্বাস করিতেন যে, রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলকে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করার দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, তাহাই সাম্যবাদের চরম উদ্দেশ্য।

স্ট্যালিন যুগ

স্ট্যালিনও লেনিনের ন্যায় বাস্তবপন্থী ছিলেন। তিনি লেনিনের আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ধ্বনি তুলিয়া ট্রট্স্কি যখন এক দেশে (রাশিয়ায়) বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করিতেছিলেন, স্ট্যালিন "Socialism in a Single Country" অর্থাৎ একটি দেশে (রাশিয়ায়) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি মনে করিতেন যে রাশিয়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বেড়াজালে আবদ্ধ রহিয়াছে। রাশিয়ার বিপ্লবকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে রাশিয়ার রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা ধনতন্ত্রের সহিত যে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ আসিতেছে, সেই যুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটিবে। এই বাস্তব উপলব্ধি হইতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পরও ঐ পর্বে রাষ্ট্রের বিলুপ্তির প্রশ্নকে অবাস্তব জ্ঞান করিয়া রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিবার ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, তিনি রাশিয়ার জাতীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন এবং সোবিয়েত রাষ্ট্রের অন্তর্গত জাতিগুলিরও মর্যাদা স্বীকার করিয়া লন। চতুর্থতঃ, আমলাতন্ত্রকে স্ট্যালিন শক্তিশালী করিয়া তোলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, শক্তিশালী আমলাতন্ত্র ব্যতীত শক্তিশালী

রাষ্ট্র টিকিয়া থাকিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, স্ট্যালিন দলকে আরও সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত করিয়া সমাজতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। ষষ্ঠতঃ তাঁহার সমালোচকেরা বলিয়াছিলেন যে, স্ট্যালিন পরোক্ষভাবে স্ট্যালিন পূজা (Stalin cult) উৎসাহিত করিয়াছিলেন। স্ট্যালিন স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নূতন কিছু নহে। তাহা মার্কসবাদেরই বিবর্তনের ফল।

সোবিয়েত রাষ্ট্রের প্রাক্তন নেতা ক্রুশ্চভ রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলের বিংশ কংগ্রেসকে স্ট্যালিন-নীতিগুলির মধ্যে কতকগুলির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব ঐ দলীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়। প্রথমতঃ, তিনি বলেন ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। তাঁহার মতে রাশিয়ার ও পৃথিবীর সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্র একমাত্র শ্রমিক বিপ্লবের মাধ্যমেই আসিবে এমন ধরা-বাঁধা নিয়ম স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না—এই মতও তিনি প্রচার করেন। তৃতীয়তঃ, তিনি ঘোষণা করেন যে, পার্লামেন্টারী প্রথা অনুযায়ী সমাজতন্ত্র স্থাপন অসম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, ক্রুশ্চভ বলেন যে যাহারা নিয়মতান্ত্রিক সমাজবাদী তাহাদের সহিতও সোবিয়েতের সহযোগিতা সম্ভব। নিয়মতান্ত্রিক সমাজবাদীগণকে সর্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখা অনুচিত। পঞ্চমতঃ, ক্রুশ্চভ "Personality Cult" বা ব্যক্তিপূজার বিরোধিতা করিয়া দলের অভ্যন্তরে Collective Leadership বা সংঘবদ্ধ নেতৃত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন। ষষ্ঠতঃ, তিনি রাশিয়াতে ধীরে ধীরে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করেন।

ক্রুশ্চভ যুগ

ক্রুশ্চভ-নীতি অনুযায়ী রাশিয়াতে যে সকল পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা আধুনিক কালে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বাস্তবতার খাতিরে লেনিন, স্ট্যালিন ও ক্রুশ্চভ—এই তিনজনেরই নেতৃত্বকালে মার্কসীয় নীতি কিছুটা নূতনভাবে রাশিয়াতে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু মূলতঃ মার্কসীয় নীতির মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে তাই মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বলা যায়।

মার্কসীয় নীতির সমালোচনা : মার্কসীয় দর্শনের যে সকল সমালোচনা

হইয়াছে তাহার উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে মার্কসবাদীগণ এই সকল সমালোচনার যে উত্তর দিয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করা কর্তব্য।*

মার্কসবাদের সমালোচনা

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ বা বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদ : (Democratic Socialism or Evolutionary Socialism or Fabianism) : দেশের সমগ্র গণতান্ত্রিক সমাজবাদ শ্রেণী-স্বার্থের দ্বন্দ্বে বিশ্বাসী। কিন্তু দুইটি বিষয়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে পার্থক্য রহিয়াছে ; প্রথমতঃ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদীগণ মনে করেন যে আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রথায় পার্লামেন্টিয় শাসনপদ্ধতি মানিয়া নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করাই কাম্য। তাঁহারা মার্কস্ বর্ণিত সহিংস বিপ্লবে বিশ্বাস করেন না এবং মনে করেন যে বলপ্রয়োগে যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ আর কখনই লাভ করা সম্ভব হইবে না। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীগণ আরও বলেন যে বলপ্রয়োগে যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে একনায়কত্ব উত্থিত হওয়া অপরিহার্য। একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী ; সুতরাং বলপ্রয়োগের পথ সর্বদা পরিত্যজ্য। রাষ্ট্রের কর্মপরিধির ক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদী সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পার্থক্য আছে। মার্কসীয় নীতি অনুসারে যে পর্যন্ত কমিউনিজম্ বা পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্যন্ত দলীয় একনায়কত্ব অপরিহার্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শাসন পরিচালনে বিশ্বাসী। তাঁহারা রাষ্ট্রের বিলুপ্তি নীতিতেও (withering away of the State) বিশ্বাস করেন না। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের সর্বপ্রধান দার্শনিক ব্যাখ্যাতা বার্ণস্টিন ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার মূল স্বীকার করিয়া লইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে ইতিহাসের অর্থনৈতিক উপাদানগুলি রাষ্ট্রের, সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ামক ; কিন্তু নীতি, ধর্ম ও বুদ্ধিগত উপাদান প্রভৃতির স্বাধীন অস্তিত্ব ও প্রভাব অস্বীকার করা অনুচিত। তিনি বলিয়াছেন যে মার্কস নীতি, ধর্ম, প্রভৃতির উপর উপযুক্ত পরিমাণে জোর দেন নাই। মার্কসীয় নীতির সমর্থনে এই শেষোক্ত সমালোচনা সম্বন্ধে পুনরায় বলা যাইতে পারে যে মার্কস সামাজিক বিবর্তনে নীতি, ধর্ম প্রভৃতির অস্বীকার করেন নাই। তবে তাহাদিগকে গৌণ স্থান দিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে এই উপাদানগুলি অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়। ইংলণ্ডের ফেবিয়ান (Fabian) সম্প্রদায়, জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাটগণ

*রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি, শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ের বিস্তারিত সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

(Social Democrats) ও রিভিশিনিষ্ট দল গণতান্ত্রিক বা বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। মার্কসবাদী সমাজবাদীগণের যেমন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে, তেমনি গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরাও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হইয়াছে।

সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্র—(Guild Socialism) : সমিতিভিত্তিক সমাজবাদীগণ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদীদের ন্যায় ধনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্র

এই শ্রেণীর সমাজবাদীগণ রাষ্ট্রকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমিতিগত স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে রাষ্ট্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যক্তি, সমিতি ও উৎপাদনকারী শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আপনাপন ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। সমিতিগত সমাজবাদীগণ মনে করেন যে উৎপাদনের উৎসগুলির মালিকানা রাষ্ট্রের নহে, সমাজেরই হস্তে ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়। সমাজ বলিতে তাঁহারা guild বা উৎপাদনকারী শ্রমিক সমিতিগুলির সমষ্টির কথাই মনে করেন। ইহারা ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী। এই দিক হইতে সমিতিমূলক সমাজবাদ ও রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। কারণ রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ (State Socialism) সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত করিবার নীতিতে বিশ্বাসী। সমিতিমূলক সামাজবাদীগণ প্রতি কারখানাকে স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে চান। স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় শ্রমিক সমিতিগুলি (Guilds) আঞ্চলিক সংস্থাগুলি নির্বাচন করিবে। আবার আঞ্চলিক শ্রমিক সংস্থাগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সমিতি বা National Guild Congress গঠন করিবে। এই জাতীয় শ্রমিক উৎপাদক সমিতি সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমিতিমূলক সমাজবাদীগণ সমাজস্থ বিভিন্ন বৃত্তির (Functions) ভিত্তিতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় সংস্থাসমূহ গঠন করিতে চান। ইহা ব্যতীত ভৌগোলিক নির্বাচন কেন্দ্রের ভিত্তিতে আরও একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে। প্রথমটি উৎপাদকগণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, দ্বিতীয়টি consumers বা ভোক্তা বা জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয়। প্রথমটির কর্তব্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিধিব্যবস্থা করা, দ্বিতীয়টির কর্তব্য হইবে রাজনৈতিক। সুতরাং সমিতিমূলক সমাজবাদীগণ যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অনেকটা দ্বি-কক্ষীয় (Bicameral) বিধানমণ্ডলীর অনুরূপ। দুইটি সভায় যদি বিরোধ ঘটে তাহা হইলে উভয়ের দ্বারা নির্বাচিত যুক্ত কমিটিকে বিরোধ মীমাংসার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

সাম্যবাদী (Communist) ও রাষ্ট্রহীন সংঘভিত্তিক সমাজতন্ত্রীদের (Syndicalist) ন্যায় সমিতিভিত্তিক সমাজবাদীগণ ব্যাপকভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সাম্যবাদী ও রাষ্ট্রহীন সংঘভিত্তিক সমাজতন্ত্রীগণ হিংসা ও বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী। সমিতিমূলক সমাজবাদীগণ উপরোক্ত পন্থার বিরোধীতা করেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্বারাই ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব বলিয়া তাহারা মনে করেন। পার্লামেণ্টীয় রাজনীতির মধ্য দিয়াও যে একেবারেই ফললাভ করা যায় না, তাহাও তাহারা মনে করেন না। এ জে, প্লেন্টি; এস, জি, হবসন; জি, ডি, এইচ, কোল এই ধরনের সমাজতন্ত্রের প্রধান সমর্থক। অনেক সমিতিভিত্তিক সমাজবাদকে রাষ্ট্রহীন সংঘভিত্তিক সমাজবাদের ইংলণ্ডীয় রূপ (English version of Syndicalism) বলিয়া বর্ণনা করেন।

রাষ্ট্রহীন সংঘভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism): এই শ্রেণীর সমাজবাদীগণ সমাজকে উৎপাদকগণের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা উৎপাদকের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সেই অনুযায়ী সমাজ পদ্ধতি স্থাপনে অগ্রসর হন। তাঁহারা বলেন যে ইচ্ছাপূর্বক গঠিত উৎপাদকের সর্বোচ্চ সংঘকেই সমাজনিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া কর্তব্য। মার্কসীয় শ্রেণী-সংগ্রাম ও উদ্বৃত্তমূল্যে (Surplus value) ইহারা বিশ্বাস করেন, পার্লামেণ্টীয় রাজনীতিকে ঘোর সন্দেহের চক্ষে দেখেন এবং সর্বাঙ্গীন ধর্মঘট (General strike), ব্যাপক নাশকতা (Sabotage) ও বলপ্রয়োগে ইহারা ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন করিতে চান। রাষ্ট্রহীন সংঘভিত্তিক সমাজবাদীরা কমিউনিস্টদের ন্যায় রাষ্ট্রকে ধনতন্ত্রের হস্তের শ্রমিক-দলন-যন্ত্র হিসাবে গণ্য করেন। রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন এই সম্প্রদায়ের সমাজবাদীদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ তাহাদের মতে রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্র মাত্র।

অরাষ্ট্রীয় সংঘমূলক সমাজবাদ

রাষ্ট্রীয় সংঘভিত্তিক সমাজবাদের নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের বিনাশ সাধনের পর সমাজের ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া বিভিন্ন উৎপাদক গোষ্ঠীর হাতে দিতে হইবে। এইরূপ করিলে প্রতিটি-উৎপাদক বা শ্রমিক আপন সৃজন ক্ষমতা সমাজের উপকারের জন্য নিয়োজিত করিতে পারিবে। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে তাহার সে সুযোগ মিলিবে না। এই নীতি অনুযায়ী সমাজ বিভিন্ন উৎপাদক গোষ্ঠীর ইচ্ছা-মূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিরাজ করিবে। প্রতি শিল্প বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মীগণই শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রিত করিবে। কিন্তু ধনোৎপাদনের উৎসগুলি

বিভিন্ন উৎপাদন গোষ্ঠীর সমষ্টিমূলক প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত থাকিবে। ফরাসীর চিন্তানায়ক জর্জ সরেল (১৮৪৭-১৯২২) এই নীতির প্রবর্তক। তিনি বলেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আপনা আপ'ন ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে আসিবে না। শ্রেণীসচেতন সংঘবদ্ধ শ্রমিকমণ্ডলীকে চেষ্টান্বিত হইয়া বলপ্রয়োগে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে হইবে। তিনি বলেন যে বিপ্লবের চেষ্টা-নিরপেক্ষ অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করা যায় না। বলা বাহুল্য ইহাই মার্কসীয় নীতি। পরিশেষে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সরেল মার্কসের মূল নীতি স্বীকার করিয়া তাঁহারই পথে বিপ্লব সংগঠনের নীতি ঠিক করিয়াছেন।

অতিরিক্ত পাঠ্য :

COKER, F. W : Recent Political Thought, Chaps II, IV, VI, IX
JOAD, C. E. M , Introduction to Modern Political Theory—Chaps. III, IV, V
LASKI : Communism
LLOYD, C : Democracy and its Rivals—Parts II, III.
JOAD, C, E, M : Guide to the Philosophy of Morals and Politics—Part IV
MARX AND ENGELS : Communist Manifesto.

চতুর্দশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিকতা

(Internationalism)

আধুনিক জগতে জাতীয়তাবাদ উগ্র অ-কল্যাণকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার একটি কল্যাণকর মূর্তিও কল্পনা করা যায়। সেই মূর্তিতে জাতীয়তাবাদ গঠনপন্থী ও বিশ্ব-শান্তিকামী। কিন্তু এইরূপে জাতীয়তাবাদ দেখা দেয় নাই।

উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় হিসাবেই আন্তর্জাতিক আদর্শের উদ্ভব হইয়াছে। আন্তর্জাতিকতার ইতিহাস বিস্তৃত হইয়া সুদূর অতীতে চলিয়া গিয়াছে। মধ্যযুগে, রেনেসাঁর সময় এবং সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আজ পর্যন্ত এই আদর্শ চিন্তানায়কদের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের জাতিসংঘ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সহিত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্যের বিশেষ মিল রহিয়াছে। আবার দুইটি প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ সংগঠনগত মিলও প্রচুর; আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে মৈত্রীস্থাপন ও জাতিগুলির উন্নতি সাধন জাতিসংঘ ও জাতিপুঞ্জের মূল নীতি।

নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ যে ভূমিকায় বর্তমান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব সংস্থাগুলির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জাতিপুঞ্জের সাফল্য লক্ষণীয়।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশ্ব রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিশ্ব সাম্রাজ্য নহে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রই ভবিষ্যতে মানব সমাজের কল্যাণের জন্য স্থাপিত হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

জাতীয়তাবাদের দুই রূপ; কল্যাণকর ও অকল্যাণকর

আধুনিক জগতে জাতীয়তাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। জাতীয়তাবাদের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করিতে না পারিলে বর্তমান সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা অসম্ভব। জাতীয়তাবাদের দুইটি রূপ কল্পনা করা যায়—একটি মঙ্গলদায়ক, আর একটি অকল্যাণের আকর। অন্য জাতির সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া জাতির সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি

বিধানে জাতীয়তাবাদের কল্যাণরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় মানব ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের এই মঙ্গলময় মূর্তির প্রকাশ এখনও দেখা যায় নাই। আজ পর্যন্ত ইহা অলব্ধ আদর্শই থাকিয়া গিয়াছে। ইতিহাসে জাতীয় রাষ্ট্রের অকল্যাণ মূর্তির প্রাদুর্ভাবই চিরন্তন হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি আপন সংকীর্ণ স্বার্থের খাতিরে পশুশক্তি প্রয়োগে অন্যজাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রতলে অধীন জাতি নিষ্পেষিত হইয়াছে। ক্ষমতা বিস্তারের জন্য শক্তিশালী জাতিগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বারংবার সমরাঙ্গনে সভ্যতা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। একবার ১৯১৪ সালে এবং পুনরায় ১৯৩৯ সালে ২৫ বৎসরের মধ্যে দুইটি মহাসমর জাতীয় রাষ্ট্রের সর্ববিধ্বংসী ভয়ঙ্কর রূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছে। সাম্প্রতিককালে আণবিক বোমা ও কল্পনাতীত অন্যান্য মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় মানবসভ্যতা ঘোরতররূপে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে।

আধুনিক জগতে অকল্যাণকর জাতীয়তাবাদের প্রাদুর্ভাব

সভ্যতার আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পৃথিবীর বুকে মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও ধ্বংস আনিয়া দিয়াছে। এই দারুণ বিপর্যয়ের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার উপায়রূপে শান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শ বারংবার মানবসমাজে উত্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক যুগে সমস্ত জাতিগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা ব্যাপক ও অপরিহার্য। তথাপি শান্তির বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হইয়াছে। ধর্মগুরুগণ, দার্শনিকেরা, রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ যে সকল আন্তর্জাতিকতার আদর্শ লোক সমাজে প্রচার করিয়াছেন তাহার ইতিহাস দীর্ঘ ও বিস্তৃত।

আন্তর্জাতিকতা উদ্ভবের কারণ

আন্তর্জাতিক আদর্শের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: এই আদর্শের ইতিহাসকে তিনটি সুস্পষ্ট যুগে ফেলা চলে। (১) মধ্যযুগ ও নবজীবনায়নের যুগ (Mediaeval and Renaissance Periods), (২) উনবিংশ শতাব্দী, (৩) বিংশ শতাব্দী।

মধ্যযুগ: চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যযুগীয় দুই জন চিন্তানায়ক পিয়েরে দুবোয়া (Pierre Dubois) ও দান্তে (Dante) আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। 'The Recovery of the Holy Land' পুস্তকে ফরাসী চিন্তানায়ক দুবোয়া প্রস্তাব করেন যে ইউরোপের রাজন্যবর্গের

মধ্যযুগ

সংঘ গঠিত হইলে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম ও কর্মস্থল অ-খ্রীষ্টানগণের অধিকার হইতে কাড়িয়া লওয়া সম্ভব হইবে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক সালিশী ও আন্তর্জাতিক আদালত প্রাতষ্ঠিত করা উচিত, তিনি এই কথা বলেন। কোন রাষ্ট্র যদি এই সংঘের আদেশ পালন না করে তবে অর্থনৈতিক অসহযোগ বলে তাহাকে নতি স্বীকার করাইতে হইবে।

দুবোয়া

ইটালীয় মহাকবি দান্তে প্রস্তাব করেন যে পশ্চিম ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বগুণসম্পন্ন একজন সম্রাট প্রয়োজন। এই সম্রাটের অধীনে বিভিন্ন রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন বিরাজ করিবে। সম্রাট সকল রাষ্ট্রের পক্ষে প্রযোজ্য নীতিগুলি বিধিবদ্ধ করিবেন এবং শান্তিস্থাপন করিবেন। স্থানীয় রাজ্যগুলি স্থানীয় স্বাধীনতার অধিকারী থাকিবে অর্থাৎ দান্তে শান্তিস্থাপনের জন্য বিভিন্ন জাতিগুলিকে সম্রাটের নেতৃত্বে সংহত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাও একপ্রকার আন্তর্জাতিকতার উদাহরণ।

দান্তে

রেনেসাঁস যুগ : ইউরোপীয় নবজীবনায়নের অন্যতম নেতা ইর‍্যাস্‌মাস্ (Erasmus) যুদ্ধের বিরোধিতা করেন এবং শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে রাজন্যবর্গের দ্বারাই এই সংঘ গঠিত হইবে। আপসে বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিশী প্রথার প্রবর্তনও তিনি সুপারিশ করিয়াছিলেন।

রেনেসাঁস-ইর‍্যাসমাস

সপ্তদশ শতাব্দী : ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীয় এমেরিক ক্রচে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির জন্য একটি সংঘ ও তাহাদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসাকল্পে সালিশী ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিকতার চিন্তানায়কগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম যুদ্ধের আর্থিক অপচয়ের দিকে লোকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৬৩৪ সালে ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ সালী ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরীর নামে সুপ্রসিদ্ধ Grand Design (মহান পরিকল্পনা) প্রকাশ করেন। সালী প্রস্তাব করেন যে ইউরোপের পনেরটি রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়া একটি পরিষদ গঠন করিবে। এই পরিষদই আন্তর্জাতিক মৈত্রী রক্ষার জন্য সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিবে। কোন রাষ্ট্র যদি যুদ্ধে অগ্রসর হয় তাহা হইলে অন্য রাষ্ট্রগুলি নিয়মভঙ্গকারী যুদ্ধোদ্যত রাষ্ট্রকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিয়া শান্তি পুনঃস্থাপিত করিতে সচেষ্ট হইবে।

ক্রচে

সালী

১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Law of War and Peace গ্রন্থে ওলন্দাজ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিস্থাপন করেন। আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে তাহার অবদান বিশেষ স্মরণীয়। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উলিয়াম পেন আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য শালিশী আদালতের যে প্রস্তাব করেন তাহাও উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দী

অষ্টাদশ শতাব্দী: ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে জন বেলার্স প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে শান্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য এক ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে এই যুক্ত রাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতি বৎসর একটি করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রকংগ্রেস আহ্বান করিয়া রাজন্যবর্গ ও রাষ্ট্রগুলির দাবি দাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা ও মীমাংসার ব্যবস্থা করা উচিত।

স্যাঁ পিয়েরে

এ্যাবে ও দ স্যাঁ পিয়েরে (Abbe de St. Pierre) ১৭১৩ সালে আন্তর্জাতিক চিরন্তন শান্তি রক্ষার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রস্তাব করেন যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির একটি কংগ্রেস থাকিবে। কংগ্রেসে ফ্রান্সের প্রধান্য থাকা তাঁহার মতে আবশ্যক। রুশো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পিয়েরের পরিকল্পনা আলোচনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা দূর করিতে হইলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা অপরিহার্য।

রুশো

কাণ্ট

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট ১৭৯৫ সালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'চির-শান্তি' (Perpetual peace) প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি জাতিসংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। প্রতি রাষ্ট্রে সৈন্যবাহিনী তুলিয়া দিয়া শান্তিপূর্ণ-ভাবে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার দাবি জানান। তিনি আরও বলেন যে প্রতি রাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তির পথ সুগম হইবে।

উনবিংশ শতাব্দী

উনবিংশ শতাব্দী: বিভিন্ন যুগের চিন্তানায়কদের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই বটে কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে আন্তর্জাতিকতার বাণী বার বার উচ্চারিত হইয়াছে। ইহার প্রভাবে ও বাস্তব অবস্থার চাপে রাষ্ট্রনায়কগণও শান্তি ও আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। Holy Alliance (পবিত্র সন্ধি) ও Concert of Europe

পবিত্র সন্ধি (Holy Alliance) ও ইউরোপীয় 'কনসার্ট

রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টার প্রথম ফল। প্রথমটি দ্বারা রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া খ্রীষ্টীয় ন্যায়নীতির মাধ্যমে পরস্পরের সহিত ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। Concert of Europe সংক্রান্ত নীতি রুশ তুর্কী যুদ্ধের পর প্রচারিত হয়। বিজয়ী রাষ্ট্রের স্বার্থে নহে, সমগ্র ইউরোপের সর্বোচ্চ স্বার্থেই বিজিত দেশের ভূখণ্ড হস্তান্তরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—এই নীতিটি সেই সময়ে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়। বার্লিন কংগ্রেস (১৮৭৮) হইতে শুরু করিয়া অনুমান ত্রিশ বৎসরকাল এই নীতি কিছুটা কার্যকরীভাবে চলিয়াছিল। Holy Alliance নামেই কেবল 'পবিত্র' ছিল। ইহার আসল উদ্দেশ্য ছইল স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখা।

যে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিভিন্ন রাষ্ট্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করে তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান International Postal Union বা 'আন্তর্জাতিক পোস্টাফিস সংঘ' উনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য ১৯১৪ সালের পূর্বেই ২০টি সংস্থা স্থাপিত হয়। ইহার অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মলাভ করে।

১৮৯৮ সালে রুশ সরকারের প্রচেষ্টায় হেগে আন্তর্জাতিক বৈঠক আহূত হয়।

হেগ সম্মেলন

পর বৎসর এই বৈঠকের অধিবেশন হয়। ছাব্বিশটি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। নিরস্ত্রীকরণ এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সভায় স্থায়ী আন্তর্জাতিক সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদালত অনেকগুলি বিবাদের মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়।

১৯০৭ সালে দ্বিতীয় শান্তি বৈঠক বসে। আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসায় নিরপেক্ষ তৃতীয় রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগের প্রস্তাবও এখানে স্বীকৃতি লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বহু সালিশী চুক্তি সম্পন্ন হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের চুক্তি সম্পন্ন হয়। নিখিল আমেরিকা রাষ্ট্র সম্মেলনের (Pan-American Union) প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন রাজ্য সন্ধিপত্র মারফৎ স্বীকার করিয়া লয় যে তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ International Commission বা আন্তর্জাতিক কমিটির মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি হইবে।

মন্তব্য : সুতরাং দেখা যাইতেছে মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত চিন্তানায়কগণ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিকতা স্থাপনকল্পে নানা পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টায় চুক্তি, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ সুগম হইয়াছে। বহুসংখ্যক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। হেগের স্থায়ী সালিশী আদালতে বহু আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে, আন্তর্জাতিক স্বার্থ কিছু পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি জাতীয় স্বার্থের প্রধান্য সর্বক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যখনই জাতীয় স্বার্থের সহিত আন্তর্জাতিক স্বার্থের গুরুতর সংঘাত ঘটিয়াছে তখনই শান্তি বিঘ্নিত হইয়াছে। এই কারণেই প্রথম মহাযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

জাতিসংঘ ও জাতিপুঞ্জ

প্রথম মহাযুদ্ধের ভস্মস্তূপ হইতে Leauge of Nations বা জাতিসংঘের উৎপত্তি হয়। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ হইতে জন্মলাভ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)।

জাতিসংঘ (League of Nations) : প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারসাই সন্ধি-পত্রের (১৯১৯) অংশ হিসাবে জাতিসংঘের সনদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে জাতিসংঘের কার্য শুরু হয়। জাতিসংঘের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি এইরূপ : (১) সভা (Assembly), (২) পরিষদ (Council) এবং (৩) কার্যদপ্তর (Secretariat)।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য : আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ উদ্দেশ্য লাভের জন্য জাতি-সংঘ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার আবশ্যকতা মানিয়া লয় এবং যুদ্ধের পন্থা পরিহার করিবার নীতি গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক স্থাপনের নীতি লিপিবদ্ধ করে। আন্তর্জাতিক আইনই জাতিতে জাতিতে ন্যায় ব্যবহারের মানদণ্ড—এই নীতিটিও গৃহীত হয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইল্‌সনই জাতিসংঘের জনক বলিয়া ইতিহাসে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

সভ্যসংখ্যা : যে সকল জাতি প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদেরই লইয়া জাতিসংঘ গঠিত হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করে নাই। ক্রমে সদস্য সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ১৯২০ সালেই অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হইবার চার মাসের মধ্যেই ইহার সদস্য সংখ্যা ৪০ হয়। ১৯৩২ সালে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৫। ১৯৩৪ সালে রাশিয়া জাতিসংঘে প্রবেশ করিবার অধিকার পায়। জাতিসংঘের নিয়মানুযায়ী সভার দুই তৃতীয়াংশের ভোটে নূতন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিত।

সভা

সভা (Assembly) : সকল সদস্য রাষ্ট্রই সভার সভাশ্রেণীভুক্ত ছিল। যদিও প্রতি সদস্য রাষ্ট্র তিনজন করিয়া প্রতিনিধি সভায় প্রেরণ করিতে পারিত, তথাপি প্রতি সদস্য রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোট ছিল। সভা জাতিসংঘের সনদে উল্লিখিত যে কোন বিষয় অথবা বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত যে কোন বিষয় আলোচনা করিতে পারিত। নূতন সদস্য নির্বাচন, পরিষদের অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলির নির্বাচন, বাজেট, জাতিসংঘের সনদের সংশোধন, সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যয়ভার বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে সভাব বিশেষ ক্ষমতা ছিল। নূতন সদস্য নির্বাচন ও জাতিসংঘের সনদ পরিবর্তন এবং আরও কয়েকটি আনুষ্ঠানিক বিষয় ব্যতীত সভার সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়া অপরিহার্য ছিল।

পরিষদ

পরিষদ (Council) : পরিষদই জাতিসংঘের প্রাণস্বরূপ ছিল। জাতিসংঘের মর্যাদা ও কর্মকুশলতা প্রধানতঃ পরিষদের উপরই নির্ভরশীল ছিল। ১৪ জন সদস্য লইয়া পরিষদ গঠিত ছিল। ইহার মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য, বাকি ৯ জন অস্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্যগণ অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্য হইতে সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইত। প্রথমতঃ কথা ছিল যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী সদস্য হইবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান না করায় ১৯২৬ সাল পর্যন্ত একটি স্থায়ী আসন শূন্য থাকে। ঐ বৎসর জার্মানীকে শূন্য স্থায়ী আসনটি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে জার্মানী ও ইটালী জাতিসংঘ হইতে পদত্যাগ করে। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েট রাশিয়া জাতিসংঘের ও তাহার পরিষদের স্থায়ী সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালে রাশিয়া কর্তৃক ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণের পর রাশিয়া জাতিসংঘ হইতে বহিষ্কৃত হয়। জাতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্রসংঘের সনদ ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে সনদের ১৬ ধারা অনুযায়ী, অন্যান্য সদস্য কর্তৃক অর্থনৈতিক এমন কি সামরিক পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থাও ছিল।

দুই একটি বিষয় ছাড়া সভা ও পরিষদের কর্মক্ষেত্র প্রায় একই ছিল। তবে পরিষদ একটি ক্ষুদ্র, মোটামুটিভাবে দৃঢ়সম্বদ্ধ সংস্থা ছিল; এবং বৎসরে তিন-

চার বার মিলিত হইত বলিয়া জাতিসংঘে তাহার ভূমিকা আরও মূল্যবান হইয়া দাঁড়ায়।

জাতিসংঘের সনদে উল্লিখিত বিষয় এবং বিশ্বশান্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় পরিষদের আলোচনায় পরিধিভুক্ত ছিল। বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখাই পরিষদের প্রধান কর্তব্য ছিল। কতকগুলি ছোট-খাট ব্যাপার ছাড়া সমস্ত বিষয়েই পরিষদকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইত।

কর্ম দপ্তর

কর্ম দপ্তর (Secretariat) : কর্মদপ্তরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন (সম্পাদক প্রধান) (Secretary-General। তিনি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। জাতিসংঘের কর্মদক্ষতা অনেক পরিমাণে ইহারই উপর নির্ভর করিত। প্রায় ছয়শত কর্মচারী কর্মদপ্তরে নিযুক্ত থাকিয়া সভা ও পরিষদ আপিসের কার্য সম্পাদন করিত।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত (Permanent Court of International Justice) : পনের জন বিচারক লইয়া এই আদালত গঠিত ছিল। সংকল্পপত্র বা চুক্তি-পত্রের ব্যাখ্যা বা বিচারযোগ্য যে কোন আন্তর্জাতিক প্রশ্ন ইহারা দরখাস্তের মারফৎ বিচার করিতে পারিতেন। জাতিসংঘের সনদে লিখিত হইয়াছিল যে পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের ব্যবস্থা করিবেন। এই ক্ষমতানুযায়ী তাহারা ১৯৩০ সালে স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতটি স্থাপন করেন।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organisations) : শ্রমিকগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সবদেশে শ্রমিক আইন প্রণয়ন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রই ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত। এই প্রতিষ্ঠানের সভায় শ্রমিক, মালিক ও সরকার—এই তিন পক্ষীয় প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থাকিতেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং সংস্থা তাহার আপন সনদ অনুযায়ী স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছে।

সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Auxiliary Organisations) :

সাহায্যকারী সংস্থা সমূহ

উপরোক্ত সংস্থাগুলি ব্যতীত জাতিসংঘের অভ্যন্তরে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছিল, যেগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য একেবারেই উপেক্ষনীয় নহে।

(১) অর্থনৈতিক ও মুলধনবিষয়ক সমিতি (Economic and Financial Organisation) বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশেষতঃ অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল।

(২) যানবাহন ও চলাচল সংক্রান্ত সমিতি (Organisation for Communication and Transit): রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্রান্তরে যানবাহনের ব্যবস্থা যাহাতে অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে, এইদিকে দৃষ্টি রাখাই এই সমিতির প্রধানকার্য ছিল।

(৩) স্বাস্থ্য সংস্থা (Health Organisation): সংক্রামক রোগ নিবারণ সম্বন্ধে উপদেশ দান, যে সকল রোগে বেশী মৃত্যু হয়, সেই সকল রোগের প্রতিবিধান সম্পর্কে উপদেশ দান, প্রভৃতি এই সংস্থার কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

উপদেষ্টা সমিতি সমূহ

ইহা ব্যতিত কয়েকটি উপদেষ্টা সমিতিও ছিল, যথা (১) নিরস্ত্রীকরণ সমিতি (Disarmament Committee)। (২) Mandates Committee: রাজনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসর অ-স্বায়ত্বশাসিত (Non-self Governing) দেশগুলির শাসনভার কোন অগ্রসর রাষ্ট্রকে দেওয়া হইত। জাতিসংঘকে সেই বিষয়ে এই সমিতিটি সাহায্য করিত এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের নিকট হইতে নিয়মিত রিপোর্ট পাইয়া জাতিসংঘের নিকট বিবরণী পেশ করিত। (৩) সামাজিক ও মানবিক কর্তব্য সংক্রান্ত সমিতি (Social and Humanitarian Activites Committee): এই সমিতির পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রসংঘ নারী ও শিশুদের কল্যাণমূলক কার্যাবলী যাহাতে সদস্যরাষ্ট্রগুলি গ্রহণ করে, সেই দিকে দৃষ্টি দিত। অশ্লীল পুস্তকাদির প্রচার, মাদক দ্রব্য ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই সমিতি জাতিসংঘকে উপদেশ দিত।

সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সমিতি (Committee on Intellectual Co-operation): ১৫ জন বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিককে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের প্রসারের জন্য ওই সমিতি জাতিসংঘকে উপদেশ দিত।

জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ:

জাতিসংঘ যে মহান আদর্শ লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সর্বজনগ্রাহ্য। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা মনুষ্য সমাজে বিরাট আশা ও আশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছিল,

কিন্তু নানা বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইয়া জাতিসংঘ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

(১) উগ্রজাতীয়তাবোধ

(১) উগ্র ও মারমুখী জাতীয়তাবোধ জাতিসংঘের পতনের প্রধান কারণ। জাতি বিদ্বেষ, নিজ জাতি সম্বন্ধে অহেতুক বর্বরোচিত গর্ব, সম্পূর্ণ জাতীয় স্বার্থের জন্য অন্য সমস্ত জাতির স্বার্থনাশে দ্বিধাহীনতা জাতিসংঘকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। (২) জাতিসংঘের পরিষদ—যাহার উপর জাতিসংঘের মূল আদর্শ লাভের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই ঋজুতার সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে নাই। এই পরিষদে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দুঃখের বিষয় প্রতি বৃহৎ শক্তি রাষ্ট্রসংঘকে আপন স্বার্থের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। অর্থাৎ বৃহৎ শক্তিবর্গ জাতিসংঘের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে (৩) তদানীন্তন জগতের সর্ববৃহৎ শক্তি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জাতিসংঘ দুর্বল হইয়া পড়ে। (৪) রাজনৈতিক মতদ্বৈধতার জন্য জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে জাতিসংঘে স্থান দেওয়া হয় নাই। ইহাতেও জাতিসংঘের মর্য্যাদার হানি হইয়াছিল। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল যে জাতিসংঘ একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান নহে। (৫) ভারসাই সন্ধির মধ্যে যে সকল অন্যায় নিহিত ছিল, তাহার ফলে যুদ্ধোত্তর যুগে আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী জাতি বিদ্বেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাও জাতিসংঘের ব্যর্থতার আর একটি কারণ। ( ) জাতিসংঘের সনদ অস্থায়ী ইহার কোন সৈন্যবল ছিল না। (৭) যদি রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিকতা ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী হয় তাহা হইলে কোন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাই সফল হইতে পারে না। জাতিসংঘের ব্যর্থতার ইহাও একটি কারণ। (৮) জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতে হইত। ইহাতেও যে অসুবিধা হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। (৯) ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান জাতিসংঘের পতনের একটি প্রধান কারণ।

(২) পরিষদ কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গ

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানে অস্বীকৃতি

(৪) রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা

(৫) প্রতিহিংসামূলক সন্ধি

(৬) সৈন্যবলের অভাব

(৭) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব

(৮) সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি

(৯) ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান

উপসংহার: যদিও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রশংসনীয় সফলতা লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি স্বীকার করিতে হইতে হইবে যে এই দিকে জাতিসংঘ

যে প্রথম প্রচেষ্টা করিয়াছে তাহা উপেক্ষা করা চলে না। প্রথম দশ বৎসর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের বিশ্ব আর্থিক বিপর্যয়ের পর হইতে অবস্থার দারুণ পরিবর্তন হইতে লাগিল। হিট্‌লারের অভ্যুত্থানে জাতিসংঘের সমস্ত আশা বিনষ্ট হয় এবং সংঘের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। সামাজিক, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শ্রমিক কল্যাণকর প্রচেষ্টা এবং অ-রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাফল্য সত্যই লক্ষণীয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, ১৯৪১ সালে, ব্রিটেন্ প্রভৃতি শক্তিসমূহ ঘোষণা করেন যে যুদ্ধোত্তর যুগে শান্তির ভিত্তি দৃঢ় করিয়া গঠন করিতে হইবে। এই ঘোষণা লণ্ডন ঘোষণা (London Declaration 1941) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আটলান্টিক সনদে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টও বলেন যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠাই যুদ্ধোত্তর যুগের মৌলিক আদর্শ হইবে। ১৯৪২ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের নীতি মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গ ঘোষণা করেন। ১৯৪৩ সালে মস্কো ঘোষণায় বলা হয় যে সকল শান্তিকামী জাতির সাম্য ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর যুগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করিতে হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্রেটনউড্‌সএ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রথম খসড়া প্রস্তুত হয় এবং ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক বৈঠকে বর্তমান সনদটি একান্নটি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হইয়া আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়। এই একান্ন জনই জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য। ইহার মধ্যে ভারত অন্যতম। ক্রমে সংখ্যা বর্ধিত হইয়া এখন জাতিপুঞ্জের সদস্য সংখ্যায় শতাধিক হইয়াছে।

জাতিপুঞ্জ গঠনের ইতিহাস

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য : আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যলাভ করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিরঙ্কুশ সহযোগিতা ও আদান প্রদান প্রয়োজন। এই সহযোগিতার ক্ষেত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। যদি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে বেশি দিন শান্তি টিকাইয়া রাখা সম্ভব নহে। তাই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর জাতিপুঞ্জ বিশেষ জোর দিয়াছেন। জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের সহিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্য তুলনা করিলে দেখা যাইবে উদ্দেশ্যের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই।

জাতিপুঞ্জ যে সকল সংস্থা গঠিত করিয়াছে তাহাও জাতিসংঘের গঠন পদ্ধতির অনুরূপ।) ১

সাধারণ সভা (General Assembly) : জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য রাষ্ট্র লইয়া ইহা গঠিত। প্রতি রাষ্ট্র সাধারণ সভায় পাঁচজন করিয়া সদস্য পাঠাইতে পারে কিন্তু ভোট প্রতি সদস্য-রাষ্ট্রের একটি মাত্র। সাধারণ ভাবে বৎসরে একবার অধিবেশন হয়, তবে নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) বা অধিকাংশ সদস্য-রাষ্ট্র যদি অনুরোধ করে তবে বিশেষ অধিবেশনও হইতে পারে।

গঠন ও কর্মক্ষেত্র

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সাধারণ সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে দুইতৃতীয়াংশের সমর্থন অপরিহার্য। (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান সম্বন্ধীয় সুপারিশ। (২) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন। (৩) নূতন সদস্য-রাষ্ট্র গ্রহণ। (৪) কোন সদস্য-রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জ হইতে বিতাড়ন। (৫) অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন। (৬) বাজেট। (৭) অনুন্নত দেশের তত্ত্বাবধান।

সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ যদি ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ করে তাহা হইলে পরিষদের অনুমতি ব্যতীত সাধারণ সভা ঐ বিষয় আলোচনা করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত সাধারণ সভা অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক-ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সকল সমস্যার আলোচনা করিতে সক্ষম।)

(**নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) :** জাতিসংঘের পরিষদের ন্যায় জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ইহার মোট সদস্য সংখ্যা এগার জনের মধ্যে পাঁচ জন স্থায়ী সদস্য ও ছয় জন অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্য হইতেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউ. এস. এস. আর., ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীন (চিয়াং কাইশেক—চীন)। ছয় জন অস্থায়ী সদস্য সাধারণ সভা, কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। অস্থায়ী সদস্যদের কার্যকাল দুই বৎসর।

নিরাপত্তা পরিষদ গঠন

বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে নিরাপত্তা পরিষদ কোন বিশেষ আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্বন্ধে সনদে উল্লিখিত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে পারে।

কর্মক্ষেত্র

(১) যে কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ; (২) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা সংঘটন

ও তদ্দ্বারা মীমাংসা ; (৩) মধ্যস্থতার দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা ; (৪) সালিশী ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা ; (৫) প্রত্যক্ষভাবে মীমাংসার প্রয়াস।

যদি উপরোক্ত পন্থায় ফললাভ না হয় তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সহিত সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে নির্দেশ দিত পারে। যদি ইহাতেও কোন ফল না হয় তবে নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী শান্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারে। এই বাহিনী নিরাপত্তা পরিষদের Staff-military Committee কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

নিরাপত্তা পরিষদের ভিটো প্রথা : নিরাপত্তা পরিষদের ১১ জন সদস্যদের মধ্যে সাতজনের ভোটেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইলে সাতটি সম্মতিজ্ঞাপক ভোটের মধ্যে পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যদের ভোট অবশ্য থাকা চাই। যদি কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের জন্য আন্তর্জাতিক সৈন্যদল ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে পাঁচটি স্থায়ী সদস্যেরই সম্মতি প্রয়োজন। যদি কেহ বিরুদ্ধে ভোট দেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সেই স্থায়ী সদস্য 'ভিটো' ব্যবহার করিতেছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তই অনুমোদিত হওয়া সম্ভব হয় না।

"ভিটো', ব্যবস্থা,

যখন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অনেক চিন্তা করিয়াই ভিটো প্রথা সনদভুক্ত করা হইয়াছিল। যে পাঁচটি শক্তি স্থায়ী আসনের অধিকারী তাহারা (জাতীয়তাবাদী চীন ব্যতিরেকে) বৃহৎ শক্তি। তাহাদের একজনের অমতে যদি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে শান্তি বিঘ্নিত হইবার বাস্তব সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ভিটো প্রথা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য আবশ্যক।

"ভিটোর" প্রয়োজনীয়তা

কেহ কেহ মনে করেন যে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাম্য জাতিপুঞ্জের ভিত্তি। ভিটো প্রথাদ্বারা এই সাম্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে সকল সার্বভৌমিক রাষ্ট্রের সাম্য নীতিগতভাবে অবশ্য স্বীকার্য কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করাও অত্যাবশ্যক। আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা একটি জরুরী অবস্থা। এই জরুরী অবস্থায় সাধারণ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না। জরুরী অবস্থার জন্য জরুরী ব্যবস্থার অপরিহার্যতা স্বীকার না করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। সুতরাং

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শক্তির তারতম্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা চলে না। ভিটো প্রথা তাই সমর্থনীয়।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice): পৃথক একটি সনদের দ্বারা এই বিচারালয় গঠিত হইয়াছে। ইহাতে বিচারপতির সংখ্যা ১৫ জন এবং ইহাদের কার্যকাল ৯ বৎসর। বিচারালয়ের সনদের অন্তর্গত যে কোন বিষয়ের বিবাদ এই বিচারালয়ে বিচারের বস্তু হইতে পারে।

গঠন ও কর্মক্ষেত্র

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ: এই পরিষদ সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ১৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার পরিবর্ধন এই পরিষদের কর্তব্য। এই পরিষদের অন্তর্গত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা রহিয়াছে। তাহার ভিতর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ; শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ও খাদ্য কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা প্রভৃতি প্রধান। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কমিটি রহিয়াছে। তাহার মধ্যে Commission on Human Rights অর্থাৎ মানবাধিকার কমিশন, Economic Commission for Europe বা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন, Economic Commission for Asia and Far East বা এশিয়া ও দূর প্রাচ্য সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন উল্লেখযোগ্য।

গঠন ও কর্মক্ষেত্র

অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ও তাহার অন্তর্গত বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট সাধারণ সভায় পেশ করিতে হয় এবং সেখানে এই রিপোর্টগুলি আলোচনা হইতে পারে।

অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council): অনগ্রসর দেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য ১৪ জন সদস্যবিশিষ্ট এই পরিষদটি তত্ত্বাবিধানে নিযুক্ত আছেন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপকারিতা: যে বিরাট আদর্শ লইয়া জাতিপুঞ্জ গঠিত হইয়াছে তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমতের স্থান নাই। তবে তাহার বাস্তব কার্যকারিতা সম্পর্কে মতান্তর স্বাভাবিক। প্রথমে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বর্তমান পৃথিবীতে নানা সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে এবং বাধাবিঘ্ন

জাতিপুঞ্জের কার্যকারিতার আলোচনা

পর্বতপ্রমাণ বলিয়াই জাতিপুঞ্জ আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য উল্লেখযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর জগতে যদি জাতিপুঞ্জ স্থাপিত না হইত তাহা হইলে এতদিন আণবিক যুদ্ধ বিশ্ব সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিত—এইরূপ ভাবিবার কারণ আছে। জাতিপুঞ্জের মঞ্চে বিবদমান, দুই পক্ষ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার সহযোগীবৃন্দ এবং রাশিয়া ও তাহার সহযোগী রাষ্ট্রবর্গ মিলিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও দুই পক্ষের সহযোগিতা চলিতেছে। ইহার ফলে যুদ্ধের অনুকূল মনোভাব ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতেছে। ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া, কাশ্মীর, ইসরায়েল, মিশর, কঙ্গো, টিউনিশিয়া প্রভৃতি স্থানে জাতিপুঞ্জের শান্তি প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের অবদান অবিস্মরণীয়। নূতন পৃথিবী সৃষ্টির কার্যে জাতিপুঞ্জের এই সকল ক্ষেত্রের গঠনমূলক প্রচেষ্টা নূতন আশায় অনুন্নত জাতিগুলিকে উদ্বোধিত করিয়াছে।

রাজনৈতিক অবদান শান্তি প্রচেষ্টা

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবদান

যে সকল কারণে জাতিসংঘ ব্যর্থ হইয়াছিল সেই সকল কারণের প্রায় সকলগুলিই বর্তমান জগতেও বিদ্যমান, বিশেষতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে জাতীয়তাবাদের অকল্যাণকর শক্তিগুলি এখনও বর্তমান জগতে সক্রিয়। পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতা ও আদর্শের সংগ্রাম চলিতেছে কয়েকটি রাষ্ট্র সভ্যতাবিধ্বংসী আণবিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। স্বার্থের সংঘাত প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সাধারণ মানুষ আজ যদি জাতিপুঞ্জকে সমর্থন না করে, তাহা হইলে সভ্যতার বিনাশ অনিবার্য হইয়া পড়িবে। বর্তমান সভ্যতা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপনীত। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষকে আজ শান্তির প্রতীক জাতিপুঞ্জের পতাকাতলে সমবেত হইতে হইবে। মুক্তির অন্য পথ নাই।

জাতিপুঞ্জও উগ্র-জাতীয়তাবাদ

জাতিপুঞ্জ ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা

বিশ্বরাষ্ট্র (World State) : বিশ্ব রাষ্ট্রের আদর্শ বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা দিয়াছে। গ্রীক দার্শনিক ও সোফিস্ট এ্যান্টিফোন ও স্টোইক

সর্বজনীনতা (Cosmopolitanism)

দার্শনিকগণ সর্বজনীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আদর্শ কল্পনালোকেই থাকিয়া যায়। মধ্যযুগে দান্তে বিশ্ব সম্রাট ও তাঁহার অধীনে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যসমূহের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। দান্তের বিশ্ব সাম্রাজ্যের গঠনের সহিত আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠনপদ্ধতির কিছুটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। আধুনিক কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় পন্থায় বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। কারণ আধুনিক রাষ্ট্র জাতীয় ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোন বিশ্বরাষ্ট্রে স্থান দিতে হইলে তাহাদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা দান সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিশ্বরাষ্ট্র গঠন

শাসন ও বিচার ক্ষমতা ব্যবহার করিবে ইহাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। বিশ্বরাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবে। এই নির্বাচনে সর্বরাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিশ্বসরকার এবং জাতীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সরকার আইন, সকলরাষ্ট্রেরই অধিকার থাকিবে। বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য নীতি।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অন্য এক উপায় হইতেছে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। ইহার দ্বারা ঐক্য ও প্রগতিও আসিতে পারে। কিন্তু বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নীতি আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। একটি রাষ্ট্র আপন ক্ষমতাবলে অন্যান্য জাতিকে বশে আনিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে, অধীন জাতিগুলির আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইবে —এই আশা করা স্বপ্নবিলাস বই কিছু নহে। রোমান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রমাণ করে যে সাম্রাজ্যবাদ বিজয়ী রাষ্ট্রের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। তাহার ফলে অধীন জাতিগুলির নৈতিক ও সামাজিক অধিকার বিনষ্ট হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ কায়েম হইয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা মূর্খতা ব্যতীত কিছুই নহে।

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) ও বিশ্বশান্তি

সাম্রাজ্যবাদের শোষক রূপ

অতিরিক্ত পাঠ্য

BURNS, C. D.—Political Ideals. Ch. IX, XIII
MUIR. R.—Nationalism and Internationalism
WOOLF, L—Imperialism and Civilisation
Covenant of the League of Nations
United Nations, Charter.

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথকীকরণ

(Theory of Separation of Powers)

[রাষ্ট্রের নিজ উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনপ্রকার ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হয়: (১) আইন প্রণয়ন ক্ষমতা; (২) শাসন ক্ষমতা; (৩) বিচার ক্ষমতা। এইজন্য রাষ্ট্রে তিনটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়: আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মঁতেসক্যুর মতে এই তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র রাখা আবশ্যক। সেইজন্য একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার না করে, তাহাই লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি ইহার ব্যত্যয় হয় তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। এই নীতির সমালোচকরা বলিয়াছেন যে: (১) রাষ্ট্রের ক্ষমতা দুইটি অথবা পাঁচটি, তিনটি নয়। (২) মঁতেসক্যুর মত ইতিহাস সম্মত নহে, (৩) রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, সুতরাং পৃথকীকরণ সম্ভব নয়. (৪) বিভিন্ন বিভাগের পৃথকীকরণ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হইতে পারে—যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ঘটিয়াছে; (৫) রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ সমপর্যায়ের নহে—আইন ও শাসন বিভাগদ্বয়ের গুরুত্ব রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিছু বেশি। (৬) মঁতেসক্যু বলেন যে, ক্ষমতা পৃথকীকরণের অভাব হইলেই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়—ইহাও ভুল। বৃটেনে মন্ত্রিমণ্ডলী কার্যতঃ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পরিচালনা করেন কিন্তু সেখানে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে; (৭) যাহারা গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা বা যোজনায় বিশ্বাসী, তাহারা বলিতেছেন যে ক্ষমতা পৃথকীকরণে পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে, (৮) একনায়কত্বের সমর্থকেরাও রাষ্ট্রের ঐক্যের নামে ক্ষমতা পৃথকীকরণের বিরোধিতা করিতেছেন।

তথাপি ইহার মূল্য আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ইহার যথেষ্ট মূল্য ছিল। সম্পূর্ণ ক্ষমতা পৃথকীকরণ সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় নহে। তবে সীমিত পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা এখনও আছে। বিচার বিভাগ সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে সত্য। এই মতবাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস গৌরবময়। ১৭৮৭ সালে আমেরিকার সংবিধান প্রস্তুতকালে, এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংবিধানের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার চিহ্ন বর্তমান সংবিধানেও বর্তমান আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহার মর্যাদা কমিয়াছে—প্রধানতঃ ব্রিটেনের শাসনপদ্ধতি বিবর্তনের ফলে। আমেরিকাতেও ইহার মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধভাবে গৃহীত হইতে পারে।]

রাষ্ট্রের ন্যায় বিরাট জনসমষ্টিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে রাষ্ট্রকে তিনটি প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। প্রথমতঃ সুস্পষ্ট আইনের ভিতর দিয়া জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ যে বিধিনিষেধ আইনদ্বারা সৃষ্ট হয়, তাহা সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভাবে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, পক্ষপাতশূন্য ভাবে রাষ্ট্রকে বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব লইতে হইবে। এই তিনটি প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন না হইলে রাষ্ট্র কোনক্রমেই নাগরিকদের জীবন-ধন

রাষ্ট্রের ত্রিবিধ কার্যাবলী: আইন-প্রণয়ণ, শাসন ও বিচার

রক্ষণাবেক্ষণ ও সমাজকল্যাণ সাধন করিতে পারে না। এই তিনটি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রকে তিন প্রকারের ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হয়। প্রথম আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, দ্বিতীয় আইন পরিচালন (কার্যে পরিণত করণ) ক্ষমতা ও তৃতীয় বিচার ক্ষমতা। এই তিন প্রকার ক্ষমতা পরিচালনের জন্য আধুনিক রাষ্ট্রে তিনটি বিভাগ দেখা যায়: যথা—আইন বিভাগ (Legislature), শাসন বিভাগ (Executive) এবং বিচার বিভাগ (Judiciary)।

অ্যারিস্টটলের আমল হইতে ত্রিবিভাগীয় নীতি চলিয়া আসিতেছে; তিনি আইন বিভাগকে Deliberative বিভাগ নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু মূলতঃ Legislative ও Deliberative বিভাগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। Executive বা শাসন বিভাগকে অ্যারিস্টটল Magisterial বিভাগ আখ্যা দিয়াছেন। এখানেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তৃতীয়তঃ, বিচার বিভাগকে তিনি Judiciary নামেই অভিহিত করিয়াছেন। অ্যারিস্টটলের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের ত্রিবিভাগীয় ক্ষমতানীতি প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, গ্রীক রাষ্ট্র দার্শনিক ত্রিবিধ ক্ষমতা ও ত্রিবিধ বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি ক্ষমতা পৃথকীকরণ-নীতি প্রচার করেন নাই।

অ্যারিস্টটলের ত্রিবিভাগীয় নীতি

ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মঁতেসক্যু ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি বৈজ্ঞানিক ভাবে গঠিত করেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Spirit of Laws-এ এই নীতি লিপিবদ্ধ করেন। তাহার নীতি বিশ্লেষণ করিলে চারিটি উপাদান পাওয়া যায়। (১) তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রের সামগ্রিক ক্ষমতা তিন ভাগে ভাগ করা যায়—আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, আইন পরিচালনের ক্ষমতা ও বিচার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ দেখা যায়—আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ; (২) এই তিনটি বিভাগকে পৃথক রাখা অত্যাবশ্যক। তাহা করিতে হইলে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হস্তে বিভিন্ন বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে হইবে; (৩) কোন এক বিভাগীয় ক্ষমতাধিকারীদের হস্তে অন্য কোন বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া চলিবে না; যাহাতে একটি অন্যটিকে প্রভাবিত না করিতে পারে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৪) যদি এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হস্তে একাধিক বিভাগীয় ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে

মঁতেসক্যুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি চারিটি উপাদানে গঠিত

ব্যক্তি ও জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। অথবা যদি একটি বিভাগ অন্য অন্য বিভাগকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে।* যদি শাসন বিভাগকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা হইলে সুবিধার জন্য স্বৈরাচারী আইন সৃষ্টি করিবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। যদি শাসন বিভাগকে বিচার ক্ষমতা দেওয়া হয় তবে বিচার প্রহসনে পরিণত হইবে। শাসক সম্প্রদায় শাসনের সুবিধার জন্য ন্যায় বিচারের অমর্যাদা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তেমনি আইনবিভাগ ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা স্বতন্ত্র না রাখিলে স্বৈরাচারের দ্বার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

ক্ষমতাপৃথকীকরণ-নীতির সমালোচনা: মঁতেসক্যুর পূর্বে ও পরে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই নীতি সম্বন্ধে আপন আপন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মঁতেসক্যু যেরূপ প্রাঞ্জলতা ও দৃঢ়তার সহিত ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে মতটিকে প্রচার করিয়াছেন সেরূপ কেহই পারেন নাই। এই নীতি নানা দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছে। (১) এক শ্রেণীর সমালোচক বলিয়াছেন যে, মঁতেসক্যু তিনটি ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন—আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, শাসন ক্ষমতা ও বিচার ক্ষমতা। মূলতঃ বিচার ক্ষমতা শাসন ক্ষমতারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করেন; অর্থাৎ শাসন বিভাগের ন্যায় বিচার বিভাগও আইন কার্যে পরিণত করেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দুই ভাগে বিভক্ত করা সমীচীন; যথা—আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ। গুড্‌নো (Goodnow), জেন্‌কস্‌ প্রভৃতি লেখকগণ এই মতাবলম্বী। এই সমালোচনার কিছু মূল্য আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা অসমীচীন। কারণ শাসনযন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না হইলে পক্ষপাতশূন্য

ক্ষমতা তিন প্রকারের নয়: (ক) দুই প্রকার

*"If the legislative and executive powers are united in the same person or body of persons, there is no liberty, because of the danger that the same monarch or the same senate may make tyrannical laws and execute them tyrannically. Not again is there any liberty if the judicial power is not separated from the legislative and the executive. If it were joined to the legislative power, the power of the life and liberty of the citizens would be arbitrary ; for the judge would be the law-maker ? If it were joined to the executive power, the judge would have the force of an oppressor"—Montesquieu's Spirit of Laws,

নৈর্ব্যক্তিক ন্যায় বিচার সম্ভব নহে। দ্বিবিধ ক্ষমতানীতির (Duality theory) সমর্থনে অন্য একপ্রকার যুক্তিও দেওয়া যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে, বিচারক্ষমতা আইন প্রণয়ন ক্ষমতারই অংশীভূত। কারণ আইন বিভাগ যে আইন প্রস্তুত করেন, বিচার বিভাগ তাহারই ব্যাখ্যা ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং মূলতঃ ক্ষমতা দ্বিবিধ—শাসন ক্ষমতা ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা। সুতরাং মঁতেসক্যুর ত্রিবিভাগীয় নীতি (Trinity Theory) গ্রহণযোগ্য নহে।

(২) শাসন পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উইলোবী (Willoughby) তাহার The Governments of Modern States পুস্তকে বলিতেছেন যে, মঁতেসক্যু উল্লিখিত তিনটি বিভাগ ব্যতীত আরো দুইটি বিভাগ উল্লেখযোগ্য। তাহার একটি হইতেছে Electorate বা ভোটদাতাগণ এবং অন্যটি Administration বা কর্মচারী সম্প্রদায়।* কিন্তু অনেকে এই মতবাদ স্বীকার করিয়া লন নাই। গ্ল্যাডেন্ (Gladden) তাহার The Essentials of Public Administration পুস্তকে লিখিতেছেন—ভোটদাতাগণকে (Electorate) আইনসভা হইতে পৃথক করা যায় না; আবার কর্মচারী সম্প্রদায় (Administration) শাসন বিভাগেরই অংশীভূত। সুতরাং মঁতেসক্যুর ত্রিবিভাগীয় নীতির দোষ ধরা চলে না।

(খ) ক্ষমতা পাঁচ প্রকারের

(৩) কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন যে, মঁতেসক্যু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রিটেনের শাসনপদ্ধতির ভিত্তিতে তাহার মতবাদ রচনা করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তখন সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী ছিল। মঁতেসক্যু এইখানে ভুল করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী ওয়াল্‌পোলের নেতৃত্বে তখন ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার সূচনা হইতেছিল। ক্যাবিনেট প্রথানুযায়ী মন্ত্রিসভার (শাসন বিভাগ) হস্তে বস্তুতঃ আইন প্রস্তুতির ভারও আসিয়া পড়ে। কারণ ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার পশ্চাতে পার্লামেন্টের—বিশেষ করিয়া কমন্স্ সভার (আইনসভা) অধিকাংশ ব্যক্তির সমর্থন থাকে। আঠারো শতকের প্রথমাংশেই এইরূপ ধাঁচের প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ আঠার শতকের প্রথম ভাগে প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনে মঁতেসক্যু নির্দেশিত ক্ষমতা পৃথকীকরণ

মতটি অনৈতিহাসিক

*The Governments of the Modern States—p.—17

পুরাপুরিভাবে বিদ্যমান ছিল না। সুতারাং ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মত ইতিহাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে গঠিত।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মঁতেসক্যু যখন ব্রিটেনে অবস্থান করিয়া তথাকার শাসনপদ্ধতি আলোচনা করিতেছিলেন, তখন ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার বিবর্তন কেবলমাত্র শুরু হইয়াছে। বিদেশী ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাহা যে ধরিতে পারেন নাই, তাহা তেমন দোষের নহে। তখনও ব্রিটেনে এখনকার মত রাজা পার্লামেণ্টে বসিতেন না এবং পার্লামেণ্টকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিতে পারিতেন না। আবার পার্লামেণ্ট (আইনসভা) সেই সময়ে রাজার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। এতদ্ব্যতীত যদিও বিচারপতিগণ নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন তথাপি বিচার বিভাগ কার্যতঃ অনেকাংশে রাজা ও আইনসভার (Parliament) ক্ষমতার ঊর্ধ্বে ছিল। ব্রিটেনের শাসনপদ্ধতিতে সেকালে ক্ষমতা পৃথকীকরণের চেহারা মোটামুটিভাবে একপ্রকার স্পষ্টই ছিল, সুতরাং ইতিহাসের দিক হইতে মঁতেসক্যুকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মনে করা উচিত হইবে না।

উপরোক্ত সমালোচনার উত্তর

(৪) সর্বদেশের শাসনপদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র না থাকিলে সুষ্ঠু, বাধাহীন ও মসৃণ রাষ্ট্রশাসন সম্ভব হয় না। ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিভেদ সৃষ্টি হইতে পারে। রাষ্ট্রশাসনে এক ও অভিন্ন মৌলিক নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে একই রাষ্ট্রে বিপরীত নীতি অনুসৃত হইবার আশঙ্কা থাকে। আইন বিভাগ একদিকে যাইবে, শাসন বিভাগ যাইবে অন্যদিকে এবং এই দুইএর সঙ্গে বিচার বিভাগেরও কোন সামঞ্জস্য থাকিবে না। ইহা দ্বারা রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে।

পৃথকীকরণের দ্বারা অচলাবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি ইচ্ছা করিয়াই সংযোজিত হইয়াছিল। সেখানে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি উড্‌রো উইলসন ও ট্রুম্যানের রাষ্ট্রপতিত্বের শেষ সময়কার শাসন বিভাগের (President) সহিত আইন বিভাগের (Congress) দ্বন্দ্ব সুপরিচিত। সুতরাং সম্পূর্ণ ক্ষমতার পৃথকীকরণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত নহে;

অতএব বাঞ্ছনীয়ও নহে। এই দিক হইতে বিচার করিলে মঁতেসক্যুর নীতি ত্রুটিপূর্ণ।

(৫) সমালোচকেরা আরও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবও নয়। কারণ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত যে একটিকে অন্যটি হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র রাখিলে রাষ্ট্রের পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্বতন্ত্রীকরণের পরীক্ষা চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, রাষ্ট্রশাসনের সুবিধার জন্য অর্থাৎ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অসুবিধা দূর করিবার জন্য কতকগুলি সংবিধান-বহির্ভূত প্রথা মানিয়া লইতে হইয়াছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি (যিনি শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ কর্তা) ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি অনুযায়ী কংগ্রেস (বিধানমণ্ডলী) কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। আইন সভা বা বিধানমণ্ডলীতে তাঁহার কোন স্থান নাই। অথচ সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা করিতে হইলে তাঁহাকে বিধানমণ্ডলীর (কংগ্রেস) সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিতে হয়। লিখিত সংবিধানগত এই অসুবিধাটুকু দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রথানুযায়ী কংগ্রেসের নিকট বাণী পাঠাইতে পারেন ও কংগ্রেসে প্রয়োজনবোধে বক্তৃতা দিতে পারেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তারের একটি সুযোগ তাঁহাকে প্রথানুযায়ী দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ তাঁহার দলীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কংগ্রেসের নীতি প্রভাবিত করার সুযোগ পান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কার্যতঃ শাসন ও আইন বিভাগের পৃথকীকরণ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইতেছে না। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই এইরূপ প্রথাগুলির উদ্ভব হইয়াছে।

বিভিন্ন বিভাগ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, পৃথকীকরণ তাই অবাস্তব

তাহা ছাড়া সংবিধান অনুসারে (ক) রাষ্ট্রপতি, যিনি শাসন বিভাগের কর্তা, তিনি কংগ্রেস (বিধানমণ্ডলী) প্রণীত আইন ভিটো অথবা বাতিল করিতে পারেন। অর্থাৎ শাসনবিভাগ আইন প্রণয়ণের উপর সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। (খ) সেনেট (বিধানমণ্ডলীর ঊর্ধ্বতন পরিষদ) রাষ্ট্রপতির উচ্চ কর্মচারী নিয়োগ বাতিল করিতে পারেন ; অন্যদিকে সর্বোচ্চ আদালত (সুপ্রীম কোর্ট) সংবিধান ও ন্যায় বিচারের নীতি অনুযায়ী কংগ্রেসী আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের এই সূত্রগুলি ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি লঙ্ঘন

করিয়াই সন্নিবেশিত হইয়াছিল। নতুবা সংবিধান অচল হইয়া উঠিত। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়।

(৬) সমালোচকেরা এই নীতির বিরুদ্ধে আরও বলিয়াছেন যে, মঁতেসক্যুর তত্ত্বানুযায়ী ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ব্যত্যয় হইলেই স্বাধীনতা হানি হয়। এই মতবাদ ভ্রান্ত। ব্রিটেনে ক্যাবিনেট প্রথার বিবর্তন দ্বারা ক্যাবিনেট অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে আইনগত ক্ষমতা কার্যতঃ আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ, ক্যাবিনেট (কার্যকরীভাবে শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান) হাউস অব্ কমন্স্'এর (কার্যকরীভাবে বিধানমণ্ডলীর দুইটি সভার মধ্যে আইন প্রণয়নের প্রকৃত অধিকারী) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত। ক্যাবিনেটের পশ্চাতে কমন্স্ সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন সর্বদা রহিয়াছে। সুতরাং ক্যাবিনেটই আইন প্রণয়নের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সেই জন্য সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রিটেনে শাসনক্ষমতা ও আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে পৃথকীকৃত নহে। এখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা ব্রিটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কেহই বলিবে না। দ্বিতীয়তঃ, বিচারপতিগণ ব্রিটিশ রাজ (কার্যতঃ মন্ত্রীমণ্ডলী) কর্তৃক নিযুক্ত হন অর্থাৎ বিচার বিভাগের উপর শাসন বিভাগের ক্ষমতা রহিয়াছে। এই স্থানেও পৃথকীকরণ নীতি লঙ্ঘিত হইতেছে। তথাপি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বিচারকগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিভূ হিসাবে কাজ করিতেছেন। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের উপরিতন সভা অর্থাৎ হাউস্ অব্ লর্ডস্ ব্রিটেনের সর্বোচ্চ বিচারালয় হিসাবে দীর্ঘকাল হইতে কাজ করিয়া আসিতেছেন অর্থাৎ একটি আইনসভা বিচারক্ষমতাও ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু কেহই অভিযোগ করিবেন না যে উপরোক্তভাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণ-নীতির ব্যত্যয় ঘটায় ব্রিটেনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। চতুর্থতঃ, শীর্ষস্থানীয় বিচারক-প্রতিষ্ঠানের বহুতর রায় ব্রিটেনের প্রথানুযায়ী আইনের অংগীভূত হইয়াছে। অর্থাৎ বিচারকগণ পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকার ব্যবহার করিতেছেন। এখানেও ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি মানিয়া চলা হইতেছে না। পঞ্চমতঃ, ব্রিটেনে অনেক শাসন বিভাগ পার্লামেণ্টের আইনের বলে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার অধিকারী হইয়া থাকেন। এই

ক্ষমতা পৃথকীকরণের অভাবে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবেই বলা যায় না।

নিয়মাবলী অন্যান্য আইনের ন্যায় নাগরিকগণ কর্তৃক অবশ্য পালনীয়। অর্থাৎ শাসনবিভাগ একপ্রকার আইন প্রস্তুত করিতেছেন। মঁতেসক্যু-নীতি এখানেও ভঙ্গ করা হইতেছে। ষষ্ঠতঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন কোন শাসনবিভাগ যথা—আয়কর বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিচার ক্ষমতাও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাও পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থী। কিন্তু নীতি হইতে এইসকল ব্যতিক্রম সত্ত্বেও ব্রিটেনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি যেরূপে মঁতেসক্যু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

(৭) আধুনিক সমালোচকেরা আরও বলিয়াছেন যে, মঁতেসক্যুর নীতি স্বীকার করিয়া লইতেছে যে শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ সমপর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগ। তিনটি বিভাগই রাষ্ট্রব্যবস্থায় সম-মর্যাদার আসনের অধিকারী (Co-ordinate or equal)। এই ধারণা ভ্রান্ত। কিন্তু রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে আইন বিভাগের যে প্রাধান্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। শাসন বিভাগ আইন বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত বিধি-নিষেধ কার্যে পরিণত করে। দার্শনিক লক্ এইজন্য আইন বিভাগকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও মঁতেসক্যুর নীতির ত্রুটি রহিয়াছে।

বিভিন্ন বিভাগ সমপর্যায়ের নহে (ক) চকমতে আইন বিভাগের প্রাধান্য

(৮) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্কার বলিতেছেন যে, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বহুধা বিস্তৃত হওয়ার ফলে শাসনবিভাগের গুরুত্ব বিস্ময়করভাবে বাড়িয়াছে। প্রথমতঃ, শাসনবিভাগ অনেক পরিমাণে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করিতেছেন। ভারত ও বৃটেনের ন্যায় দায়িত্বশীল ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভা যে সকল দেশে রহিয়াছে সেই সকল দেশেই আইনসভার উপর মন্ত্রিমণ্ডলীর ক্ষমতা প্রায় অপ্রতিহত। ইহার ফলেই শাসনবিভাগ পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে অনেক সময় আইনসভা পূরক আইন (Supplementary or Delegated Legislation) প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়া থাকেন। এই ক্ষমতার প্রয়োগে মন্ত্রিমণ্ডলী যে আইন ও বিধিব্যবস্থা প্রচলন করেন তাহাকে Delegated Legislative power বা হস্তান্তরিত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা বলে। ইহাকে অনেক সময়ে

(খ) অন্যমতে আধুনিক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের প্রাধান্য—সকলের ক্ষমতা অবাস্তব

Rule-making power বা বিধি-নির্দেশের ক্ষমতা বলা হয়। এই ভাবে শাসন বিভাগ আধুনিককালে অসাধারণভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। বার্কার আরও বলেন যে, শাসন বিভাগের বিভিন্ন শাখা বিচারক্ষমতাও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষে আয়করবিভাগ, শুল্ক বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ সীমিত ক্ষেত্রে বিচারক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই যুক্তি হইতেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মঁতেসক্যু যে তিনটি বিভাগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমতা কল্পনা করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

(৯) আধুনিক রাষ্ট্র নাগরিক-কল্যাণের জন্য নানা ক্ষেত্রে আপন ক্ষমতা বিস্তার কবিয়াছে। এই কল্যাণকামী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হইলে শাসনবিভাগকে অনেক ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ গঠনের ও বিচারক্ষমতা ব্যবহারের সীমাবদ্ধ সুযোগ দিতে হইবে। যদি পুরাতন ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যায় তাহা হইলে কল্যাণরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইবে এবং বিভিন্ন বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা রক্ষার জটিলতার মধ্যেই কল্যাণ পরিকল্পনা সমাধি লাভ করিবে। যাহারা গণতান্ত্রিক তাহারাও তাই বলিতেছেন যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ কল্যাণকামী রাষ্ট্রে বাধা স্বরূপ, সুতরাং পরিত্যজ্য। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়া দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ে এই নীতির মূল্য ছিল। কিন্তু আজ গণতান্ত্রিক মঙ্গলকামী রাষ্ট্রে উহার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে। আজ ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলেও জন-স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

আধুনিক রাষ্ট্রেব পবিকল্পনা বা যোজনাব সাফল্যের জন্য ক্ষমতা পৃথকাকবণ অযৌক্তিক

(১০) বলা বাহুল্য যে যাহারা একনায়কত্বে বিশ্বাসী তাহারা এই নীতির ঘোর বিরোধিতা করিয়াছেন। একজন নাৎসী আইনবিদ্ বলিয়াছেন যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ-নীতি মারফত শাসনযন্ত্রের ক্ষমতা ন্যূনতম তলে আনয়ন করিয়া পুরাতন ধনতান্ত্রিকেরা বেপরোয়া ভাবে মুনাফালাভের সুবিধা করিয়াছিলেন। একতাবদ্ধ জাতীয় নাৎসী রাষ্ট্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নাই। এইরূপ রাষ্ট্রে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ অবাস্তর ও হানিজনক। ভিসিন্স্কিও রাশিয়াতে রাষ্ট্রের আদর্শের

একনায়কত্ববাদীদের বিরোধিতা

উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মঁতেসক্যু যেরূপভাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি প্রচার করিয়াছিলেন সেইরূপভাবে উহা গ্রহণ করা অসমীচীন। সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়। জন স্টুয়ার্ট মিল সত্যই বলিয়াছেন যে, ঐ নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগে রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঘন ঘন অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে।* ইহাও স্বীকার্য যে বর্তমান যুগের কল্যাণরাষ্ট্রে (welfare state) অতিমাত্রায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ দেশের কল্যাণযোজনাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। মঁতেসক্যু যখন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রচার করেন, তখন

সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ অসম্ভব ও নানা কারণে অবাঞ্ছনীয়

ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র আইন ও বিচার ক্ষমতা দখল করিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়াছিল; সেই সময়ে ব্রিটেনের শাসনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া মঁতেসক্যু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকৃত রহিয়াছে সুতরাং সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে। ফ্রান্সে স্বতন্ত্রীকরণের অভাব বশতঃ অর্থাৎ রাজার হস্তে শাসন, আইন ও বিচার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ফ্রান্সে ব্যক্তিস্বাধীনতা নাই। সেই যুগে মঁতেসক্যুর নীতির উপযোগিতা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল উহার সেই মূল্য আর নাই, কারণ রাষ্ট্রের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির মূল্য

ঐতিহাসিক মূল্য

তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির মূল্য রহিয়াছে। এই সূত্রে গণতান্ত্রিক দেশে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার জন্য সতর্কতা লক্ষণীয়। আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্র মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহার কর্মপ্রচেষ্টা প্রসারিত করিয়াছে। তাই রাষ্ট্র আজ বিরাট ক্ষমতার অধিকারী। ইহা সুসঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ক্ষমতার যাহাতে অপব্যবহার না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সুতরাং কল্যাণকামী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন অবান্তর

বর্তমান সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

---

*"...each department acting in defence of its own powers would never lend its aid to the other and the consequent loss in efficiency would outweigh all the possible advantages arising from independence".—Representative Government.

তাহা বলা যায় না। এই দিক হইতে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য মূল্যবান। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে Judicial Review অথবা বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ ও পুনঃপরীক্ষা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অসীম ক্ষমতাশালী শাসন ও আইন-বিভাগের কার্যাবলীর ন্যায্যতা সম্বন্ধে বিচারের অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিচার প্রতিষ্ঠানের আছে। ভারতবর্ষেও সীমাবদ্ধভাবে ঊর্ধ্বতন বিচার বিভাগকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকাতে তথাকার সংবিধান অনুসারে প্রকৃত ন্যায় বিচারনীতির (Natural Justice) পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকেরা সরকারী কার্য ও কংগ্রেসের আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারেন। আমাদের দেশে সংবিধানের আলোকে ঊর্ধ্বতন (হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্ট) বিচার প্রতিষ্ঠান আইন ও শাসন-বিভাগীয় কার্যাবলী বিচারকদের দৃষ্টিতে পুনঃপরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সুতরাং ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি একেবারেই মূল্যহীন তাহা বলা চলে না।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির ইতিহাস:—যদিও অ্যারিস্টটল আধুনিক কালের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রচার করেন নাই তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক নীতির মূল অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রনীতিতে (politics) রহিয়াছে।

(১) অ্যারিস্টটল

অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের কার্যাবলী তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—Deliberative বিভাগ বা আইন বিভাগ, Magisterial বিভাগ বা শাসন বিভাগ ও Judiciary বা বিচার বিভাগ। তাহার মতে বড় নগররাষ্ট্রগুলিতে একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হস্তে একাধিক বিভাগের কার্যভার দেওয়া অসমীচীন, কারণ তাহাদ্বারা কোন কার্যই সুসম্পন্ন হয় না। তিনি শ্রমবিভাগ বা Division of Labour-এর নীতি অনুযায়ী উপরোক্ত প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর ভার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত হইলে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেকসংখ্যক মানুষ সরকারী কর্ম সম্পাদনের সুযোগ পাইবে। ইহা ন্যায়বিচার সম্মত। অ্যারিস্টটলের মতে ছোট-খাট নগররাষ্ট্রগুলিতে একাধিক বিভাগের কাজ একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে দেওয়া চলিতে পারে, কারণ ছোট রাষ্ট্রে উপযুক্ত লোকের সংখ্যা অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। বৃহৎ রাষ্ট্রে এই অসুবিধা নাই। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে মঁতেসক্যুর ন্যায় অ্যারিস্টটল্ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি প্রচার করেন নাই। তিনি ক্ষমতা বণ্টনের নীতি (Separation of Functions) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ দার্শনিক জন্ লক্ তিনটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উল্লেখ করেন—আইনক্ষমতা, শাসনগত ক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বিষয়ক ক্ষমতা। তিনি আরও বলেন যে, প্রথম ও তৃতীয় ক্ষমতা দুইটি "are always almost united"। অর্থাৎ এই দুইটি ক্ষমতাই শাসন বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহাতে তিনি কোন আপত্তি উত্থাপন করেন না। লক্ বলেন যে—আইন প্রণয়নের জন্য সভা থাকা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত সুশানের জন্য শাসনবিভাগেরও আবশ্যকতা আছে। তৎপর তিনি সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে আইনসভাকে কোনক্রমেই শাসনক্ষমতা ব্যবহার করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে। কারণ, তাহা হইলে ক্ষমতার অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা আছে। লক্ হইতেই ব্যক্তিস্বাধীনতাভিত্তিক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির সূত্রপাত হইল।*

(২) লক্

মঁতেসক্যুর পর ইংরেজ ব্যবস্থার শাস্ত্রবিদ ব্ল্যাকষ্টোন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মতবাদ সমর্থন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিজ্ঞ হ্যামিল্টন, ম্যাসিডন ও জে, Federalist নামক পুস্তকে মঁতেসক্যুর নীতিকে স্বাধীনতার কবচ হিসাবে বর্ণনা করেন; যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি রাজ্যের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের উপর এই নীতি প্রভাব বিস্তার করে। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্বে সংবিধানের ভিতর ঘোষণা করা হয় যে, ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি ব্যক্তিস্বাধীনতার স্তম্ভস্বরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঁতেসক্যু প্রচারিত ক্ষমতাপৃথকীকরণবাদ ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রনীতিও রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

মঁতেসক্যু ও ব্ল্যাকষ্টোন্

যুক্তরাষ্ট্র ও ফরাসী দেশে এই নীতির প্রভাব

* And because it may be too great a temptation to human frailty, apt to grasp at power, for the persons who have the power of making laws to have also in their hands the power to execute them, whereby they may exempt themselves from obedience to the laws they make, and suit the law, both in its making and execution, to their own private advantage,......". Locke—*Second Treatise on Government Chapter XII.*

এই নীতির উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস তেমন গৌরবজনক নহে। ব্রিটেনে মন্ত্রিমণ্ডলীর (Cabinet) হস্তে কার্যতঃ আইন প্রণয়ন ক্ষমতাও ন্যস্ত হইয়া যায়। কারণ, কমন্স্ সভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহারাই মন্ত্রিসভা গঠন করে। তাই এই মন্ত্রিসভার পশ্চাতে কমনস্ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকে। কমনস্ সভা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে আইন প্রণয়ন করে। তাই কার্যতঃ মন্ত্রিসভার হাতে আইনের ক্ষমতা আসিয়া পড়ে। এই পরিস্থিতির উদ্ভব সত্ত্বেও ব্রিটেনের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাই মঁতেসক্যুব নীতি ব্রিটেনের শাসনপদ্ধতির বিবর্তনের দ্বারা অনেকাংশে ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির বিবর্তন ও মঁতেসক্যুব নীতি

যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি যে পুরাপুরিভাবে সংবিধানভুক্ত হইয়াছে তাহা নহে। যখন ১৭৮৭-১৭৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ফিলাডেলফিয়া সংবিধান গঠন মণ্ডলীতে আলোচনা হয় তখন হ্যামিলটন, ম্যাডিসন ও জে, ঐ মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে মঁত্যেসক্যুর নীতি অনুযায়ী সংবিধান প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে ইহা গৃহীত হইয়াছিল মাত্র। বাধাহীনভাবে শাসনকার্য পরি-চালনার সুবিধার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মঁতেসক্যুব নীতি সংবিধানের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই।* উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশেও মঁতেসক্যু নীতি বিগর্হিত ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতা হইতে যখন দেখা গেল যে, মঁতেসক্যুর নীতি হইতে বিচ্যুতির ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে না এবং সরকারী কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছে, তখন এই নীতির মর্যাদা ও মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইল। আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে এই মতবাদটি বাস্তবভাবে আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে; কারণ শাসন বিভাগ প্রয়োজনের তাগিদে অন্য দুইটি বিভাগের কিছু কিছু ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছে। উল্লিখিত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই মতটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এবং এখনও সম্পূর্ণ মূল্যহীন নয়।

বর্তমান রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে, বিশেষতঃ রাজনৈতিকদলগুলির সুগঠিত অভ্যুত্থানের দরুণ, ক্ষমতা পৃথকীকরণ-

* ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির সমালোচনা (৪) ও (৫) দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫ ও ৬।

নীতির মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ, ফ্রান্সে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজন্যবর্গের ব্যক্তিস্বাধীনতা বিধ্বংসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে এই নীতি গঠিত হইয়াছিল। তৎকালে কার্যতঃ শাসন, বিচার ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ফরাসী রাজন্যবর্গের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া স্বৈরাচারের সৃষ্টি হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর ইউরোপে গণতন্ত্রের দ্রুত অভ্যুত্থানের ফলে স্বৈরাচারের আশঙ্কা দূরীভূত হইল। রাজনীতি গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিরাপদ হইল। তখন আর এই নীতির বিশেষ আবশ্যকতা রহিল না। তাই কেবলমাত্র বিচারকগণের স্বাধীনতা রক্ষার দিকে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রনায়কগণ ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্র হইতে বিদায় দিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না।

(ক) যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ (৬ পৃঃ পঞ্চম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

(খ) বৃটেনে ক্ষমতা পৃথকীকবণ (৭ পৃঃ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

(গ) ভারত ও ক্ষমতা পৃথকীকরণ

বর্তমান ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আইনবিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা পৃথকীকৃত নাই বলিলেই চলে। শাসন বিভাগ অর্থাৎ দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভাগুলি আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা গ্রাস করিয়াছে। দলীয় রাজনীতির বিবর্তনের দরুণ এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। লোকসভা, রাজ্যসভা ও প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আপন মন্ত্রিসভাগুলি গঠন করে। সেই হেতু আপন দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে মন্ত্রিসভাগুলিই আইনসভাগুলির উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এবং কার্যতঃ আইনক্ষমতা করায়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু, সাধাবণভাবে বলা যাইতে পারে যে; ইহার দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতার হানি হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, শাসনযন্ত্রের কোন কোন বিভাগের (যথা, আয়কর বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতি) উচ্চ কর্মচারীগণ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিচারক্ষমতার অধিকারী। এখানে মঁতেসক্যুর নীতি হইতে বিচ্যুতি দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, আধুনিক সমস্যাপীড়িত ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ভারতের কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্যবিধানমণ্ডলীসমূহ ইচ্ছা করিয়াই অনেক সময় আইনগুলি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে না। আইনের অনেকাংশ শাসনযন্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রিসভা বা শাসনযন্ত্রের হাতে ছাড়িয়া দেয় এবং শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গ আইনের নানা অলিখিত বিষয় পূরণ করিয়া দেন।

ইহাকে Delegated Legislative power অথবা Rule making power বলা হইয়া থাকে। যে আইন উপরোক্তভাবে প্রস্তুত হয় তাহাকে Del‹gated Legislation বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি এবং শাসন যন্ত্র আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইতেছেন। এখানেও ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির ব্যত্যয় ঘটিতেছে।

ভারতে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যেও পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ নহে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকার্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন। দ্বিতীয়তঃ, সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাহাদের সুচিন্তিত রায়ের মাধ্যমে অনেক সময় আইনের এমন সুসংযত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যাহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট আইনটি পরিবর্ধিত হয়। অর্থাৎ বিচার বিভাগ এইরূপে পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা লাভ করিতেছে। অন্যপক্ষে পার্লামেণ্ট কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলী সংবিধানের ১২৪ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী অকর্মণ্যতা ও অশোভন আচরণের (misbehaviour) জন্য সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার আবেদন জানাইয়া রাষ্ট্রপতির নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন। সেই দরখাস্ত পেশ হইলে উপরোক্ত শ্রেণীর কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিবার অধিকার রাষ্ট্রপতির রহিয়াছে।

সুতরাং সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে ভারতে ক্ষমতাসক্ত্য নীতির ব্যাপক ব্যত্যয় ঘটিতেছে। তথাপি আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র

(Constitution of the State)

[শাসনতন্ত্র হইল বিশেষ পবিত্রতাসম্পন্ন মৌলিক আইন, যাহা শাসনব্যবস্থার কাঠামোর রূপরেখা অঙ্কিত করে। ইহাতে স্থান পায়—সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, অর্থাৎ, আইনসভা, কার্যসম্পাদন বিভাগ, বিচার বিভাগ, প্রভৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক, শাসনব্যবস্থার সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক, জনসাধারণের অধিকার, রাষ্ট্রপরিচালনার বিভিন্ন নীতি-পদ্ধতি, সংশোধনের ব্যবস্থা প্রভৃতি। বস্তুতঃ রাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্ষমতার অধিষ্ঠানই ইহার দ্বারা প্রতিভাত হয়।

শাসনতন্ত্রকে সাধারণতঃ 'লিখিত' ও 'অলিখিত' এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগকে আক্ষরিক অর্থে বুঝিলে ভুল হইবে। কারণ, এই দুই শ্রেণীতেই লিখিত ও অলিখিত উভয় অংশ বর্তমান। লিখিত হইতে পারিত এমন অংশ লিখিত হয় নাই এবং কোন এক বিশেষ সময়ে বিধিবদ্ধ আইন-প্রণেতৃমণ্ডলী ইহাকে আইন হিসাবে ঘোষণা করেন নাই বলিয়াই ইহাকে 'অলিখিত' শাসনতন্ত্র বলা হয়। 'লিখিত' শাসনতন্ত্র ইহার বিপরীত। পুরাতন ব্যবস্থার অবসান ও নূতন শক্তি-সম্পর্কের ফলে নূতন অধিকারাদি ঘোষণা হইল 'লিখিত' শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য।

স্থায়িত্ব, নিশ্চয়তা ও গতিশীলতাই হইল শাসনতন্ত্রের মূল গুণ। সেই দিক হইতে অনেকে বলেন যে 'অলিখিত' শাসনতন্ত্র অস্থায়ী ও অনিশ্চিত এবং 'লিখিত' শাসনতন্ত্র গতিশীল নহে। কিন্তু ইহা যুক্তিসহ নহে। শুধুমাত্র লিখনের দ্বারা এ গুণ বা অগুণ স্থিরীকৃত হয় না। .

শাসনতন্ত্রের অপর শ্রেণীবিভাগ হইল: সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়। সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করা সম্ভব হইলে শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয়; সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োজন হইলে তাহা দুষ্পরিবর্তনীয়। আধুনিক শাসনতন্ত্রের মধ্যে প্রথমোক্ত বিভাগের উদাহরণ হইল ব্রিটেন ও দ্বিতীয় বিভাগের উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি। এ শ্রেণী বিভাগের গুরুত্ব রহিয়াছে কারণ শাসনতন্ত্র হইল মৌলিক আইন; তাহাকে সংশোধন করিবার ক্ষমতা যাহার বা যাহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকে, আইনগতভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাও তাহাদেরই হস্তে রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, আনুষ্ঠানিক সংশোধন ছাড়াও শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অপর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হইল: 'অলিখিত' রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি; সর্বোচ্চ বিচারসভার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য।

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের সমালোচনায় বলা হয় যে, তাহা অস্থায়ী, জনসাধারণের অধিকার তাহাতে সুনিশ্চিত থাকে না। কিন্তু এ সমালোচনাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। আবার দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র যে বাড়িতে পারে না তাহাও সঠিক নহে। আসলে এ পার্থক্য আপেক্ষিক। তবে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের সঙ্গী হিসাবে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের আইনের পুনর্বিচার করিবার যে অধিকার তাহার দুইটি বিপদ-সংকেত রহিয়াছে: (১) এ পদ্ধতি মূলতঃ অগণতান্ত্রিক; (২) ইহা প্রধানতঃ রক্ষণশীল ব্যবস্থা।

সুশাসনতন্ত্রের নিম্নোক্ত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন: (১) তাহা লিখিত হইবে; (২) তাহা কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে; (৩) তাহার বক্তব্য সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত হইবে; (৪) তাহার বক্তব্য সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হইবে; (৫) তাহাতে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত থাকিবে।]

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা লর্ড ব্রাইসের উদ্ধৃতি দিয়া শুরু করিলে বোধ হয় অশোভন হইবে না। "যে আইন ও প্রথার সামগ্রিক ছত্রচ্ছায়ায় রাষ্ট্রের জীবন বহিয়া চলে (the aggregate of laws and customs under which the

life of the state goes on) অথবা, সমাজকে সংগঠিত করা, শাসন করা ও ধরিয়া রাখার নিমিত্ত নীতি ও নিয়মকে রূপদানকারী আইনের যে জটিল সমষ্টি (Or "the complex totality of laws embodying the principles and rules whereby the community is organised, governed and held together)" তাহাকেই ব্রাইস রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করেন। অগ্ ও জিংক (Ogg and Zink) বলিতেছেন "বিশেষ পবিত্রতা সম্পন্ন মৌলিক আইন যাহা শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর রূপরেখা অঙ্কিত করে (…fundamental law of special sanctity...outlining the structure of a governmental system)" অথবা, নীতি, আইন, প্রথা ও ব্যাখ্যা সব মিলাইয়া যাহা "শাসনব্যবস্থার রূপ ও চরিত্র নির্ণীত করে (…which give form and character to the governmental system concerned)"* এই বক্তব্য ডাঃ ফাইনারের নিকট ভাষান্তর লাভ করিয়াছে: "মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত সংবদ্ধরূপই হইল শাসনতন্ত্র (The system of fundamental political institutions is the constitution); অথবা "শাসনতন্ত্র হইল (রাষ্ট্রাভ্যন্তরস্থ) শক্তি সমবায়ের আত্মজীবনী (…a constitution is the autobiography of a power-relationship)।"**

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা

উপরোক্ত বক্তব্য হইতে মূলতঃ আমরা তিনটি বিষয় বুঝিতে পারি:

শাসনতন্ত্রের অর্থ

১। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র একটি আইনগত ধারণা। টীকা স্বরূপ এখানে একটু বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে শাসনতন্ত্রের সবটাই বিচারালয়ে উপস্থিত করিবার উপযুক্ত বিধিবদ্ধ আইন নহে। আইনের সাথে সাথে রীতি-নীতি, প্রথা, ঐতিহ্য সব মিলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সামগ্রিক বিষয়টিরই তাৎপর্য আইনগত।

শাসনতন্ত্র মূলতঃ আইন

২। দ্বিতীয়তঃ, এই তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি শাসনতন্ত্রেরই ছত্রচ্ছায়ায় রাষ্ট্রের জীবন বহিতে থাকে, মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুসংবদ্ধরূপ ইহাতে মেলে, তাহা হইলে ইহার গুরুত্ব যে অপরিসীম তাহা বুঝিতে

শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের মৌলিক আইন: অন্যান্য আইনের নিয়ামক

* Ogg and Zink—Modern Foreign Governments—p. 23

** Finer—The Theory and Practice of Modern Government—p. 116

কষ্ট হয় না। সুতরাং এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিশেষ পবিত্রতাসম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাও স্বাভাবিক।

শাসনব্যবস্থার মূল গঠনপদ্ধতিব নির্দেশদান ইহার উদ্দেশ্য

৩। শাসনতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামোটিকে উপস্থিত করা। শাসনব্যবস্থায় শাসক শাসিতের সম্পর্ক, সরকারের আইন-প্রণয়ন, কার্যসম্পাদন ও বিচারবিভাগের গঠন-প্রণালী, পারস্পরিক সম্পর্ক ও আপেক্ষিক গুরুত্ব, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের অধিকার,—এ সব কিছুই শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রে মূল ক্ষমতার অধিষ্ঠান কোথায়, এবং তাহারই তত্ত্বাবধানে অন্যেরা কতটুকু ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিতেছে—তাহার নির্ধারক হইল শাসনতন্ত্র। সেইজন্যই ডাঃ ফাইনার ইহাকে "ক্ষমতা-সম্পর্কের আত্মজীবনী" বলিয়াছেন।

ইহাই যদি শাসনতন্ত্রের অর্থ হয়, তাহা হইলে দেখা যাক শাসনতন্ত্রের রূপটি কি ?

শাসনতন্ত্রের বিভাগ লিখিত ও অলিখিত

বহুকাল হইতেই শাসনতন্ত্রকে লিখিত (written) ও অলিখিত (unwritten),—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। ভাষাগত অর্থ ধরিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রথম দলের শাসনতন্ত্রগুলির সবকিছুই পাঠোপযোগী করিয়া রাখা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় দলের শাসনতন্ত্রগুলি মোটেই লেখা হয় নাই, লোকে মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছে এবং সেই মানসিক ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রশাসন চলিতেছে বস্তুতঃ ব্যাপার তাহা নহে।

সারা পৃথিবীতে আধুনিক শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অলিখিত শাসনতন্ত্রের একমাত্র উদাহরণ। তাহার কারণ ব্রিটেনে কোন আইন-প্রণেতৃমণ্ডলী কখনও একটিমাত্র বিধিবদ্ধ ঘোষণার মধ্যে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার রূপটি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই, যেমন ঘটিয়াছে ভারতীয় ইউনিয়নে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রে। তথাপি ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নাই,—একথা ভাবিবার কোনই কারণ নাই। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে,—(১) বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত নানা আইনের ভিতরে, (২) নানা রীতি-নীতি, প্রথা ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে, যাহাকে ব্রিটেনের সকলেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেও

এই পার্থক্যকে আক্ষরিক অর্থে ধরিলে ভুল হইবে

(৩) শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিচারকমণ্ডলী প্রদত্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য ও ব্যাখ্যা। এ অবস্থায় দেখা যাইতেছে যে আইন ও বিচারক-প্রদত্ত ব্যাখ্যা উভয়ই লিখিত অবস্থায় বর্তমান। প্রথা ও রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য হইল যে সেগুলিকে কোন আইন-প্রণেতৃসভা আইনের ভাষায় সাজাইয়া আইন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, অথবা বিচারকের ভাষ্য হিসাবেও সেগুলি কোনদিন উপস্থিত হয় নাই; তথাপি বিভিন্ন সময়ে বহু রাষ্ট্রনায়ক সেগুলি কি তাহা তাঁহাদের লেখায় ও বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন এবং সে বক্তব্য দেশের সকলেই মোটামুটি মানিয়া চলে। উপরন্তু হার্ণ, বেজহট, ডাইসি, মে, য়্যানসন ও জেনিংস্‌ প্রমুখ বহু সুপণ্ডিত লেখক তাঁহাদের পুস্তকে শাসনতান্ত্রিক প্রথাগুলিকে তালিকাভুক্ত করিয়া সেগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তাহা হইলে মানিতে হয় যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রও নানা লেখার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। ইহার বিপরীত 'লিখিত' শাসনতন্ত্রের উদাহরণ হিসাবে মার্কিন শাসনতন্ত্রকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, দল-প্রথা. প্রভৃতি বহু বিষয় অলিখিত থাকিলেও শাসনতান্ত্রিক প্রথা হিসাবে তাহাদের গুরুত্ব কম নহে। ডাঃ ফাইনার সেজন্য 'অলিখিত' শাসনতন্ত্রের নির্দেশক দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন: (১) লিখিত-রূপে স্থান পাইতে পারিত এমন বহু বিষয় এবং অন্যান্য শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে এমন কিছু বিষয়, ইহা হইতে বাদ পড়িয়াছে; (২) সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র বলিয়া কোন আইন প্রণেতৃমণ্ডলী ইহাকে কোনদিন ঘোষণা করে নাই,—ফলে কোন বাহ্যিক চিহ্ন দিয়া শাসনতান্ত্রিক আইনকে অন্যান্য আইন হইতে পৃথক করা যায় না। * ইহার বিপরীত গুণগুলিকে, তাহা হইলে 'লিখিত' শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরিতে হইবে, যথা, (১) মোটামুটি প্রয়োজনীয় সব বিষয় তাহাতে লিখিত থাকিবে, (২) বিধিবদ্ধ প্রণেতৃমণ্ডলী কোন এক বিশেষ সময় হইতে শাসনতান্ত্রিক আইন বলিয়া তাহাকে চালু করিবে; ফলে অন্যান্য ধরণের আইনের সহিত শাসনতান্ত্রিক আইনের পার্থক্য অতি সহজেই বুঝা যাইবে।

'লিখিত' ও 'অলিখিত' শাসনতন্ত্রের প্রকৃত প্রার্থক্য

বস্তুতঃ 'লিখিত' শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয় মূলতঃ দুই কারণে: (১) যখন

* Dr. Finer—Idid p. 119

পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে, শাসন-ক্ষমতা যখন হস্তান্তরিত হয়—যখন ক্ষমতা-সম্পর্কে এই নূতন অবস্থা ঘোষণা করিয়া জানাইবার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ভারত স্বাধীন হইবার পর সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন ছিল যে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ হইতে স্বাধীন ভারতবর্ষে ক্ষমতা-সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এবং তাহারই ফলস্বরূপ আসিয়াছে ১৯৫০ সালের লিখিত শাসনতন্ত্র।* সোবিয়েত ইউনিয়নের ১৯৩৬ সালের শাসনতন্ত্র আসিয়াছে শান্তিপূর্ণ শাসনচলাকালীন সময়ে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এ শাসনতন্ত্র হইল ১৯১৭ সালের বিপ্লবের ফলে জার-শাসিত রাশিয়া হইতে নূতন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপান্তরণের সামগ্রিক প্রতিফলন।

'লিখিত' শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন দুইটি

পুরাতন অবস্থার অবনতি : নূতন ক্ষমতা সম্পর্কে ঘোষণা

(২) দ্বিতীয় প্রয়োজন অনুভূত হয়, পুরাতন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অপচয়, অক্ষমতা ও সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য নূতন ব্যবস্থা পত্তনের সময়। নূতন ভারসাম্যকে সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক ও অধিকার সুনিশ্চিত করিবার জন্য, তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়।

বিশেষ অধিকারে নিশ্চয়তা বিধান

ব্রিটেনের ইতিহাস স্বতন্ত্র: তাহার শাসনতন্ত্র ক্রমবিবর্তনের ফল। রাজার অবাধ শাসনক্ষমতা দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ ও আপস-মীমাংসার ভিতর দিয়া পার্লামেন্টের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে; সে প্রক্রিয়া রূপ পাইয়াছে কখনও বিশেষ আইনের মারফৎ, কখনও বা রফা-নিষ্পত্তির পরিণতিতে প্রথাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে। রাজা প্রথম চার্লসের পরাজয়, বিচার ও প্রাণদণ্ডের পরে ক্রমওয়েলের সময় একবারমাত্র ইংলণ্ডে লিখিত শাসনতন্ত্র প্রচলনের প্রচেষ্টা হয়; কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিকারীদিগের মধ্যেই রাষ্ট্র-শাসনের মূল ব্যবস্থা সম্পর্কে মতৈক্যের অভাবে সে প্রচেষ্টা বর্জিত হয়, তাহার

ব্রিটেনের অলিখিত শাসনতন্ত্রের উদ্ভব তাহার নিজস্ব অনুকরণীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাস হইতে

* অবশ্য ক্ষমতার মৌলিক পরিবর্তন না করিয়াও আঙ্গিকের কিছু কিছু পার্থক্য সূচিত করিয়া জনমতকে শান্ত করিবার জন্য মাঝে মাঝে লিখিত শাসনতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের এ অভিজ্ঞতা একাধিকবার ঘটিয়াছে। অন্যান্য দেশেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু লক্ষণীয় হইল সে ক্ষেত্রেও মূল উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন অবস্থা হইতে নূতনের পার্থক্য ঘোষণা করা।

পর, ব্রিটেন ধীর পরিবর্তনের পথই সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে ব্রিটেন রহিয়া গিয়াছে অনন্যসাধারণ।

যাহা হউক, এবার উভয়জাতীয় শাসনতন্ত্রের আপেক্ষিক গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাক।

শাসনতন্ত্র মূল্যায়নের মানদণ্ড

মানুষ জীবনে খানিকটা স্থিরতা ও নিশ্চয়তা চায়। শাসনকার্য চালাইবার জন্যও প্রয়োজন স্থায়ী ও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। সুতরাং স্থায়িত্ব ও নির্দিষ্টতাই হইল শাসনতন্ত্রের প্রধান দুইটি গুণ। কিন্তু কালের সুদীর্ঘ বিস্তারে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে দেখা যাইবে সমাজ-জীবন কখনও একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের আপেক্ষিক গুরুত্ব পাল্টাইয়া যায়, সামাজিক মতামতও রূপান্তর গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় এই দীর্ঘকালের প্রয়োজন মিটাইতে। সুতরাং যে শাসনতন্ত্র অনড়. বাড়িতে জানে না, পরিবর্তিত হইতে পারে না—তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য, তাহার বর্জন অবশ্যম্ভাবী। এবার তাহা হইলে দেখা যাক, স্থায়িত্ব, নির্দিষ্টতা ও পরিবর্তন ক্ষমতা,—এই ত্রিবিধ গুণের মানদণ্ডে 'লিখিত' ও 'অলিখিত' শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক গুণাগুণ কতখানি।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইবে যে 'লিখিত' শাসনতন্ত্র স্থায়ী ও নির্দিষ্ট এবং (অলিখিত) শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু বিপরীত দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে অনির্দিষ্ট বা ক্ষণভঙ্গুর ভাবিলে সম্পূর্ণ ভুল করা হইবে। কোন ব্রিটিশ নাগরিক বা আইনজ্ঞ এ অভিযোগ স্বীকার করিবেন না। দীর্ঘকাল ধরিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, এবং সে ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা কোন অংশে কম নহে। অপর দিক হইতে 'লিখিত' বলিয়াই শাসনতন্ত্রের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বা তাহার স্থায়িত্ব যে বেশী তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র বারবার বর্জন করিয়া পুনর্লিখন করিতে হইতেছে। ১৮০ বৎসর পূর্বে ১৭৮৯ সালে যে মার্কিন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার বহিরঙ্গ মোটামুটি এক থাকিলেও, (এই দীর্ঘকালের ভিতর মোটে ২২টি সংশোধনী

'অলিখিত' হইলেই শাসনতন্ত্র অস্থায়ী অনির্দিষ্ট ও অশ্রদ্ধেয় হয় না

গৃহীত হইয়াছে)—তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি এক স্থানে বসিয়া নাই। বাস্তবরূপে তাহার বহু পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে। এইজন্যই ডাঃ ফাইনার বলিয়াছেন: "শাসন-ব্যবস্থা কি, তাহার একমাত্র প্রামাণ্যবস্তু হিসাবে "শাসনতন্ত্র'কে গ্রহণ করা চলে না (Thus, the constitution cannot be accepted as the sole evidence of what is constitution ..)."*

'লিখিত' হইলেও তাহার বিপরীত সত্য নহে

দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্টতা সম্বন্ধে 'লিখিত' শাসনতন্ত্রের দাবীও মানিয়া লওয়া যায় না। ভাষার মারফৎ মানুষ মনোভাব প্রকাশ করে ঠিকই, কিন্তু ভাষার একাধিক অর্থ থাকে। উপরন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পেষণ করিলে একই ভাষা হইতে নানাবিধ অর্থ নিষ্কাষণ করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হইতে শুরু করিয়া অন্যান্য 'লিখিত' শাসনতন্ত্রের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা সপ্রমাণিত হয়। সুতরাং নির্দিষ্টতার দাবীও অস্বীকৃত হইল।

সুতরাং তুলনামূলক বিচারে সকলের অবগতির জন্য একটি বিশেষ মানদণ্ডের (Standard of reference) অধিক গুরুত্ব 'লিখিত' শাসনতন্ত্রকে দেওয়া যায় না।** লর্ড ব্রাইস উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ বর্জন করিয়া নূতন শ্রেণীবিভাগের প্রচলন করিয়াছেন।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য বা দুঃসাধ্য কিনা এই মাপকাঠিতে বিচার করিয়া লর্ড ব্রাইস তাঁহার Studies in History and Jurisprudence নামক পুস্তকে শাসনতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন,—সুপরিবর্তনীয় (flexible) ও দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid)। যে শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় তাহাকে সুপরিবর্তনীয় বলিতে হইবে; এবং যেগুলি পরিবর্তন করিতে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হইবে সেগুলিকে বলা হইবে দুষ্পরিবর্তনীয়। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান উদাহরণ হইল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্র হইল দুষ্পরিবর্তনীয়।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ
(১) সুপরিবর্তনীয ও
(১) দুষ্পরিবর্তনীয

*Dr. Finer—Ibid. P. 126

**—Ibid. P. 126

ব্রিটেনে পার্লামেণ্টে অন্যান্য আইন যেভাবে পাস করা হয়, শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কিত আইনও অনুরূপভাবে প্রণীত হইয়া থাকে।

বিভিন্নদেশে শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি : ব্রিটেন

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি নিম্নরূপ : (ক) কংগ্রেসের (যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা) উভয় কক্ষ সংশোধনী প্রস্তাবটিকে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে পাস করিবে, নয়তো, (খ) বিভিন্ন রাজ্যগুলির দুই-তৃতীয়াংশের প্রস্তাবে শাসনতন্ত্র-সংশোধনী সম্মেলন আহূত হইবে এবং সেই সম্মেলনে বিধিসম্মতভাবে সংশোধনী-প্রস্তাব পাস হইবে; এবং (ক) বিভিন্ন রাজ্যগুলির (বর্তমান সংখ্যা ৫০) তিন-চতুর্থাংশের (অর্থাৎ, অন্ততঃ ৩৮) আইনসভা সেই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করিবে, অথবা (খ) সেই তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যে সংশোধনী সম্মেলন হইতে সেই প্রস্তাব গৃহীত হইবে। অর্থাৎ, সংশোধন প্রস্তাব করিবার অধিকার দুই প্রকার এবং তাহা গ্রহণ করিবার পদ্ধতিও দ্বিবিধ। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত পবিবর্তনের ক্ষমতা শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উপর ন্যস্ত করা হয় নাই; কোনরূপ পরিবর্তন করিতে হইলে তিন চতুর্থাংশ রাজ্যবিধানমণ্ডলীর অনুমোদন লইতে হইবে। ইহার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের অধিকার স্বীকৃত হইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংশোধনের ব্যাপারে রাজ্য আইনসভাগুলির বিশেষ গুরুত্ব নির্দিষ্ট হইল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সুইজারল্যাণ্ডে সামগ্রিক পরিবর্তন ও আংশিক সংশোধনের ভিতর পার্থক্য করা হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষে প্রস্তাব পাস করা হয়। উভয় কক্ষের মধ্যে মতান্তর ঘটিলে, বিষয়টি গণভোটে দেওয়া হয়। অথবা, যদি ৫০,০০০ ভোটার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দাবী করে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা তাহা গ্রহণ না করে, তাহা হইলেও বিষয়টি গণভোটে প্রেরিত হয়। পরিবর্তনের পক্ষে অধিক ভোট পড়িলে কেন্দ্রীয় আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। পরে নূতন আইনসভা সংশোধনের ব্যবস্থা করে। আংশিক সংশোধনের জন্য হয় কেন্দ্রীয় আইনসভা নিজ উদ্যোগে প্রস্তাব গ্রহণ করে; নতুবা ৫০,০০০ ভোটারের আবেদনের ভিত্তিতে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার পর পুনরায় সেই প্রস্তাব ক্যাণ্টন, অর্থাৎ অঙ্গরাজ্যগুলির নিকট গণভোটে প্রেরিত হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হইলে তবে শাসনতন্ত্র সংশোধিত হইবে। ইহা হইতে

সুইজারল্যাণ্ড

চারটি বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ মিলিতেছে: (১) শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয়; (২) অঙ্গ-রাজ্যগুলির অধিকার স্বীকৃত আছে; (৩) শাসনতন্ত্র সংশাধন করিতে গেলে জন-সম্মতির আবশ্যিক প্রয়োজন নিশ্চিত হইয়াছে এবং (৪) সংশোধনের জন্য জনমত গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে।

সোবিয়েত ইউনিয়ন

সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্রীয় সোবিয়েতের (আইনসভা) উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে সংশোধিত করা সম্ভব। এতদ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেণ্টীয় সার্বভৌমত্বের নীতি ঘোষিত হইতেছে।

ভারতীয় ইউনিয়ন

ভারতীয় ইউনিয়নে শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: (১) কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রীয় আইনসভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই সংশোধন করা যায়। (২) কতকগুলি বিষয় সংশোধন করিতে উভয়কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন হয়, অবশ্য এই সংখ্যা মোট সদস্যদের অর্ধেকের অধিক হইবে; এবং (৩) কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় সংশোধনের জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতির সহিত কমপক্ষে অর্ধেক অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ, সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মিশ্রণ এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং তাহার সহিত কিছু পরিমাণে অন্ততঃ অঙ্গরাজ্যের বিশেষ অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের সংশোধনের ক্ষমতা শাসন ব্যবস্থার মৌলিক ক্ষমতার নির্দেশক

শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করিবার বিশেষ যৌক্তিকতা রহিয়াছে। শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা সংস্থাপনের নির্দেশ দেয়। সুতরাং শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অধিকার যাহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, শাসন ক্ষমতাও আইনগত ভাবে যে মূলতঃ সেই স্থলেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রিটেনের সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মারফৎ পার্লামেণ্টীয় সার্বভৌমত্বের নীতি গৃহীত হইয়াছে। অন্যত্র পার্লামেণ্টের ক্ষমতার উপর অন্যান্য বাধা আরোপ করিয়া বিভিন্ন ক্ষমতার এক ভারসাম্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

এইসূত্রে নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(১) লিখিত শাসনতন্ত্র মাত্রই দুষ্পরিবর্তনীয় নহে। যথা; নিউজিল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র লিখিত, তথাপি সুপরিবর্তনীয়।

(২) 'সুপরিবর্তনীয়' ও 'দুষ্পরিবর্তনীয়' এই বাক্যে দুইটি সরল অর্থে বোঝা হইয়া থাকে যে কোন কিছুকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইহাদের সংজ্ঞাগত অর্থ তাহা নয়। কারণ ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র 'সুপরিবর্তনীয়'। অথচ, বাস্তবে দেখা যায় ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন বহু বৎসরব্যাপী বহু গবেষণা বিচার-বিশ্লেষণ, বিতর্ক ও আন্দোলন সাপেক্ষ। অপরপক্ষে, বহু দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র নিয়মিত ও ঘনঘন পরিবর্তন সাধিত হইতে দেখা গিয়াছে।

অধ্যাপক হুয়ারের অভিমত

বস্তুতঃ, শাসনতন্ত্র সহজে ও ঘনঘন পরিবর্তিত হইবে কিনা তাহা আইনগত পদ্ধতির উপরেই নির্ভর করে না; শাসনতন্ত্রের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা যেরূপ বণ্টন ও সংগঠন করা হইয়াছে, সমাজের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অংশগুলি তাহা মানিয়া লইতে রাজি আছে কিনা ইহার উপরও নির্ভরশীল।* সেইজন্য এই অর্থগত ভুল বোঝাবুঝি এড়াইবার জন্য অধ্যাপক হুয়্যার Rigid ও Flexible, দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয়, কথা দুইটির সরল অর্থেই শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অর্থাৎ, পরিবর্তনের আইনগত পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, বিভিন্ন কারণে যদি পরিবর্তন সহজসাধ্য না হয় তবে তাহা দুষ্পরিবর্তনীয়। তাঁহার প্রস্তাব মানিলে অষ্ট্রেলিয়া ডেনমার্ক, নরওয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতিকে দুষ্পরিবর্তনীয় এবং সুইজ্যারল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতিকে সুপরিবর্তনীয় বলিতে হইবে।**

আমরা অবশ্য অধ্যাপক হুয়্যারের সংজ্ঞার চেয়েও লর্ড ব্রাইস্ প্রদত্ত সংজ্ঞা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছি। পরিবর্তনের পদ্ধতিগত পার্থক্যের বিচারে পরিবর্তন কত সুসাধ্য বা দুঃসাধ্য তাহা সঠিক বুঝা না গেলেও এই মাপ-কাঠিতে শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগের যথেষ্ট গুরুত্ব লক্ষিত হয়। অধ্যাপক হুয়্যারের প্রস্তাব সহজবোধ্য হইলেও শ্রেণীবিভাগের সমস্যাকে শেষ পর্যন্ত জটিলতর করিয়া দেখিতে পারে।

* Wheare—Modern Constitutions. p, 22-24

** Ibid, p, 24

শাসনতন্ত্রের সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রশ্ন হইল—সব শাসনতন্ত্রকেই চলমান জীবনের সহিত পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত নিজেকে পরিবর্তিত হইতে হইবে। সুতরাং যে শাসনতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক সংশোধন যত দুষ্কর তাহাকে ততই অন্য উপায়ের শরণাপন্ন হইতে হইবে। অর্থাৎ অলিখিত প্রথা ও রীতি-নীতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। পাশাপাশি আইনবিদ বিচারকেরা শাসনতন্ত্রের রূপান্তর ঘটাইবেন।

(১) আনুষ্ঠানিক সংশোধন
(২) রীতি-নীতি ও প্রথা
(৩) বিচারশালার ভাষ্য·

শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের মৌলিক আইন। দেশের সমস্ত আইন-কানুনের ইহাই নিয়ামক। এই শাসনতন্ত্রকে যদি জাতীয় পার্লামেণ্টের উপরে স্থান দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনিবার্যভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আসিয়া বাসা বাঁধে সর্বোচ্চ বিচারসভায়। অর্থাৎ আইনসভা প্রণীত যে কোন আইন বা কার্যসম্পাদন বিভাগে যে কোন কার্যই সর্বোচ্চ বিচার সভার সম্মুখে শাসনতন্ত্রসম্মত কিনা তাহা নিষ্পত্তির জন্য উপস্থিত হইতে পারে। সর্বোচ্চ বিচারকমণ্ডলীর মত বিপরীত হইলে সে আইন বা সে কার্য বে-আইনী বলিয়া নাকচ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ আইন সম্বন্ধে শেষ রায় দিবার অধিকারী বিচারসভা, পার্লামেণ্ট নহে। লক্ষণীয় বিষয় যে, এই Judicial Review অথবা আইন সম্বন্ধে অন্তিম বিচার করিবার বিচারকমণ্ডলীর যে অধিকার তাহা সুইজারল্যাণ্ড বা সোবিয়েত ইউনিয়নে নাই, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় ইউনিয়নে আছে।

সর্বোচ্চ বিচারকমণ্ডলীর আইনের পুনর্বিচার করার ক্ষমতা

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের সমালোচনায় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ-গাহিয়া বলা হয়: (১) এ ব্যবস্থায় শাসনপদ্ধতিতে স্থায়িত্ব আসে; (২) জনসাধারণের মৌলিক অধিকার ও যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির বিশেষ অধিকার নিরাপদ থাকে। কিন্তু অনড় স্থায়িত্ব যে বাঞ্ছনীয় নহে এবং সম্ভবও নহে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিপরীত দিক হইতে, ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয় হওয়া সত্ত্বেও যে অত্যন্ত দৃঢ়ভিত্তিক, তাহার পরিবর্তনের জন্য যে দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ-আলোচনা, মতের সংঘাত

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা

(১) অস্থায়িত্ব

রফা-নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয় তাহা যে কোন অনুসন্ধিৎসু দর্শকেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। অনুরূপ, জনসাধারণের মৌলিক অধিকারও ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের খামখেয়ালীর উপর নির্ভরশীল, এ অভিযোগও কেহ করিবেন না। জনচেতনা ও জনমতকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নাই। অপরপক্ষে জার্মানীর ১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া সত্ত্বেও হিটলার ক্ষমতায় আসিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জনসাধারণের অধিকার ও অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকার গুঁড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। আসলে আইনগত আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মারফৎ অধিকার বজায় রাখা সম্ভব নহে; তাহা নির্ভর করে জনসাধারণের চেতনা, বিবেক ও মূল্যদানের প্রস্তুতির উপর। সুতরাং দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অপেক্ষা উন্নততর ব্যবস্থা, এ কথা তত্ত্বের দিক হইতে মানা যায় না। বুঝিতে হইবে যে, এ পার্থক্য মূলতঃ আপেক্ষিক।

(২) অধিকার রক্ষার আপেক্ষিক অনিশ্চয়তা

ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের পক্ষে ইহার বিপরীতও সর্বত্র সত্য নহে

তাহার উপর যে সব রাষ্ট্রে আইন শাসনতন্ত্রসম্মত নহে এই বিচারে নাকচ করিয়া দিবার অধিকার সর্বোচ্চ বিচারসভার থাকে, সেখানে নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। ব্যাপক জনমতের প্রতিনিধিস্বরূপ আইনসভা প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিতে পারেন সর্বোচ্চ বিচারসভার সামান্য কয়েকজন বিচারপতি। ইঁহারা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নহেন, জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল নহেন, তথাপি, ইঁহাদের রায়ই জনসাধারণের রায় অপেক্ষা অধিক গুরুত্বসম্পন্ন হইবে। এ ব্যবস্থা গণতন্ত্রের মূল নীতিকেই খণ্ডিত করে। অধিকন্তু সর্বোচ্চ বিচার-সভার বিচারকেরা সাধারণতঃ বৃদ্ধ; তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যান-ধারণার শিকড় অতীতে প্রোথিত থাকিয়া যায়; নূতন যুগের চাহিদার সহিত অনেক সময়েই তাঁহাদের মনের মিল থাকে না। সুতরাং বহুক্ষেত্রেই রক্ষণশীলতার প্রতিভূস্বরূপ তাঁহারা সর্বপ্রকার প্রগতিমূলক আইন-প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করিতে থাকেন। এ দিক দিয়াও সর্বোচ্চ বিচারালয়ের এ ক্ষমতা বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে।

সর্বোচ্চ বিচারালয় কর্তৃক পুনর্বিচার পদ্ধতির দোষ

তবে লক্ষণীয় এই যে দুষ্পরিবর্তনীয়তারও স্তরভেদ আছে। সংশোধন যদি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়, তবে সর্বোচ্চ বিচারশালার বাধা উত্তীর্ণ হওয়াও দুষ্কর হইবে না। বিপরীত অবস্থায় সে বাধা সত্যই দুক্রমনীয় হইবে।

দুষ্পরিবর্তনীয়তার স্তরভেদ আছে

তথাপি, এত কথা বলা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রিটেনের অভিজ্ঞতা সর্বত্র প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, নূতন অবস্থার ঘোষণার জন্য লিখিত শাসনতন্ত্র প্রয়োজন। ব্রিটেনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে শাসনতন্ত্র ও জনচেতনা গড়িয়া উঠিয়াছে, দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে অন্যত্র তাহার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি মিলিবে না। দ্বিতীয়তঃ, একই যুক্তিতে শাসনতন্ত্রের কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয়তা বাঞ্ছনীয়। কারণ সুপরিবর্তনীয়তার সহিত স্থায়িত্বের যে সকল সংমিশ্রণ ব্রিটিশ মেজাজ সম্ভব করিয়াছে, তাহার সাথী অন্যত্র না মিলিতেও পারে। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র হওয়া উচিত সংক্ষিপ্ত আকারের এবং মূল ও সাধারণ বিষয়েই তাহার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া শাসনতন্ত্রকে যতই বৃহৎ ও জটিল করা হইবে ততই তাহার প্রয়োগযোগ্যতা সীমিত হইয়া যাইবে অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তাহার পরিবর্তন অথবা বর্জন অবধারিত হইয়া উঠিবে। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্র সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হইবে, যাহাতে তাহার অর্থ লইয়া মতান্তর ঘটিবার সুযোগ কম থাকে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যেহেতু শাসনতন্ত্র সাধারণ বিষয় লইয়াই মত প্রকাশ করিবে, সেজন্য বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্বন্ধে সর্বদাই তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ঘটিবে, সুতরাং আইনজ্ঞের বিসংবাদও পরিহার করা সম্ভবপর হইবে না। পঞ্চমতঃ, শাসনতন্ত্রে শাসনপদ্ধতির বিবরণ, বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কাজ সম্পর্কে বক্তব্যের পাশাপাশি জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলিও লিপিবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর অনেকেই গুরুত্ব দেন। কারণ, জনসাধারণের অধিকারের শেষ অবলম্বন জনচেতনা—এ কথা মানিয়া লইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে এ চেতনায় জাগরণ ও অভিব্যক্তি সময়সাপেক্ষ

শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

লিখিত হওয়া প্রয়োজন

কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয়তা বাঞ্ছনীয়

শাসনতন্ত্রের বক্তব্য সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত হইবে

সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হইবে

এবং বিশেষ পদ্ধতির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক আইনে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকিলে, সেগুলি লঙ্ঘন করা যেমন এক দিক দিয়া কষ্টসাধ্য হয়, অপরদিকে সেগুলি বজায় রাখিবার সংগ্রামে আইনসম্মত পন্থাও জনসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে।

শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত থাকিবে

অতিরিক্ত পাঠ্য—

K. C. Wheare—Modern Constitution.

H. Finer—The Theory and Practice of Modern Government.

Lord Bryce—Studies in history and Jurisprudence.

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ

(Classification of States aud Government)

[রাষ্ট্র ও সর কারের শ্রেণীবিভাগের ইতিহাস অ্যারিস্টটলের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক পলিটেক্স্ হইতে শুরু হইয়াছে। তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য করেন নাই। সরকারের গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। রাজতন্ত্র (Monaichy) গুণগত অভিজাততন্ত্র (Aiistocracy) ও গণতন্ত্র (Polity) এই তিনটি মূল বিভাগ তিনি দেখাইয়া বলিয়াছেন যে এই রাষ্ট্রগুলি সমগ্র রাষ্ট্রের মঙ্গলকামী। ইহাদের রূপ বিকৃতি হইতে পারে। অর্থাৎ ইহারা ক্ষুদ্রস্বার্থ অর্থাৎ শাসক বা শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তৎপর হইতে পারে। তাহা হইলে রাজতন্ত্র একক স্বৈরতন্ত্রে (Iyranny); গুণগত অভিজাততন্ত্রে (Aristocracy). স্বার্থগত অভিজাততন্ত্রে (Oligarchy) এবং গণতন্ত্র জনতা-তন্ত্রে (Mobociacy) পরিণত হয়।

অ্যারিস্টট্লের শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিয়া অনেকে আধুনিক রাষ্ট্রকে রাজতন্ত্র (Monaichy), অভিজাততন্ত্র (Aiistocracy or Oligarchy) ও গণতন্ত্রে (Democracy) বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার সমালোচনা করিয়া অন্যপক্ষ অনেকে বলেন যে ইহার দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকৃত গঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। তাহাদের মতে রাষ্ট্র ও সরকারের একটি সম্মিলিত শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন। কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সরকার গঠন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগও সরকারের শ্রেণীবিভাগ পৃথকভাবে করিলে রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য রক্ষা করা হয় বটে, কিন্তু তাহা কার্যতঃ সুফল দেয় না। সম্মিলিত শ্রেণীবিভাগ তাই বাঞ্ছনীয়। আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকারকে প্রধানতঃ স্বেচ্ছাতন্ত্র (Despotism), এক-নায়কত্ব (Dictatorship) ও গণতন্ত্রে (Democracy) বিভক্ত করা যায়। স্বেচ্ছাতন্ত্র, রাজতান্ত্রিক (Monarchical), সামরিক (Militaiy) ও আভিজাততান্ত্রিক (Aiistocratic or Oligaichical) হইতে পারে। একনায়কত্বের তিনটি রূপ দেখা যায়—ব্যক্তিগত (Personal), দলগত (Party) শ্রেণীগত (Class) একনায়কত্ব। গণতন্ত্র দুইপ্রকার। প্রজাতান্ত্রিক ও সসীম রাজতান্ত্রিক। এই দুইটির প্রত্যেকটি এককেন্দ্রিক (Unitaiy) বা যুক্তরাষ্ট্রীক (Fedeial) হইতে পারে। আবার এককেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রীক প্রজাতন্ত্র বা সসীম রাজতন্ত্র (Limited Monaichy) রাষ্ট্রপতি শাসিত (Piesidential) ও বিধানমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary) হইতে পারে।]

ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে দেশ-কালভেদে রাষ্ট্র ও সরকার বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অনেকে বলেন যে তথাপি মূলগতভাবে সকল রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্য এক। সকল দেশে সকল সময়ে রাষ্ট্র একই উপাদানে গঠিত হইয়াছে দেখা যায়। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি সকল রাষ্ট্রেরই বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার সরকারও প্রতি রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত হয় এবং তাহারা আইন, শাসন ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী হইয়া থাকেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রে সরকারের গঠনপদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মৌলিক কর্তব্য একই—আইন প্রণয়ন শাসনপরিচালনা ও বিচার ব্যবস্থা করা।

রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে এবং এক সরকার অন্য সরকারের মধ্যে বাহিক সাদৃশ্য আছে

কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এবং এক দেশের সরকার ও অন্য দেশের সরকারের মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য থাকিলেও, এমন সকল বৈষম্য দেখা দেয় যে তাহা মূলগত বিভেদের ইঙ্গিত দেয়। রাষ্ট্রহিসাবে বর্তমান স্পেন বা পর্তুগাল রাজ্যের উপাদানে ও বৃটেনের বর্তমান রাষ্ট্রের উপাদানে পার্থক্য নাই। অর্থাৎ জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি দুই রাষ্ট্রেই বর্তমান, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রহিয়াছে। প্রথম দুইটি স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, ব্রিটেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তেমনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র সরকার একই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু যদি বলা হয় যে দুই-এর মধ্যে মূলগত পার্থক্য নাই তাহা হইলে ভুল হইবে। সরকারের গঠন পদ্ধতি কতকগুলি সুদূরপ্রসারী পার্থক্যের সন্ধান দেয়। সুতরাং রাষ্ট্রের ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ অপরিহার্য।

ক্ষেত্র বিশেষে দলগত পার্থক্য দেখা যায়

কোন বিশেষ দেশে বস-বাসকারী জনসমষ্টি যখন রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হইয়া সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তখন তাহাকে রাষ্ট্র বলে। এইভাবে সংগঠিত জনসমষ্টির মধ্যে যাহারা রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা (আইন, শাসন ও বিচার) ব্যবহার করে তাহাদিগকে একত্রে সরকার বলে। সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়াই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ও সরকারের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বিভেদ করা হয় এবং দুইটি শ্রেণীবিভাগ আলাদাভাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ পৃথকভাবে বিবেচ্য

এই বিষয়ে অন্যমতও বর্তমান। অ্যারিস্টট্‌ল্ বলিয়াছিলেন যে, সরকার (Government বা Constitution) রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ, সরকারের মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সরকারের গঠন অনুযায়ী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা সমীচীন। সত্যই সরকারের গঠনপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া, রাষ্ট্রের গঠন আলোচনা অত্যন্ত অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। সরকারের প্রকৃতি পরিহার করিয়া কেবলমাত্র রাষ্ট্রের কতকগুলি বাহ্যিক লক্ষণ অবলম্বনে রাষ্ট্রের যে শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যায় তাহার মূল্যও খুবই নগণ্য। এই শর্তানুযায়ী দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন নাই। এক শ্রেণীবিভাগের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন রূপ আলোচিত হইতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধ মত

লজিক বা বিশুদ্ধ তর্কের দিক হইতে বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে উপরোক্ত দুইটি মতবাদের মধ্যেই কিছুটা যৌক্তিকতা রহিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে দুইটি মতবাদ অনুসারেই রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভেদ বিবেচনা করা হইয়াছে। সুতরাং পৃথকভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ এবং একই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ আলোচনা অপরিহার্য।

ঐতিহাসিক কারণে দুই-ই আলোচনা করা সমীচীন

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ : রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীবিভাগই অ্যারিস্টট্লের শ্রেণী-বিভাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দেশ-কালভেদে তাহার কিছুটা পরিবর্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অ্যারিস্টট্ল যে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার উপরই আধুনিক শ্রেণীবিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

অ্যারিস্টট্লের শ্রেণীবিভাগ : অ্যারিস্টট্ল্ তিনটি সূত্র প্রয়োগ করিয়া গ্রীক রাষ্ট্রগুলিকে বিভাগ করিয়াছিলেন : (১) সংখ্যা-মূলক সূত্র। এখানে প্রশ্ন হইতেছে সার্বভৌমিকের সংখ্যা কত—একজন, অল্পসংখ্যক ব্যক্তি না বহুজন? (২) আদর্শমূলক সূত্র—এখানে বিবেচ্য, রাষ্ট্রক্ষমতা কি শাসক বা শাসকশ্রেণীর জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, না, সর্বসাধারণের জন্য? (৩) অর্থনীতিমূলক সূত্র—এখানে দেখিতে হইবে শাসক বা শাসকশ্রেণী ধনী, মধ্যবিত্ত না দরিদ্র?

অ্যারিস্টট্লের রাষ্ট্রশ্রেণীবিভাগের সূত্র

এই তিনটি সূত্রের প্রয়োগে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার রাষ্ট্র অ্যারিস্টট্ল স্বীকার করিয়া লন।

সার্বভৌমিকের সংখ্যা	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
একজনের শাসন (Government of one)	রাজতন্ত্র (Monarchy or Royalty)	একক স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny)
অল্প কয়েকজনের শাসন (Government of the Few)	গুণগত অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	স্বার্থগত অভিজাততন্ত্র (Oligarchy)
বহুজনের শাসন (Government of the Many	গণতন্ত্র (Polity)	জনতা তন্ত্র (Democracy (Mobocracy)

রাজতন্ত্রে সার্বভৌমিক একজন। ইনি আদর্শ সদ্গুণের অধিকারী; এবং তিনি সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণকল্পে ক্ষমতা ব্যবহার করেন। গুণগত অভিজাততন্ত্রে

চরম শাসনক্ষমতা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে থাকে; এই অভিজাত শ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারা নানা সদ্‌গুণের অধিকারী এবং শাসনতন্ত্র তাহারা সমস্ত রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। অ্যারিস্টট্‌ল আরও বলেন যে গুণগত অভিজাততন্ত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীগণ দরিদ্র নহেন, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। গণতন্ত্র বা Polityতে রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকই সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেন; ইহারাও রাষ্ট্র পরিচালনা করেন সমগ্র রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য। বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে অ্যারিস্টট্‌লের মতে গণতন্ত্রে (Polity) শাসক সম্প্রদায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত।

অ্যারিস্টটলীয় রাষ্ট্রশ্রেণীবিভাগের ব্যাখ্যা

রাজতন্ত্র যখন আদর্শভ্রষ্ট হইয়া বিকৃতরূপ গ্রহণ করে তখন তাহা একক স্বৈরাচারতন্ত্রে পরিণত হয়। এইরূপ শাসনতন্ত্রে Tyrant বা একক স্বৈরাচারী আপন স্বার্থে সরকার চালাইয়া যান। Tyranny বা একক স্বৈরাচারতন্ত্রকে অ্যারিস্টট্‌ল তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ইহাই তাহার মতে সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় শাসনপদ্ধতি। স্বার্থগত অভিজাততন্ত্র (Oligarchy) গুণগত অভিজাততন্ত্রের অবনতির ফলেই উদ্ভুত হয়। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমিক সম্প্রদায় কেবল-মাত্র আপনাদের স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বার্থপর অভিজাততন্ত্রে শাসকমণ্ডলী সকলেই ধনী ব্যক্তি। গণতন্ত্রের (Polity) বিকৃতরূপ হইতেছে জনতাতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের জনসমষ্টির অধিকাংশ ব্যক্তিই চরম ক্ষমতা পরিচালনা করেন। কিন্তু তাহারা আপনাদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্যই সার্বভৌম ব্যবহার করিয়া থাকেন, সমগ্র রাজ্যের কল্যাণের জন্য নহে।

স্বার্থগত অভিজাততন্ত্র ও জনতাতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে গিয়া অ্যারিস্টট্‌ল বলিয়াছেন যে প্রথমোক্ত শাসন ব্যবস্থাটি মূলতঃ ধনীব্যক্তিদের শাসন ও দ্বিতীয়টি মূলতঃ দরিদ্র ব্যক্তিদিগের শাসন। স্বার্থগত অভিজাততন্ত্রে দরিদ্রশ্রেণীর প্রতি ন্যায় বিচার হয় না; আবার জনতাতন্ত্রে ধনী ব্যক্তিরা সুবিচার লাভ করিতে পারে না।

অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা: অ্যারিস্টটলীয় শ্রেণীবিভাগের সমালোচকরা দুই দিক হইতে তাহার মতবাদকে আক্রমণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাহারা বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের বিবর্তনের ফলে গ্রীক দার্শনিকের শ্রেণীবিভাগ আজকাল অচল।

সমালোচনা

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ গ্রীসের নগররাষ্ট্রের বিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই গঠিত হইয়াছিল; প্রাচীন নগররাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহার মত নির্ভুল। আরও বলা যাইতে পারে যে আধুনিক অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অ্যারিস্টট্‌লের রাষ্ট্র-শ্রেণীবিভাগপদ্ধতি একরকম মানিয়াই লইয়াছেন। সামান্য যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা মৌলিক নহে। জেলিনেক্‌, বার্জেস, ব্লুন্‌টস্‌লি প্রভৃতির মতে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রই আধুনিক রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক বিভাগ। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ মূলতঃ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

(১) অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ আজকাল অচল

ইহার উত্তর

দ্বিতীয়তঃ, সমালোচকেরা বলিয়াছেন যে অ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে তফাত করেন নাই। ইহা সত্য। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে তাহার মধ্যে শাসনপদ্ধতিই হইতেছে রাষ্ট্রপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। তাই তিনি শাসনপদ্ধতি অনুযায়ী—রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত প্রাচীন রাষ্ট্র এবং সরকারের প্রকৃতি ও স্বরূপ ও পরস্পরের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য দেখানো প্রয়োজন মনে করেন নাই।

(২) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে তিনি তফাত করেন নাই

ইহার উত্তর

রাষ্ট্রের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ: আধুনিক রাষ্ট্রকে জেলিনেক্‌, বার্জেস, ব্লুন্‌ট্‌সলী প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগের একটি সহজ সূত্র আছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কে বা কাহারা? যদি একজন হয় তবে তাহা রাজতন্ত্র, যদি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি হয় তাহা হইলে সেই শাসন পদ্ধতি অভিজাততন্ত্র। আর রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক যদি চরম শাসনক্ষমতার অধিকারী হইয়া থাকে তবে তাহা গণতন্ত্র।

রাষ্ট্রের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

রাজতন্ত্র সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক হইয়া থাকে। ইতিহাসে নির্বাচিত রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্তও আছে। প্রাচীন ভারতে, রোমে ও পোল্যাণ্ডে ইহা দেখা গিয়াছিল। ভেনিসের অভিজাততন্ত্র ক্রমে বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িয়াছিল।

রাজতন্ত্র: রাজতন্ত্রের সপক্ষে বলা হইয়া থাকে যে শাসনব্যবস্থা সাধারণ মানুষ বেশ বুঝিতে পারে। গণতন্ত্র নানা প্রতিষ্ঠান মারফত কাজ করে; গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে নানা ঘোর-প্যাঁচ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্ভরশীলতা ও ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই সাধারণ মানুষ তাহার কার্যপদ্ধতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। সহজবোধ্যতা রাজতন্ত্রের একটি প্রধান গুণ। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয় মিশ্রিত মনোভাব আছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে এ মনোভাব অনুকূল। সাধারণ মানুষই সকল রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। সুতরাং রাজতন্ত্র গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। তৃতীয়তঃ, রাজতন্ত্রে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা রাজার হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। ইহার ফলে রাষ্ট্র দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। হব্‌স্ এই কারণেই রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসনপদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রুশো রাজতন্ত্র পছন্দ করিতেন না, তথাপি তিনি তাহার সোসাল কন্‌ট্রাক্ট (Sccial Contract) পুস্তকে রাজতন্ত্রের কর্মদক্ষতার সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের বিপদ-আপদের সময় দ্রুত উপযুক্ত কর্ম-পন্থা অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রকে বিপন্মুক্ত করিতে পারে। বোদাঁ রাজতন্ত্রের এই গুণটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ, যে সকল দেশ রাজনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসর, যে সকল জাতি আইনের মর্যাদা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, যে সকল দেশে বিভেদবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র স্বার্থ জাতির একতা নষ্ট করিয়া জাতিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে সেখানে রাজতন্ত্র দৃঢ় শাসনের মাধ্যমে জাতিকে একতাবদ্ধ করিতে পারে। ইংলণ্ডে টিউডর রাজগণের দৃঢ় রাজত্ব এইরূপে ইংলণ্ডবাসীর মঙ্গলসাধন করিয়াছিল; টিউডর রাজত্বের পূর্বে জাতীয় একতা ছিল না, টিউডর রাজন্যবর্গ তাহাদের শক্তিশালী শাসনের সাহায্যে ইংলণ্ডে জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। ষষ্ঠতঃ, বলা যাইতে পারে যে রাজতন্ত্রের একটি বিরাট ঐতিহ্য আছে। রাজতন্ত্রের নেতৃত্বেই ইউরোপে জাতিসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেইন প্রভৃতি দেশে দৃঢ় রাজতন্ত্র

রাজতন্ত্রের সুবিধা
(১) সহজবোধ্য

(২) রাজতন্ত্র সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ভয় মিশ্রিত মনোভাব

(৩) রাজতন্ত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় রাজতন্ত্র দৃঢ় শাসনের অনুকূল

(৪) রাজতন্ত্র বিপদের সময় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা প্রয়োগে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে পারে

(৫) রাজতন্ত্র দেশকে একতাবদ্ধ করে

উত্থিত হইয়াছিল বলিয়াই এই সকল দেশে একতাবদ্ধ জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু রাজতন্ত্রের যে সকল সমালোচনা হইয়াছে তাহাতে এই শাসনব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হওয়া সুকঠিন। প্রথমতঃ, বলা যাইতে পারে যে রাজা অত্যাচারী হইলে দেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ইতিহাস এই শাসনপদ্ধতির সর্বনাশা দিক সম্বন্ধে মানবসমাজকে সর্বদা সতর্ক করিয়া দিতেছে। স্পেইনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, ইংলণ্ডের রাজা জন্‌ ও অষ্টম হেন্‌রী, ফ্রান্সের চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই, রাশিয়ার জারেরা ও ভারতের অত্যাচারী সম্রাটগণ মানব সভ্যতার কলঙ্ক বিশেষ। কোন দেশ রাজতন্ত্র মানিয়া লইলে সেই দেশের রাজা যে অভিশাপরূপে আসিয়া জুটিবে না তাহার কোন স্থিরতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক আদর্শের দিক হইতে গণতন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ—এই মত আজ সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিক অন্তর্নিহিত শক্তি স্ফুরণের অবকাশ পায়, সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার লাভ করে। এই নীতি পরিহার করিয়া আধুনিক যুগে কেহই রাজতন্ত্র গ্রহণ করিবে না। সুতরাং রাজতন্ত্রের তথাকথিত আদর্শ অবাস্তব।

সমালোচনা

(১) রাজা অত্যাচারী হইলে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার সীমা থাকে না

(২) গণতন্ত্র রাজতন্ত্র অপেক্ষা গ্রহণযোগ্য : কারণ গণতন্ত্র মানবাধিকার স্বীকার করিয়া লয়

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) : যে শাসন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি জন্মগত, ভূমি-সম্পত্তিগত বা ধনগত অধিকার বলে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেন তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলে। ইংলণ্ডে সামন্ত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত যে সরকার প্রচলিত ছিল তাহা মূলতঃ অভিজাততন্ত্রমূলক। এই দীর্ঘ সময়ে ইংলণ্ডে ভূমি সম্পত্তিগত ও জন্মগত অধিকারবলে এক অভিজাতশ্রেণী (Lords) রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

অভিজাততন্ত্র

অনেকে আধুনিক অভিজাততন্ত্রের সহিত অ্যারিস্টটেলীয় অভিজাততন্ত্র মিশাইয়া ফেলেন। এই দুইটি শাসন ব্যবস্থাকে পৃথক রাখিতে হইবে। গ্রীক দার্শনিকের

অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইতেছে অভিজাতশ্রেণীর সদ্‌গুণ (virtue) বর্তমান অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে এই শাসন পদ্ধতির ক্ষমতাধিকারীগণ বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তি। জন্মগত ভূসম্পত্তিগত বা ধনগত প্রাধান্য তাহাদের লক্ষণ। এইদিক হইতে বিচার করিলে অভিজাততন্ত্র এক প্রকারের শ্রেণী শাসন। অ্যারিস্টটলের অভিজাততন্ত্র শ্রেণীশাসন নহে; মূলতঃ সদ্‌গুণাধিকারীদের শাসন।

আ্যারিস্টটেলীয় অভিজাততন্ত্র ও বর্তমান অভিজাততন্ত্রের পার্থক্য

অভিজাততন্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী ইহা একটি শ্রেণীশাসন। সদ্‌গুণ অভিজাত-তন্ত্রের অপরিহার্য লক্ষণ নহে এইরূপ অবস্থায় অভিজাততন্ত্রের সপক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি উত্থাপন করা সুকঠিন। যাহারা ইহার সমর্থন করিয়াছেন তাহারা বলিয়াছেন যে অভিজাতশ্রেণী অনেক সময় শাসন দক্ষতা দ্বারা বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছেন। মধ্যযুগীয় ভেনিসের অভিজাততান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইতেছে উদ্যমশীলতা ও শাসন পটুতা। কার্লাইল অভিজাততন্ত্রের এই অর্থগ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে অভিজাত শ্রেণী শাসন করিবে এবং নিম্নশ্রেণী শাসিত হইবে ইহা শেষোক্ত শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল। এই উক্তির সত্যতা পুরাপুরি মানিয়া লওয়া যায় না। প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে এই উদ্যমশীলতা শাসন দক্ষতা শ্রেণীস্বার্থরক্ষার জন্যই অভিজাতশ্রেণী ব্যবহার করিয়াছেন। অথবা যুদ্ধবিগ্রহে রাষ্ট্রকে লিপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাতে রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষেরই ক্ষতি হইয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে শাসন দক্ষতা রাষ্ট্র ব্যবস্থার শেষ কথা নয়। জনজীবনের সামগ্রিক উন্নতি বিধানই কাম্য। দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক যুগে অভিজাত শ্রেণীর ভবিষ্যত নাই। গণতান্ত্রিক সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের তুলনায় শ্রেণীস্বার্থবাহী অভিজাততন্ত্রের তথাকথিত আদর্শ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে অভিজাততন্ত্র রক্ষণশীল হয়। শ্রেণীশাসন যে আপন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকল্পে শাসন পরিচালনা করিবে এবং তাহাদের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ পরিহার করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। ইহাই অভিজাততন্ত্রের রক্ষণশীলতার মূল কারণ। অভিজাততন্ত্র

অভিজাততন্ত্রের উদ্যমশীলতা ও শাসনপটুতা

কিন্তু এই দুইটি গুণ শ্রেণীস্বার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে

পরিবর্তন ও প্রগতির-পরিপন্থী বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ অভিজাততন্ত্র আপনশ্রেণী স্বার্থকেই বজায় রাখে।

অভিজাতশ্রেণী নিঃস্বার্থ ও অশেষ গুণসম্পন্ন হইবে এবং সমাজকল্যাণে মনোনিবেশ করিবে—এইরূপ কল্পনা করিয়া লওয়া অসম্ভব নয়। এই কল্পনা সত্যে পরিণত হইলে মানবসমাজের দ্রুত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তাহাও স্বীকার্য। কিন্তু কল্পনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ গঠন করা অসমীচীন। দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রের সমর্থকগণ বলিয়াছেন যে গণতন্ত্রে মানুষ স্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে। ইহাতেই মনুষ্য সমাজের সর্বাধিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। অভিজাততন্ত্র পরনির্ভরশীলতা আনিয়া দেয়; মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে তাহা বাধা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। গণতন্ত্র আত্মশক্তি অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এইজন্য অশেষ গুণবিশিষ্ট অভিজাততন্ত্র সম্ভব হইলেও তাহা মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া গণতন্ত্রই কাম্য।

গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র: গণতন্ত্রের আদর্শ উচ্চতর

গণতন্ত্র: গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। ফরাসী-বিপ্লব হইতে আরম্ভ করিয়া গণতন্ত্র ধীরে ধীরে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিয়াছে। সমাজ, অর্থনীতি, শাসনতন্ত্র, ব্যক্তিগত জীবনধারা, এমনকি চিন্তাজগতেও গণতন্ত্র তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর চিন্তা ও কর্ম বুঝিতে হইলে গণতন্ত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে রাষ্ট্রের বাহ্যিক প্রকৃতি লইয়া শ্রেণীভেদ করা হয়, তাহার বেশী মূল্য নাই। বস্তুতঃ জেলিনেক, বার্জেস প্রভৃতি ইহাই করিয়াছেন এবং তাহারা তদ্দারা রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্র স্বীকার করিতেছেন। তাহা দ্বারা রাষ্ট্রের বা তাহার গঠনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহা পাইতে হইলে রাষ্ট্র ও সরকারের গঠন পদ্ধতি একই সঙ্গে বিবেচনা করিয়া সম্মিলিত শ্রেণীবিভাগ করা বাঞ্ছনীয়। আধুনিক কালে রাষ্ট্র নানা নূতনরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; বিভিন্ন দেশ নূতন

আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকার (Modern State and Government)
স্বেচ্ছাচার (Despotism
একনায়কত্ব (Dictatorship)
গণতন্ত্র (Democracy)
রাজতান্ত্রিক (Monarchical)
সামরিক (Military)
অভিজাততান্ত্রিক (Aristocratic or Oligarchial)
ব্যক্তিগত (Personal)
দলগত (Party)
শ্রেণীগত (Class)
প্রজাতন্ত্র (Republic)
সসীম রাজতন্ত্র (Limited or Constitutional Monarchy)
এককেন্দ্রিক (Unitary)
যুক্তরাষ্ট্রীক Federal
এককেন্দ্রিক (Unitary)
যুক্তরাষ্ট্রীক (Federal)
বিধানমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)
বিধানমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)
বিধানমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)
বিধানমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary)
রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential)

রাষ্ট্রীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা গঠিত করিয়াছে। রাষ্ট্র ও সরকারের এই সকল নূতন গঠন ব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতিগুলিকে উপযুক্ত স্থান দিবার জন্য নূতন শ্রেণীবিভাগের কথা চিন্তা করা উচিত। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

রাষ্ট্র ও সরকারের সম্মিলিত শ্রেণীবিভাগ

এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক রাষ্ট্রকে প্রথম স্তরে স্বেচ্ছাতন্ত্র (Despotism) একনায়কত্ব (Dictatorship) ও গণতন্ত্র (Democracy) এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার সরকারের ব্যাখ্যা

স্বেচ্ছাতন্ত্র (Despotism): স্বেচ্ছাতন্ত্রে সর্বময় রাষ্ট্রক্ষমতা রাজা, সামরিক নায়ক অথবা অভিজাত শ্রেণীর হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। সেই অনুসারে স্বেচ্ছাতন্ত্র তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা রাজতান্ত্রিক, সামরিক ও অভিজাততান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্র।

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, রাজতান্ত্রিক, সামরিক ও অভিজাত-তান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্রে Benevolent বা কল্যাণকামী হইতে পারে অথবা তাহা স্বৈরাচারতন্ত্রের (Tyrannical) রূপ গ্রহণ করিতে পারে। জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ তাঁহার Representative Government গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কল্যাণকামী রাজতন্ত্রের বাস্তব সম্ভাবনা অতিশয় অল্প। কারণ কল্যাণকামী রাজতন্ত্র তখনই সফল হইতে পারে যখন রাজা সর্বদ্রষ্টা সর্বগুণসম্পন্ন সর্বকর্মদক্ষ। একাধারে এই গুণের সমাবেশ হওয়া অসম্ভব বলিলেই হয়। যদি তাহা কখনও সম্ভব হইযাও উঠে তথাপি কল্যাণকামী রাজতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্র সর্বাংশে প্রার্থনীয়। কারণ গণতন্ত্রে মানুষ আপন রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ব্যবহারের সুযোগ পায় ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে। কিন্তু কল্যাণ-কামী রাজতন্ত্রে তাহার কিছুই করিবার নাই, সে নিরুপায় হইয়া তথাকথিত দয়ালু নৃপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। আপন রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অভাবে তথাকথিত দয়ালু রাজতন্ত্রে নাগরিক অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং তাহার দরুণ নৈতিক অবনতি ঘটে। কল্যাণকামী রাজতন্ত্র সম্বন্ধে জন স্টুয়ার্ট মিল যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্বাংশে তথাকথিত কল্যাণকামী সামরিক-তন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র সম্বন্ধেও সত্য। বলা বাহুল্য সর্বত্র এই তিন শ্রেণীর রাষ্ট্র স্বৈরাচারে পরিণত হইয়াছে।

কল্যাণকামী স্বেচ্ছাতন্ত্র

রাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্র

সাউদী আরবের একছত্র শাসক রাজা ইবন্ সাউদ স্বেচ্ছাতান্ত্রিক নৃপতি। রাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্রে রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি এই ক্ষমতা সাধারণতঃ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতে রোমে ও পোল্যাণ্ডে নির্বাচিত রাজতন্ত্রেরও উদাহরণ পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হইতে নির্বাচনমূলক রাজতন্ত্রকে ব্যতিক্রম বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। নির্বাচিত রাজতন্ত্রকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের পর্যায়ে ফেলাও যায় না; কারণ যাহাবা নির্বাচকমণ্ডলী তাহারাই এই ক্ষেত্রে চরম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলীব প্রকৃতিব উপব নির্বাচনমূলক রাজতন্ত্রের প্রকৃতি নির্ভর করে।*

বাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্র

বর্তমান ইতিহাসে অনেক সময় দেখা গিয়াছে কোন সার্মরিক নেতা বা কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সমর-অধিনায়ক সামরিক শক্তির সাহায্যে সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছেন। পাকিস্তান, ইরাক, তুরস্ক, সুদান, মিশর, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে সামরিক বিপ্লবের ফলে সামবিক স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্পেনে গৃহযুদ্ধের ফলে ১৯৩৭ সালে সেনাপতি ফ্রাঙ্কোযে সামরিক স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এখনও স্থায়ী আছে।

স মাজিক স্বেচ্ছাতন্ত্র

অভিজাততান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্রে বংশমর্যাদা, ভূ-সম্পত্তির অধিকারী অথবা ধনবলে বলীয়ান শ্রেণী সার্বভৌমক্ষমতা দখল করেন। তাহারা সাধারণতঃ আপন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষারকল্পে সরকার পরিচালনা করেন। **

অভিজাততান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্র

একনায়কত্বের তিনটি বিভিন্নরূপ ইতিহাসে দেখা গিয়াছে। ব্যক্তিগত একনায়কত্ব (Personal Dictatorship) দলগত একনায়কত্ব (Party Dictatorship) ও শ্রেণীগত একনায়কত্ব (Class Dictatorship)। একনায়কত্ব ও স্বেচ্ছাতন্ত্রে (Despotism) সংবাদপত্র ও সাধারণ আলাপ আলোচনায় অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই দুই প্রকার রাষ্ট্র-শাসন পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। একনায়কত্বের সহিত জনমতের হয় প্রত্যক্ষ অথবা

একনায়কত্ব স্বেচ্ছাতন্ত্র হইতে পার্থক্য

* রাজতন্ত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের পূর্ব আলোচনা দ্রষ্টব্য।

** অভিজাততন্ত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের পূর্ব আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে কিন্তু স্বেচ্ছাতন্ত্রে জনসাধারণের মতামতের সহিত কোনই সম্পর্ক থাকে না। স্বেচ্ছাতন্ত্র সার্বভৌম জনতার জন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না। রাজা, সামরিক নেতা অথবা অভিজাতশ্রেণী নিজেরাই এই ক্ষমতার উৎস। মুসোলিনী, হিট্‌লার উভয়েই একাধিকবার নির্বাচনের মাধ্যমে জনসমর্থন লাভ করিয়াছেন। মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট্ দল রোম অধিকার করিয়া ক্ষমতা করায়ত্ত করে; ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার ক্ষমতাধিকারের পশ্চাতে জনসমর্থন ছিল না বটে. কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট লাভ করিয়াছিলেন। হিট্‌লার ও নাৎসী দল (National Socialist Party) নির্বাচনের ভিতর দিয়াই প্রথম জার্মানীতে গণতান্ত্রিক সরকারের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিট্‌লারও নির্বাচনের মধ্য দিয়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটলাভ করিয়াছিলেন। ইটালী ও জার্মানীতে প্রথম পর্যায়ে যথাক্রমে ফ্যাসিস্ট দল ও নাৎসী দলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে দুই দেশেই এই দলগত একনায়কত্ব ব্যক্তিগত একনায়কত্বে পরিণত হয়। কারণ ইটালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিট্‌লার আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিগত একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে সামরিক স্বেচ্ছাতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বা দলগত একনায়কত্বে পরিণত হইতে পারে।

ব্যক্তিগত একনায়কত্বে এক ব্যক্তির উপর সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হয়। প্রাচীন রোমে রাষ্ট্রের বিপদের সময় একাধিকবার সর্বময় ক্ষমতা একজন নায়কের উপর দেওয়া হইয়াছিল দেখা যায়। সিন্‌সিনেটাস্ এইরূপে খ্রী পূঃ ৪৫৮ সালে সেনেট কর্তৃক একনায়কত্বে অভিষিক্ত হন। খ্রীঃ পূঃ ৮২ সালে সালা (Sulla) এবং খ্রীঃ পূঃ ৪৫ সালে জুলিয়াস সীজারও আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিগত একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জুলিয়াস সীজারকে তাঁহার জীবনকালের জন্য একনায়কত্ব দেওয়া হইয়াছিল।

ব্যক্তিগত একনায়কত্ব

কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকার করিয়া আপন মতানুযায়ী শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইলে, তাহাকে দলগত একনায়কত্ব বলে। দলগত একনায়কত্ব বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে প্রথম দেখা দিয়াছে। মুসলিনীর ফ্যাসিস্ট দলই এইরূপ একনায়কত্বের সূত্রপাত করেন। সমাজের নানা স্তর ও নানা শ্রেণী হইতে ইহারা নিজেদের সমর্থক সংগ্রহ করেন এবং শক্তিবলে

দলগত একনায়কত্ব

নিয়মতান্ত্রিক সরকারের অবসান ঘটাইয়া নিজেরা সর্বময় ক্ষমতাধিকারী হইয়া পড়েন। জার্মানীর নাৎসী দলও এই পর্যায়ে পড়ে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইটালী ও জার্মানীতে দলগত একনায়কত্ব দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যক্তিগত একনায়কত্বে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রেণীগত একনায়কত্বের রূপ সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী (proletariat) রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া ধনতন্ত্রের বিনাশ ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। রাশিয়াব কমিউনিস্ট দল এই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর মুখপাত্র। বাশিয়াব একনায়কত্ব মূলতঃ দলগত নহে, শ্রেণীগত। এই জন্য দলগত একনায়কত্ব হইতে শ্রেণীগত একনাযকত্বেব পার্থক্য বজায় রাখা প্রয়োজন। ফ্যাসিস্ট বা নাৎসী দল শ্রেণীগত দল নহে। ইটালীতে ফ্যাসিস্ট দলে এবং জার্মানীতে নাৎসী দলে শিল্পপতি, শ্রমিক, জমিদার, মধ্যবিত্ত, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যোগদান কবিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়াব সর্বহারা দলে শ্রমিক কৃষক ব্যতীত কেহ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শ্রেণীগত একনায়কত্ব শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। আধুনিক দলগত একনায়কত্ব শ্রেণীসমাজকে মানিয়া লয় এবং শ্রেণীসমাজ রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে।

শ্রেণীগত একনাযকত্ব

দলগত ও শ্রেণীগত একনায়কত্বেব পার্থক্য

স্বেচ্ছাতন্ত্র ও একনাযকত্বেব ছত্রচ্ছায়ায় অনেক সময় উচ্চপদস্থ শাসক গোষ্ঠীকে কার্যতঃ অধিকাংশ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা কবিতে দেখা যায়। এইরূপ শাসক সম্প্রদায়কে Bureaucracy বা শাসকতন্ত্র বলে। রাজতন্ত্রে গণতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্রে এবং বিভিন্ন প্রকারের একনায়কত্বে—এইরূপ ঘটিতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন যে এইরূপ হইলেও রাষ্ট্র বা সরকারের মূল প্রকৃতি একই থাকিয়া যায়। কারণ শাসকতন্ত্র উত্থিত হইলেও চরম শাসনক্ষমতা বা সার্বভৌম অধিকার যাহার উপর মূলতঃ ন্যস্ত থাকে, তাহা সেই পাত্রেই থাকিয়া যায়।

শাসকতন্ত্র (Bureaucracy)

অধ্যাপক সীলি গণতন্ত্রকে "a government in which every one has a share" বলিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন।* অর্থাৎ যে সরকারে সকলেই অংশ গ্রহণ করে তাহাকে গণতন্ত্র

গণতন্ত্র

* গণতন্ত্রের বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য

বলে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম লিঙ্কন্ গণতন্ত্রকে "Government of the people, by the people, for the people" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ জনকল্যাণে জনগণ—শাসিত জনসাধারণের রাষ্ট্রকেই গণতন্ত্র বলে। যে রাষ্ট্রে সামগ্রিক শাসন ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহাকে গণতন্ত্র বলে। এই সংজ্ঞাগুলি গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করে। উপরোক্ত সংজ্ঞা হইতে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। গণসার্বভৌমত্ব ও জনকল্যাণ গণতন্ত্রের মূলসূত্র। এই দুইটি সূত্র হইতে আরও কয়েকটি উপসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রাষ্ট্রে গণসার্বভৌমত্ব সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে এবং শাসনপদ্ধতি জনকল্যাণে পরিচালিত করিতে হইলে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীসে এথেন্সের গণতন্ত্রে সমগ্র নাগরিকদিগকে লইয়া Ecclesia বা গণমণ্ডলী সৃষ্ট হইয়াছিল। এথেন্সকে এইজন্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়। কারণ প্রতি নাগরিকের প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রশাসনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল। নগররাষ্ট্র এথেন্সের জনসংখ্যা নগণ্য ছিল বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছিল। আধুনিক বিরাটকায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের মতামত প্রকাশের জন্য প্রতিনিধিসভা সৃষ্ট হইয়াছে। এইজন্য আধুনিক গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলে। দ্বিতীয়তঃ গণসার্বভৌমত্ব ও জনকল্যাণ রূপায়িত করিতে হইলে প্রতিনিধিমণ্ডলীর মাধ্যমে কেবলমাত্র মতামত প্রকাশের সুযোগ করিয়া দিলেই যথেষ্ট নয়, মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও সাম্য স্থাপন করাও একান্ত প্রয়োজন। কারণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সাম্য ব্যতীত গণসার্বভৌমত্ব মিথ্যায় পর্যবসিত হয় এবং জনকল্যাণ অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং গণতন্ত্রের সূত্রগুলি বর্ধিত আকারে এইরূপ দাঁড়ায়: (১) গণসার্বভৌমত্ব, (২) জনকল্যাণ, (৩) স্বাধীন মতপ্রকাশের জন্য গণমণ্ডলী বা প্রতিনিধি সভা। (৪) সাম্য (৫) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার।

প্রজাতন্ত্র ও সসীম রাজতন্ত্র: যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে আসীন শাসকশ্রেষ্ঠ নির্বাচনের ফলে ক্ষমতাধিষ্ঠ হন এই জন্য এই দুইটি রাষ্ট্রই শাসকপ্রধান গণতন্ত্র।

প্রজাতন্ত্র ও সসীম রাজতন্ত্র

সসীম রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাহার ফলে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু রাজাই আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রশ্রেষ্ঠ ও শাসকপ্রধান বলিয়া গণ্য হন।

* **এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার:** প্রজাতন্ত্র এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় হইতে পারে। যে রাষ্ট্রে মূলগতভাবে আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচার-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব একটি নির্দিষ্ট সরকারী বা রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হয় তাহাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বা সরকার বলে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক সরকার সমগ্র রাষ্ট্রের উপর একই কেন্দ্র হইতে সমগ্র শাসন ক্ষমতা অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছে। ইচ্ছাপূর্বক কেন্দ্র হইতে কোন কোন ক্ষমতা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা মূলতঃ কমিয়া যায় না। একই সরকারের হস্তে সমগ্র সরকারী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করাই এককেন্দ্রিকতার মূলনীতি।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বা সরকার

যুক্তরাষ্ট্রতত্ত্বের (Federalism) মূল কথা হইতেছে যে এই প্রকারের রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতীত, সংবিধান অনুযায়ী গঠিত দুই বা ততোধিক নির্দিষ্ট সরকার সংবিধান উল্লিখিত কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আপনাপন বিবেচনানুযায়ী আইন ক্ষমতা, শাসন ক্ষমতা ও বিচার ক্ষমতা পরিচালনা করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রে আইন বিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচার বিভাগ থাকিবে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাজ্যেও অনুরূপ বিভাগগুলি থাকিবে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার অন্যদিকে প্রতিটি রাজ্যসরকার সংবিধানে উল্লিখিত নিজ নিজ এলাকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যবস্থা বর্তমান। বর্তমান পৃথিবীতে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রেও ঐরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র তত্ত্ব

রাষ্ট্রপতিশাসিত গণতন্ত্র ও বিধানমণ্ডলীশাসিত গণতন্ত্র: প্রজাতন্ত্র বা সসীম রাজতন্ত্র রাষ্ট্রপতিশাসিত বা বিধানমণ্ডলীশাসিত হইতে পারে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতন্ত্রে প্রকৃত শাসকশ্রেষ্ঠ বিধানমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীল নহেন অর্থাৎ

* বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য

রাষ্ট্রপতিশাসিত ও বিধানমণ্ডলী শাসিত সরকার

বিধানমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি প্রকৃত শাসকশ্রেষ্ঠের বিরুদ্ধে যায় তথাপি তাহার বা তাহাদের পদ পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই শ্রেণীভুক্ত গণতন্ত্র। সেখানে রাষ্ট্রপতি বিধানমণ্ডলীর (Senate and House of Representatives) অধিকাংশের সমর্থন হারাইলেও রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে তাহার কোন বাধা নাই।

বিধানমণ্ডলীশাসিত গণতন্ত্রে প্রকৃত শাসকমণ্ডলীকে বিধানমণ্ডলীর সংখ্যা গরিষ্ঠের আস্থাভাজন হইতে হইবে; অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে তাহাদিগকে বিধানমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করিতে হইবে। ইহা একেবারেই অপরিহার্য। যদি তাহারা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিধানমণ্ডলীর অধিকাংশের সমর্থন না পান তাহা হইলে তাহাদের পদত্যাগ করিতে হইবে। ব্রিটেন ও ভারতে এই নিয়ম প্রচলিত। এইজন্য এই দুইটি রাষ্ট্রকে বিধানমণ্ডলীশাসিত রাষ্ট্র বলা যায়!

অতিরিক্ত পাঠ্য

Aristotle Politics—(Jowett)—Book III, Chs. VII—VIII

Barker—Reflections on Government, Chs. III, VI

Bluntsli —Theory of the State, Book VI

Burgess—Political Science and Constitutional Law, Vol II Book III, Chs. 1-2

Mac Iver—The Modern State, Chs. XI—XII

Willoughby—The Government of Modern States (1919) Chs. 3-5.

চতুর্থ অধ্যায়

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

(Democracy and Dictatorship)

[গণতন্ত্র শুধু শাসনব্যবস্থামাত্র নহে, ইহা একটি আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি। গণতান্ত্রিক সরকার ছাড়া, গণতান্ত্রিক সমাজ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শ্রমশিল্পে গণতন্ত্র প্রভৃতি আলোচনার বিষয়ীভূত।

গণতন্ত্র 'জনগণের সরকার', জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের প্রতিরূপ। জনসাধারণের সমর্থনে, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত, জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল সরকারই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ও প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে। বর্তমান যুগে বৃহদাকৃতি রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব-মূলক গণতন্ত্র ছাড়া উপায়ান্তর নাই। তবে কোন কোন দেশে গণভোট গণউদ্যোগ ও প্রত্যাহার-আজ্ঞা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিনিধিমণ্ডলীর বিচ্যুতির প্রতিরক্ষা হিসাবেই এ ব্যবস্থার অনুসৃতি, কিন্তু ইহাতে প্রতিনিধিমণ্ডলীর মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় দায়িত্ববোধ দুর্বল হয় এবং শাসনকার্যে কিছুটা স্থায়িত্বের অভাব ঘটিতে পারে।

স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব হিতবাদী তত্ত্ব ও আদর্শবাদী তত্ত্ব এই ত্রিবিধ উৎস হইতে গণতন্ত্রের নীতির উদ্ভব। গণতন্ত্র স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধ্বনির উপর প্রতিষ্ঠিত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাপকতম জনতার কল্যাণ সম্ভব, শক্তির প্রয়োগ নহে, যুক্তির প্রয়োগেই গণতন্ত্র বিশ্বাস করে, ইহার মাধ্যমে জনসাধারণের চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মূলতঃ দুই ধরনের সমালোচনা উপস্থিত হয়, প্রথম হইল সাধারণ মানুষের অযোগ্যতার ও অক্ষমতার যুক্তি, দ্বিতীয় হইল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হইলে গণতান্ত্রিক নীতির অসম্পূর্ণতার অভিযোগ।

গণতন্ত্র দাবী করে না যে তাহা ত্রুটিহীন। তাহার বক্তব্য হইল যে তুলনামূলক বিচারে সে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। বরং মানবসভ্যতার অগ্রগতির সম্ভাবনা এই ব্যবস্থাতেই বৃহত্তর ও নিশ্চিততর।

গণতন্ত্রের বিপরীত ব্যবস্থা একনায়কত্ব। সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব গণতন্ত্রের মূল আদর্শকে আঘাত করে না। সে আঘাত আসে ফ্যাসিস্টপন্থী মতবাদ হইতে। যুক্তি, বিচার ও স্বাধীনতার আদর্শকে উপেক্ষার ভিত্তিতে যে মতবাদের সূত্রপাত, তাহা নিজস্ব প্রচার ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে চূড়ান্ত জঘন্য রূপকেই প্রকাশ করিয়াছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সভ্যতার বিচারে উন্নততর স্তর। কিন্তু তাহাকে বজায় রাখিতে হইলে এবং আদর্শকে সফল করিতে গেলে জনসাধারণের বিশেষ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। রাষ্ট্রকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ, সংকীর্ণতা বর্জন, যুক্তিসহকারে বিচার, পরমতসহিষ্ণুতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষণে ব্যগ্রতা, প্রভৃতি চারিত্রিক গুণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাহার সহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান, অন্ততপক্ষে তাহার কুফলগুলিকে সংযত না করিতে পারিলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

গণতান্ত্রিক পরীক্ষা দীর্ঘদিনের নহে, ইহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা হারাইবার কারণ নাই।]

গণতন্ত্র : "গণতন্ত্র" বলিতেই আমাদের সহসা মনে পড়িয়া যায় আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তি : "Government of the people, by the people, for the people"; অর্থাৎ জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সরকার। আরও বিশদ করিয়া বলিতে গেলে, ইহা হইল সেই ধরনের শাসনব্যবস্থা যাহার মাধ্যমে জনসাধারণের ইচ্ছা রূপ পাইবে, যাহার দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত ও বর্ধিত হইবে যাহা হয়, জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হইবে, নতুবা, যাহার পরিচালকমণ্ডলী জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইবে, নিজস্ব কার্যাবলীর জন্য জনসাধারণের ইচ্ছায় শাসনাধিকার হইতে অপসারিত হইতে পারিবে। ইহা এমনই ব্যবস্থা যেখানে শাসক ও শাসিতের আদিম বিভেদকে উঠাইয়া দিয়া, চেষ্টা করা হইতেছে শাসককে শাসিতের দ্বারা নিযুক্ত ও পরিচালিত করিতে। সাম্য ইহার ভিত্তি ; ইহার আস্থা ব্যক্তি-মানুষের যোগ্যতা ও ক্ষমতার উপর।

গণতন্ত্র কি ?

গণতন্ত্রের আদর্শ : কিন্তু এত বলিয়াও স্বীকার করিতে হয় যে ' গণতন্ত্র" শুধুমাত্র শাসন-ব্যবস্থা বা সরকারকে বুঝায় না। গণতন্ত্রের অর্থ আরও ব্যাপকতর, আরও গভীরতাপূর্ণ। শাসন-ব্যবস্থার ধারণার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া "গণতন্ত্র" এক মহৎ আদর্শে পরিণত হইয়াছে। একটি বিশেষ সমাজ-চেতনা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ ধরণের জীবনধারণ-পদ্ধতি হিসাবে "গণতন্ত্র" রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার আসরে উপস্থিত হইয়াছে।

গণতন্ত্র শুধু সরকার নয়, ইহা একটি আদর্শ

এইচ. ই. বার্নস (H. E. Barnes) এর সংজ্ঞা ধরিতে গেলে, গণতন্ত্র হইতেছে, সেই ধরনের সামাজিক সংগঠন, যেখানে শুধু সমষ্টির সর্বোত্তম কর্মক্ষমতায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এই ধরনের কার্যের উপর কিছু অপরিহার্য বাধা-নিষেধ বাদ দিলে, সমাজের সমষ্টিগত সর্বস্তরের কার্যকলাপে ব্যক্তির অংশগ্রহণ অবারিত এবং যেখানে কর্মনীতি শেষপর্যন্ত সমগ্র জনতার ইচ্ছার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়।* অর্থাৎ, এক কথায়, শুধু শাসনব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা

* "a form of social organisation in which the participation of each individual in the various phases of group activity is free from such artificial restrictions as are not indispensable to the most efficient functioning of the group, and in which group policy is ultimately determined by the will of the whole group." —Merriam and Barnes সম্পাদিত—A History of political Theories—P. 48.

মাত্র নহে, সমাজের যে কোন সংগঠনেই গণতন্ত্রের নীতিকে প্রয়োগ করি না কেন, দেখা যাইবে, তাহার বৈশিষ্ট্য হইল: প্রথমতঃ সকলের মতামতের ভিত্তিতে সে সংগঠন পরিচালিত হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, সংগঠনের সদস্যদের সংগঠনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণের উপর অপ্রয়োজনীয় বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইবে না। তাহা হইলে, স্বীকার করা হইল সংগঠন পরিচালনার ব্যাপারে সকলের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন আছে; অর্থাৎ, প্রত্যেকের মতামতেই কিছু মূল্যবান বস্তু থাকার সম্ভাবনা এবং সেটুকু গ্রহণ করা প্রয়োজন: দ্বিতীয়তঃ, পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার সকলেরই সমান; তৃতীয়তঃ, প্রত্যেকের অধিকারকে কার্যকরী করিবার সুযোগ পাওয়া চাই, চতুর্থতঃ, কাহার মতের মূল্য কতখানি তাহা যুক্তি দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, একে অপরকে বুঝাইয়া সমষ্টিগত শ্রেষ্ঠ মতটি উদ্ভাবন করিতে হইবে; পঞ্চমতঃ, প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে আপন ক্রিয়াকর্ম করিয়া যাইবার অধিকার থাকিবে,—শক্তির প্রয়োগ এখানে মুখ্য নহে, শক্তি-মূলক বাধা আসিবে কেবলমাত্র সমষ্টির সামগ্রিক স্বার্থের সর্বোত্তম রূপায়নের প্রয়োজনে। অর্থাৎ, গণতন্ত্র বিশ্বাস রাখে ব্যক্তি-মানসের শুভবুদ্ধির উপর, তাহার চিন্তা ও কর্মক্ষমতার উপর, তাহার সমাজচেতনার উপর; বিশ্বাস করে, সকলকেই সমান সুযোগ দান করা উচিত, ইহার দ্বারা ব্যক্তির কল্যাণ হইবে সমাজের উন্নতি ঘটিবে; বিশ্বাস করে, জোর করিয়া হুকুম দিয়া সকলকে চালানোর চেষ্টা না করিয়া সকলকে বুদ্ধি, চেতনা ও ক্ষমতার স্বাধীন ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দানের মাধ্যমে ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হইবে। সেইজন্যই ডেলাইল বার্ণস্‌ও (C. Delisle Burns) বলিয়াছেন: যে সমাজে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তিই প্রধান, যেখানে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের দায়িত্ব অনুভব করে, যেখানে প্রত্যেকেই যৌথ জীবনে কিছু চিন্তা বা অনুভূতির অবদান রাখিয়া যায়। শুধু বাহুবল লইয়াই লোকে আসে না; নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাহা অনন্য তাহারই কিছুটা দিবার ক্ষমতা প্রত্যেকের আছে বলিয়া ধরা হয় এবং প্রত্যেকে নিজে তাহা অনুভব করে; গণতন্ত্র সেইহেতু একধরণের মানুষের সমাজ নহে, সমান মানুষের সমাজ এই অর্থে যে প্রত্যেকেই সমাজের অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় অংশ।*

গণতন্ত্রের তাৎপর্য

গণতন্ত্রের এই আদর্শগত তাৎপর্য হইতেই শব্দটির নানা প্রয়োগ দেখা যায়।

---

* A society in which reason governs the contact of men and one in which each man feels responsibility for his action is also a society in whick

ব্যাপক অর্থে সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে উপরে বর্ণিত অর্থেই গণতান্ত্রিক সমাজকে (Democratic Society) চিনিতে হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে (Democratic State) শাসনব্যবস্থা জনসম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ম্যাক্‌আইভারের অর্থে "সমষ্টিগত ইচ্ছার" প্রতিফলন সে রাষ্ট্রে দেখা যাইবে। গণতান্ত্রিক সরকারের সংজ্ঞা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের উপরেও অনেকে শ্রমশিল্পে গণতন্ত্র প্রয়োগের (Industrial Democracy) কথা বলিয়া থাকেন: তাঁহারা বলিতে চান যে শ্রমই ধনোৎপাদনের মূল উৎস; সুতরাং যাঁহারা শক্তি ও বুদ্ধি দিয়া খনি, কারখানা, বাগিচা বা ব্যবসা চালাইতেছেন তাঁহাদেরই মালিক হিসাবে উহার উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন প্রভৃতির সামগ্রিক পরিচালনার ভার গ্রহণ করা উচিত। প্রধানতঃ সিণ্ডিক্যালিস্ট ও গিল্ড সোস্থালিস্টদের এই বক্তব্য হইলেও ইহার ব্যাপকতর সমর্থন আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রয়োগ সম্ভব এবং অনুরূপ প্রয়োগের ভিতর দিয়াই নানাবিধ সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম উদ্ভূত হইয়া থাকে।

গণতান্ত্রিক আদর্শ ও
(১) সমাজ (২) রাষ্ট্র
(৩) শাসনব্যবস্থা
(৪)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা: যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হইল গণতান্ত্রিক সরকার, তাহাতেই ফিরিয়া আসা যাক। লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, গণতন্ত্র "সেই সরকার যেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের অধিকাংশের শাসন বর্তমান; যোগ্যতা-সম্পন্ন নাগরিকদের অন্ততঃ কমপক্ষে অধিবাসিদের তিন-চতুর্থাংশ হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে নাগরিকদের বাহুবল ও ভোটের অধিকারে মোটামুটি সমপরিমাণ হয়"* অর্থাৎ লিংকন যেখানে সাধারণ ভাবে "জনসাধারণের সরকার" বলিয়া গিয়াছেন, অথবা জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন,

ব্রাইস-প্রদত্ত সংজ্ঞায় জনগণের সার্বভৌমত্বের ব্যবহারিক রূপ

every man contributes some thought and feeling to the common life. No man gives only the force of his arm ; but each is, regarded as capable and each feels himself capable of adding something unique out of his own personality. Democracy as an ideal is therefore, a society not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole. C. Delisle Burns : Political Ideals—P. 278

* "A government in which the will of the majority of qualified citizens rules, taking the qualified citizens to constitute the great bulk of the inhabitants, say roughly, at least three-fourths, so that the physical force of the citizens coincides (broadly speaking) with their voting power"—Lord Bryce.

"রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতায় সকলের প্রবেশাধিকার"* ব্রাইস যেখানে নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহারই ভিত্তিতে সংজ্ঞা-নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাইস-প্রদত্ত সংজ্ঞায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে: (১) গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থ যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের **সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন:** (২) রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর নাগরিক হইবার যোগতা থাকিতে পারে না; (৩) এ অবস্থায় ব্যাপকতম অধিবাসীর যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন,—সংখ্যায় তাহাদের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ হইতে হইবে; (৪) সংখ্যার দিক হইতে, জনশক্তির দিক হইতে, ক্ষমতা যেখানে রহিয়াছে, আইনগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা যাহাতে সেইখানেই অর্পিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই তাঁহার উপরিউক্ত প্রস্তাব।

গণতান্ত্রিক সরকারের শ্রেণীবিভাগ: গণতান্ত্রিক সরকারকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রত্যক্ষ (Direct) ও (২) অপ্রত্যক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক (Indirect of Representative)।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলিতে বুঝিতে হইবে যেখানে সকল নাগরিক একত্র মিলিয়া আলোচনার দ্বারা আইন প্রণয়ন করে এবং তাহারাই সেই আইনকে কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। স্বভাবতঃই এ অবস্থা প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের মত স্থানেই সম্ভব। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিক সংখ্যা এত বৃহৎ যে তাহাদের একত্র মিলিয়া আলোচনা করা বাস্তবে অসম্ভব। একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন ক্ষুদ্রাকৃতি ক্যাণ্টনে এ ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু সেগুলিও সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র নহে, সমগ্র সুইজারল্যাণ্ডের অংশ মাত্র। সুতরাং আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলিতে প্রতিনিধিত্ব-মূলক গণতন্ত্রকেই বুঝায়। অর্থাৎ, শাসকমণ্ডলী নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে। তাহাদের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবে, এবং নির্দিষ্টকাল অতিবাহিত হইলে পর, অথবা অন্য কোন জরুরী অবস্থায়, পুনরায় নির্বাচনের জন্য নাগরিকদের নিকট উপস্থিত হইবে। এককথায় জনসাধারণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে তাহাদের নির্বাচিত আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের মারফৎ।

এ স্থলে অধ্যাপক রবার্ট এম্ ম্যাকআইভার প্রাচীন গ্রীস ও রোমের প্রত্যক্ষ

* "...Admission of all to a share in the sovereign power of the state." J. S. Mill—Representative Government—(World Classics Edition)—P, 198

1 R. M. MacIver. The Web of Government. P. 136.

গণতন্ত্র শাসিত নগর রাষ্ট্রগুলির পতন সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করিয়াছেন সেদিকে নজর করিলে সে যুগের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও বর্তমানের গণতন্ত্রে শুধুই সংখ্যাগত পার্থক্য যে নয় তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ম্যাকআইভার নিম্নলিখিত কারণগুলি হাজির করিয়াছেন :

১। প্রাচীন যুগের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল ক্রীতদাস প্রথা ;

২। সাংস্কৃতিক সুযোগ কার্য্যকরীভাবে সীমাবদ্ধ ছিল তুলনামূলকভাবে সংখ্যাল্প সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে ;

৩। জাতীয় চেতনার উদ্ভব ঘটে নাই ;

৪। ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের অধিকারভিত্তিক সম্পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্রের চেতনা তখন গড়িয়া উঠে নাই।'

কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারেও নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপের কিছু কিছু ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেগুলি হইল, যথাক্রমে গণভোট (Referendum), গণউদ্যোগ (Initiative) ও প্রত্যাহার আজ্ঞা (Recall)। গণভোট বলিতে বুঝায় যে যোগ্যতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কোন একটি প্রস্তাব নাগরিক সাধারণের মতামতের জন্য উপস্থিত করিলেন। নাগরিকদের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ী প্রস্তাবটি বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত হইবে অথবা বর্জিত হইবে। গণউদ্যোগের ক্ষেত্রে নাগরিকদের তরফ হইতে প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব পেশ করা যায়। নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিকদের সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের ভিত্তিতে প্রস্তাবটি বিধিবদ্ধ উপায়ে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হইবে। সাধারণতঃ এই প্রথার সহিত গণভোটের ব্যবস্থা জড়িত থাকে। উদ্দেশ্য হইল : জনতার উদ্যোগে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইতেছে তাহা শেষ পর্য্যন্ত সর্বসাধারণের রায়েই গৃহীত বা বর্জিত হওয়া উচিত। গণহস্তক্ষেপের চরমতম ব্যবস্থা হইল প্রত্যাহার আজ্ঞা। এ ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার নির্বাচকমণ্ডলী যদি মনে করে যে সে ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা হারাইয়াছে, তবে বিধিসঙ্গত নিয়ম অনুসারে তাহাকে আসনচ্যুত করিতে পারে।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা

(১) গণভোট
(২) গণউদ্যোগ
(৩) প্রত্যাহার আজ্ঞা

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের নানারূপ সুপরিচিত ও সম্ভাব্য ত্রুটি দূর করিবার জন্যই উপরোক্ত ব্যবস্থা। প্রধানতঃ পার্টিগত ক্ষুদ্রস্বার্থের দ্বন্দ্বে আইনসভা যখন

গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নেও অক্ষম হইয়া পড়ে, অথবা আইনসভার দুটি কক্ষের বিরোধে কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যায়, তখনই প্রয়োজন হয় জনসাধারণের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। শাসনতন্ত্রের সংশোধনের প্রয়োজনে গণভোট-ব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়ায় রহিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে ঐ একই উদ্দেশ্যে গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ক্যাণ্টনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে সাধারণ আইন সম্বন্ধে গণউদ্যোগের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। প্রত্যাহার আজ্ঞার ব্যবস্থা একমাত্র সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রেই পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতির ব্যবহার

নাগরিকদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি রহিয়াছে। আমরা ডাঃ ফাইনারের তীব্র সমালোচনার সারাংশ নিম্নে উপস্থিত করিতেছি:

ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি

গণভোটেও রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি সমান উৎসাহে অংশগ্রহণ করে। গণ-ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের সমর্থনে যেরূপ ভোট পড়িয়াছিল, গণভোটেও তাহারই মোটামুটি পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। গণভোটের বিষয় সর্বদা জনসাধারণের নিকট 'পরিষ্কার' থাকে না, ফলে গণভোটের 'জনপ্রিয়তাও' সবসময়ে ব্যাপক নহে। অধিকন্তু, গণভোটের ভিতর দিয়া আইনসভা ও সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে ও ফলে দায়িত্ববোধ কমিয়া যাইতে পারে। জনসাধারণের শিক্ষিত হইবার সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ। কারণ, রাজনৈতিকদলগুলির হস্তক্ষেপের ফলে এবং অসন্তুষ্ট দলগুলির ঈর্ষা বা রোষ-প্রকাশের ফলে বিভ্রান্তি আরও বাড়িতে পারে। প্রত্যাহার-আজ্ঞা, প্রতিনিধিদের কার্যক্রমকে বিরোধীদের ঈর্ষা ও জনতার সাময়িক উত্তেজনা ও অন্ধ-সংস্কারের ক্রীড়নকে পরিণত করিতে পারে। সুতরাং ডাঃ ফাইনারের সিদ্ধান্ত হইল যে জনতার সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে চাহিলে আপত্তি নাই। কিন্তু প্রতিনিধিত্ব-মূলক গণতন্ত্রের দুর্বলতা দূর করিবার পথ মূলতঃ রাজনৈতিকদলগুলির বিশুদ্ধিকরণের চেষ্টা, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পথ নহে।*

উপসংহার

সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকারের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমরা নিম্নলিখিত সূত্রগুলিকে নির্দিষ্ট করিব:

* Dr. Finer—The Theory and Practice of Modern Government. Pp. 563-568

১। দেশের শাসকমণ্ডলী, অর্থাৎ মূলতঃ আইন-প্রণেতৃবর্গ এবং শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যদি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত না হন, তাহা হইলেও জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভার নিকট ইহাকে সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল হইতে হইবে।

গণতান্ত্রিক সরকারের মূল বৈশিষ্ট্য

২। এই নির্বাচন নির্দিষ্ট কাল অন্তর হওয়া প্রয়োজন; তাহা না হইলে শাসকদিগকে অপসারিত করিবার সুযোগ থাকিবে না, জনসাধারণের প্রতি তাহাদের দায়িত্ব নির্ধারিত থাকিবে না।

৩। ব্যাপকতম জনতার ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।

৪। নির্বাচনে প্রার্থী হইবার অধিকারে বাধা-নিষেধ যথাসম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৫। নির্বাচনে স্বাধীনভাবে ভোট দিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৬। সাধারণভাবে এবং বিশেষতঃ নির্বাচনপ্রসঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন গড়িবার স্বাধীনতা, সমালোচনার স্বাধীনতা প্রয়োজন।

৭। অনেকের মতে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকার প্রয়োজন। কারণ, তাহা হইলে সরকারী বিরোধী দল বা দলগুলি সর্বদাই সমালোচনার মারফত অধিকার সম্বন্ধে সকলকে সজাগ রাখিতে পারিবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে অধিক জনসমর্থনের ভিত্তিতে বর্তমান সরকারীদলকে অপসারিত করিবার সম্ভাবনা জিয়াইয়া রাখিয়া বর্তমান সরকারকে অধিক সংযত, সহানুভূতিসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল রাখিতে পারিবে।

গণতন্ত্রের তত্ত্বগত সমর্থন: আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দাবীর মূল উৎস তিনটি*: প্রথমত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব (Doctrine of Natural Rights)—যাহার ঘোষণা ছিল: নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করিবার অধিকার লইয়া প্রত্যেক মানুষই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং, প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রশাসনে অংশ গ্রহণ করিবার সমান স্বভাবগত অধিকার রহিয়াছে; এ ধ্বনি বিভিন্ন দেশে অবাধ রাজতন্ত্র বা বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ-বিপ্লবের প্রেরণা যোগাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, হিতবাদী তত্ত্ব" (Utilitarian Theory),–যাহার

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তাত্ত্বিক তিনটি উৎস

(১) স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব

* Coker—Recent Political Thought—C,h X—দ্রষ্টব্য।

বক্তব্য হইল :—সমাজের লক্ষ্য হইতেছে,—'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন (Greatest good of the greatest number) ; যেহেতু যাহার জ্বালা সেই বোঝে ; জ্বালা কোথায় এবং কিরূপে সেই জ্বালার অপসারণের মারফত সুখসাধন সম্ভব, সেজন্য শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় প্রচুরতম লোকের অংশগ্রহণ আবশ্যক : এবং তৃতীয়তঃ, 'আদর্শবাদী তত্ত্ব' (Idealist Doctrine), যাহা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল লেখনীর মারফত প্রমাণিত করিতে চাহিলেন যে একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যাহার ভিতরে প্রতিটি ব্যক্তি-চরিত্রের অন্তর্নিহিত সর্ববিধ গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভবপর হয়।

(২) 'হিতবাদী তত্ত্ব'

(৩) 'আদর্শবাদী তত্ত্ব'

এইবার বিভিন্নসূত্র হইতে প্রাপ্ত গণতন্ত্রের পক্ষের যুক্তিগুলি পরস্পর সাজাইলে আমরা নিম্নলিখিত তালিকায় উপনীত হইব :

গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি

(১) প্রত্যেক মানুষেরই মানুষ হিসাবে কতকগুলি সমান অধিকার প্রাপ্য রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মূল হইল এই যে সে শুধু অপরের আজ্ঞাবাহী হইয়া সারাজীবন চলিবে না, নিজের বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ করিতে পারিবে। সুতরাং সামাজিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের যে বৃহত্তম শক্তি অর্থাৎ, শাসনব্যবস্থা, তাহার গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করিবার সমান অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই রহিয়াছে।

সাম্যের যুক্তি

২। প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা সমান এ কথা কেহ বলিতেছে না। কিন্তু, কাহার যোগ্যতা কতটুকু তাহা বুঝিতে গেলেও প্রয়োজন প্রত্যেককে স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য করিবার সমান সুযোগ দেওয়া। সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এই স্বাধীনতার অধিকারের ব্যবহার হইতে উদ্ভূত এবং ইহার ভিতরেই স্বাধীনতার অধিকার বজায় থাকিতে পারে।

স্বাধীনতার অধিকার

৩। ভ্রাতৃত্বের মূল তাৎপর্য হইল সম-উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ সর্বমানুষের সহযোগিতা। গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য নির্ধারণে ও তদনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় সকলের সুযোগদান করিতেছে। সুতরাং বলা যায় যে সমাজে মানুষ হিসাবে মানুষের সহিত ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের দাবী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই রক্ষিত হইতে পারে।

ভ্রাতৃত্বের দাবী

৪। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত,

জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল ও জনসাধারণের দ্বারা পরিবর্তনীয়। সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেই রূপ পাইতে পারে।

জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা

৫। সাধারণ মানুষের স্বার্থ সাধারণ মানুষই ভাল বুঝিতে পারে। সুতরাং, যে ব্যবস্থায় শাসকমণ্ডলী সাধারণ মানুষের দ্বারা নির্বাচিত ও সাধারণ মানুষের নিকট দায়িত্বশীল, সেখানে সাধারণের স্বার্থই সর্বাপেক্ষা বেশী বজায় থাকিবে।

ব্যাপকতম মানুষের কল্যাণের সম্ভাবনা

৬। বৃহত্তম জনতার মতামত গ্রহণের ফলে মতের সংঘাতের ভিতর দিয়া মিথ্যা অপনীত হইয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করে।

সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব

৭। শক্তির পরিবর্তে মুক্তি, হুকুম দেওয়া ও হুকুম তামিল করার বদলে আলোচনা ও মীমাংসা, স্বমত-আস্ফালনের বিকল্পে পরমতসহিষ্ণুতা ও মিলনের প্রয়াস,—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং মানবসভ্যতার বিকাশে ইহার উন্নততর স্থান অনস্বীকার্য।

সভ্যতার উন্নততর স্তর

৮। গণতন্ত্র সাধারণ নাগরিককে শিক্ষিত করে, তাহাকে দায়িত্বশীল করিয়া তোলে, নিজস্ব ক্ষুদ্রস্বার্থের গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের প্রেরণায় তাহাকে উদ্দীপিত করে। একমাত্র গণতন্ত্রেই সর্বসাধারণের পক্ষে এই চরিত্র-বিকাশ সম্ভবপর।

শিক্ষা ও চরিত্রের বিকাশ সম্ভব

৯। এই ব্যবস্থায় মানুষ দেশকে আপন বলিয়া চিনিতে শিখে; তাহার দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়।

দেশপ্রেমের উজ্জীবন

১০। সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা আয়ত্তাধীন বলিয়া আকস্মিক বিপ্লবের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

আকস্মিক বিপ্লবের সম্ভাবনা নাই

গণতন্ত্রের সমালোচনা: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমালোচকমণ্ডলীর সংখ্যাও যেমন বৃহৎ, দৃষ্টিভঙ্গীও সেরূপ বিভিন্ন। তাহা সত্ত্বেও সমালোচকদের মূলত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। একদল সমালোচক গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই অস্বীকার করেন; তাহাদের মতে, জনসাধারণের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার যোগ্যতা নাই। অপর দলের অভিমত হইল যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের নীতির যথাযথ প্রয়োগ করে না; ইহা মধ্য পথে আসিয়া থামিতে চায় এবং

গণতন্ত্রের বিরোধী সমালোচনার দুই রূপ

গণতন্ত্রের অধিকতর অগ্রগতি ব্যাহত করে। ইহারা মনে করেন শুধুমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা খাড়া করা হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত; এই ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক ও ব্যাপকভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের পত্তন করিলে পর গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। যাহা হউক, বিরোধী সমালোচনাগুলিকে আমরা এক্ষণে পরপর উপস্থিত করিতেছি।

গণতন্ত্র অক্ষম ও অস্থায়ী

অগ্রগতির বিরোধী শক্তি

তুচ্ছ কার্যে রত, দুর্নীতিপূর্ণ দলীয় সরকার

১। হেনরী মেইনের মতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অপদার্থ, অক্ষম, ক্ষণভঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার সামাজিক সাধারণ জনতা বুদ্ধিহীন, নেতৃত্ব তাহাদের খুশী করিয়া চলে; সুতরাং নেতৃত্ব হয় দুর্বল। তাহাদের কাজই হয় এই মূর্খ জনতাকে ভুলাইয়া রাখিয়া শাসন পরিচালনা করা। বস্তুতঃ গণতন্ত্র বলিতেই বুঝিতে হইবে প্রাত্যহিক তুচ্ছতা ভরা দুর্নীতিপূর্ণ দলীয় সরকার।

ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে

২। লেকী উপরোক্ত মত সমর্থন করিয়াই বলেন যে গণতন্ত্র মূর্খ ও আজ্ঞ জনতার সরকার বলিয়াই স্বাধীনতা ও অধিকার খর্ব করিতে বাধ্য।

দুর্বল নেতৃত্ব

৩। ফ্যাগুয়ের মতে,—নেতৃত্বের চরিত্রও ক্রমে অবনত হইয়া পড়ে এবং নেতৃত্ব সামগ্রিকভাবে দুর্বল হয়।

বিশেষজ্ঞ অপসারিত

৪। আধুনিক সরকার পরিচালনায় যে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাহা সাধারণ মানুষের থাকিতে পারে না। গণতন্ত্র সাধারণের হস্তে শাসনক্ষমতা সমর্পণ করিয়া বিজ্ঞ ও গুণীজনকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হইতে সরাইয়া রাখিয়াছে।

জনতা শাসন করিতে পারে না—গণতন্ত্র চতুর নেতৃত্বের শাসন

৫। লে বন বলেন,—জনতা নিজস্ব মতামত গঠন করিতে অক্ষম। তাহারা নেতাদের মতামতকেই নিজস্ব মতামত বলিয়া মনে করে। গুণের আদর এখানে অসম্ভব; যাহারা লোক মাতাইতে পারে তাহারাই শাসন চালায়

৬। আধুনিক রাষ্ট্রে যে পরিমাণ বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহাতে প্রকৃতপক্ষে সরকারী আমলারাই শাসন চালাইয়া থাকে। পার্টি সংগঠনও বিরাট ও ব্যাপক হইবার ফলে পার্টি নেতারাও সাধারণ মানুষ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে

বাধ্য। সেখানেই ।ক্ষুদ্র-বৃহৎ নেতাদের আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; এককথায় গণতন্ত্র বহিরাবরণ মাত্র। উপার্জনের উপায় হিসাবে রাজনীতিতে যোগদানকারী আমলাতন্ত্রেরই রাজত্ব চলিতে থাকে।

গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রের শাসন

৬। কোন জীববিজ্ঞানী ও মনস্তাত্ত্বিক বলিতে চাহিতেছেন যে মানুষের মধ্যে স্বভাবজাত গুণবৈষম্য বংশানুক্রমিক ভাবে পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হইয়া বৈষম্য বাড়াইয়া চলে এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও পাওয়া গিয়াছে যে মানুষের বুদ্ধিমত্তায় স্বাভাবিক বৈষম্য বিরাট; সুতরাং গণতন্ত্র সকলকে একই পর্যায়ে টানিয়া নামাইয়া সমগ্র সমাজের ক্ষতিসাধন করিতেছে।

স্বাভাবিক বৈষম্য উপেক্ষা করার ত্রুটি

উপরোক্ত যুক্তিগুলি হইতে একটি সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয়: তাহা হইলে গণতন্ত্রের পরিবর্তে অভিজাততন্ত্রের প্রবর্তন প্রয়োজন। হয়ত জ্ঞান ও গুণের আভিজাত্যের কথাই বলা হইতেছে; কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা হইল এই যে সাধারণ লোকের কলঙ্কস্পর্শ হইতে শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু অপর দিকের সমালোচনাও রহিয়াছে।

৮। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সমালোচনায় বলা হয় যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার কথা ভাবিয়াই ক্ষান্ত হয়; কিন্তু আর্থিক বৈষম্যের ফলে মানুষ তাহার স্বাধীনতা ব্যবহার করিতে পারে না। বক্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় উপস্থিত করা যাইতে পারে: "কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেন না, সকল রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমান ভাবে প্রভাবিত হইতেই পারে না। টাকার জোরে যেখানে লোকমত তৈরী হয় টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।"* এ বক্তব্যে মূল কথা ইহা নহে যে জনসাধারণকে অধিকার দেওয়া ভুল হইয়াছে; বক্তব্য ইহাই যে ধনবৈষম্যের অবসান ঘটাইয়া প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার পূব পর্যন্ত ভোট দিবার অধিকার অন্তঃসারশূন্য বহিরাবরণ মাত্র।

ধনবৈষম্যের ফলে গণতন্ত্র খণ্ডিত ও দুর্বল

* রবীন্দ্রনাথ: সমবায়নীতি: পৃঃ ২১-২২

গণতন্ত্রের পক্ষে জবাব : কিন্তু আক্রমণ যতই তীব্র হউক অথবা যত বিভিন্ন দিক হইতেই আসুক না কেন, গণতন্ত্রের নিজস্ব জবাব রহিয়াছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিগুলির উপর এখন আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ব্যবস্থা বলিয়া কেহই দাবী করেন না। তথাপি সমালোচনাগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়া গণতন্ত্রের সমর্থকেরা তাঁহাদের বক্তব্য হাজির করেন। যে সব সমালোচনা গণতন্ত্রের মূল নীতিতেই আপত্তি উত্থাপন করে তাহাদের উত্তর একপ্রকারের। আব যেগুলি নীতিকে স্বীকার করিয়াও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বাস্তব ও সম্ভাব্য ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখাইয়া দেয়, স্বভাবতঃই সেগুলির জবাব ভিন্ন ধরনের।

ইতিহাসের একদেশদর্শী ব্যাখ্যা

১। ইতিহাসের নজির তুলিয়া যাঁহাবা প্রমাণ করিতেছেন যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায সভ্যতার অগ্রগতি রুদ্ধ, তাঁহাদের যুক্তি নিতান্তই একদেশদর্শী। কারণ, সভ্যতার অবনতি ও অগ্রগতি, উভয়বিধ ঘটনাই গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক উভয় প্রকার শাসনাধীনেই ঘটিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং সভ্যতার মূল উৎস সন্ধান না করিযা শুধুমাত্র সন, তাবিখ ও শাসন ব্যবস্থা মিলাইয়া কোন কিছু প্রমাণ করা যাইবে না।

২। যাঁহারা বলেন যে জনশাসনের মূঢতা, অজ্ঞতা ও অন্ধ কুসংস্কারের হস্তে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, তাঁহাদের ফিরাইয়া প্রশ্ন করা যায় যে প্রতিভার অপমৃত্যু কি রাজতন্ত্রে বা অভিজাততন্ত্রের শাসনেও ঘটে নাই, স্বার্থপর হীনচরিত্র, অকর্মণ্য ব্যক্তিরাও কি সম্মানের পদে অভিষিক্ত হয় নাই। যদি বলা হয় যে সক্রেটিস, যীশুখ্রীষ্ট, স্যাভোনারোলা বা গ্যালিলিওকে অজ্ঞ, মোহান্ধ জনতা উপেক্ষা করিয়াছে, উপহাস করিয়াছে, তাহা হইলে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে সুপরিচিত অভিজাত, অ্যারিষ্টোফেনিসই সক্রেটিস বিরোধী অভিযানের নেতৃত্ব করেন; সমাজের ও ধর্মমণ্ডলীতে উচ্চমহলের অভিজাতবৃন্দের অসন্তোষ ঘটাইবার পূর্ব পর্যন্ত স্যাভোনারোলা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন, রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের উচ্চবর্গের ষড়যন্ত্রই খ্রীষ্টকে ক্রুশকাষ্ঠে তুলিয়াছে, গ্যালিলিওকে অসীম নিপীড়ন বরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

৩। যাঁহারা জীববিদ্যার নজির আনিয়া মানুষে মানুষে গুণগত পার্থক্যের কথা বলেন, তাঁহারাও তো প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে যাঁহারা আর্থিক বা চাকুরি ও ব্যবসার দিক হইতে সমাজের উঁচুমহলের বাসিন্দা তাঁহাদের বংশেই

নিয়মিতভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে অধিকতর গুণসম্পন্ন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থের সন্তানেরা যদি মোটামুটি অন্যান্যদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত হয় বা অধিক উপার্জন করে, তবে তাহার কারণ আর্থিক বা সামাজিক সুযোগ সুবিধা না হইয়া বংশগত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলী, এ প্রমাণ কোন বৈজ্ঞানিক আজও হাজির করতে পারেন নাই।

৪। যে সব মনস্তাত্ত্বিক ভিড়ের মধ্যে মানুষের মনের (Crowd Psychology) উচ্ছৃঙ্খলতা, দায়িত্বহীনতা ও উত্তেজনা প্রবণতার উল্লেখ করিয়া গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে 'সাধারণ-মানুষের, মতই অনুরূপ মানসিক দুর্বলতা ভিড়ের মধ্যে ব্যাংকার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী, অধ্যাপক বা শিল্পীরাও প্রদর্শন করেন। "স্বয়ং লে বন্ স্বীকার করিতেছেন: ইহা প্রমাণ হয় না যে কোন ব্যক্তি ভালো গ্রীক বা অঙ্ক জানে বলিয়া, অথবা সে কারুকৃৎ, গোবৈদ্য, চিকিৎসক বা ব্যারিষ্টার বলিয়াই, সামাজিক সমস্যার বিষয়ে সে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসমন্বিত পুরুষ।"*

বুদ্ধি ও গুণের হিসাবে স্বাভাবিক অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব নাই

৫। সুতরাং বুদ্ধি ও গুণের শ্রেষ্ঠতা দিয়া তৈয়ারী কোন স্বতন্ত্র অভিজাত শ্রেণী নাই যে তাহার হস্তে শাসনক্ষমতা তুলিয়া দিয়া নিশ্চিত হওয়া যাইবে। বরং মিল্ বলিতেছেন যে যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়াও লওয়া যায় যে এমন রাজা খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব,—তিনি অভিজাত শাসনের উপর গুরুত্ব দেন নাই,—যে প্রজার কল্যাণ করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম, তবে সে শাসন আরও ক্ষতিকারক** কারণ কুশাসনে সাধারণের মধ্যে সংগ্রামী মনোবৃত্তি ও ঘৃণা অন্ততঃ জাগ্রত থাকে; রাজার সুশাসনে চিন্তা অনুভূতি ও কর্মক্ষমতা শিথিল ও অবসন্ন হইয়া যায়। পরহস্তের দান গ্রহণ করিবার চারিত্রিক স্খলন হইতে ক্রমে বৃহত্তর অন্যায় ও অত্যাচার সহ্য করিতে মন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৬। লর্ড ব্রাইস বলিতেছেন। "গণতন্ত্র হয়ত বিশ্ব মানবের ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। হয়তো বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও সে ভ্রাতৃত্ব আনিতে

---

* "It does not follow", "even Le Bon admitted. "that because an individual knows Greek or mathematics, is an architect, a veterinary surgeon, a doctor, a barrister, he is endowed with a special intelligenee on social questions." Coker—Recent Polittcal Thought—P. 374

** "Evil for evil, a good despotism, in a country at all advanced in civilisation is more noxious than a bad one- J. S, Mill—Ibid. P. 185

পারে নাই, শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মনকে রাষ্ট্রের কার্যে হয়তো লাগাইতে সক্ষম হয় নাই, রাষ্ট্রনীতিকে দোষমুক্ত ও গৌরাবান্বিত করিতেও হয়তো বিফল হইয়াছে, তথাপি অতীত শাসন ব্যবস্থাসমূহের তুলনায় গণতন্ত্র নিজ অধিকার সপ্রমাণিত করিয়াছে।

৭। কিন্তু গণতন্ত্র শুধু আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করে। বিভিন্ন দেশে একনায়কত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে তো অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে দুর্নীতির শাস্তিবিধান হইতেছে, দক্ষতার সহিত সরকারী কার্য সম্পাদিত হইতেছে, প্রত্যেকেই আপন কর্তব্য পালনে রত। তথাপি যতই সময় অতিবাহিত হয় ততই একনায়কত্ব দ্রুত অবনতির পথে নামিয়া যাইতে থাকে। ইহার কারণ স্বরূপ গণতন্ত্রের সমর্থকেরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থিত করেন।

বিকল্প ব্যবস্থা
একনায়কত্বের দোষ

(ক) একনায়কত্ব মতবিরোধ সহ্য করে না। অথচ, মতবিরোধ যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহা সুপরিজ্ঞাত। যেহেতু, এই বিরোধী বিক্ষোভের আয়তন ও তীব্রতা মাপিবার কোন স্বাভাবিক উপায় নাই, সেইজন্য সে আতঙ্কিত থাকে এবং বিরোধিতার সামান্যতম প্রকাশে তাহাকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য ব্যাগ্র হইয়া উঠে। তাহার দমন প্রচেষ্টা ক্রমেই অধিকতর ব্যাপক ও তীব্র হইতে থাকে। সন্দেহ, ঈর্ষা, গোপন গোয়েন্দাগিরি ও আতঙ্কের বিষ সমগ্র নাগরিক জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

(খ) একনায়কত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তিই হইল নেতৃত্বের ভ্রান্তির সম্ভাবনা অস্বীকার করা। সুতরাং নেতৃত্বের ভ্রান্তির ইঙ্গিত থাকিতে পারে এরূপ কোন সমালোচনাই চলিবে না। অতএব সত্য বিশ্বাসকে প্রকাশ করিবার উপায় থাকে না; নাগরিক অধিকার বাতিল হয়। ফলে একদিকে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ খর্বিত ও ব্যাহত হয়, অপরদিকে মারাত্মক জাতীয় ক্ষতি হইবার পূর্ব পর্যন্ত সরকার নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। উপরন্তু সরকার নিজস্ব ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করিবে না বলিয়াই ক্ষতির দায়িত্ব সম্পূর্ণ অথবা অপেক্ষাকৃত নির্দোষের স্কন্ধে চাপাইয়া গুরু শাস্তির ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ অন্যায়ের উপর অন্যায় জমা হইয়া থাকে।

---

* While Democracy may not have led to world brotherhood, has not brought fraternity, has not drafted the best trained minds to state service, or dignified and purified Politics, in comparison with governments of the past it has justified itself,—Merriam and Barnes—Ibid. P. 63

(গ) সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীকৃত করাই একনায়কত্বের নিয়ম। ফলে, সমস্ত পার্থক্য ও বৈচিত্র্যকে দলিয়া পিশিয়া সমাজ-জীবনকে কেন্দ্রীয় ইচ্ছার একটিমাত্র ছাঁচে ঢালিয়া গড়ার চেষ্টাই চলিতে থাকে। ভাল, শাসনব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় এবং জাতীয় জীবনে মেষপালের ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঘ) ব্যক্তিজীবন হইতে স্বাতন্ত্র ও বৈচিত্র্য অবলোপের চেষ্টার ফলে মহৎ শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শৃংখলিত মানবাত্মা সৃষ্টি ক্ষমতাহীন অপৌরুষতায় পর্যবসিত হয়।

(ঙ) সভ্যতার অগ্রগতি হয় জিজ্ঞাসা ও সমালোচনার মাধ্যমে। প্রশ্ন তুলিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিলে সমাজ সম্বন্ধে আসিবে নির্লিপ্ততা ও উপেক্ষা। পরিণতিতে সমাজ-জীবনে পচন অবশ্যম্ভাবী।

গণতন্ত্রের সমস্যা: গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ গণতন্ত্রের দোষ সম্বন্ধে সমালোচক চেতনা লইয়াই গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন জাগাইয়াছেন। মিল্ সম্বন্ধে সমালোচক ম্যাককান্ বলিতেছেন যে স্বাধীনতা সম্বন্ধে এতখানি আতঙ্ক বোধ হয় স্বাধীনতার গুণগ্রাহী আর কোন লেখকের লেখাতেই পাওয়া যায় না। তিনি মূল দুইটি সমস্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন: (১) সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর নিপীড়ন এবং (২) অতি-সাধারণ সংখ্যাগুরুর জবরদস্তিতে অসাধারণত্ব নূতনত্ব, বৈচিত্র্য ও প্রগতির পথ রুদ্ধ হওয়া।

মিল নির্দেশিত দুইটি সমস্যা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মোটমুটি ছয়টি প্রধান ত্রুটির কথা লর্ড ব্রাইস উল্লেখ করিয়াছেন: (১) অর্থের শক্তিতে শাসন ক্ষমতার বিকৃতি-করণ ও তাহার অপপ্রয়োগ, (১) জনসেবার পরিবর্তে নিজস্ব সুবিধার উপায় হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ পেশায় পরিণত হওয়া; (৩) ব্যয় বাহুল্য; (৪) সাম্যের নীতির অপপ্রয়োগের ফলে গুণীর অনাদর; (৫) দলীয় দ্বন্দ্ব, (৬) জনপ্রিয়তার মোহে

ব্রাইস কর্তৃক ছয় দফা সমস্যার উল্লেখ

*No writer had more confident hopes of what liberty, that is individual free choice, can do for men: no write stirs deeper doubts as to whether men are fit for liberiy." P, 55

"Previous radicals had a deep distrust of rulers. This radical has a deep distrust of voters." P. 64

John MacCunn—Six Radical Thinkers.

ও 'ভোট' সংগ্রহ করিবার আগ্রহে রাজনীতিবিদদের নীতিভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই তালিকার প্রথম তিনটি সমস্যা অবশ্য সর্বপ্রকার শাসন ব্যবস্থাতেই দেখা যাইতে পারে; পরবর্তী তিনটি গণতন্ত্রের নিজস্ব বিশেষ সমস্যা।

ডানিং-এর মন্তব্য এই সূত্রে স্মরণীয়: "গণতন্ত্র অন্যায়ের কতকগুলি প্রাচীন উৎসমুখ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে; নূতন কতকগুলি উৎসমুখ খুলিলেও তাহার হস্ত-স্পর্শে মূল স্রোতধারা বর্ধিত হয় নাই।*

গণতন্ত্রের সাফল্যের পূর্বশর্ত: গণতন্ত্র সাফল্যলাভ করিবে কি না তাহা মূলতঃ নির্ভর করে দুইটি উত্তরের উপর:

১। প্রথমতঃ, গণতন্ত্রের নীতি জনসাধারণ গ্রহণ করে কি না?

২। দ্বিতীয়তঃ, এই নীতিকে কার্যে পরিণত করিতে গেলে যে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতে হইবে তাহা করিবার ইচ্ছা ও যোগ্যতা জনসাধারণের আছে কি না?

জনসাধারণের ইচ্ছা ও যোগ্যতা

এইবার সেই মূল কর্তব্য ও দায়িত্বের বিচারে আসা যাক্।

১। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অর্থ যে তাহা জনসাধারণের সম্মতি, সমর্থন ও নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার। সুতরাং ইহার সাফল্যের সর্বপ্রথম শর্ত হইল জনসাধারণের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। কারণ, আগ্রহ ও বিচারক্ষমতার অভাব থাকিলে অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করিবার সম্ভাবনা; এবং নিয়মিত সজাগভাবে শাসকমণ্ডলীর কার্যকলাপের বিচার ও সমালোচনা না করিলে নিয়ন্ত্রণাধিকার ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ

২। এই অংশগ্রহণের ভিত্তি হইবে দেশবাসীর প্রতি সর্বব্যাপক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি হইবে সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণ। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যদি ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, দলগত স্বার্থানুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই না হয়, তাহা হইলে জাতীয় রাজনীতি শুধুমাত্র বিভিন্ন স্বার্থ-সংঘাতের আখড়ায় পর্যবসিত হইবে।

সংকীর্ণ মনোভাব বর্জন

৩। এ দৃষ্টিভঙ্গির সফল প্রকাশ তখনই সম্ভব হয়, যখন জনসাধারণের মন

* Democracy has closed some of the old channels of evil; it has opened some new ones, but it has not increased the stream.

Dunning. History of Political Theories.

হইবে যুক্তিপন্থী, বিচারবুদ্ধি হইবে শিক্ষিত, সমালোচনা করিবার ক্ষমতার সাথে সাথে বিরোধী মত সহ্য করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন। অর্থাৎ যুক্তির প্রাধান্যকে স্বীকার করিতে হইবে; তাহার জন্য মন শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন।

যুক্তির প্রাধান্য

৪। শুধু নিজস্ব অধিকারই নহে, অপরের অধিকার, বিশেষ করিয়া সংখ্যা-লঘুর অধিকার, শ্রদ্ধাসহকারে রক্ষা করিবার কার্যে অগ্রণী হইতে হইবে।

কিন্তু শুধু চারিত্রিক গুণের তালিকা প্রণয়ন করাই যথেষ্ট নহে। যে বাস্তব সমাজ ব্যবস্থায় এগুলির যথোপযুক্ত বিকাশ ও প্রয়োগ সম্ভব, তাহারও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সুতরাং ;—

৫। গণতন্ত্রের মূলনীতি যেহেতু সর্বসাধারণের সমানাধিকার, যেহেতু বাস্তব সমাজ-জীবন হইতেও ধর্ম, বর্ণ, কুলকৌলীন্য, শ্রেণী ও ধনগত বৈষম্য অপসারিত করিতে হইবে। কারণ এই সকল দিক হইতে বিভেদের পর্বত-প্রমাণ প্রাচীর যদি মানুষকে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়া রাখে, তাহা হইলে যে সমস্বার্থবোধ গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি তাহাই বিলীন হইয়া যাইবে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

বৈষম্যের অবলোপ

৬। সুতরাং, এই সংঘর্ষ ও বৈষম্যের মূলোৎপাদনের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সমাজতান্ত্রিক মতবাদীরা মনে করেন ধনোৎপাদন ও বণ্টনের উপায়কে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করিতে পারিলেই প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়। অন্যেরা অতদূর অগ্রসর হইতে রাজি না হইলেও, স্বীকার করেন যে অর্থ নৈতিক বৈষম্যকে সংযত করা এবং ধনতন্ত্রের অন্ততঃ কতকগুলি প্রচণ্ড কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই আধুনিককালে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির স্বীকৃতি আসিয়াছে:

(ক) ব্যাপক বেকারী হইতে জনসাধারণের প্রতিরক্ষা।

(খ) সভ্যতার মানানুযায়ী সর্বনিম্ন বেতন।

(গ) সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ ও যথোপযুক্ত বিশ্রাম।

(ঘ) রোগ ও বার্ধক্যের বিপর্যয় হইতে নিরাপত্তা।

(ঙ) শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা পাইবার সুযোগ।

(চ) সর্বপ্রকার মানবতার অপমান সূচক বৈষম্যের অবসান।

(ছ) সংখ্যালঘুর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ : গণতন্ত্রের সম্মুখে সমস্যাবলী অত্যন্ত গভীর এবং তাহাব মূল সমস্যা ধনবৈষম্য হইতে উদ্ভূত। অ্যানিউরিন বিভান বলিতেছেন : "ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে মূল বিষয়বস্তু আসিয়া দাঁড়ায় একটি মাত্র সমস্যাতে : হয় দারিদ্র্য, সম্পত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করিতে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করিবে, নতুবা, দারিদ্র্যেব আতঙ্কে সম্পত্তিই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবে।"* অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের যে আদর্শ তাহার যাত্রা শুরু কবিয়াছিল, তাহাই আজ বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের দাবির সম্মুখীন। ইতিমধ্যেই "সীমাবদ্ধ সরকারের" (Limited Government) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দাবী মূলতঃ বর্জিত হইয়াছে। সামাজিক উন্নয়নমূলক বাষ্ট্রেব (Social Welfare State) কর্মপন্থা ক্রমবর্ধমান হারে সর্বত্র গৃহীত হইতেছে। মনে বাখিতে হইবে, সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বৃটেনে শুরু হইয়াছে মাত্র ১৯২৯ সালে ; ১৭৮৯ সালে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব শাসনতন্ত্রেব মুখবন্ধে,—"আমবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব এই শাসনতন্ত্রকে স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতেছি (We the people of the Uuited States do ordain and establish constitution for the United States of America)",—বলা হইলেও এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে শতকরা পাঁচজনের বেশী লোকের মতামত গ্রহণ করা হয় নাই।** অর্থাৎ, গণতন্ত্র শাসনব্যবস্থা হিসাবে অত্যন্ত নবীন, অতি সাম্প্রতিক। সুতরাং এই বিশ্বব্যাপী বিশাল পবীক্ষামন্দিরে সমস্যা-সমাধানের নূতন নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে সে বিষয়ে আশা হাবাইবার সময় এখনও আসে নাই। কবি বলিয়াছেন—"জনসাধারণ অসাধারণ।" গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল জনতার উপর আস্থা। 'সভ্যতার সংকট"-এ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : ··"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।....আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা

* "The issue therefore in a capitalist democracy resolves itself into this : either poverty will use democracy to win struggle against property, or property in fear of poverty, will destroy democracy".

Aneurin Bevan—In Placc of Fear—P. 3

** Leslie Lipson—The Great Issues of Politics—পৃঃ ১৪১এ Charles A. Beard হইতে উদ্ধৃতি।

ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"* রবীন্দ্রনাথের এত বড বিশ্বাসের প্রতি অমর্যাদা ইতিহাস এখনও দেখায় নাই।

একনায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্র: গণতন্ত্রের বিকল্প হইল একনায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্র। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রেণীবিভাগ লইয়া আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি অপ্রাসঙ্গিক। গণতন্ত্রের সহিত তুলনামূলক আলোচনাতেই আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব।

সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও নাৎসি-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান

প্রথমেই, সোবিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের সহিত ফ্যাসিস্ট বা নাৎসী একনায়কত্বের পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। কারণ, সোবিয়েত ইউনিয়ন গণতন্ত্রের মূল নীতিকে অস্বীকার করে না, জনতার শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতা নাই,—এ বক্তব্য সোবিয়েত নেতৃবৃন্দের নহে। বরঞ্চ সোবিয়েত নায়কগণ বলিতে চাহেন যে তাঁহারা জমিদার বা পুঁজিপতিশ্রেণীর অবলুপ্তি সাধন করিয়া, শোষক-শ্রেণীর সর্বপ্রকার রাজনৈতিক দল বিতাড়িত করিয়া, প্রকৃত গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, লেলিন বলিয়াছেন যে সোবিয়েত ব্যবস্থা হইল শতকরা নব্বইজনের জন্য গণতন্ত্র ও শতকরা দশজনের উপর একনায়কত্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর সোবিয়েত ইউনিয়নের অনুসরণে পূর্ব ইউরোপে ও এশিয়ায় যে সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলিও নিজেদের মূলতঃ গণতান্ত্রিক বলিয়াই দাবি করে। পশ্চিম ইউরোপীয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে এ মতবাদ অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত গণতন্ত্র বলিয়া মনে করে। বাস্তবিকপক্ষে, ইহারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক আদর্শকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব

পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু অপরপক্ষে গণতন্ত্রের রাজনৈতিক অধিকারের আদর্শের উপরই সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। সোবিয়েত ইউনিয়নে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের পথ রুদ্ধ থাকাই গণতন্ত্রের মূল নীতির খণ্ডন বলিয়া মনে করা হয়। রাজনৈতিক দল যে মূলতঃ বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ, সুতরাং শোষকশ্রেণীর অবসানের পর দেশে একাধিক দল গঠনের উৎসমুখই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—এ যুক্তি তাঁহারা

* রবীন্দ্রনাথ—সভ্যতার সঙ্কট—রচনাবলী—ত্রয়োদশ খণ্ড—পৃঃ ৪১০

মানেন না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে সোবিয়েত সরকারের সমালোচনা সম্ভব এবং সমালোচনা হইয়াও থাকে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে যেহেতু বিরোধী দলের নেতৃত্বে জনসাধারণের বিক্ষোভ সংগঠিত করিয়া সাম্যবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারকে ভোটের জোরে অপসারিত করার স্বাধীনতা নাই, সেহেতু এখানে সমালোচনার স্বাধীনতা নিস্ফল ও আনুষ্ঠানিক।

নাৎসি-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের দৃষ্টিভঙ্গি

কিন্তু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মৌলিক আঘাত আসিয়াছে নাৎসি ও ফ্যাসিষ্ট মতবাদ হইতে। এ দুইয়ের ভিতর প্রকাশভঙ্গি ও মতামতের খুচরা পার্থক্য থাকিলেও, একনায়কত্বের নীতি উপস্থাপনের দিক হইতে ইহারা মূলতঃ এক। ইহাদের বক্তব্যকে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তিপর্যায়ে সাজাইতে পারি :

যুক্তির বিসর্জন : নেতার অন্ধ অনুসরণ

ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষ ভোট দিতে ব্যগ্র নহে। স্বাধীনতার সত্যরূপের সন্ধান মানুষ পায় যখন সে নিজস্ব মতামত ও বিচার-বুদ্ধি রাষ্ট্র ও দলের বৃহৎ ইচ্ছাশক্তির মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে পারে। নিজের ক্ষুদ্র অহমিকা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, জাতি ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের নিকট নিজেকে উৎসর্গ করিতে হইবে। এই ক্ষুদ্রতার গণ্ডী উত্তরণের কঠিন যাত্রাপথে একমাত্র পথ প্রদর্শক দলের, তথা জাতির, নায়ক। নেতার আজ্ঞা মানিয়া চলার ভিতরেই জীবনের স্বার্থকতা ; ব্যক্তিগত বুদ্ধি বা যুক্তি নয়, অনুভূতি ও প্রেরণা দিয়া এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে। সুতরাং একনায়কত্বের মূল ধ্বনি হইল : এক জাতি, এক দল, এক নেতা।

রাষ্ট্র, জাতি ও কুলের অহমিকা প্রচার

দ্বিতীয়তঃ একনায়কত্ব জাতিসত্তার প্রসার ও গৌরবকেই সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া উপস্থিত করে। অহমিকায় মানুষের মন পূর্ণ রাখা হয়। রাষ্ট্র, জাতি ও দলের গৌরব প্রচার করা ছাড়াও, কোথাও "কৌলিক প্রাধান্যে"র (Racial Superiority) ভুয়া বিজ্ঞান, (যেমন, নাৎসী জার্মানীতে), কোথাও বা অতীত রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের ধ্বনি, (যেমন, ফ্যাসিষ্ট ইটালীতে), কোথাও মধ্য যুগীয় আভিজাত্য ও বীরত্বের স্মৃতির রোমাঞ্চকর কাহিনী, (যেমন, জাপানী একনায়কত্বে), অহমিকার ইন্ধনকে অধিকতর প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে।

ইহার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হিসাবে প্রায় সর্বত্রই উঠিয়াছে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের

দাবি। হিট্‌লারের দাবি,—ভার্সাই চুক্তির অবিচারের প্রতিবিধান চাই; মুসোলিনীর হুংকার—রোমান সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইবে; জাপানের বক্তব্য,—দক্ষিণ-পূর্বএশিয়্যর সহ-সমৃদ্ধির বন্ধন স্থাপন করিতে হইবে। কথন-ভঙ্গি যাহাই হউক না কেন, সাম্রাজ্য-বিস্তারের লোভ সর্বত্রই সমান প্রকট। বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের একনায়ক কর্ণধারগণও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অঞ্চল সম্পর্কে নিয়মিত বিরোধ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

সাম্রাজ্য বিস্তারের দাবি

অনিবার্যভাবেই একনায়কতন্ত্রে যুদ্ধের বন্দনা ঝংকৃত হইয়াছে। ব্যক্তিপূজা ও শক্তি-পূজার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবেই যুদ্ধের উপাসনাও যুক্ত। যুদ্ধের মনোভাব এক অস্বাভাবিক ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে। সর্বপ্রকার সমালোচনাকে স্তব্ধ করিয়া দেয়; যুদ্ধের আতংক সৃষ্টি করিয়া পররাজ্য গ্রাস করাও সম্ভব (যেমন হিটলার বার বার করিয়াছে); সুতরাং একনায়ক-তন্ত্রের অপ্রতিহত গতিবেগ হইল আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও বিপর্যয় সংগঠনের দিকে।

যুদ্ধের উপাসনা

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ফরাসী, ইংরেজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মিত্রপক্ষ হইতে প্রচার করা হইত যে পৃথিবীতে গণতন্ত্র নিরাপদ করাই হইল যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যুদ্ধ চলাকালীনই ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লবের ফলে সোবিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯২২ সালে ইটালীতে মুসোলিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইল। ১৯২৩ সালে স্পেনে প্রাইমো ডি. রিভেরা, ১৯২৩ সালে পোল্যাণ্ডে পিল্‌সুড্‌স্কি এবং ১৯৩৩-এ জার্মানীতে হিট্‌লার শাসনক্ষমতা দখল করিল। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইহার সাথে সাথে অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, পর্টুগ্যাল প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে হয় রাজতন্ত্রের নামে, নয় সম্পূর্ণ নগ্নরূপে, স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিল। ইহারই যোগ্য সাথী ছিল এশিয়ার জাপানী একনায়কত্ব ও দক্ষিণ আমেরিকার বহুরাষ্ট্রে অনুরূপ শাসনব্যবস্থা।

একনায়কতন্ত্রের প্রসার

একনায়কতন্ত্রের এই ব্যাপক প্রসারের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দুইটি বিষয়ে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে: প্রথম হইল,—বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য বাঁটোয়ারা হইয়া গিয়াছিল; ফলে যাহাদের ভাগে কম পড়িয়াছিল তাহারা জোর করিয়া পুনর্বণ্টনের জন্য যুদ্ধ ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছিল; দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক শক্তির শান্তিপূর্ণ সম্প্রসারণের

সম্ভাবনা শেষ হইয়া আসিয়াছিল এবং আশু অর্থনৈতিক সংকটে একের পর একটি রাষ্ট্র জর্জরিত হইতে থাকে। সুতরাং একদিকে যুদ্ধের ভিতর দিয়া সংকট এড়াইবার পথ খুঁজিয়া বাহির করার প্রয়াস এবং ঐ একই পন্থায় জনসাধারণের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া ও বিক্ষোভকে দমিত করার প্রয়োজন, এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়া বিভিন্ন দেশের শাসকশ্রেণী একনায়কত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। স্বভাবতঃই এই প্রচেষ্টায় জনসমর্থন জুটিয়াছিল অর্থনৈতিক সংকটের মুখে সাধারণ মানুষের বিহ্বলতা এবং তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্বের অক্ষমতা, অপদার্থতা ও ব্যর্থতার ফলে। ইহার উপরেও বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ইতিহাসগত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই ছিল।

একনায়কত্ব প্রসারের মূল কারণ

অর্থনৈতিক সংকট, সাম্রাজ্য সম্পর্কের সমস্যা ও জনসাধারণের বিভ্রান্তি ও হতাশার সুযোগে যে ফ্যাসিস্টপন্থী একনায়কত্বের উদ্ভব হয়, তাহারই জঘন্য পরিণতি দেখি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ দিয়া সে বীভৎসতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নথিপত্রে; তাহার প্রতিধ্বনি সাম্প্রতিক কালে 'আইকম্যান' বিচারের বিবরণীর ভিতরেও শুনিতে পাওয়া যায়। লর্ড রাসেল 'The Scourge of the Swastika' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় নাৎসী মানব বিদ্বেষের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইতিহাসের এই পটভূমিকাতেই বিভানের সাবধানবাণীর তাৎপর্য বুঝা যায়। নাৎসী বা ফ্যাসিস্ট মতবাদ ও কার্যকলাপকে নিতান্তই আঞ্চলিক বিকৃতিমাত্র বলিয়া মনে করিলে মারাত্মক ভুল হইবে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ও সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তার ভিত্তিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, করিলে অনুরূপ মতাদর্শ তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। একনায়কত্ব সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটিবার যথেষ্ট উপাদান সঞ্চিত হইয়াছে।

মানববিদ্বেষী নাৎসী ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের জঘন্য পরিণতি

সামগ্রিকতাবাদ (Totalitarianism)

এ অধ্যায়ে সমাপ্তি চিহ্ন টানিয়া দিবার পূর্বে সাম্প্রতিক যুগে বহুল আলোচিত আরও একটি রাষ্ট্রনৈতিক শব্দের কিছুটা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শব্দটি হইল Totalitonianism বা সামগ্রিকতাবাদ। জীবনের সর্ববিষয়ে সরকারী ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত থাকিয়া যখন সমাজ ও সরকারী ব্যবস্থাকে নির্দিষ্টপথে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে, তখন তাহাকেই সামগ্রিকতাবাদ বলা হইয়া থাকে।

সংজ্ঞা

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভালো যে absolutism বা চরম ক্ষমতার তত্ত্বের সহিত সামগ্রিকতাবাদকে এক করিয়া দেখা ভুল হইবে। কারণ একচ্ছত্র নৃপতিও তো আইন সঙ্গতভাবেই চরম ক্ষমতার অধিকারী। অশোক বা আকবর, চতুর্দশলুই বা অষ্টম হেন্‌রী,—ইঁহারা প্রত্যেকেই চরম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এমন কি জুলিয়াস সীজার বা নেপোলিয়নের মতো ডিক্টেটারও। নিঃসন্দেহে চরম ক্ষমতার মালিক ছিলেন। তবুও তাঁহাদের শাসন সামগ্রিকতাবাদী বা টোটালিটারিয়ান ছিলো না।

চরম ক্ষমতা তত্ত্বের সহিত পার্থক্য

তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার তত্ত্বেও আমরা চরম ক্ষমতা তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। অষ্টিন বলিয়াছেন: রাষ্ট্রক্ষমতা অসীম, অবাধ ও চরম। রুসোর সমষ্টিগত সার্বভৌমিকতার তত্ত্বেও একই দুর্বার ও অমোঘ ক্ষমতার কথা কল্পনা করা হইয়াছে।

কিন্তু রাষ্ট্রের অবাধ ও চরম সার্বভৌম ক্ষমতা কখনও অবাধ রাজতন্ত্র বা চরম একনায়কতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও আধুনিক যুগে সামাগ্রিকতাবাদ বলিতে যাহা বোঝা হইতেছে তাহা শুধু ক্ষমতার প্রাচুর্যে সন্তুষ্ট হয় না। তাহা সমাজ-জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সমাজ ও ব্যক্তি জীবনকে অবিশ্রান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়া চলে। সামগ্রিকতাবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার চরিত্র আরও ভালো করিয়া বুঝা যাইবে।

সার্মগ্রক নিয়ন্ত্রণ

ক। সামগ্রিকতাবাদী রাষ্ট্রে সবসময়েই একটি সরকারী জীবনদর্শন থাকে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইহার নির্ভুলতা প্রতিটি মিনারশীর্ষ হইতে ঘোষিত হয় এবং সকল নাগরিককেই তাহা মানিয়া লইতে হয়, অন্ততঃ প্রকাশ্যে কোনরূপ আপত্তি জানানো সহ্য করা হয় না।

বৈশিষ্ট্য: ক। সরকারী জীবনদর্শন

খ। সরকারের ঘোষিত নীতির বিরূপ কোন কিছু এমন কি লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিত গবেষকের সৃষ্টি বা দৃষ্টির মধ্যেও যেন ধরা না পড়ে।

খ। বিরোধী মতের স্থান নাই।

গ। প্রাক-প্রাথমিক পর্য্যায় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্য্যন্ত পাঠক্রমকে এমনভাবে ঢালিয়া সাজানো হয় যাহাতে সরকারী নীতির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সকল নাগরিকই শৈশব হইতে বুঝিতে বুঝিতে বড়ো হইতে থাকে। সমগ্র শিক্ষক সমাজকেও এই নীতিরই বাহন হইতে হয়।

গ। শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নীতির বাহক

ঘ। মানুষের সহিত মানুষের মনের ও মতের আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে পুস্তক বা পত্রিকা প্রকাশন, নাটক বা চলচিত্র, প্রদর্শনী, রেডিও বা টেলিভিশন, প্রযোজন সব কিছুর উপরেই কঠিন সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

ঘ। চিন্তা প্রকাশের মাধ্যমের উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্ব

ঙ। অর্থনীতির উপর একক কর্তৃত্ব

ঙ। সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে চালিত হয়।

চ। ট্রেড্‌ ইউনিয়ন বা চার্চ্চ, ক্রীডা বা সাহিত্য, আমোদ-প্রমোদ বা বিজ্ঞান-চর্চা,—যে কোন বিষয়ের যে কোন অরাজনৈতিক সংস্থার উপরেও যথোপযুক্ত সরকারী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

চ। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ

উপরোক্ত বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে এমন সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপক, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা প্রাচীন যুগে বা অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অর্থনীতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা সম্ভব নয়। সামগ্রিকতাবাদ সম্ভব একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারক্ষম উচ্চবিকাশপ্রাপ্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে। যেমন সম্ভব হইয়াছিল জার্মানীতে হিটলারী-নাৎসি শাসনে বা ইটালীতে মুসোলিনির ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে। যেমন সম্ভব হইয়াছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা বৃটেনে; তাহাদের গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাব সরকারের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণের সহায়ক হইয়াছিল।

সামগ্রিকতাবাদ আধুনিক যুগের সৃষ্টি

Schapiro তাঁহার The World in Crisis নামক বইয়ে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে সাম্যবাদই এই সামগ্রিকতাবাদের জনক। [পৃঃ ২২৭) তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন যখনই আসিয়াছে তখনই সামগ্রিকতাবাদের তত্ত্বও আসিয়া হাজির হইয়াছে। গ্রীসে নগররাষ্ট্র—সভ্যতার অস্তগামী যুগে আমূল পরিবর্তনের প্রবক্তা প্লেটোও সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। পুরাতন ফিউডালী ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নতুন সভ্যতার আবাহনে রুসোও রাষ্ট্রের জন্য সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডে ক্রমওয়েলের হাতে একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল এবং অর্থনীতি বা ধর্মক্ষেত্র কোথাও হস্তক্ষেপে তিনি বিরত ছিলেন না। সোবিয়েৎ নায়কগণ পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার যন্ত্র

সামগ্রিকতাবাদ ও সামগ্রিক পরিবর্তনের চাহিদা

হিসাবে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা কখনও অস্বীকার করেন না। তাঁহারা শুধু রাষ্ট্রীক পরিবর্তনেই সন্তুষ্ট নহেন, অর্থনীতিতে, সামাজিক সম্পর্কে, চিন্তায়, শিক্ষায়, সর্বত্রই পুরাতন ধনতান্ত্রিক জীবনযাত্রার সীমানা উত্তরণ করিয়া নূতন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিজ্ঞায় উজ্জীবিত।

সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ মূলতঃ পৃথক

হেন্‌রী পি. স্পেন্‌সার বলিতেছেন: "ইহার অনন্য চরিত্রের জন্য সোবিয়েৎ রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে অন্যান্যদের হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করা প্রয়োজন।* সেবাইন বলেন: "ন্যাশন্যাল সোশ্যালিজম ও কমিউনিজমের মধ্যে ওপর ওপর দেখিলে অনেক ভাসাভাসা মিল ধরা পড়িবে। কিন্তু এরূপ মিল দেখা গেলেও ন্যাশন্যাল সোশ্যালিজমের তুলনায় কমিউনিজমের স্থান নীতি বা যুক্তির দিক হইতে বহু বহু উর্দ্ধে।**

আসলে নাৎসিবাদ বা ফ্যাসিবাদ এবং সাম্যবাদ উভয়েই অনেক কিছু ধ্বংস করিতে চায়, গড়িতে চায় অনেক কিছু। কে কি ধ্বংস করিতেছে, কি গড়িতেছে—তাহাই প্রশ্ন। জার্মানীতে বা ইটালীতে যে একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্র সমস্ত অর্থনীতির উপর নিজেদের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করিয়াছিল, হিটলার বা মুসোলিনির রাজত্বে সেই পুঁজিপতিচক্রের প্রাধান্যই বিস্তারিত হইয়াছে। দুর্বল ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা সরকারী নিয়ন্ত্রণে ইহাদের অধস্তন বশংবদ প্রজা হিসাবে ব্যবসা করিয়াছে; ট্রেড ইউনিয়ন লড়াই করিবার স্বাধীনতা হারাইয়াছে; পার্লামেণ্ট ও স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনাধীন সরকার ক্ষমতা হারাইয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সোবিয়েৎ ব্যবস্থায় জার শাসন, জমিদারি শাসন, বিদেশী পুঁজি ও দেশী মূলধন একই সঙ্গে উৎসাদিত হইয়াছে। পুরাতন দিনের এবং পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত অনেক অধিকার অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সর্বদেশে সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত যে অংশ সেই নির্বিত্ত শ্রমিক ও কৃষক "সম্পত্তির অধিকারকে" নির্মূল করিয়া নতুন এমন এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে,

* "Because of its unique character the 'dictatorship of the prolatariat" in Soviet Russia must he entirely excluded from these categories."—Henry P. Spencer on 'Dictatorship' in Encyclopedia of the Social Sciences (Vols 5—6).

** "Many of the similarities between national socialism and communism lie upon the surface and are manifest. (P. 922)...Despite these manifest similarities, however, it is certain that communism was on a far higher level both morally and intellectually, than national socialism. (P. 925)—George H. Sabine—A History of Political Theory,

যেখানে তাহার আর্থিক ও সামাজিক অধিকার স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন........ "আপাততঃ রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। ...সনাতন বলে পদার্থটা মানু.ষব অস্থিমজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বত প্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে———সনাতনেব গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্য একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে।"* সনাতনকে উৎসাদিত করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা যে সর্বাত্মক ও সামগ্রিক হইবে তাহাতে আব বিস্ময়ের কি আছে? সুতরাং ওপর ওপর মিল থাকিলেও নাৎসিবাদ বা ফ্যাসিবাদে যে ধরণের সামগ্রিকতাবাদী রাষ্ট্র দেখি তাহার সহিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য উপেক্ষা করা একেবারেই ভ্রমাত্মক। নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ জীবনের সর্বত্র ক্ষমতাব হস্ত অনুপ্রবেশ করাইয়া পুবাতন শ্রেণী সম্পর্ক বজায় রাখিতে চায়; সাম্যবাদ জীবনের সর্বত্রই মৌলিক আলোড়ণ আনিতে চায়, তাই অনুপ্রবেশও তাহার সর্বত্র।

অতিরিক্ত পাঠ্য

1. FRANCIS W. COKER—Recent Political Thought
2. C. DELISLE BURNS—Political Ideals
3. C. E. M. JOAD—Liberty To-Day
4. MERRIAM AND BARNES—A History of Poiitical Theories.
5. J. S. MILL—Representative Government
6. BRYCE—Modern Democracies
7 LASKI—Liberty in the Modern State
8. SABINE—A History of Politial Theory.

* রবীন্দ্রনাথ-রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড পৃঃ ৬৭৯

পঞ্চম অধ্যায়

বিধান মণ্ডলীশাসিত ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

(Parliamentary and Presidential Government)

[ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতির ভিত্তিতেই এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। বিধানমণ্ডলীশাসিত সরকারে পৃথকীকরণ করা হয় নাই। এখানে শাসন বিভাগের প্রকৃত কর্তৃপক্ষ বিধানমণ্ডলীর নিকট, বিশেষ করিয়া, তাহার জননির্বাচিত কক্ষের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। ফলে, এক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলী আইন প্রণয়ন, আয়—ব্যয় নিয়ন্ত্রণ তো করেই, উপরন্তু শাসনবিভাগকে সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল: (১) ইহাতে একজন আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, (২) মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে বিধানমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীল থাকেন, (৩) বিধান-সভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয় (৪) মতের অভিন্নতা ও পারস্পরিক সহায়তার নীতির ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠিত, (৫) মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একদলের হন, সংযুক্ত মন্ত্রিসভা করিতে গেলে অন্ততঃ বাস্তব কার্যক্রম সম্বন্ধে ঐক্যমতের প্রয়োজনীয়তা আছে, (৬) মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ বিধানমণ্ডলীরও সদস্য হইবেন, (৭) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব অন্য মন্ত্রিরা মানিয়া চলেন, (৮) প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভাই বিধানমণ্ডলীর নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। মূলতঃ দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে বলিয়াই মন্ত্রিসভা বিধানমণ্ডলীর উপর নেতৃত্ব করিতে পারেন। অবশ্য বহুদল বিশিষ্ট বিধানমণ্ডলীতে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন দুঃসাধ্য ও সেখানে প্রধানতঃ বিধানমণ্ডলীই মন্ত্রিসভার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

এ ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল: (১) শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে সুশাসন সম্ভব হয়, (২) জনমতের প্রভাবও মন্ত্রিসভার উপর আরও প্রত্যক্ষরূপে পড়ে; (৩) জরুরী অবস্থায় পরিবর্তন সাধন করিয়া শাসন ব্যবস্থাকে প্রয়োজনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে; (৪) জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাও সুসাধ্য হয়। কিন্তু ইহায় প্রধান ত্রুটি হইল যে এ ব্যবস্থায় বিধানমণ্ডলীর গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং মন্ত্রিসভার স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। তাহা ছাড়া বহু রাষ্ট্রনৈতিক দলের পরিণতিতে শাসনব্যবস্থার অস্থায়িত্ব নিশ্চিত।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হইয়াছে। জননির্বাচিত রাষ্ট্রপতির উপর শাসনভার নির্দিষ্টকালের জন্য ন্যস্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে গুরুতর অপরাধ ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করা যায় না। আইনসভার নিকট তিনি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন, আইনসভার সমালোচনা তাঁহাকে সরাইতে পারে না; তিনিও আইন সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন না। তিনি যে মন্ত্রিসভা নিয়োগ করেন তাহা তাঁহার নিকট দায়িত্বশীল,—পূর্বোক্ত মন্ত্রিসভার সহিত ইহার পার্থক্য প্রচুর। এই সরকারের মূল গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব ও নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম, আবার ক্ষমতা পৃথকীকরণ সম্ভূত সর্বদোষই ইহাতে বর্তমান। উপরন্তু এ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনমনীয় এবং ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার বীজ নিহিত থাকে।]

আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। শাসন বিভাগ পরিচালনায় প্রকৃত কর্তৃপক্ষ (Real Executive) যদি আইন-সভা, বিশেষ করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষের নিকট দায়িত্ব-সম্পন্ন (Responsible) থাকেন, তাহা

হইলে তাহাকে বিধানমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary) মন্ত্রিসভা-শাসিত (Cabinet) অথবা দায়িত্বশীল (Responsible) শাসনব্যবস্থা বলা হইবে। অপরদিকে শাসন পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি যদি তাঁহার শাসনকাল (Tenure of office) এবং শাসন সংক্রান্ত নীতির (Policy) জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন না হ'ন তাহা হইলে সেরূপ শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ শ্রেণীবিভাগের মূল ভিত্তি হইল ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি: বিধানমণ্ডলী-শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হয় নাই। কারণ এক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলী শুধু আইন-প্রণয়ন বা সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়াই ক্ষান্ত নহে, শাসন-কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যকাল ও কর্মনীতিও নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। মন্ত্রিমণ্ডলী ততক্ষণই শাসন চালাইতে পারিবেন, যতক্ষণ তাঁহারা বিধানমণ্ডলীর আস্থাভাজন রহিয়াছেন, বিধানমণ্ডলী অনাস্থাপ্রকাশ করিলে তাঁহাদের কর্মভার ত্যাগ করিতে হইবে। অপরদিকে এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী বিধানমণ্ডলীর অংশ হিসাবে আইন-প্রণয়নে প্রধান-ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন সুতরাং, বিধানমণ্ডলী ও মন্ত্রিসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগের ফলে ক্ষমতার পৃথকীকরণের পরিবর্তে একীভবন ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি—শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরণই বজায় থাকে; কারণ রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকাল বা কর্মনীতির জন্য যেমন বিধানমণ্ডলীর মুখাপেক্ষী নহেন, সেরূপ বিধানমণ্ডলীর কার্যক্রমেও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাঁহার নাই। এইবার দুইটি ব্যবস্থার বিশদ আলোচনায় আসা যাক।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

বিধানমণ্ডলী-শাসিত বা মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত সরকার: বিধান-মণ্ডলী-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উপস্থিত করা হইল:

বৈশিষ্ট্য

১। এই শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ একটি নামসর্বস্ব, বা উপাধিসূচক (Titular) শাসনকর্তা থাকেন। তিনি নামে শাসক হইলেও, প্রকৃত শাসনভার অর্পিত থাকে মন্ত্রিসভার উপর। আইনের ভাষায় বলিবার বা লিখিবার সময় উল্লেখ করা হয় যে মন্ত্রিসভা প্রধান শাসকের উপদেষ্টা; কিন্তু মন্ত্রিসভার উপদেশই শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃত আদেশ, প্রধান শাসক আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া আদেশকে আইনসিদ্ধ

নামসর্বস্ব শাসক ও প্রকৃত শাসকের পার্থক্য

করেন। ইহারই বিপরীত দিক হইল যে আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধানের কোন নির্দেশই আইনসঙ্গত হইবে না যতক্ষণ না কোন মন্ত্রী তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ব্রিটেনে রাজার অবাধ শাসন-ক্ষমতা ক্রমে পার্লামেণ্টের নিকট হস্তান্তরিত হইবার সুদীর্ঘ ইতিহাসই এই ব্যবস্থার পটভূমি রচনা করিয়াছে। প্রথমে রাজা ইচ্ছামত কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়োগ করিতেন, যাহাতে তাঁহাদের উপদেশ লইয়া চলিলে সহজে তাঁহার প্রস্তাবাদিতে পার্লামেণ্টের সমর্থন লাভ করিতে পারেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া দাঁড়াইল যে রাজা তাঁহাদেরই মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করিবেন যাঁহারা পার্লামেণ্ট, তথা জন-প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ; অর্থাৎ, হাউস অব্ কমন্সের, আস্থাভাজন। এই মন্ত্রিসভার নির্দেশেই শাসন চলিবে; রাজা ইঁহাদের সমস্ত সিদ্ধান্তেই সম্মতি জানাইয়া চলিবেন; আইনতঃ তিনি ইঁহাদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না অথবা ইঁহাদের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে স্বয়ং কিছু করিবেন না। হাউস্ অব্ কমন্স্ জনতার প্রত্যক্ষ নির্বাচনে গঠিত বিধানসভা। এই ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা নিশ্চিতভাবে জনপ্রতিনিধিদের হস্তে আসিল। কিন্তু প্রায় ছয় শতের এক সভার পক্ষে শাসন পরিচালনা করা সম্ভব নহে। অল্প সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হস্তে সে দায় সমর্পন করিযা তাঁহাদের কার্যকাল ও কর্ম নীতিকে বাঁধিয়া রাখা হইল হাউস্ অব কমন্সের সমর্থনের উপর।

ব্রিটিশ ইতিহাসের পটভূমিকা

ব্রিটিশ উদাহরণের অনুকরণে পৃথিবীর নানা গণতান্ত্রিক দেশে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বৃটেনে রাষ্ট্রপ্রধান হইলেন রাজা বা রাণী। কিন্তু যে দেশে রাজতন্ত্রের জের নাই, সেখানে হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন নতুবা কানাডার মত ডোমিনিয়নে (Dominion) গভর্ণর জেনারেল মনোনীত হন। তাহা হইলে দেখা গেল যে রাষ্ট্রপতি থাকিলেই যে রাষ্ট্রশাসিত শাসনব্যবস্থা হইবে তাহা নহে; রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক বা প্রকৃত তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

নামসর্বস্ব শাসকের নানা নামে পরিচয়

প্রশ্ন উঠিতে পারে, বৃটেনে রাজাকে নামমাত্র ক্ষমতায় বসাইয়া রাখিবার ঐতিহাসিক কারণ থাকিতে পারে কিন্তু অন্য দেশে নামমাত্র শাসক খাড়া রাখিবার প্রয়োজন কি? প্রকৃতপক্ষে নামসর্বস্ব শাসক রাষ্ট্রের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ হিসাবে সর্বসমক্ষে উপস্থিত থাকেন; বহু আনুষ্ঠানিক কার্য তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হয়। ইহা

ইহার প্রয়োজনীয়তা

ছাড়াও তাঁহার অপরাপর দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনার স্থান বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণেই উপযুক্ত, এস্থলে অবান্তর ভারবৃদ্ধি করিতে পারে।

২। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ বিধানমণ্ডলীর নিকট যৌথভাবে (Collectively) ও ব্যক্তিগতভাবে (Severally) দায়িত্বশীল (Responsible) থাকিবেন। এ দায়িত্ব আইনগত (legal) ও রাষ্ট্রনীতিগত (Political), উভয়তঃই। ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এক বা একাধিক দপ্তরের (Department) দায়িত্বে থাকিবেন এবং যৌথভাবে সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায় তাঁহাদেরই। সেজন্য মন্ত্রিসভাকে অনেক সময়েই সরকার বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যৌগ ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব

দায়িত্বের অর্থ হইতেছে যে মন্ত্রিসভা আইন-প্রণয়ণের জন্য তাঁহাদের প্রস্তাব বিধানমণ্ডলীতে উপস্থিত করিবেন, আয়-ব্যয় সম্পর্কে প্রস্তাব আনয়ন করিবেন, শাসন-পরিচালনা সম্পর্কিত তাঁহাদের নীতি ব্যাখ্যা করিবেন, নীতি ও শাসন সম্পর্কে বিধানমণ্ডলীর যে কোন সদস্যের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকিবেন। যদি তাঁহাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, যদি তাঁহাদের সম্বন্ধেঅনাস্থা-সূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অবিলম্বেপদত্যাগ করিতে হইবে।

বিভাগীয় মন্ত্রিগণ স্ব স্ব বিভাগের জন্য দায়ী ও সম্মিলিতভাবে সমগ্র শাসনের জন্য দায়ী

যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল যে বিধানসভার অনাস্থা যদি কোন একটি বিশেষ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র মন্ত্রিসভাকেই পদত্যাগ করিতে হইবে; কারণ সামগ্রিক ভাবে সরকার পরিচালনার ভার এই সম্মিলিত সংস্থার উপরেই ন্যস্ত। ব্যক্তিগত দায়ের বিশেষ অর্থ হইল যে, প্রতিটি মন্ত্রিকেই নিজ দপ্তর পরিচালনা করিতে হইবে এবং বিধানমণ্ডলীতে সেই সংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যা, প্রস্তাব আনয়ন ও প্রশ্নের উত্তর দানের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কখনও কখনও এমন হইয়াছে, যে, যে ক্রটীর জন্য সমালোচনা উত্থিত হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে একটি মন্ত্রিরই। সে স্থলে যৌথদায়িত্বের নীতি প্রযুক্ত হয় না, সেই বিশেষ মন্ত্রী স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পদত্যাগ করেন এবং মন্ত্রিসভা টিকিয়া যায়। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে দায়িত্ব যে নিতান্তই সেই ব্যক্তির, সম্মিলিত নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন।

বিধানসভার অনাস্থা প্রকাশে পদত্যাগ করিতে হইবে

ব্যক্তিগত পদত্যাগ

যৌথ-দায়িত্বের নীতি হইতেই বুঝা যায় যে সমচেতনা, সমস্বার্থ ও পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই মন্ত্রিসভা গঠিত। কার্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগরূপ হইল যে বিধানমণ্ডলীতে যে কোনও মন্ত্রির বিরুদ্ধে সমালোচনা ও আক্রমণ শুরু হইলে মন্ত্রিসভার সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে তাহার প্রতিরোধ করিবেন। মন্ত্রিসভার মূলনীতিতে সকলেই ঐক্যমত জ্ঞাপন করিবেন মন্ত্রিসভার প্রতিটি প্রস্তাব সকলে সমর্থন কবিবেন। বিধানমণ্ডলীর ভিতরে বা বাহিরে জনসমক্ষে কোন মন্ত্রীই মন্ত্রিসভাব গৃহীত নীতির বিরোধী মত প্রকাশ করিবেন না। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে সকল মন্ত্রীই সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ অভিন্নমত পোষণ করেন। মতপার্থক্য থাকিতে পারে, থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মত-পার্থক্যজনিত বিসংবাদের নিষ্পত্তি করিতে হইবে মন্ত্রিসভার রুদ্ধদ্বারকক্ষের মধ্যে। বাহিরে তাহার কোনরূপ প্রকাশ থাকিতে পারিবে না। এই নীতির যুক্তি বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপর। মন্ত্রিসভাব আভ্যন্তরীণ বিরোধ বাহিরে প্রকাশ পাইলে, মন্ত্রিসভার সমর্থকগণের ঐক্য ও আস্থা উভয়ই বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।

নীতিগত অভিন্নতা ও পারস্পরিক সহায়তার নীতি

এক ও অভিন্ন নীতিকে কার্যে পারণত করিবার ভার যে মন্ত্রিসভার, স্বভাবতঃই তাহা একই দলের সদস্যবৃন্দ লইয়া গঠিত হওয়া প্রয়োজন। একই দলের সদস্য হইলে পর সমস্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলা নিবিড় হয়। অনেক সময় সংখ্যা-গরিষ্ঠতার তাগিদে একাধিক পার্টির সংযুক্ত (coalition) মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় পার্টিগুলিতে এক-কার্যক্রমে একমত হইতে হইবে। অন্যথায় শাসন পরিচালনার কার্যে অচিরেই মতবিরোধ ও ভাঙনের ভিতর দিয়া মন্ত্রিসভার পতন অনিবার্য হইয়া উঠিবে।

একদলের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠন বাঞ্ছনীয়

বিধানমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীলতার নীতি হইতেই আসে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দকে বিধানমলীর কোন না কোন কক্ষের সদস্য হইতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সম্পর্কে লিখিতে গিয়া বেজহট (Begehot)' ইহাকে পার্লামেণ্টের একটি কমিটি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিধানমণ্ডলীর কমিটি ইহাকে বলা যায় না এই কারণে যে বিধানমণ্ডলী কখনও ইহাকে নির্বাচন করে না। মন্ত্রিসভা গঠন প্রক্রিয়া হইল,—সাধারণ নির্বাচনের

মন্ত্রিসভার সদস্য বিধান-মণ্ডলীর সদস্য হইবেন

পর আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আহ্বান করেন। তিনি তখন প্রধানমন্ত্রিরূপে তাঁহার দলীয় নেতৃবৃন্দ হইতে সহযোগী বাছাই করেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান তাঁহাদের হস্তে আইনসঙ্গতভাবে শাসনভার অর্পণ করেন। ল্যাস্কি সেইজন্যই ইহাকে বিধানসভায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের একটি কমিটি (a committee of the party in power in the legislative assembly) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার অর্থে যদি ধরা হয় যে দলই নিজ ইচ্ছামত কোন 'কমিটি' বিধানসভার উপর চাপাইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে। ইহা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা সন্নিবেশিত বিধনামণ্ডলীর সদস্য লইয়া গঠিত কমিটি। এই ব্যবস্থায় বিধানগুলীব প্রাধান্যই সূচিত হইতেছে।

ইহার অপরতম নীতি হইল যে মন্ত্রিসভার উপর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব সকলে মানিয়া লইবে। তাহার অর্থ ইহা নহে যে তিনি সকলের উপর নিজের হুকুম-চালাইতে পারিবেন। বস্তুতঃ, মন্ত্রিসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতাব নীতির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকেও অন্যান্য মন্ত্রিদের মতামতের সহিত নিজেকে মানাইয়া চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রী দলের নেতা, অন্যান্য মন্ত্রিদিগকে তিনিই বাছাই করেন।

প্রধানমন্ত্রীব নেতৃত্ব

প্রয়োজন পড়িলে এবং দল ও মন্ত্রিসভার অধিকাংশের সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিলে, কোন বিশেষ মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন, তিনি পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া যাইবে, এমন কি বিধানসভা ভাঙ্গিয়া নূতন নির্বাচনের প্রশ্ন পর্যন্ত আসিয়া যাইতে পারে। উপরন্তু দেশের জনসাধারণের নিকট ও বিদেশেও তিনি শাসনব্যবস্থার প্রতীক ও প্রতিনিধি—এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিসভায় তাঁহার প্রাধান্য যে সুনিশ্চিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

এতক্ষণ পর্যন্ত বিধানমণ্ডলীর নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহারই অপর দিক হইল যে মন্ত্রিসভা প্রকৃতপক্ষে বিধানসভার নেতা। এ নেতৃত্বের জন্য দায়ী হইতেছে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সাধারণ নির্বাচনে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন হইয়াছেন। সাধারণ নির্বাচনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলিকে আইনে পরিণত করা ও কার্যে রূপায়িত করার ভারও তাঁহাদের। উপরন্তু তাঁহারাই প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা করিতেছেন। শাসন বিভাগের প্রয়োজন তাঁহারা জানেন। শাসন-বিভাগের অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য রহিয়াছে। এক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের

মন্ত্রিসভা বিধানমণ্ডলীর নায়ক

প্রস্তাব তাঁহারাই আনিবেন, আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব তাঁহারাই উপস্থিত করিবেন, শাসনব্যবস্থার নীতি প্রণয়ন করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। শুধু তাহাই নহে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে তাঁহাদের প্রস্তাবই বিধানসভায় গৃহীত হইবে। তাঁহাদের নীতিই অনুমোদিত হইবে। বিরোধীদল অবশ্যই বিরোধিতা করিবেন, বিকল্প প্রস্তাবও আনিবেন; কিন্তু মন্ত্রিসভার সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন সে প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। এক কথায়, মন্ত্রিসভার সমর্থকদল যতক্ষণ পর্যন্ত বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবে ততক্ষণ বিধানমণ্ডলীর উপর মন্ত্রিসভার অখণ্ড প্রতাপ বজায় থাকিবে।

প্রাধান্যের ভিত্তি

মন্ত্রিসভার এ প্রতাপের ভিত্তি হইল দুইটি: (১) আধুনিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় সমস্যার বাহুল্য ও জটিলতা, এবং (২) সমর্থক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা।

১। সমস্যার বাহুল্য ও জটিলতা

আধুনিক জীবনের সমস্যা প্রচুর ও জটিল; ফলে সরকারী কার্যের পরিধি অভাবিতরূপে বাড়িয়া গিয়াছে, দক্ষতা ও বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজনও বাড়িয়াছে অনুরূপ। সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতার সহিত যথোপযুক্ত মনোনিবেশ করিবার সময় বা জ্ঞান বিধানসভার নাই। সুতরাং মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

২। দলীয় শৃংখলা

দলীয় শৃংখলাও বাড়িয়াছে। মন্ত্রিসভার সমর্থকদের পক্ষে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অপরপক্ষে ভোটদান প্রায় অসম্ভব। কারণ, এরূপ কার্যের ফলে দল হইতে বহিষ্কার প্রায় নিশ্চিত, নূতন নির্বাচনের সময় দলের বিরোধিতার মুখে জয়ী হওয়া দুষ্কর; কিন্তু, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল এই যে নেতৃত্বের সহিত খুঁটিনাটি মতপার্থক্য থাকিলেও, নিজদলের মন্ত্রিসভাকে পরাজিত করিয়া বিরুদ্ধদলকে ক্ষমতায় ডাকিয়া আনিতে কেহ চাহে না। এ-অবস্থায় মন্ত্রিসভার বিধানমণ্ডলীর উপর প্রাধান্য যেরূপ নিশ্চিত, সেরূপ প্রকট।

বহুদল বিশিষ্ট বিধানসভার অবস্থার পার্থক্য

এ অবস্থায় সম্পূর্ণ পৃথক দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সব বিধানসভায় মূল দুইটি দলের পরিবর্তে বহুসংখ্যক দল জনতার প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। কিছুকাল পূর্বেও ফ্রান্সের অবস্থা এইরূপই ছিল। এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোন একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যেহেতু সংযুক্ত মন্ত্রিসভার ঐক্য ও শৃংখলার বন্ধন শিথিল, সে জন্য

ঘন ঘন মন্ত্রিসভা পরিবর্তনও অনিবার্য হয়। ফলে মন্ত্রিসভার উপর বিধানমণ্ডলীর প্রাধান্য সুনিশ্চিত হয় বটে, কিন্তু মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব থাকে না।

এইবার বিধানমণ্ডলী শাসিত বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে গুণাগুণ লইয়া কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

গুণঃ ১। এ ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল যে শাসনবিভাগ ও আইন প্রণয়ন বিভাগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেব ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন করে। ইহার ফলে বিশিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতার সহিত আইনের প্রস্তাব রচিত হয়; তাহার উপর আইনে শাসন বিভাগের অভিজ্ঞতা প্রতিবিম্বিত হয়; শাসকমণ্ডলী যে ভাবে দেশের শাসনব্যবস্থা চালাইতে চাহেন, ঠিক সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য আইন প্রণীত হয়। অর্থাৎ, শাসনব্যবস্থায় দ্বিমুখীভাব কার্য করিতেছে না; পরস্পরবিরোধী শক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণে শাসনকার্য ব্যাহত হইতেছে না। শাসনকার্যের মূল উদ্দেশ্য এক; উভয় যন্ত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মোদ্যোগের ফলে সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়, সুশাসন নিশ্চিত হয়।

শাসন-বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্মে সামঞ্জস্য : ফল—সুশাসন

২। অপরদিকে শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে বিধানসভার নিকট স্বীয় কার্যের জবাবদিহি করিতে হয়। বিধানসভায় বিরোধিতা, সমালোচনা, বক্তব্য, চিন্তা-চেতনার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে শাসনবিভাগের কার্যও বিধানসভার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবান্বিত হয়। ইহার ফলে শাসনব্যবস্থার উপরে জনমত যথেষ্ট কার্যকরী হয়।

জনমতের প্রতি দায়িত্বশীল

৩। জাতীয় প্রয়োজনের সহিত এ ব্যবস্থা অনেক সহজে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে সক্ষম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেভিল চেম্বারলেন (Neville Chamberlain)। পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচুর বিক্ষোভ প্রকাশ পাইতেছিল। প্রয়োজন ছিল, সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করা; কিন্তু লেবার পার্টি (Labour Party) চেম্বারলেনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল। চেম্বারলেন পদত্যাগ করিলেন: রাজা উইনস্টন চার্চিলকে (Winston Churchill) প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করিলেন। সংযুক্ত মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ব্রিটেন সংকট উত্তীর্ণ হইবার কার্যে প্রবৃত্ত হইল। নির্ধারিত কালের জন্য স্থিরীকৃত শাসন হইলে এইরূপ রদ-বদল হওয়া সম্ভব হইত না।

জাতীয় প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম

৪। এ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে দায়িত্ব পরিষ্কাররূপে নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জনসাধারণের পক্ষে সহজে দায়িত্ব নির্ধারণ সম্ভব, ফলে সুনির্দিষ্ট মতামত জ্ঞাপনও অধিকতর সহজ। সুতরাং, স্বীকার করিতে হয় যে ইহা গণতন্ত্রকে কার্যকরী করার উপযুক্ত ব্যবস্থা।

ক্ষমতা ও দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত.—সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

৫। শাসকমণ্ডলী বিধানসভা মারফৎ বিরোধী দলের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। ফলে শাসকমণ্ডলীর পক্ষে জনমতের সূক্ষ্ম পরিবর্তনও নির্ণয় করা ও সাড়া দেওয়া সম্ভব। জনসাধারণের পক্ষে, বিধানমণ্ডলীর উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, রাজনৈতিক শিক্ষাগ্রহণও সহজসাধ্য।

শাসন-বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্মে সামঞ্জস্য :

সমালোচনা : বিধানমণ্ডলীশাসিত সরকারের নিম্নরূপ সমালোচনা করা হয়।

১। এ ব্যবস্থায় শাসন-বিভাগ ও আইন বিভাগের পার্থক্য বজায় রাখা হয় না। ফলে, অনেকের মতে, স্বাধীনতা বিপদাপন্ন হয়। কিন্তু এ সমালোচনা ক্ষমতা পৃথকীকরণ সম্পর্কে একটা অন্ধ ভক্তি হইতে উদ্ভূত। ব্রিটেনে মন্ত্রীসভা-শাসিত সরকার; কিন্তু সেখানে সেজন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত হইয়াছে, তুলনামূলক বিচারে অন্ততঃ, সে অভিযোগ টিকিবে না।

ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি মানা হয় না

২। অনেকে বলেন যে এ অবস্থায় দলীয় কলহ ও তিক্ততা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ, পরস্পর বিরোধী দলগুলি সর্বদাই দলীয় সুবিধার কথা চিন্তা করে, দলীয় স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জিত হয়। কিন্তু এ দোষ বিধানমণ্ডলীশাসিত ব্যবস্থারই একচেটিয়া নহে; অন্য ব্যবস্থাতেও ইহা সমান গুরুত্ব অর্জন করিতে পারে।

দলীয় কলহ বৃদ্ধি পায়

৩। তৃতীয় যুক্তিটি আরও গুরুতর। তাহাতে বলা হয় যে এ ব্যবস্থায় বিধানসভা হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া মন্ত্রিসভায় আসিয়া কেন্দ্রীভূত হয়। বিধানসভা মূলতঃ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে অনুমোদনের ছাপ দিয়া পার করিয়া দেয়। বিরোধী দলের পক্ষে বিধানসভা শুধুমাত্র 'বিক্ষোভ প্রকাশের কক্ষ' (Ventilating chamber) হইয়াছে। ইহার ফলে, বস্তুতঃ 'মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব' (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার উপর

বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা হ্রাস : মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব

বিধানমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ কার্যতঃ কিছুই নাই। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকগণ কোন দল শাসন করিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, তাহার পর প্রকৃতপক্ষে সেই দলের বিধানসভাস্থ নেতৃবৃন্দ খুশিমত শাসন চালাইয়া থাকেন। সেজন্য ইহাকে কেহ কেহ 'নয়া স্বেচ্ছাতন্ত্র' (New Despotism) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার Representative Government গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন যে প্রতিনিধিত্বমূলক বহুব্যক্তিসম্বলিত সভার পক্ষে প্রত্যক্ষ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে চেষ্টা করা ভুল; এমন কি আইন প্রণয়ন করিতে যাওয়াও এ সভার উচিত নহে। ইহার প্রকৃত কর্তব্য হইল বিশেষজ্ঞদের উপর কার্যভার দিয়া তাহাদের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করা। মন্ত্রিসভার নেতৃত্বের উদ্ভবের ফলে এ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যাহত হইযাছে কিনা তাহা বিচার করা প্রয়োজন; কারণ বিশেষজ্ঞতা ও দক্ষতা যে আসিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

বিধানমণ্ডলীতে বিরোধীদলের সদস্যগণ মন্ত্রিসভার খুঁত ধরিতে, দোষত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিতে বা জনসাধারণের নিকট অপদস্থ করিবার জন্য সদাই উন্মুখ।

মন্ত্রিসভার উপর বিধানমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ

আইনসম্মত বহুবিধ সুযোগও বিধানমণ্ডলীতে রহিয়াছে। যে কোন সদস্য মন্ত্রিসভার নিকট প্রশ্ন (Question) উপস্থিত করিয়া তাহার উত্তর দাবি করিতে পারেন। উপযুক্ত উত্তর না হইলে, অতিরিক্ত প্রশ্ন (Supplementary Question) করা যাইতে পারে। বিরোধীপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মুলতুবী প্রস্তাব (Adjournment Motion) উত্থাপন করিয়া সরকারের সমালোচনা করিতে পারে। বাজেট আলোচনার সময় সাধারণভাবেই বিভিন্ন দপ্তর ও সাধারণভাবে সমগ্র মন্ত্রিসভার সমালোচনা হয়। ছাঁটাই প্রস্তাবের (Cut Motion) মারফৎ মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা যায়। সর্বোপরি সরাসরি অনাস্থা প্রস্তাব (Motion of No-Confidence) আনয়ন করিয়া মন্ত্রিসভাকে চূড়ান্ত সমালোচনার সম্মুখীন হইতে বাধ্য করা সম্ভব।

মন্ত্রিসভার নির্দেশ বিধানসভায় দলীয় সদস্যরা মানেন এ কথা ঠিক। বিরোধী পক্ষের সমালোচনায়ও তাঁহারা প্রত্যক্ষতঃ মত পরিবর্তন করেন না। কিন্তু এ আলোচনা ও সমালোচনা দেশের জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া যায়। আজ ইচ্ছামত শাসন চালাইলেও, কিছুদিন পরে আবার নির্বাচনের জন্য সাধারণের ভোটপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাহা ছাড়া, বিধানসভার উপনির্বাচনের মারফৎ জনমতের আবহাওয়ার নির্দেশ মিলে। উপরন্তু নিজ দলের যে সদস্যগণ

বিধানমণ্ডলীর অভ্যন্তরে বাধ্য সন্তানের ন্যায় 'ভোট' দিয়া যাইবে, দলীয়সভায় তাহারাই আবার আসন্ন নির্বাচনে পরাজয়ের আশংকায় তিক্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হইলে, দলে ভাঙ্গন ঘটা ও নূতন নায়ক নির্বাচনও অসম্ভব নহে। সুতরাং বিধানমণ্ডলীর নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতার নীতির ফলেই, বিধানসভা প্রত্যক্ষতঃ না হউক, পরোক্ষভাবে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। একনায়কত্বের অভিযোগ যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না।*

দুর্বল শাসন

৪। একাধিক লোকের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা দ্বারা শাসন পরিচালিত হয় বলিয়া অনেকের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিলম্বিত হয়, অন্তর্বিরোধের ফলে সিদ্ধান্তকে সুচারুরূপে কার্যে পরিণত করা যায় না। বিশেষ করিয়া জরুরী অবস্থাতেই এই দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠে।

ব্রিটেনের অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় জরুরী অবস্থাতেও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই; সংযুক্ত মন্ত্রিসভা হওয়া সত্ত্বেও, অর্থাৎ বহু মৌলিক বিষয়ে গুরুতর মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, জাতির সম্মুখে সাফল্যের সহিত ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব উপস্থাপিত করিয়াছে।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় অস্থায়ী শাসন

৫। বিধানসভায় বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের ফলে যে গুরুতর অসুবিধা দেখা দেয় তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার নিশ্চয়ই ত্রুটিহীন নহে। কিন্তু ইহার সুবিধা ও কার্যকারীতার জন্যই, ব্রিটেনে ঐতিহাসিক ঘটনার যোগাযোগে সন্তর্পণে ও ধীরে যে ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই আজ পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুসৃত হইতেছে।

গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শর্তগুলি স্বভাবতঃই বিধানমণ্ডলী শাসিত সরকার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কিন্তু যে

বিধানমণ্ডলী শাসিত সরকারের সাফল্যের পূর্বশর্ত

তিনটি বিষয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে নিম্নরূপ: ১। ভোটের অধিকারের বিস্তার, ২। বাক্ স্বাধীনতা ও সংগঠনের স্বাধীনতা ও ৩। দলপ্রথার যথোপযুক্ত বিকাশ।

১। সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার থাকিলে পর মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যাবলী

* "The function of the House of Commons is, therefore, not to control the Government, but to act as a forum of outside opinion".

—Jennings—Cabinet Government. P, 19

জনসাধারণের ইচ্ছাকে সম্মুখে রাখিয়া পরিচালিত হইবে। বিত্তশালী ও অভিজাতদের ক্ষমতা বণ্টন ও উপদলীয় কলহের আসরে পর্যবসিত হইবে না। ২। দ্বিতীয়তঃ বাক্‌স্বাধীনতা ও সংগঠনের স্বাধীনতা মন্ত্রিসভাকে প্রকৃতপক্ষে জনমতের প্রতি কর্ণপাত করিতে ও অবস্থাবিশেষে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য করিবে। ৩। উপরন্তু সুগঠিত একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকা অপরিহার্য। কারণ তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীসভা গঠন করিতে এবং বিরোধী দল বিকল্প শক্তি হিসাবে কার্য করিতে পারিবে। পূর্বেই লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, মন্ত্রিসভার সমর্থক দলের সহায়তায় মন্ত্রিমণ্ডলী প্রচণ্ড ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। এ অবস্থায় বিধানমণ্ডলীতে ক্রমাগত তাহাদের সমালোচনা করিয়া এবং জনসাধারণে প্রচার করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যায় আচরণ বিরোধী দল প্রতিহত করিতে পারে। আবার সুনিশ্চিত ও স্থায়ী সরকারের প্রয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং প্রযোজনীয় বিরোধিতার তাগিদে সংখ্যালঘু দল, উভয়েরই সুগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

সাধারণভাবে ফ্রান্স ও বৃটেনের তুলনামূলক বিচারে বলা হইয়া থাকে যে, দ্বিদলপ্রথাই বাঞ্ছনীয়; কারণ, বহুদলের ফলে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। যদিও এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দুরূহ। কারণ, দুইদল সবসময়ে প্রকৃত জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে না। অনেক সময় জনমতের বহু অংশ এই প্রথার চাপে বিনষ্ট হয়; কখনও বা দুই দল কার্যতঃ বহুদলের আবাসস্থল হইয়া দাঁড়ায়। তাহা ছাড়া সর্বত্র ফরমায়েশ করিয়া দুই দল গড়া সম্ভব নয়। সুতরাং একাধিক দলের মিলিত (coalition) মন্ত্রিসভা ও মিলিত বিরোধী বিধানমণ্ডলীর শক্তি সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা ও বিচারের প্রয়োজন রহিয়াছে। মোটামুটি জনসাধারণের বাছাইয়ের জন্য দুইটি বিপরীত কার্যক্রম ও দলীয় সমাবেশের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

বিরোধী দলের রাজনৈতিক গুরুত্ব বাস্তব ও কার্যকরী রূপ পাইতে পারে একমাত্র সহনশীলতার ভিত্তিতে অর্থাৎ, মন্ত্রিমণ্ডলী ও সংখ্যাগুরু দলকেসমালোচনা করিবার পূর্ণ সুযোগ বিরোধী দলকে দান করিতে হইবে; জনমত গঠনের অবকাশ দিতে হইবে; সমালোচনামাত্রই যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা দেশদ্রোহিতা নয় তাহা বুঝিয়া চলিতে হইবে। বিরোধীদলকে বুঝিতে হইবে যে, সংখ্যাগুরু দলের মন্ত্রিসভাই শাসন করিবে। শাসন বানচাল করিবার মনোভাব লইয়া প্রতিপদে বিরোধিতা করিলে এ ব্যবস্থা অচল হইয়া যাইবে। অপরপক্ষে, ভবিষ্যতে

তাহাদেরও মন্ত্রিসভার দায়িত্ব লইতে হইতে পারে এ চিন্তা মাথায় রাখিয়া অত্যন্ত দায়িত্বশীলভাবে সমালোচনা করিতে হইবে।

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রকৃতই সকলের নিকট হইতেই দায়িত্বশীলতা দাবি করে।

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার (Presidential form of Government): পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার গঠিত হয় মূলতঃ ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির ভিত্তিতে। শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের কার্য সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াই এ ব্যবস্থার উৎপত্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি এইবার বিচার করা যাক:

বৈশিষ্ট্য

১। রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের সকল ক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পন করা হয়।

জননির্বাচিত রাষ্ট্রপতির উপর শাসনভার

২। তিনি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন। ইহার ফলে একদিকে জনসমর্থন হইতে উদ্ভূত মর্যাদা ও শক্তির তিনি অধিকারী হন, অপর দিকে বিধানমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত না হওয়ার ফলে বিধানমণ্ডলীর সহিত বাধ্যবাধকতার সম্পর্কও থাকে না। সুতরাং আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

শাসনকাল নির্দিষ্ট

৩। একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য তাঁহার নির্বাচন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চার বৎসর পদাধিকারী থাকেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে কার্যনীতির ব্যর্থতা, অক্ষমতা বা অযোগ্যতার জন্য অপসারিত করা যাইবে না। মস্তিষ্কবিকৃতি প্রমাণ হইলে, অথবা রাষ্ট্রদ্রোহিতার গুরুতর অপরাধে বিশেষ বিচারপদ্ধতির (Impeachment) মারফত রাষ্ট্রপতির অপসারণ সম্ভব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৯ সালে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রপতি অপসারিত হন নাই।

৪। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নহেন; এবং

আইনসভা তাঁহাকে অথবা, তিনি আইনসভাকে বাধিতে পারেন না

৫। আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। ফলে আইনসভায় যতই সমালোচনা হউক না কেন, এমন কি, তাঁহার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করিলেও, তিনি পদত্যাগ করিবেন না।

৬। তিনি আইনসভায় প্রত্যক্ষভাবে বা কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মারফত আইন প্রণয়নের প্রস্তাব আনিতে পারেন না। তিনি

অবশ্য বাণী প্রেরণের মারফত প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু সেগুলি আইন-সভার প্রস্তাব নহে। সেই অনুযায়ী চলা বা না-চলা সম্পূর্ণ আইনসভার ইচ্ছাধীন।

৭। তিনি বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ কর্মচারী নিয়োগ করেন। সাধারণতঃ ইহারাও মন্ত্রী নামে পরিচিত হন এবং ইহাদের মিলিতভাবে মন্ত্রিসভা নামেই অভিহিত করা হয়। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, এ মন্ত্রিসভার সহিত পূর্বাংশে বর্ণিত মন্ত্রিসভার মৌলিক প্রভেদ রহিয়াছে। নিম্নে সেই পার্থক্যগুলি উল্লিখিত হইল :

রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভা

(ক) রাষ্ট্রপতিশাসনে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ মূলতঃ তাঁহার কর্মচারী। তিনি তাঁহাদের নিয়োগ করেন এবং ইচ্ছামত তাঁহাদের বরখাস্ত করিতে পারেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত বা যৌথ উপদেশ গ্রহণ করা বা না-করা তাঁহার ইচ্ছাধীন।

ইহার বৈশিষ্ট্য

মন্ত্রিসভা শাসনে যদিও প্রধানমন্ত্রীই অন্যান্য মন্ত্রিদের বাছাই করেন, তথাপি ব্যাপারটি সম্পূর্ণই তাঁহার পছন্দের উপর নির্ভর করে না। দলের মধ্যে এমন কিছু বড় নেতা থাকেন, যাঁহাদের বাদ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। উপরন্তু মন্ত্রিসভার ভিতরে প্রধানমন্ত্রীর অনস্বীকার্য প্রাধান্য থাকিলেও, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। প্রধানমন্ত্রীকে বিধানসভার দলীয় ঐক্য বজায় রাখিবার খাতিরে দলীয় নেতাদের পরামর্শ লইয়াই চলিতে হয়।

(খ) রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিগণের সহিত বিধানমণ্ডলীর সম্পর্ক নাই; তাঁহাদের দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট। অপরক্ষেত্রে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(গ) রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ মতৈক্য অপরিহার্য নহে। বস্তুতঃ যৌথ-দায়িত্বের নীতি ও শৃংখলা তাঁহাদের উপর বর্তায় না; তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। শাসনকার্যের সকল দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির, বিধানমণ্ডলী-শাসিত ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার যৌথ ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব রহিয়াছে।

গুণাগুণ : ১। গুণের দিক হইতে প্রথমে বলা হয় যে, ক্ষমতার পৃথকী-করণের ফলে, স্বাধীনতা নিরাপদ হয়। এ যুক্তির আলোচনা পূর্বেই হইয়াছে, পুনরুক্তি অবান্তর।

গুণ

২। শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব নিশ্চিত ও নিরাপদ হয়। রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকাল জানেন; এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে পারেন। মন্ত্রিশাসিত সরকারে বিধানসভার অনাস্থা প্রকাশের ফলে বিতাড়িত হইবার আশংকা থাকিয়াই যায়, বিশেষ করিয়া যদি বহু দলের প্রাধান্য থাকে।

৩। শাসন-নীতির মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বিরাজ করে। রাষ্ট্রনৈতিক খেয়ালের দমকা হাওয়ায় তাহা নিরন্তর পরিবর্তিত হয় না।

৪। যেহেতু এক ব্যক্তির শাসন, সেজন্য যথেষ্ট দ্রুততা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত শাসননীতি কার্যকরী হইবার সুযোগ থাকে।

৫। অনেকের মতে বহুদলীয় বিধানমণ্ডলীতে রাষ্ট্রপতি-শাসনই বাঞ্ছনীয়। কারণ, তাহাতে শাসন-ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আসিবে।

ত্রুটি: ১। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রধান ত্রুটি হইল ইহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবিভাগজনিত দুর্বলতা। কারণ, আইন ব্যতীত শাসন হয় না। কিন্তু সেই আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রপতির অধিকার নাই। বরং আইনসভা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রমান করিবার জন্যই রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব না মানিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী চলিবে; রাষ্ট্রপতির নীতি উপযুক্ত আইনের অভাবে, উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দের অভাবে পদে পদে ব্যাহত হইবে। অপরদিকে আইনসভা শাসন বিভাগের প্রয়োজন, কার্যক্রম বা চিন্তাধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত থাকিবে না। ফলে, জাতীয় প্রয়োজন সব সময়ে সুচারুরূপে আইনের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইবে না। উপরন্তু যোগাযোগের অভাবে, শাসনবিভাগ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশে ও অযথা সমালোচনায় বিধানসভার যথেষ্ট মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটিবে। উপরন্তু, রাষ্ট্রপতির দল ও বিধানমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি পৃথক হয়, তবে একে অপরের বিরুদ্ধে চলিয়া শাসন-ব্যবস্থার সমূহ ক্ষতিসাধন করিবে।

ক্ষমতা পৃথকীকরণের ত্রুটি: দুর্বল সরকার

২। ফলে, দায়িত্ব নির্ণয়েও যথেষ্ট অসুবিধা থাকিবে। পারস্পরিক দোষারোপের ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ান হইবে।

দায়িত্ব নির্ণয়ে অসুবিধা

৩। বিধানমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকার ফলে রাষ্ট্রপতির মধ্যে স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা

৪। নির্বাচনের পরে রাষ্ট্রপতির অযোগ্যতা প্রমাণিত হইলে পরেও, নির্দিষ্ট কালের মধ্যে তাঁহার অসাধারণ অসম্ভব। ফলে, গুরুতর সংকটের সম্মুখে শাসনব্যবস্থার যথাযোগ্য পরিবর্তন সাধন করার সুযোগ নাই, সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।'

অনমনীয় ব্যবস্থা

৫। বিধানমণ্ডলী-শাসিত ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভায় যাঁহারা স্থান পান, তাঁহারা

দীর্ঘকাল যাবৎ বিধানমণ্ডলীতে শিক্ষানবীশী করিয়া যোগ্যতা প্রমাণিত করেন। একযোগে কার্যসম্পাদন করা, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দায়িত্ব হইতে বৃহত্তর দায়িত্বভার গ্রহণ করার, মন্ত্রীরা সুযোগ পাইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি-শাসনে মন্ত্রিসভার ঐক্য ও অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য সৃষ্টি হইবার বিশেষ সুযোগ থাকে না।

মন্ত্রিসভার ঐক্য ও অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য এখানে অনুপস্থিত

তুলনামূলক বিচারে মন্ত্রিসভাশাসিত সরকার অপেক্ষা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার যে দুর্বল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ক্ষমতা পৃথকীকরণের এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সেতু নির্মাণের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সেখানে রাষ্ট্রপতি বিধানমণ্ডলীতে বাণীপ্রেরণের মাধ্যমে, বিধানমণ্ডলীতে দলীয় সদস্যদের মারফত, নানাভাবে অনুগ্রহ (Patronage) বিতরণ করিয়া, আইন বাতিল করিবার (Veto) সীমাবদ্ধ অধিকার প্রয়োগের ভয় দেখাইয়া এবং সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট জাতীয় প্রয়োজনের আবেদন উপস্থিত করিয়া, আইনবিভাগের উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। জাতীয় সংকটের মুহূর্তে আইনবিভাগ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব যে অনুসরণ করে তাহার জলন্ত উদাহরণ দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সময় যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি উইলসন (President Wilson) এবং রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের (President Roosevelt) ব্যাপক কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব বিস্তারের মধ্যে দেখা গিয়াছে। সেইজন্য কেহ কেহ বলেন যে, দুইটি বিভিন্ন ব্যবস্থায় সমতা আজ পার্থক্যের ন্যায় সমান গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে।*

* "Nevertheless it is true that the similarities between the two systems are now at least as significant as their differences"
—Lipson—The Great Issues of Politics—P- 292

অতিরিক্ত পাঠ

GARNER—Political Science and Government.
LASKI—Grammar of Politics.

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রতত্ত্ব

(Federalism)

[যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মূলনীতি হইল যে, শাসনক্ষমতা কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া, যাহাতে কেন্দ্র ও অঙ্গ-রাজ্যগুলি স্ব স্ব এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রে স্বাধীন ও প্রধান—একে অপরের এক্তিয়ারের মধ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। এই বিচার হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়: কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যে দুই স্তরের সরকার গঠিত হইবে: উভয়ের মধ্যে শাসনক্ষমতা নির্দিষ্টভাবে ভাগ করা থাকিবে; কেহ কাহারও অধীন নহে; বণ্টন করা হইবে শাসনতন্ত্র মারফত, যাহা লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে; শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি সর্বোচ্চ বিচারশালা থাকিবে এবং সে বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তই প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র; অঙ্গরাজ্যগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নহে এবং নাগরিকগণ এই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জানায়।

যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ, সেখানে সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রসমবায়ের সহিত তাহার পার্থক্য মূলতঃ এইস্থলে যে, রাষ্ট্রসমবায় কতকগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমষ্টি, যুক্তরাষ্ট্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। প্রকৃত রাষ্ট্রবন্ধন ও ব্যক্তিগত রাষ্ট্রবন্ধনও মূলতঃ একাধিক রাষ্ট্রের জোট। মৈত্রীবন্ধন বা জাতিসংঘ তো প্রকাশতঃই এক রাষ্ট্র নহে। অধ্যাপক হুয়্যার 'আধা-যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া একটি বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এইজন্য যে, বিশেষক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি প্রধান না হইলেও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকে এই নামে অভিহিত করা যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাফল্যের পিছনে এই ব্যবস্থা বজায় রাখিবার কামনা ও ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। ঐক্যের জন্য কামনার পশ্চাতে রহিয়াছে—শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনের সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক সুবিধা প্রভৃতি। অনুরূপ পৃথক থাকিবার ইচ্ছার জন্য দায়ী অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা, অতীত ইতিহাস, জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য প্রভৃতি। আবার ইচ্ছা হইতেই শক্তি আসে; কর্মক্ষমতা সৃষ্টি হয় অতীত কর্মের ইতিহাস হইতে। শুধু তাহাই নহে, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন ও কর্মক্ষম করিতে হইলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাগত সামঞ্জস্য, ভৌগোলিক উপযুক্ত সংস্থান, ইত্যাদি থাকা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল গুণ হইল,—ইহা জাতীয় ঐক্যের সহিত অঙ্গরাজ্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম। সরকারের সহিত জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুফল কুড়ানো সম্ভব। পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ বেশী। দোষ হইল—অর্থ, সময় ও শক্তির প্রচুর অপব্যয় জড়িত রহিয়াছে এই ব্যবস্থায়; ইহা আধুনিক কেন্দ্রিকতার প্রবণতার বিরুদ্ধে; শাসন ও অধিকারের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য, অসংলগ্নতা ও বিভ্রান্তি ঘটায়।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র আজিকার জগৎ হইতে বিলীন হইয়া যাইবে বলিয়া মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য হইল যে, এখানে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র এক্ষেত্রে অপরিহার্য নহে।

সুবিধা হইল: শাসনব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী, একই নীতি ও শাসনতন্ত্র সমগ্র দেশের উপর প্রযুক্ত হয়, সংঘর্ষ ও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা হইতে মুক্ত এবং অপচয় কম। অসুবিধা আছে প্রচুর; যথা—আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের গণতান্ত্রিক অধিকার এক্ষেত্রে অস্বীকৃত, জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাবে শাসন ত্রুটিপূর্ণ হওয়া ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশী।

যুক্তরাষ্ট্র হইল একটি বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থা। সুতরাং এই ধরনটি বুঝিতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম অনুসন্ধান করিতে হইবে শাসনক্ষমতার অবস্থান কোননীতির ভিত্তিতে নির্দেশিত হইয়াছে (How power is located) এবং সেই নীতি বজায় রাখিবার জন্য সরকারী যন্ত্রটিকেই বা কি ভাবে গড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

শাসনক্ষমতার অবস্থান

বিষয়টি বুঝিতে পারা কঠিন নয়। কারণ, ইতিপূর্বে আমরা বিধানমণ্ডলীশাসিত ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের নীতিগত ও গঠনমূলক পার্থক্য লইয়া আলোচনা করিয়াছি। সে ক্ষেত্রে দেখিয়াছি আইনবিভাগ ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত অথবা পৃথক করিয়া বণ্টিত এই নীতির ভিত্তিতেই শাসনব্যবস্থাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেশাসনক্ষমতার অবস্থানের প্রশ্নটি ভিন্ন নীতির ভিত্তিতে উপস্থাপিত করা হইতেছে। এস্থলে প্রশ্ন হইল, শাসনক্ষমতা কি একটিমাত্র কেন্দ্রেই কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে অথবা নীতিগতভাবে একটি কেন্দ্র ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র কাহাকে বলে? যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল শাসনক্ষমতাকে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়-যাহাতে সকলের স্বার্থ যে-সব বিষয়গুলিতে জড়িত তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে, এবং অন্যান্য বিষয়গুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারের দায়িত্বভুক্ত রাখা হয়; উভয় পর্যায়ের সরকার নিজ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে কার্য করিবার ব্যাপারে স্বাধীন ও স্ব-প্রধান; কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, কেহ কাহারও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্র সংজ্ঞা

অধ্যাপক হুয়্যার (Prof. Wheare) বলিতেছেন: 'যুক্তরাষ্ট্রের নীতি বলিতে আমি বুঝাইতে চাই ক্ষমতা বটনের সেই পদ্ধতি—যাহাতে সাধারণ সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৃত্তের মধ্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র (By the federal principle I mean the method of dividing powers so that the general and regional governments are each, within a sphere, co-ordinate and independent.)' *ডাইসি বলিতেছেন: যুক্তরাষ্ট্রতত্ত্ব বলিতে

* K. C. Wheare Federal Government. P. 11.

বুঝায়, কেহ কাহারও অধীন নহে, এমন কতকগুলি অঙ্গের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতার বণ্টন ব্যবস্থা, যাহাতে প্রত্যেকের ক্ষমতার উৎস ও নিয়ামক হইল শাসনতন্ত্র ("Federalism means the distribution of the force of the state among a number of co-ordinate bodies, each originating in and controlled by the constitution.")*

দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন: প্রথমতঃ, এক্ষেত্রে শাসনক্ষমতার স্থানিক বণ্টনের কথা বলা হইতেছে ; দ্বিতীয়তঃ, নিজ নিজ কর্তব্য-ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় সরকার বা আঞ্চলিক সরকার, বা অঙ্গরাজ্য, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী বা অধীন নহে। এই মৌলিক নীতি হইতে যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাহা নিম্নে আলোচিত হইল :

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

১। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পাশাপাশি দুই স্তরের সরকার দেখা যাইবে,—প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার (Federal, Government) এবং দ্বিতীয়তঃ, আঞ্চলিক সরকার বা অঙ্গরাজ্য সরকার (State Government)।

২। এই দুই স্তরের সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতার নিখুঁত বণ্টন আবশ্যক।

কেহ কাহারও অধীন নহে

৩। বণ্টন এমনভাবেই করা হইবে যাহাতে দুই স্তরের সরকারই নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, কেহ কাহারও অধীন থাকিবে না। কেহ অপরের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

৪। এই উভয় স্তরের সরকার মিলাইয়া কিন্তু **একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে** বুঝিতে হইবে। ভাষান্তরে বলিলে—একই রাষ্ট্রের একটি অখণ্ড সার্বভৌমত্বের আত্মপ্রকাশ দুই স্তরের সরকারের ভিতর দিয়া ঘটিয়াছে। বিষয়টি আরও জটিল বলিয়া মনে হয় এইজন্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যত্রও, আঞ্চলিক সরকারগুলিকে 'state' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র

পরিষ্কার বুঝিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা এই আঞ্চলিক সরকারগুলির নাই, তাহাদের কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। তথাপি 'state' বলা হয় প্রধানতঃ ঐতিহাসিক কারণে। উত্তর-আমেরিকায় একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে যুক্ত হইয়া 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করিবার পূর্বে অঙ্গরাজ্যগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই ছিল, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সময়ে তাহারা প্রাক্তন মর্যাদাবোধকে বজায় রাখিতে চাহিয়াছিল।

* A. V. Dicey, Law of the Constitution, P. 153.

দ্বিতীয়তঃ, অঙ্গরাজ্যগুলির পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্বপ্রদানও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। এই দ্বিতীয় যুক্তিতেই ভারতের মত অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রতে 'state' শব্দটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র যে এক অখণ্ড সার্বভৌমিকতাসম্পন্ন রাষ্ট্র, তাহা বারবার জোরের সহিত উল্লেখ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, অনেক সময়েই বলা হয় যে, অঙ্গরাজ্যগুলি নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে চরমক্ষমতাসম্পন্ন (Sovereign); এমন কি সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে ক্যাণ্টনগুলির (Cantons) অর্থাৎ অঙ্গরাজ্যগুলির, সার্বভৌমত্বের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু 'সার্বভৌমত্ব' শব্দটি তাহার প্রকৃত অর্থে এসকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। নিজ এক্তিয়ারে অপরের হস্তক্ষেপের যে কোন অধিকার নাই তাহাই বিশেষ গুরুত্বের সহিত বুঝাইবার নিমিত্ত 'সার্বভৌমত্ব' শব্দটির ব্যবহার।

৫। নাগরিকগণের সহিত কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক, উভয় সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকার প্রশ্ন উঠে না। এক কথায়, প্রত্যেক নাগরিকই এক অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সেই হিসাবেই উভয় সরকারের সহিত তাহার সম্পর্ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকত্বের (Dual citizenship) উল্লেখ দ্বারা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নাগরিক দায় ও অধিকারে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

উভয় সরকারের নাগরিকদের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ

৬। উভয় সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন যে নির্দিষ্ট ও স্থায়ী, তাহা সুনিশ্চিত করিবার জন্য বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত এমন এক শাসনতন্ত্রের মারফত, যাহা উভয়স্তরের সরকারেরই একক আয়ত্তাধীন নহে, যাহার স্থান উভয়েরই ঊর্ধ্বে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যের কথা বলা হইয়া থাকে। এইজন্যই ডাইসি তাঁহার সংজ্ঞায় শাসনতন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য

৭। বণ্টন-ব্যবস্থা যাহাতে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট হইতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্র লিখিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৮। শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্ব সূচিত করিবার জন্য সেটি দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) হওয়া প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, পরিবর্তন-পদ্ধতি এমন হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে পরিবর্তন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার বা শুধুমাত্র রাজ্যসরকারগুলির ইচ্ছাধীন

শাসনতন্ত্র :
(১) লিখিত

না হয়। ক্ষমতার বণ্টন যেভাবে হইয়াছে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন কারতে গেলে উভয় তরফের সম্মতি প্রয়োজন। অন্যথায়, কেহ কাহারও অধীন নহে, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার এই যে মূল নীতি, তাহাই খণ্ডিত হইবে।

(২) দুষ্পরিবর্তনীয়

৯। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া মতবিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার নিষ্পত্তি করিবার জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী এক নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী প্রয়োজন। ইঁহারা উভয় সরকারের কাহারও কর্তৃত্বাধীন হইবেন না। ইঁহাদের ভাষ্যই বাধ্যতামূলক হইবে।

সর্বোচ্চ বিচারকমণ্ডলী

ক্ষমতা বণ্টনে প্রকার ভেদ: যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দিবে একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এ বণ্টনের ভিতর দিয়া দুই স্তরের সরকারের মধ্যে কাহাকে অধিক শক্তিশালী করা হইবে, তাহা বলা হয় নাই। সাধারণভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সমগ্র জাতির স্বার্থ-জড়িত যে সব বিষয়গুলি যেমন, যুদ্ধ-শান্তি, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি কেন্দ্রের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তালিকার পার্থক্যের ভিতর দিয়া কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের আপেক্ষিক শক্তির হের ফের করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রের শাসনাধীন বিষয়গুলিকে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, অবশিষ্ট সব কিছুই অঙ্গরাজ্যের দায়িত্বে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কানাডার ব্যবস্থা বিপরীত। সেখানে অঙ্গরাজ্যের কর্মভার তালিকাভুক্ত করিয়া, বাকি সমস্ত কেন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধরা হইত যে অবশিষ্টাংশ (Residuary powers) যাহার ভাগ্যে পড়িবে সেই অধিক শক্তিশালী হইবে। কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব নহে। কারণ, যেরূপ তালিকা দেওয়া হইল তাহার উপরই সবকিছু নির্ভর করিতেছে।

ক্ষমতাবণ্টনের ভিন্নপদ্ধতিতে গঠিত সরকারের সহিত পার্থক্য:

১। **এককেন্দ্রিক সরকার** (Unitary Government): এককেন্দ্রিক সরকার হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ বিপরীত। এককেন্দ্রিক সরকারে সমগ্র শাসনক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রে সমাবিষ্ট; সমগ্র ভূখণ্ডের উপর ইহার আইনগত প্রাধান্য অবাধ ও চরম। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা বিভক্ত, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত; এককেন্দ্রিক সরকারেও আঞ্চলিক সরকার থাকিতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে

এককেন্দ্রিক সরকারে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত

আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতা নিতান্তই কেন্দ্রের দান,—কেন্দ্র ইচ্ছামত আইনের দ্বারা সে ক্ষমতা বাড়াইতে, কমাইতে বা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিতে পারে।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নানা স্তরের মিলন ও সমাবেশ হইয়া আসিতেছে। এ স্থলে তাহার গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণগুলির উল্লেখ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন।

২। রাষ্ট্রসমবায় (Confederation): রাষ্ট্রসমবায় গঠনের মূলনীতি হইল—এখানকার কেন্দ্রীয় সংগঠন আঞ্চলিক সরকারগুলির মুখাপেক্ষী থাকে। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রসমবায় একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রই নহে। ইহা কতকগুলি রাষ্ট্রের সমাবেশ মাত্র। তথাপি, ইহা মৈত্রীবন্ধনমাত্র (Alliance) নহে; কারণ ইহার একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে—যাহার মাধ্যমে সংযোগী রাষ্ট্রগুলির মিলিত ইচ্ছা প্রকাশ পায়, সংগঠনের কিছুটা স্থায়িত্ব থাকে এবং উদ্দেশ্যও কিছুটা বিস্তৃত হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও ইহা বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমষ্টি, ইহাতে প্রত্যেকটি সংযোগী রাষ্ট্রের আন্ত-র্জাতিক স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সহিত নাগরিকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না; আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে-কোন কার্যের জন্যই বিভিন্ন সংযোগী রাষ্ট্রের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রস্তাব কার্যকরী হইবে কি না তাহা নিতান্তই সংযোগী রাষ্ট্রগুলির অনুমোদন সাপেক্ষ ও ইচ্ছাধীন। রাষ্ট্রসমবায় কখনও কিছুটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিলেও, সংযোগী রাষ্ট্রগুলি যে কোন সময়ে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা গেল, এককেন্দ্রিক সরকারে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, আঞ্চলিক সরকার থাকিলেও তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল; যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক সরকার স্ব স্ব প্রধান—কেহ কাহারও উপর নির্ভরশীল নহে। রাষ্ট্রসমবায়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংগঠন সংযোগী আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির উপর একান্তই নির্ভরশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রসমবায়ের পার্থক্য নিম্নরূপ:

১। যুক্তরাষ্ট্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র; রাষ্ট্রসমবায় মূলতঃ অনেক রাষ্ট্রের সমাবেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্র-সমবায়ের পার্থক্য

২। যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি হইল শাসনতান্ত্রিক আইন; রাষ্ট্রসমবায়ের ভিত্তি হইল পারস্পরিক চুক্তি।

৩। যুক্তরাষ্ট্রে উভয় সরকারই আপন ক্ষেত্রে স্বপ্রধান; রাষ্ট্রসসমবায়ে সংযোগী রাষ্ট্রগুলি প্রধান।

৪। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত নাগরিকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ

রাষ্ট্রসমবায়ে কেন্দ্রীয় সংগঠন সংযোগী রাষ্ট্রগুলির মারফতে নাগরিকদের নিকট পৌঁছিতে পারে,—নাগরিকগণ শুধু যে-যাহার নিজস্ব রাষ্ট্রের নাগরিক।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের এক রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি; রাষ্ট্রসমবায়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সীমাবদ্ধ স্বীকৃতি থাকিলেও প্রত্যেকটি সংযোগী রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বীকৃতি পায়।*

৬। যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোন অঙ্গরাজ্যের বাহির হইয়া যাইবার আইনসঙ্গত অধিকার নাই; ** রাষ্ট্রসমবায়ে আছে।

৭। যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী; তুলনায় রাষ্ট্রসমবায় অস্থায়ী।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মৈত্রীবন্ধন (alliance), সন্ধিবন্ধন (league), জাতিসংঘের (League of Nations) বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations Organisation) পার্থক্য সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এক্ষেত্রে তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ব্যক্তিগত বন্ধন (Personal Union) **ও প্রকৃত রাষ্ট্রবন্ধন** (Real Union)**:** যুক্তরাষ্ট্রের বিষয় আলোচনাকালে আরও দুই প্রকারের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ প্রয়োজন। ব্যক্তিগত রাষ্ট্রবন্ধন বলা হয় যখন উত্তরাধিকার, যুদ্ধ প্রভৃতির ফলে দুইটি স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা একই নৃপতির অধীনে চালু থাকে; যেমন—ইংলণ্ড ও হ্যানোভার ছিল একই রাজ্যেব অধীন অথবা বেলজিয়ামের রাজার ব্যক্তিগত শাসনাধীন ছিল কঙ্গো। এক্ষেত্রে দুইটি রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র সত্তা; **একাধিক রাষ্ট্রের একই রাজার** শাসনাধীনে থাকার আইনগত কোন প্রভাব ছিল না। এমন কি **দুইটি রাষ্ট্র** পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত করিতে পারিত। প্রকৃত রাষ্ট্র-বন্ধনের ক্ষেত্রে একই রাজার শাসনে একাধিক রাষ্ট্র থাকিলেও ইহার আন্তর্জাতিক সত্তা একটি। ইহার উৎপত্তিও আইনসম্মত চুক্তি মারফত। ইহাদের পারস্পরিক যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইবে। পূর্বে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারির মধ্যে এইরূপ সম্পর্ক ছিল। এই শাসন-ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া মনে হইলেও, অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইহাকে আন্তর্জাতিক সত্তাসম্পন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমষ্টি বলিয়াই মনে করেন।

আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Quasi-federal)**:** অধ্যাপক হুয়্যার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য করেন। কারণ, তাঁহার মতে, দেশের লিখিত শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিগুলি নিবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না।

* সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে।

** সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে।

তাহা তো জরুরী বটেই; কিন্তু কোন্ ব্যবস্থা কার্যকরী হইতেছে তাহার ভিত্তিতেই প্রকৃত শ্রেণী নির্ণয় করা সম্ভব। অর্থাৎ এমন হইতে পারে যে, সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে নীতিগুলি সঠিকভাবে পালিত হয়। এই বিচারেই, অধ্যাপক হুয়্যার বলিতেছেন, যে সব শাসনতন্ত্র ও শাসন-ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রনীতি প্রধান না হইলেও যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন সেগুলিকে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অথবা আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলিয়া অভিহিত করা বাঞ্ছনীয়।*

অধ্যাপক হুয়্যারের মতে **যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির নিরিখে কতকগুলি শাসনতন্ত্রের বিচার**ঃ

১। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র**ঃ যে অনমনীয় সংজ্ঞা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই ইতিহাসে প্রথম যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা উচিত। একটি মাত্র ত্রুটি ছিল যে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর উচ্চতর কক্ষের, অর্থাৎ সিনেটের, সদস্যবৃন্দ অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। তাহার ফলে, কেন্দ্রীয় আইনসভা যেন কিছুটা রাজ্য আইনসভার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। কিন্তু বিষয়টি তুলনামূলকভাবে গৌণ। উপরন্তু এ ব্যবস্থাও ১৯১৪ সালের সংশোধনী মারফত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২। **অষ্ট্রেলিয়াতে** পুরাদস্তুর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বজায় আছে।

৩। **সুইজারল্যাণ্ডের** শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহের দুইটি সূত্র রহিয়াছে। (ক) কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন ক্যাণ্টনের (অঙ্গরাজ্য) যে দুজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তাঁহাদের মাহিনা প্রদত্ত হয় নিজ নিজ ক্যাণ্টন সরকার দ্বারা; উপরন্তু তাঁহাদের কার্যকাল ও নির্বাচন পদ্ধতি ক্যাণ্টন সরকারগুলি নির্ধারিত করিয়া দেয়। কিন্তু এ বিষয়টি গৌণ, বিশেষ করিয়া এ কারণে যে—কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। (খ) সুইজারল্যাণ্ডের কোন কেন্দ্রীয় আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা কোন বিচারশালার নাই, যদিও ক্যাণ্টনের আইনকে ঐ প্রথায় বাতিল করিবার অধিকার বিচারশালার আছে। কিন্তু এ বাধা সত্ত্বেও যেহেতু সুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে অতি সুনির্দিষ্টরূপে লিখিত এবং

* And finally I have thought it important to find a name for those constitutions or governments in which the federal principle, though not predominant, is not the less important, and these I have called Quasi-federal constitutions and Quasi-federal governments. Wheare Ibid. P. 33

গণভোটের ব্যবস্থাদ্বারা কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সেহেতু ইহাকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা নাই।

৪। **ক্যানাডার** গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর হস্তে কোন প্রদেশ কর্তৃক প্রণীত স্ব-এক্তিয়ারভুক্ত আইনকেও বাতিল করিয়া দিবার অধিকার রহিয়াছে। উপরন্তু, কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলী প্রদেশের আনুষ্ঠানিক রাজ্য-প্রধান, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরকে নিয়োগ করেন। প্রদেশ আইনসভা প্রণীত কোন খসড়া- আইনকে না-মঞ্জুর করিতে, অথবা কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর সম্মতির জন্য সংরক্ষিত রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্ণরকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং অনুরূপ সংরক্ষিত খসড়া-আইনকে শেষপর্যন্ত না-মঞ্জুর করিতে পারেন। তাহা ছাড়া কেন্দ্র হইতেই, সমস্ত উচ্চতর বিচারালয়ের বিচারকবৃন্দের নিয়োগ হইয়া থাকে। এগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রিক নীতির অনুপ্রবেশ এবং এই কারণেই অধ্যাপক হুয়ার ক্যানাডার শাসনতন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় না বলিয়া আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিবার পক্ষপাতী।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ক্যানাডায় প্রদেশগুলিতে বিধানমণ্ডলীশাসিত শাসনব্যবস্থা বর্তমান; প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগের ব্যাপারেও সরকার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই। শাসনতন্ত্র যেমন হউক, প্রথাগত দিক হইতে এবং বাস্তব কার্যক্ষেত্রে, অধ্যাপক হুয়্যার মনে করেন, ক্যানাডার শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

অধ্যাপক হুয়্যারের বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের তালিকা এই চারিটিতেই নিঃশেষ হইয়া গেল। ভারতীয় ইউনিয়ন এবং সোবিয়েত ইউনিয়নকে তিনি আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়া মনে করেন।

এই সূত্রে অধ্যাপক হুয়্যার যে সাবধানবাণী দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, যে বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই অনুযায়ী প্রতিটি শাসনতন্ত্র ও সরকারের বিচার হইবে। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা একটা আদর্শ; ইহার নীতি কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হইলে তাহা তথাকার শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার পরিচায়ক। বস্তুতঃ যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা একটি আদর্শ নহে, পদ্ধতিমাত্র; কোথায় কতখানি, এ নীতি ব্যবহৃত হইবে, তাহা বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে।*

* "All this concentration on the federal principle may give the impression that I regard it a kind of end or good in itself and that any deviation from it in law or in practice is a weakness or a defect in a system of government. This is not my view...Federal Government is not always and

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন অথবা সাফল্যের পূর্বশর্ত
(Prerequisites or conditions of success of federation):

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে পারা যাইবে কিনা, অথবা প্রবর্তিত হইলেও তাহা সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতে পারিবে কিনা, তাহা নির্ভর করিতেছে কতকগুলি বাস্তব অবস্থার উপর। সেগুলি বিচার করিতে গেলে প্রথমেই মিলের বিখ্যাত মানদণ্ড ব্যবহার করা প্রয়োজন; অর্থাৎ, (ক) এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বর্তমান কিনা, এবং (খ) ইহা কার্যকরী করিবার ক্ষমতা আছে কিনা।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের ইচ্ছার অর্থ

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছার অর্থ হইতেছে যে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ও ক্ষমতার সহিত আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতার মিশ্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইচ্ছা। ডাইসির ভাষায়,—"যুক্তরাষ্ট্র হইল জাতীয় ঐক্যের সহিত অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা (A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of 'state rights)"*। হুয়্যারের মত,—"তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে চাহিবে, কিন্তু এককেন্দ্রিক হইতে চাহিবে না (They must desire to be united, but not to be unitary)।"** স্ট্রং বলিতেছেন—"যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়াস হইতেছে জাতীয় সার্বভৌমত্বের সহিত অঙ্গরাজ্যের সার্বভৌমত্বের দৃশ্যতঃ অসমঞ্জস দাবীর সামঞ্জস্য সাধন করা (A federal constitution attempts to reconcile the apparently irreconcilable claims of national sovereignty and state sovereignty.)"***

(১) কেন্দ্রীয় শাসন
(২) আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য

এই সামঞ্জস্য বিধানের **শাসনতান্ত্রিক কৌশল** কি তাহা লইয়া আমরা প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি। এবার কোন্ উৎস হইতে এই বাসনা উত্থিত হইতেছে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

---

everywhere good government. It is only at the most a means to good government, not a good in itself—Whether federal government should be adopted at all, and if so, to what extent, are questions the answer to which depends on the circumstances of the case"
—K. C. Wheare—Federal Government p. 33-34

* Dicey, Ibid, p. 39
** Wheare, Ibid. p. 36
*** Strong. Modern Poltical Constitutions. p. 99

বিভিন্ন কারণে জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হইতে চায়।

ঐক্যের ইচ্ছার উৎস

১। সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণ হইতে যথোপযুক্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনঃ—ঐক্য হইতে শক্তি বৃদ্ধি পায়।

২। ঐক্যের ফলে অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়ে।

৩। অতীত রাষ্ট্রনৈতিক যোগাযোগ ঐক্যের প্রেরণা যোগায়।

৪। ভৌগোলিক সন্নিবদ্ধতা অপরতম কারণ।

৫। অনুরূপ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

৬। বাস্তব রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের ইচ্ছাকে বর্ধিত ও সংযত করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছার কারণগুলি নিম্নরূপ :

স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছার সূত্র

১। অতীতে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধীন রাষ্ট্রজীবনের ইতিহাস।

২। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের পার্থক্য।

৩। নদী, পর্বত, প্রভৃতির বিশেষ অবস্থানের ফলে অঙ্গরাজ্যগুলির ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য।

৪। জাতীয় জনসমাজ (nationality) হিসাবে পার্থক্য।

৫। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত প্রভেদ।

৬। বাস্তব নেতৃত্বের মনোভাব।

এ স্থলে একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ প্রয়োজন। উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণগুলির কোন্-কোন্‌টির যোগফলের ভিতর দিয়া যে একটি বিশেষ যুক্তরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা বলা কঠিন। তবে যে কোন ক্ষেত্রেই বাস্তব রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপ অবস্থা সত্ত্বেও এক দেশ এককেন্দ্রিকতার পথ ধরিল, আবার দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল,—এরূপ উদাহরণ রহিয়াছে।

যোগ্যতার সূত্র

এইবার যোগ্যতার সূত্রগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক।

১। ঐক্যের দৃঢ় ইচ্ছা থাকিলে ঐক্যবদ্ধ থাকিবার যোগ্যতাও জন্মগ্রহণ করে।

২। এক-জাতীয়তাবোধ ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রেরণা উৎপাদন করে।

৩। রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন মারফত ব্রিটিশ সরকার যখন প্রস্তাব করে যে যুক্তরাষ্ট্রীয়

সরকারের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও স্বেচ্ছাতান্ত্রিক দেশীয় রাজ্যগুলি মর্যাদাসম্পন্ন হইবে, ভারতীয় জনমত তাহা প্রত্যাখ্যান করে। নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইবার পূর্বেই ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাতন্ত্রশাসিত দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। প্রতিটি রাজ্যেই মন্ত্রিপরিষদীয় শাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একনায়কতন্ত্র বা স্বেচ্ছাতন্ত্রের সহিত একই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহ-অবস্থান অসম্ভব।

৪। সামাজিক ব্যবস্থাও অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। গৃহযুদ্ধের পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, আব্রাহাম লিংকন্ (Abraham Lincoln) বলিয়াছিলেন: "আমি বিশ্বাস করি, এ সরকার অর্ধ-দাস অর্ধ-স্বাধীনরূপে দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণত হয় একটি নয় অপরটিতে পর্যবসিত হইবে"।*

৪। অতীতে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে শাসন-পরিচালনার অভিজ্ঞতা ইহার ক্ষমতাকে অনেকাংশে নিশ্চিত করিবে।

৫। রাজ্যগুলির ভৌগলিক বিস্তৃত, জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক দিয়া অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। মিল্ বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি একটি রাজ্য সমধিক শক্তিশালী হয় তবে সে অন্যান্যের উপর কর্তৃত্ব করিবে। যদি দুইটি অধিক শক্তিশালী রাজ্য থাকে, তবে তাহারা একজোট হইলে অন্যদের দাবাইয়া রাখিবে। বিবাদে মাতিলে গৃহযুদ্ধ বাধাইবে। তবে ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, রাজ্য হিসাবে শক্তির পার্থক্য থাকে বলিয়াই, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তা সকল রাজ্য দাবি করে।

৭। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুক্তরাষ্ট্রে দুই সরকার পরিচালনা করিতে যে পরিমাণ অর্থবল ও লোকবলের প্রয়োজন, তাহার অভাব ঘটিলে যুক্তরাষ্ট্র টিকিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণাগুণ:

গুণ

১। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম ও প্রধান সুবিধা এই যে এই ব্যবস্থায় কতকগুলি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও সামরিক ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হইতে পারে, স্বাধীনতা নিশ্চিত করিতে পারে।

২। কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিমুখ উভয় প্রকার শক্তির মধ্যে ভারসাম্য এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই বজায় থাকিতে পারে; স্থানীয় আইনের পাশাপাশি দেশব্যাপী প্রয়োজনীয় বিষয়ে এক ধরণের আইন ও শাসন চলিতে পারে।

---

* I belive this Government cannot endure permanently half-slave and half free......It will become all one thing or all the other—Quoted by Wheare. Ibid. P. 48

৩। নানাবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকে।

৪। সুতরাং বিশাল ভূখণ্ডে, অথবা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেও যদি জনসাধারণ নানাপ্রকার ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক পার্থক্যের দ্বারা বিভক্ত হয় তাহা হইলে, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

৫। আঞ্চলিক স্বাধীন বিকাশের সুযোগ হইতে জনসাধারণ রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়।

৬। আঞ্চলিক অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে আঞ্চলিক সরকার অনেক বেশী অবহিত থাকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে। ফলে, সুশাসনের সুযোগ ও সম্ভাবনা পড়িয়া যায় এবং শাসন ব্যবস্থায় আমলতন্ত্রের প্রাধান্যও কম থাকে।

৭। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাজের চাপ কম হওয়াতে সেখানেও শাসন সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে।

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের অভ্যুত্থান ঘটাব সম্ভাবনা কম।

ত্রুটি ঃ ১। ইহা ব্যয়বহুল ব্যবস্থা।

২। দুই স্তরের শাসনব্যবস্থা চালাইবার জন্য প্রচুর সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় হয়।

৩। অর্থনীতি শিল্প-বিজ্ঞান, সামাজিক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় একীকরণ ব্যাহত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিলে যুক্তরাষ্ট্রনীতির মধ্যে যে অযৌক্তিক সংস্কারের প্রাধান্য রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।*

৪। ব্যক্তিগত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক সময়েই অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি ঘটিতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইনের বৈচিত্র্যের ফলে যেরূপ ঘটিয়াছে।

৫। আইনের বৈচিত্র্য, অধিকার ও এক্তিয়ারগত সমস্যার ফলে, মামলা মকদ্দমা লাগিয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ (Prospect of federalism : দীর্ঘকাল হইতেই বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিবার একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া কাজ করিতে দেখা গিয়াছে। অর্থসংক্রান্ত বিষয়েই এ প্রক্রিয়ার সর্ববৃহৎ নিদর্শন মিলিবে। সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, কেন্দ্রীয় সরকারের হস্ত

* "From this point of view federalism is a premium on the irrational in finance, area and personnel,—"—Dr. Finer, Theory end Practice of Modern Government—P. 185

প্রভৃত শক্তিশালী করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শাসনতন্ত্রের ১৪ নং ১৬ নং ও ১৮নং সংশোধনীর দ্বারা এবং বিচারবিভাগীয় ভাষ্যের মাধ্যমে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

ইহার কারণ বোঝা দুঃসাধ্য নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরীক্ষা সাম্প্রতিক। কেন্দ্রের হস্তে যখন যুদ্ধ-শান্তি, পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে, তখন অভিজ্ঞতার শিক্ষা হইতে কেন্দ্রকে প্রয়োজনানুযায়ী শক্তিশালী করিলে, তাহাতে অস্বাভাবিক বা অপরাধনীয় কিছু আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। বিশেষতঃ, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যধারা এবং বিজ্ঞান ও শিল্পকৌশলগত অগ্রগতির ফল অনিবার্যভাবেই রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শক্তির বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কারণ, অর্থনৈতিক সংকটকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খুচরা কর্মপদ্ধতি মারফৎ ঠেকাইয়া রাখা যায় না, দেশব্যাপী সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস প্রয়োজন। সাফল্যের সহিত সমরাভিজান পরিচালনা সন্দেহাতীতরূপেই কেন্দ্রীয় কর্মোদ্যোগের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংকট প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা বা অধিকারের শত্রু; সুতরাং সেগুলি যে 'অঙ্গরাজ্যীয় অধিকারকে' সংকুচিত করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু তাহার উপরেও আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের যেরূপ অগ্রগতি ঘটিয়াছে, শিল্পকৌশল যেরূপে প্রসারিত হইয়াছে এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি নানা বিষয়ে কল্যাণমূলক ব্যবস্থার আগ্রহ যে প্রকার বাড়িয়াছে, তাহাতে অধিকতর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কর্মোদ্যোগ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া পিছাইয়া দেওয়া যায় না। সাম্প্রতিককালের ঘটনা এবং ইহার গতি প্রকৃতি আকস্মিক দুর্যোগমাত্র নহে; ইহা নূতনতর সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার দাবি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কি বর্জিত হইতে চলিয়াছে?

কোন কোন লেখকের তাহাই মত। সেইট (Sait) বলেন: "মৈত্রীবন্ধন হইতে, রাষ্ট্র-সমবায়, রাষ্ট্র-সমবায় হইতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ একীককরণ,—এইরূপ নিম্নতম পর্যায় হইতে উচ্চতর সংগঠনের পথে রাষ্ট্রসমূহ অগ্রসর হইতে থাকে।"* লিপসনের মতে: "এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা অথবা যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের অধিকার প্রভৃতি প্রাচীন বিকেন্দ্রীকরণের কৌশল ও

* States move forward from alliance to confederacy, from confederacy to 'federation, from federation to complete union' that is from lower to higher forms.

পদ্ধতি বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও শিল্পবিজ্ঞানের অবক্ষয়ী অম্লরসে মিলাইয়া যাইতে বাধ্য।"*

তথাপি এই কথার উপরেই আলোচনার পরিসমাপ্তি টানা চলেনা: সত্যই, সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়াছে; কিন্তু পাশাপাশি রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতাও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়াছে। আসলে সরকারী কার্যভার সম্পর্কেই ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। রাজ্যসরকারগুলির কর্মপরিধিই শুধু বিস্তৃত হয় নাই, তাহাদের আত্মসচেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ অনেক বেশী সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে রাজ্যসরকারগুলি স্বকীয় অধিকার ও এক্তিয়ার অনেক বেশী সাবধানতার সহিত প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। তাহা ছাড়া ভুলিলে চলিবেনা যে,—যে সকল কারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আদিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বর্তমান যুগে সেকারণগুলি অপসৃত হইয়া যায় নাই। ক্যানাডার কুইবেক (Quebec), অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণী রাজ্যগুলি, অথবা সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও শাসনাধিকার বিসর্জন দিয়া একটি বৃহৎ এককেন্দ্রিক শাসনে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিতেছে,—এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থা ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম। সেই বৈচিত্র্যের বিকাশের সমস্যা কি বর্তমান পৃথিবী হইতে দূর হইয়া গিয়াছে? আপন ইচ্ছামত আপন পথে আত্মবিকাশের আদর্শ কি মানুষ পরিত্যাগ করিল? বড় সমস্য ইহাই যে, বৃহৎ ঐক্যের মধ্যেই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষকে যথাসম্ভব এড়াইয়া প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য বৈচিত্র্যকে বজায় রাখার পথ মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। এই সামঞ্জস্য বিধানের আদর্শের অনুসন্ধানে যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা অন্যতম পন্থা। ইহা একমাত্র পথ নহে সত্য; কিন্তু কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় ইহা স্বীয় কার্যকারিতা প্রমাণ করিয়াছে। সেই বিশেষ অবস্থা যতদিন টিঁকিয়া থাকিবে, ততদিন এ ব্যবস্থা বর্জিত হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government): পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যেখানে একটিমাত্র কেন্দ্রে সর্বাধিক শাসনক্ষমতা ও শাসনকর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত থাকে তাহাকে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা বলা হয়। এখানে যে সমস্ত আঞ্চলিক

* **Older patterns of decentralisation—whether in the form of local autonomy under a military system or of states, rights in a federal union—were doomed to dissolve in the corrosive acids of twentieth century politics, economics and technology.—Leslie Lipson. The Great Issues of politics p. 315**

শাসনব্যবস্থা থাকে তাহাদের ক্ষমতার উৎস হইল কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও সিদ্ধান্ত, শাসনতান্ত্রিক আইন নহে। তাহা হইলে, এককেন্দ্রিক সরকারের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্যগুলি নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে:

১। এককেন্দ্রিক শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা বিভক্ত।

এককেন্দ্রিক সরকারের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য

২। ফলে, এককেন্দ্রিক শাসনে যে-সব আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী থাকে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের আইন ও নির্দেশের উপর নির্ভরশীল; কেন্দ্র ইচ্ছামত তাহাদের ক্ষমতা বাড়াইতে, কমাইতে, অথবা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দিতে সক্ষম; যুক্তরাষ্ট্রে কেহ কাহারও উপর নির্ভরশীল নহে; একে অপরের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

৩। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত বা অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রকে লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে হইবে।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে পার্থক্য

এককেন্দ্রিক সরকার হইলেও আঞ্চলিক সরকারের উপর কেন্দ্রের বাস্তব কর্তৃত্বের চরিত্র দেশভেদে বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন—ইংলণ্ডে আঞ্চলিক সরকারগুলি নিতান্ত পার্লামেণ্ট-সৃষ্ট হইলেও, তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস দীর্ঘ। কিন্তু ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় সরকারের ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারের হস্তে শাসন-ক্ষমতা সমর্পণ করা হইলেও, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী প্রত্যক্ষ এবং আঞ্চলিক শাসনবিভাগীয় কর্মচারীরা অধিকাংশই কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত।

এক-কেন্দ্রিক সরকারের গুণাগুণ: যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের চরিত্র বিপরীতধর্মী হওয়ার ফলে, একের দোষ অপরের গুণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ নিম্নরূপ।

গুণ

১। শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, এককেন্দ্রিক সরকার স্বভাবতঃই শক্তিশালী হয়। রাজ্যসরকারের অধিকারের দ্বারা ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়; মতামত গ্রহণ করিবার আইনগত দায় নাই; মামলা-মকদ্দমার আশংকা নাই। একটি নির্দিষ্ট পথে শাসন পরিচালনায় ক্ষমতা বিভাজন-জনিত কোন বাধা নাই।

২। একই নীতি ও একই ধরণের আইন সমগ্র দেশের উপর প্রযুক্ত হইবার

ফলে শাসনবিভাগের কার্যপদ্ধতি সহজ, দ্রুত ও ফলপ্রসূ হয়। আধুনিক যুগে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এই ব্যবস্থায় নিশ্চিত হইতে পারে।

৩। পরস্পর-বিরোধী আইন ও কর্মনীতির সম্ভাবনা হইতে এ ব্যবস্থা মুক্ত।

৪। দুই পর্যায়ের শাসনব্যবস্থা না থাকার ফলে, অনেকের মতে, অর্থের অপচয়-সম্ভাবনা কম।

নিম্নে এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটির তালিকা লিপিবদ্ধ করা হইল :

ত্রুটি

১। ইহার মূল ত্রুটি হইল, ইহা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ হইতেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থিত হইয়াছে। এককেন্দ্রিক সরকারে নীতির দিক হইতেই এ অধিকার বর্জিত হইয়াছে।

২। নীতির প্রশ্ন ছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক প্রয়োজন, আঞ্চলিক সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত থাকা দুষ্কর ; ইচ্ছা থাকিলেও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে মন দিবার মত পর্যাপ্ত সময় না থাকিতে পারে। ফলে, শাসন কুশাসনে পরিণত হইবার আশঙ্কা প্রচুর।

৩। সমস্ত শাসন একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিলে, শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের প্রভাব ও প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।

৪। ডাঃ গার্ণার বলেন : "এ ব্যবস্থা স্থানীয় উদ্যম দমিত করিতে প্রয়াস পায় রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ বৃদ্ধি না করিয়া নিরুৎসাহ করে, আঞ্চলিক সরকারের জীবনীশক্তি হ্রাস করে এবং এক-কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের বৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দেয়।"*

যেখানে জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রভেদ বিশেষ নাই এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনে ঐতিহ্য দুর্বল, এরূপ ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক জগতের মূল গতি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও শাসনকার্য সম্পর্কে কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। আবার এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক সরকারের উপর যে বহু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, তাহাও লক্ষ্য করা গেল। প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাতিগ

*...it tends to repress local initiative, discourages rather than stimulates interest in public affairs, impairs the vitality of the Local Governments and facilitates the development of a centralised bureaucracy.

GARNER—Political Science and Government—P. 416.

এই উভয় শক্তিরই ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রতিটি সরকারেই দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা এই উভয়শক্তির ক্রিয়াকে কোন একটি পর্যায়ে নির্দিষ্ট করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হইবে কি না তাহা নির্ভর করিতেছে বাস্তব পরিস্থিতি জনসমাজের চেতনা ও নেতৃত্বের প্রচেষ্টার উপর।

অতিরিক্ত পাঠ

A. V. Dicey—Law of the Constitution

K. C. WHEARE—Federal Government.

GARNER—Political Science and Government.

LASKI—Grammar of Politics.

FINER—Theory and Practice of Modern Government.

C. F. Strang—Modern Political Constitutions.

সপ্তম অধ্যায়

আইন বিভাগ

(The Legislature)

[রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করার দায়িত্ব হইল আইনবিভাগের। শাসনব্যবস্থার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় আইনবিভাগের গুরুত্ব অধিক। কারণ আইনের মারফত শাসন চলে এবং সেই আইন প্রণয়ন করে শাসন বিভাগ। উপরন্তু রাষ্ট্রীয় অর্থবরাদ্দের ভারও আইনবিভাগের উপর। উপরন্তু বিধানমণ্ডলীশাসিত সরকার শাসনবিভাগের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। সর্বক্ষেত্রেই আইনসভার আলোচনা ও সমালোচনা শাসনকার্যকে প্রভাবিত করে।

আইন-প্রণয়ন এবং অনুরূপ কার্য ছাড়াও আইনসভাকে নির্বাচনী, প্রশাসনিক, বিচারসম্পর্কীয় প্রভৃতি, নানা দায়িত্ব পালন করিতে হয়।

আইনসভা অতীতে শুরু হইয়াছিল রাজাকে পরামর্শ দানের জন্য একটি আলোচনাসভারূপে (Parliament) পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় আইনসভায়।

আইনসভার সংগঠন কিরূপ হইবে তাহা লইয়া বিতর্ক রহিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিযা বিভিন্ন দেশে দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। কোথাও বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাজসম্মানের দাবিতে, কোথাও জনসাধারণের ভোটে নির্বাচনের মারফত, কোথাও শাসনবিভাগের মনোনয়নের দ্বারা, কোথাও বা পরোক্ষ নির্বাচন বা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনিক সভার দ্বারা নির্বাচনের ভিত্তিতে উচ্চপরিষদ গঠিত হয়।

উচ্চপরিষদ থাকার সপক্ষে যুক্তি হইল: নিম্নকক্ষের হঠকারিতা, স্বৈরাচার প্রবণতা সংযত হইবে: আইন দোষমুক্ত হইবে: বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব হইবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইবে।

ইহার বিপক্ষে যুক্তি অনেক। অ-গণতান্ত্রিকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, দায়িত্বহীনতা, কালহরণ, ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতি বহু অভিযোগ উচ্চ কক্ষের বিরুদ্ধে আনা হইয়াছে। তথাপি ইহার ব্যাপক অস্তিত্ব অন্তর্লীন শক্তির প্রমাণ দেয়।

আইনসভার ক্ষমতার বিচারে ডাইসি সার্বভৌম ও অসার্বভৌম আইনসভার মধ্যে পার্থক্য করেন। যে আইনসভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তাহা যদি শাসনতান্ত্রিক সীমাও হয়, তাহা হইলেতাহাকেই তিনি অসার্বভৌম বলিয়া অভিহিত করেন। বৃটিশ পার্লামেন্টের মত যে আইনসভার ক্ষমতা অসীম, যাহার আইন সকল বিচারশালাই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে বাধ্য,—তাহা হইল সার্বভৌম আইনসভা।]

শাসনব্যবস্থায় আইনসভার আপেক্ষিক গুরুত্বের কারণ

রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করার ভার হইল আইন বিভাগের; ইহাকে কার্যকরী করিবে শাসনবিভাগ। সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আইনবিভাগের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। একঅর্থে ইহাকে সমগ্র শাসনের নিয়ামক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যকরী করিবার পূর্বে সেই ইচ্ছাটি যে কী তাহা আইনসভার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে; দ্বিতীয়ত:, কোন কোন শাসন-যন্ত্রের

মারফত, কিভাবে এই ইচ্ছা কার্যকরী হইবে, তাহাও আইনসভাই স্থিব করিবে, তৃতীয়তঃ, ইহারই আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে, রাষ্ট্রেব আয়-ব্যায়ের চাবিকাঠিও আইনসভারই হস্তে। সর্বোপরি, আইনসভায় সর্বদাই শাসনকার্য সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা শাসনবিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং আইনসভার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উপরন্তু বিধানমণ্ডলী-শাসিত শাসনব্যবস্থা হইলে শাসনবিভাগ প্রত্যক্ষরূপে আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। যদি এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা হয়, তবে আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা বিধানমণ্ডলীর নির্দেশের উপর সম্পূর্ণ নিভবশীল হয়। সুপরিবর্তিত হইতে পারে ; ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলীর দ্বাবাই শাসনতন্ত্র সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারে , দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রেও বিধানমণ্ডলীর শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

বিশেষ অবস্থায় গুরুত্ব বৃদ্ধি

সর্বত্রই বিধানমণ্ডলীর কার্যক্রম শুধু আইন প্রণয়নের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে না ; নির্বাচনী· প্রশাসনিক বা বিচারসম্পর্কিত দায়িত্বও ইহাকে বহন করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ অবস্থায় কংগ্রেসের নিম্নকক্ষকে রাষ্ট্রপতি ও উচ্চতর কক্ষকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে হইতে পারে। অনেক রাষ্ট্রেই আইনসভাগুলিব ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সুইজারল্যাণ্ডের বিধানমণ্ডলী শুধু কার্যকরী পরিষদের (Fxecutive Council) সদস্যবৃন্দই নহে, বিচারপতি' চ্যান্সেলার (Chancellor) এবং সৈন্যাধক্ষ্যও নির্বাচন করে।

অন্যান্য কার্যভাব

নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর কক্ষ বা সিনেটের রাষ্ট্রপতি কতৃক নিয়োগে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপনের অধিকার আছে ; রাষ্ট্রপতি বিদেশের সহিত যে সকল চুক্তি করেন, তাহাতেও সিনেটের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

প্রশাসনিক

ইংলণ্ডের উচ্চতর কক্ষ (House of Lords) দেশের সর্বোচ্চ আপীল আদালত (Hizhest Court of Appeal)। যে সকল রাষ্ট্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গুরুতর অপরাধে বিশেষ বিচারের (Impeachment) ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেখানে সাধারণতঃ নিম্নতর কক্ষ হইতে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং উচ্চতর কক্ষ বিচার করে।

বিচারবিভাগীয়

ইহার উপরেও জনমত প্রকাশের স্থান হইল এই বিধানমণ্ডলী। শুধু সদস্যদের মাধ্যমেই নহে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসাধারণকর্তৃক আবেদনাদি

বিধানমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হয়। ইহার বিশিষ্ট কমিটিগুলির সম্মুখে অনেক সময়েই বিভিন্ন স্বার্থ-সম্পন্ন গোষ্ঠীর মুখপাত্রগণ এজাহার দিয়া থাকেন।

বিবিধ

সামন্ততান্ত্রিক যুগে বিধানমণ্ডলীর অস্তিত্ব ছিল না। রাজা কখনও কখনও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিবৃন্দকে ডাকিতেন পরামর্শ বা উপদেশের জন্য। প্রতিনিধিরা আসিতেন বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে—জাতীয় ঐক্যের চেতনা তখন ছিল না। প্রতিনিধিরা সাধারণতঃ বিভক্ত হইতেন তিন ভাগে,—অভিজাতবৃন্দ, ধর্মীয় প্রতিনিধিবৃন্দ ও সাধারণের প্রতিনিধিবৃন্দ। তৃতীয় বিভাগে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য নাগরিকগণ স্থান পাইতেন। ইহারা তখন আইন প্রণয়ন করিতেন না—কারণ সার্বভৌম নৃপতির রাজত্বের যুগে আইন প্রণয়নের সকল ক্ষমতা রাজার হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ রাজার নিকট আবেদন-নিবেদন করিতেন; গ্রাহ্য হইলে সেইগুলি আইনেব রূপ পাইত। পরবর্তী পর্যায়ে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট নিজেই বক্তব্যকে আইন হিসাবে প্রস্তুত করিয়া সম্মতির জন্য রাজার নিকট প্রেরণ করিত। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই অর্ডিন্যান্স" (Ordinance) হিসাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজার ছিল। প্রাথমিক যুগে প্রতিনিধিত্ব যে খুব আইন-মাফিক হইত তাহা নহে। রাজকর্মচারীরা অনেকটা নিজেদের পছন্দমত লোক বাছাই করিয়া রাজদরবারে হাজির করিত। অপর দিকে. অভিজাতবৃন্দ সাধারণের সহিত একসাথে পরামর্শ সভায় বসিতে আপত্তি করার ফলে. ইংলণ্ডে রাজার এই পরামর্শসভা মূলতঃ অভিজাত-আবাস (House of Lords) ও সাধারণ-আবাস (House of Commons) এই দুই ভাগে বিভক্তির গোড়াপত্তন হয়। ফ্রান্সে পরের যুগে অভিজাত, ধর্মীয় ও সাধারণের এই তিনটি পর্যায়ের সমমূল্যসম্বলিত তিনটি সভা গড়িয়া উঠিতে থাক। ইংলণ্ডে ক্ষমতার লড়াইয়ে রাজা আত্মসমর্পণ করেন। অভিজাতবৃন্দ দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইয়া ও নানাবিধ বোঝাপড়ার ভিতর দিয়া নিজস্ব ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তচ্যুত হইতে দিয়াছে। ফ্রান্সে তৎকালীন রাজা, অভিজাতবৃন্দ ও ধর্মীয় প্রধানদের অদূরদর্শিতা অবিমৃষ্যকারিতার পরিণামে বিপ্লবের মধ্য দিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্যকে তাঁহারা উৎখাত হইয়া যাইতে দেন। পরে আইনসভার পুনর্গঠনের সময়ে সামাজিক শক্তিনিচয় বিধানমণ্ডলীর নিম্নতর ও উচ্চতর এই দুই কক্ষের ভিতর দিয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। মূলতঃ

বিধানমণ্ডলীর সূত্রপাত

প্রাথমিক পর্যায়ে পরামর্শ সভা, এবং পরে আইন প্রণয়নের ক্ষমতায় অধিকারী বিধানমণ্ডলীরূপে আত্মপ্রকাশ,—ইহাই হইল বিভিন্ন দেশে আইন-বিভাগের বিবর্তনের ধারা। অবশ্য দেশীয় ইতিহাসভেদে বিধানমণ্ডলীর আকৃতি ও প্রকৃতির প্রকারভেদ আছে। ইহার সহিত স্মরণীয় যে, প্রাচীনতম নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ-সম্পন্ন বিধানমণ্ডলী হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রভাব প্রায় সর্বত্রই পড়িয়াছে।

এক-পরিষদীয় অথবা দ্বি-পরিষদীয় বিধানমণ্ডলী (Unicam•ral or Bicameral Lagislature) :

বিধানমণ্ডলীর সংগঠন কিরূপ হইবে—এক পরিষদ বিশিষ্ট অথবা দুইটি পরিষদে বিভক্তরূপে? ইহাব তত্ত্বগত বিচারে প্রবৃত্ত হইবাব পূর্বে স্বীকাব করিতে হইবে যে, পৃথিবীর প্রায সর্বত্রই দ্বিপরিষদীয় বিধানমণ্ডলী রহিয়াছে। নিম্নকক্ষ সর্বত্রই জনসাধারণের ভোটে বিভিন্ন নির্বাচনীকেন্দ্র হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। দ্বিতীয় বা উচ্চতর কক্ষের সংগঠন দেশভেদে বিভিন্ন নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন দেশে দ্বিতীয় পরিষদের সংগঠনে প্রযুক্ত সংগঠনিক নীতিগুলি নিম্নে বর্ণিত হল :

উচ্চতরকক্ষের সংগঠননীতি

ইংলণ্ডের উচ্চতর কক্ষ বা House of Lords উত্তরাধিকার নীতির ভিত্তিতেই প্রধানতঃ সংগঠিত। উপযুক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণ সকলেই এ সভার সদস্য। তাঁহাদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তির সহিত উপাধি লাভ করিলে লর্ড-সভার সভ্য হইতে পারে। অবশ্য সামান্য কয়েকজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞকে উপাধি দান করিয়া লর্ডসভার সদস্য করা হয়। ইঁহারা জীবৎকালীন সদস্য থাকেন; ইহাদের উপাধি উত্তরাধিকারীতে বার্তায় না। বিচার সম্পর্কিত দায়িত্ব ইহাদের উপরেই ন্যস্ত থাকে।

উত্তরাধিকারের দাবি

জনসাধারণের ভোটে নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নতর কক্ষ যে জনতা কর্তৃক নির্বাচিত, উচ্চতর কক্ষ বা Senate-এর সদস্যগণও তাহাদের দ্বারাই নির্বাচিত হন। তবে, এক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি স্বতন্ত্র। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য হইতে দুজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন। ইহাদের কার্যকাল দীর্ঘতর সময়ের জন্য। ফলে, দুই কক্ষের ভোটদাতা এক হওয়া সত্ত্বেও নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষের সদস্যগণের নির্বাচক-মণ্ডলী এক নহে। ক্যানাডার উচ্চতর কক্ষের সদস্যবর্গ শাসকমণ্ডলীরদ্বারা মনোনীত। অনুরূপ ব্যবস্থা অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে ও নিউজিল্যাণ্ডে বহাল ছিল।

শাসকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনয়ন

অতীতে ডেনমার্ক ও ফ্রান্সে উচ্চতর কক্ষের সদস্যগণকে পরোক্ষ নির্বাচনীপ্রথায় নির্বাচিত করা হইত। আবার হল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতির উচ্চকক্ষে স্থানীয় আইনসভাগুলি হইতে সদস্য নির্বাচিত হইত।

পরোক্ষ নির্বাচন বা স্থানীয় আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন

১। আইনসভায় অনেক সময়েই অধীর, অসাবধান ও উত্তেজনাপূর্ণ মনোভাব প্রাধান্য পাইয়া বসে। এ অবস্থায় একটিমাত্র আইনসভা কর্তৃক সহসা অবিবেচনা-প্রসূত হঠকারী আইন রচনা করিয়া বসা সম্ভব। দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে এরূপ অপরিণামদর্শী কর্মপ্রচেষ্টাকে সংযত করিতে পারে।

দ্বিপরিষদীয় বিধানমণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা

২। দুইটি কক্ষ হইতে আইন পাশ করাইতে হইলে বিলম্ব হইবে। কালহরণের ফলে লোকের উত্তেজনা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। সুবুদ্ধি জাগিয়া উঠিবার সুযোগ ঘটে। উপরন্তু বিশদতর আলোচনার ভিতর দিয়া আইনগুলিরও সুষ্ঠু ও উন্নতস্তরের হইয়া উঠিবার সুযোগ থাকে।

৩। শুধু বিধানমণ্ডলীর নিজস্ব ভ্রম-প্রমোদের সংশোধনই নহে, এক কক্ষের অত্যাচার হইতে জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা দ্বিতীয় পরিষদের দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে। উত্তেজনা, উচ্চাকাঙ্খা অসতর্কতা, দলীয় কলহ অথবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর প্রভাবে নিজস্ব ক্ষমতা বর্ধিত করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বিধান-মণ্ডলীর থাকে। এক্ষেত্রে এক কক্ষের আতিশয্যকে অপর কক্ষ নিশ্চিতই সংযত করিতে পারে। লর্ড ব্রাইস বলেন যে, এক কক্ষের ঘৃণ্য, অত্যাচারী ও দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া উঠিবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে এই বিশ্বাস হইতে দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে সমক্ষমতাসম্পন্ন অপর একটি কক্ষের সহ-অবস্থানের মারফতে ইহার গতিরোধ করা যায় *

৪। দ্বিতীয় কক্ষ থাকিলে বিশেষ ধরণের স্বার্থ বা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেই হিসাবে উভয় কক্ষের সংযোগ সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা দ্বারা জনমতের উন্নততর প্রতিফলন সম্ভব।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কক্ষে অঙ্গরাজ্যগুলি বিশেষ প্রতিনিধি-প্রেরণ করিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিষদের বিপক্ষে যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

---

* "The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly to become hateful, tyrannical and corrupt. needs to be checked by the co-existence of another house of equal authority."

Garner—Political Science and Government—P. 606.

১। জনতার সার্বভৌম ইচ্ছা জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নির্ধারিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নিম্নকক্ষেই প্রতিফলিত হইতেছে। দ্বিতীয় কক্ষ জনমতের প্রাধান্যকে খণ্ডিত ও বিঘ্নিত করিতেছে। বস্তুতঃ ইহা যেন একটি গাড়ীর বিপরীত পার্শ্বে ঘোড়া জুড়িয়া একই সঙ্গে দুই দিকে চালাইবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। আবিসিয়ে (Abbe Ses) বলিয়াছেন: "দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের বিরোধিতা করিলে ক্ষতিকর; একমত হইলে অবান্তর।'*

দ্বিতীয় পরিষদের পক্ষে যুক্তি

২। ল্যাস্‌কি বলিতেছেন যে, আধুনিক যুগে কোন গুরুত্বপূর্ণ আইনই সহসা রচিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে দ্রুত চলমান জগতে প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যে নূতন নূতন আইন প্রয়োজন এমনিতেই তাহা বিলম্বিত হয়। দ্বিতীয় কক্ষ কর্তৃক অযথা বিলম্ব ঘটানো সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ দ্বিতীয়কক্ষ স্বীয় গুরুত্ব প্রমাণ করিবার বিতর্কে কালহরণ করিবেই। নিম্নকক্ষ, সংবাদপত্র, সভাসমিতি, দলীয় মঞ্চ হইতে যে সকল মতামত উত্থিত হইয়াছে তাহার উপর দ্বিতীয় কক্ষে কোন নূতন কথা শুনিবার আশা নাই। দ্বিতীয় কক্ষ যেটুকু সংশোধন করিবে তাহা ভাষাগত...জ্ঞানগত বা অর্থগত নহে।**

৩। কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষ যদি বিশেষ স্বার্থের দিক হইতে বাধা দেয়, তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থ, প্রাচীনপন্থী জীবনযাত্রার স্বার্থ, এক কথায় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের স্বার্থ হইতেই সে বাধা আসিবে। এরূপ দ্বিতীয় কক্ষ সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ বাধাস্বরূপ ও তাহাকে অবলুপ্ত করাই উচিত। কারণ, উত্তরাধিকারের নীতি রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করিতেছে। একই ধরণের নির্বাচকের দ্বারা নির্বাচিত হইলে সে ব্যবস্থা পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট। শাসকবর্গ দ্বারা নিযুক্ত হইলে যদি শুধুই দলীয় লোক হয়, তাহার আইন সভায় বসিবার নৈতিক অধিকার নাই। যদি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলেও কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কীয় আইন প্রণয়নের যোগ্যতা সৃষ্টি করে না। প্রতিটি ধনী ব্যক্তিই বিত্তশালীদের স্বার্থে ভোট দান করিবে। প্রতিটি রাজকর্মচারী আইনসভায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের প্রাধান্য বিস্তার করিবে। ইহা অপেক্ষা এক কক্ষীয় আইন পরিষদ সৃষ্টি করিয়া সংযমের ভার, যে নির্বাচকমণ্ডলী ইহাদের নির্বাচিত

* "If a second chamber discents from the first, it is mischievous; it it agrees with it, it is superfluous."—Garner—Political Science and Government p, 603.

** Laski, Grammar of Politics. p. 332

করিয়াছে এবং যে শাসকমণ্ডলী ইহাদের পরিচালিত করিতেছে, তাহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।* কারণ ল্যাস্কি বলেন যে, সাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলই সহসা কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনমূলক আইন রচনার ঝুঁকি নেয় না, দীর্ঘকালের আলোচনায় নিশ্চিত জনসমর্থন পাইলেই এ কার্যে অগ্রসর হয়। উপরন্তু আইনের খসড়াকে উন্নত করিতে হইলে সে বিষয়ে বাস্তব জীবনে যাহাদের স্বার্থ জড়িত এবং যাহারা অভিজ্ঞ তাহাদের মতামত আইনসভার বাহির হইতে সংগ্রহ করার প্রয়োজন। আইন প্রণয়নে সংযমের দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে রাখা উচিত আইনসভার উপর, রাষ্ট্রনৈতিক দলের উপর এবং জনমতের উপর।

৪। দ্বিকক্ষীয় বিধানমণ্ডলীতে একে অপরের উপর দোষ চাপাইয়া দায়িত্ব-মুক্তির প্রয়াস দেখা যায়। এমন কি, দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আইন প্রণয়ন বিভাগ অক্ষম অঙ্গে পরিণত হইতে পারে।

৫। মিল্ বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় কক্ষে গুণবান ব্যক্তিদের স্থান দেওয়া উচিত। কিন্তু গুণবান ব্যক্তিদের স্থান করিবার কোন নিরাপদ বা নিশ্চিত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হয় নাই। এবং মনে রাখা উচিত যে দ্বিতীয় কক্ষের নানাবিধ উপকারের সাক্ষ্য হইল যে অভিজাত, বিত্তমান ও উচ্চ পদস্থের আসন আইনসভায় নিশ্চিত করিবার জন্যই উচ্চ কক্ষের সৃষ্টি।

৬। সাম্প্রতিক ইতিহাসের নজিরে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডে লর্ড-সভা হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন দেশে উচ্চকক্ষের ক্ষমতা খর্ব করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। ১৯১১ সালের আইনে ইংলণ্ডে লর্ডসভার অর্থসম্পর্কিত সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয় এবং ১৯১১ সাল ও পরবর্তী ১৯৪৯ সালের আইনে লর্ড সভার বাধা অধিকপক্ষে এক বৎসরের জন্য নিম্নকক্ষ মানিতে বাধ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ছাড়া প্রায় সর্বত্রই উচ্চকক্ষকে নিম্নকক্ষ অপেক্ষা কম ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। উচ্চকক্ষের সঙ্কট ইহাই। ইহার সংগঠনী নীতিকে সংশোধিত করিয়া দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলে, ইহার ক্ষমতাবৃদ্ধি অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ক্ষমতা বাড়াইলে ইহা নিম্নকক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হইবে; অথচ তাহা গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরুদ্ধে যায়। অপরদিকে, ইহাকে অক্ষম, শক্তিহীন অলঙ্কার মাত্র হিসাবে বজায় রাখিলে, ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন

---

* "It is better, therefore to have directly single-chamber government, and to throw the burden of control upon the electorate which chooses the chamber, and the executive which directsits activities."

Laski. Grammer of Politics. p. 333.

যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নী সভাকে (Constituent Assembly) দ্বিকক্ষীয় করিবার দাবি কোথাও উত্থিত হয় নাই।

৭। দ্বিতীয় কক্ষ রাখার ফলে ব্যয়বাহুল্য অনস্বীকার্য।

৮। অনেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনেও দুই-কক্ষ রাখিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির অভ্যুত্থানের ফলে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের উচ্চকক্ষে সমান প্রতিনিধিত্বের যৌক্তিকতা বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ, উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ নিজ নিজ দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোট দেন, অঙ্গরাজ্যের কোন স্বতন্ত্র নির্দেশ (mandate) অনুযায়ী নহে। বস্তুতঃ অঙ্গরাজ্যের বিশেষ অধিকার রক্ষিত হয় শাসনতান্ত্রিক রক্ষা কবচ ও জনমতের দ্বারা; উচ্চকক্ষের বিশেষ কোন গুরুত্ব সেখানে নাই।

বিষয়টির গুরুত্বের জন্যই বিশদতর আলোচনার প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও পরিষদীয় আইনসভা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে দ্বিপরিষদীয় আইনসভার পক্ষে যুক্তি হইল যে, এ-ব্যবস্থায় উচ্চকক্ষে অঙ্গরাজ্যগুলির বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সম্ভব। বস্তুতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের আয়তন বা জনসংখ্যা নির্বিশেষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য হইতে উচ্চকক্ষে অর্থাৎ সিনেটে, দুজন করিয়া সদস্য প্রেরণের অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত। ইহার ফলে সিনেটে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সমানাধিকার স্বীকৃত হইল। এই সমানাধিকারের দাবির মূল হইতেছে অবিশ্বাস। নিম্নকক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে। সংখ্যাল্প কয়েকটি জনবহুল অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি নিম্নকক্ষের সমগ্র সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশ। সুতরাং ইহারা জোট বাঁধিয়া অন্যান্য জনবিরল অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে,—এ ভয় রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নপরিষদের ৪৩৫ জন সদস্যের ভিতর ইলিনয়া, ইণ্ডিয়ানা, মিশিগান, নিউজার্সি নিউইয়র্ক, ওহিও, পেনসিলভ্যানিয়া,—এই ৭টি শিল্পোগত অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা হইল ১৭৩, এবং আইওয়া, ক্যানসাস, মিনেসোটা, নেব্রাস্কা, উত্তর ডাকোটা, দক্ষিণ ডাকোটা, ওক্লাহোমা ও উইস্‌কন্‌সিন্—এই আটটি কৃষি ভিত্তিক অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিসংখ্যা হইল মাত্র ৫৩। সুতরাং নিম্নপরিষদে শিল্পের স্বার্থে কৃষিকে উপেক্ষা করা হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা করিলে দোষ দেওয়া যায় না। অথচ উচ্চকক্ষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবার ফলে ঐরূপ প্রচেষ্টাকে সহজেই রুখিয়া দেওয়া সম্ভব। সুতরাং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব

বিশেষ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার খাতিরে যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজনীয়তা দাবি করা হয়।

তথাপি তত্ত্বকথা যাহাই হউক না কেন, দ্বিতীয় পরিষদ বাস্তবে অঙ্গ-রাজ্যগুলির স্বার্থ কতটা রক্ষা করিতেছে তাহা দেখা প্রয়োজন। মার্কিন সিনেটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ইহার বাহিরে ক্যানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার উচ্চকক্ষ অঙ্গরাজ্যের বিশেষ স্বার্থের রক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে নাই। ক্যানাডার প্রতি অঙ্গরাজ্য হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয় নাই। তাহা ছাড়া ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় রাষ্ট্রেই মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা থাকার ফলে, মন্ত্রিসভা নিম্নকক্ষের নিকট দায়িত্বশীল, এবং উভয় কক্ষের সদস্যই দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দিয়া থাকেন। বরঞ্চ তুলনায় সুইজারল্যাণ্ডের উচ্চকক্ষে অঙ্গরাজ্যীয় মনোভাব অধিকতর গুরুত্বলাভ করে। তবু এখানেও শাসনতন্ত্রের উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতার নির্দেশ থাকিলেও, উচ্চকক্ষ অপেক্ষা নিম্নকক্ষ অধিক ক্ষমতাশালী। অধিকন্তু গণভোট (Referendum) ব্যবস্থার ফলে আইনসভাই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা।

সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিতীয় পরিষদ যে কতখানি কার্যকর সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। তত্ত্বের দিক দিয়াই বা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাক।

প্রথমেই স্বীকার করিতে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিপরিষদীয় আইনসভা অপরিহার্য এমন কোন কথা নয়। এক পরিষদীয় আইনসভাতেও কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে এমন ক্ষমতাহীনতা অসম্ভব নহে, যাহাতে একের এক্তিয়ারে অপরের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের অধিকারের আসল রক্ষাকবচ রহিয়াছে শাসনতন্ত্রের ক্ষমতাবণ্টন ব্যবস্থায় ও সর্বোচ্চ বিচারালয়ের শাসনতন্ত্রের ধারক ও রক্ষকের ভূমিকার মধ্যে।*

তৃতীয়তঃ,, সর্বত্রই দলপ্রথা এত প্রবল যে, উভয় কক্ষে সদস্যগণই দলীয় নির্দেশ মান্য করেন। ইহার ফলে উচ্চকক্ষের বিশেষ ভূমিকা কার্যতঃ নাকচ হইয়া যায়।**

* I belive myself that no safeguard necessary to the units of a federation requires the protective armour of a second chamber. I suggest that all requisite protection can be secured (a) by the forms of the original distribution of powers embodied in the constitution—and (b) by the right to judicial review possessed by the courts." Laski. Grammar of Politics, p. 334

** "...the effect of State equality has been largely overcome by the operation of the party system." —Laski, Ibid, p. 333

সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়াও দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থার যৌক্তিকতা গ্রহণীয় নহে। তথাপি বাস্তব অবস্থার পরিপেক্ষিতে অধ্যাপক হুয়্যারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে যে যুক্তির দিক হইতে ইহার প্রয়োজন না থাকিলেও, অঙ্গরাজ্যগুলির সম্ভাব্য শঙ্কার মূল উৎপাটন করিতে ও সুসমছন্দে শাসনব্যবস্থা চালাইতে অঙ্গ-রাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে দ্বিপরিষদীয় আইনসভা মঙ্গলকর।*

সার্বভৌম ও অ-সার্বভৌম আইনসভা (Sovereign and Non-Sovereign Law-Making Bodies):

ডাইসি আইনসভাকে, সার্বভৌম ও অ-সার্বভৌম, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিতভাবে অ-সার্বভৌম আইনসভার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন: প্রথমতঃ, এই ধরণের আইনসভার গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত আইনের অস্তিত্ব যে আইন ইহা মানিতে বাধ্য, যাহাকে ইহা পরিবর্তন করিতে পারে না; সুতরাং দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ আইন ও মৌলিক আইনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য : ও সর্বশেষ, এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব, বিচার বিভাগীয় অথবা অন্য যে কোন ধরণেরই হউন না কেন, যাঁহারা বা যাঁহাদের এই আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা বা শাসনতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে রায় দিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। কোন আনইসভার নিম্নপদস্থতার এই সকল চিহ্ন প্রমাণ করিয়া দেয় যে তাহা সাবভৌম আইনসভা নহে।**

ইংলণ্ডের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই তিনি তাঁহার বক্তব্যকে উপস্থিত করিতেছেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন-প্রণয়নের পদ্ধতিতেই যে কোন আইন প্রবর্তন বা পরিবর্তন করিতে পারে; আইনের দৃষ্টিতে মৌলিক

*......" Although equal representation in not essential to ensure that the system is federal government, it may be essential to ensure that it is effective federal government." —Wheare. Federal Government. p. 93.

** These signs by which you may recognise the subordination of a law-making body are, first the existence of laws effecting its constitution which such body must obey and connot change; hence, secondly, the formation of a marked distinction between ordinary laws and fundamental laws: and lastly, the existence of some person or persons, judicial or otherwise, having authority to pronounce upon the validity or constitutionality, of laws, passed by such law-making body. Wherever any of these marks of subordination exist with regard to a given law-making body, they prove that it is not sovereign legislature.

—Dicey. Introduction to the studies of the law of the constitution. P. 88

বা সাধারণ আইনের কোন পার্থক্য নাই; এবং এমন কেহ নাই যে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে। সুতরাং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিঃসন্দেহে সার্বভৌম আইনসভা।

অর্থাৎ, মূল প্রশ্ন হইল, আইনসভার ক্ষমতার উপর কোন সীমা টানা হইয়াছে কিনা। যদি আইনসভার আইন প্রণয়নে কোন আইনগত বাধা থাকে, তবে তাহাকে সার্বভৌম বলা চলিবে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যের আইনসভা উভয়ই শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট এক্তিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আইনসভার স্থান শাসনতন্ত্রের নিম্নে, সুতরাং এ আইনসভাগুলি সার্বভৌম নহে। বস্তুতঃ, যুক্তরাষ্ট্র মাত্রেই শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে; সুতরাং কোন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাকেই সার্বভৌম বলা চলে না।

'সার্বভৌমত্বের' সহিত রাষ্ট্রীয় 'স্বাধীনতার' ধারণা এমনই মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে যে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে অসার্বভৌম' শব্দটির দ্বারা বুঝি পরাধীন বা উপনিবেশীয় আইনসভার উল্লেখ করা হইতেছে। কিন্তু ডাইসি এখানে আইনসভার ক্ষমতার বিস্তারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শব্দটিকে প্রয়োগ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি 'অসার্বভৌম' আইনসভাকে আবার দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা, একদিকে বিভিন্ন কোম্পানি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনিক প্রতিষ্ঠান, ঔপনিবেশিক আইনসভা এবং অপরদিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের আইনসভা যাহার শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অধিকার নাই (Legislative without being constituent)।

কোম্পানি বা কর্পোরেশনও নিজস্ব নিয়মাবলী প্রণয়ন করে; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সেগুলি বাধ্যতামূলক। অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনিক প্রতিষ্ঠান বা ঔপনিবেশিক আইনসভার আইনও আইন; কিন্তু তাহারা আরোপিত সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বাধীন রাষ্ট্রের পার্থক্য নিশ্চয়ই রহিয়াছে; তথাপি সে রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলে আইনসভা শাসনতান্ত্রিক বন্ধন অতিক্রম করিতে পারে না।

ডাইসির বক্তব্যের বিশ্লেষণ করিয়া স্যার আইভর জেনিংস দেখাইয়াছেন যে ইহার ফলে দুইটি সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়ে। প্রথমটির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; অর্থাৎ, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে বাদ দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া, ডোমিনিয়ন আইনসভা বা লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল সকলকেই এই পংক্তিতে ফেলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ হইল এই যে পার্লামেণ্ট যেহেতু সার্বভৌম সংস্থা সেজন্য সে তাহার ভবিষ্যৎ কর্মধারাকে কোনরূপেই সীমিত

বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না অর্থাৎ, পার্লামেণ্ট যে কোন সময়েই পূর্ববর্তী যে কোন সিদ্ধান্তকেই পাল্টাইতে পারে।

জেনিংস দেখাইতেছেন যে পার্লামেণ্টে যে যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে না। 'আইনগত সার্বভৌম' ও 'রাজনৈতিক সার্বভৌমে'র পার্থক্য নির্দিষ্ট করিয়া ডাইসি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ আইনগত সার্বভৌম' প্রকৃত সার্বভৌম নয়, ইহা একটি আইনগত ধারণামাত্র; ইহার দ্বারা পার্লামেণ্ট ও আদালত সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হইতেছে। অন্যান্য দেশের আইনসভার আইন আদালত গ্রহণ করে এই কারণে যে শাসনতন্ত্র ঐরূপ আইন প্রণয়নের অধিকার দান করিয়াছে। ব্রিটেনে লিখিত শাসনতন্ত্র নাই; এখানে আদালত পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন মানিয়া থাকে, এই জন্য তাহার ঐ ক্ষমতা সর্বজন স্বীকৃত আইন, Common Law হইতে উদ্ভূত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস নিজস্ব এক্তিয়ারে যথেচ্ছ আইন-প্রণয়ণের অধিকার ভোগ করে; ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সহিত তফাৎ এইটুকু যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ক্ষমতা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়, যে কোন বিষয়েই তাহার আইন করিবার অধিকার রহিয়াছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টও—আইন তাহার বল্গা যতই ছাড়িয়া থাকুক না কেন,—স্থান-কাল-পাত্র, অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিবেশ এবং শাসনতান্ত্রিক প্রথার দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত।

সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস, ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্ট, তথা দুষ্পরিবর্তনীয় লিখিত শাসনতন্ত্র শাসিত যে কোন আইনসভার সহিত মিউনিসিপ্যালিটি বা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট বা ট্রাম কোম্পানির মিল না খুঁজিয়া, তাহাদিগকে "Sovereign within its powers" বলাই জেনিংসের অভিপ্রেত। তাহা হইবে রাষ্ট্রের আইনসভার প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিকথনও হইবে না। অপরপক্ষে মনে রাখা দরকার যে মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির নিয়ম প্রণয়ন ক্ষমতা আদালতগুলি কখনও এক চোখে দেখে না।*

* "Indeed, in modern constitutional law it is frequently said that a legislature is. "Sovereign within its powers".. (But) if sovereignty is merely a legal phrase for legal authority to pass any sort of laws, it is not entirely ridiculous to say that a legislature is sovereign in respect of subject of certain subjects, for it may then pass any sort of laws on those subjects, but not any other subjects. No such phrase is used of local authorities or public utility corporations...And in interpreting the powers the courts adopt a very different attitude."—Sir Ivor jennings. The law and the Constitution. p. 151.

পার্লামেণ্ট স্বকীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিতে পারে না, ডাইসির এ সিদ্ধান্তেরও জেনিংস বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে কোন আইন পরিবর্তন করিবার অধিকারই যদি তাহার থাকে তাহা হইলে স্বকীয় কর্মপদ্ধতি সম্পর্কীয় আইন নির্ধারণ করার ক্ষমতাও ইহার রহিয়াছে।*

এতদসত্ত্বেও ডাইসি প্রণীত শ্রেণীবিভাগে ক্ষমতার ব্যাপ্তির দিক হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মত আইনসভার সহিত অন্যান্য আইনসভার পার্থক্য যে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় তাহা অনস্বীকার্য।

*..."the 'legal Sovereign' may impose legal limitations upon itself because its power to change the law includes the powers to change the law affecting itself." Jennings. Ibid, p. 153.

অতিরিক্ত পাঠ্য

GARNER—Political Science and Government
LASKI—Grammar of Politics
FINER—Theory and Pratice of modern Government
MILL—Representative Government

অষ্টম অধ্যায়

শাসন বিভাগ

(The Executive)

[রাষ্ট্রের ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত হইলে পর, তাহাকে কার্যকরি করার দায়িত্ব হইল শাসনবিভাগের ; সঙ্কীর্ণ অর্থে, শুধু নীতি-নির্ধারণ ও শাসন-পরিচালনার দায়িত্বসম্পন্ন উচ্চতম কর্তৃপক্ষকেই শাসনবিভাগ হিসাবে অভিহিত করা হয়।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় সংখ্যার ভিত্তিতে এবং আইনসভার সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে। সেই হিসাবে একক বা বহুত্ববাচক এবং রাষ্ট্রপতি-শাসন বা মন্ত্রিপরিষদীয় শাসনের উদ্ভব। তাহা ছাড়া আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রপ্রধানও থাকে।

শাসন কর্তৃপক্ষের মনোনয়ন নীতি হইল : (১) উত্তরাধিকারের নীতি, (২) জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (৩) পরোক্ষ নির্বাচন, (৪) আইনসভা কর্তৃক মনোনয়ন ও (৫) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনয়ন ;

রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দ রাষ্ট্রের কার্য নিরবিচ্ছন্নভাবে চালাইয়া থাকেন। ইহাদের চাকুরী স্থায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ন্যায় বারবার নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হয় না।

ইহাদের নিয়োগ রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের দলীয় মনোভাবের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

শাসনবিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

(১) কূটনৈতিক, (২) সামরিক, (৩) অভ্যন্তরীণ শাসক সম্পর্কিত, (৪) আইন প্রণয়নী ও (৫) বিচারবিভাগীয় কার্যাবলী।]

রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার ভার আইনবিভাগের ; সেই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। সুতরাং, আইনকে কার্যকরী করিবার বিশেষ দায়িত্ব যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে, ব্যাপক অর্থে তাহাদের সকলকে লইয়াই শাসন বিভাগ গঠিত। সঙ্কীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব যাহার উপর ন্যস্ত থাকে, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অন্য কর্মচারীদের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করাইতে হইবে, সেই একজন বা কয়েকজন কর্মকর্তার সম্মিলিত সংস্থাই শাসনবিভাগ নামে পরিচিত। সঙ্কীর্ণ অর্থে যাঁহাদের উল্লেখ করা হইতেছে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শাসনবিভাগের কর্মকর্তা। তাঁহারা রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করেন, সেই নীতিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য শাসনবিভাগকে বিভিন্ন দপ্তরে সংগঠিত করেন এবং কর্মভার বণ্টন করিয়া দেন, বিভিন্ন দপ্তরের কার্যের সংযোগ সাধন করেন, অধিনস্থ কর্মচারীরা আইনানুযায়ী যথাযথভাবে কার্য সুসম্পন্ন করিতেছে

শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে

মূল দুই ভাগ
(১) রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষ
(২) অধীনস্থ কর্মচারী

কি না তাহা তদারক করেন। অধীনস্থ কর্মচারিবৃন্দকে নির্দেশদান করা, তাহাদের কার্যক্রম ও কর্মস্থান স্থিরীকৃত করা, প্রয়োজন হইলে তাহাদের পদোন্নতিবিধান অথবা শাস্তিদান করা, এ সকলই তাঁহাদের কার্যের অঙ্গীভূত। অর্থাৎ শাসন-বিভাগকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়: (১) যাহাদের উপর শাসন-পরিচালনার রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব ন্যস্ত এবং (২) অধীনস্থ যে কর্মচারীদের দ্বারা রাষ্ট্রকার্য সম্পাদিত হয়। সঙ্কীর্ণ অর্থে শাসনবিভাগ বলিতে প্রথমোক্তদেরই বুঝায়।

শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষকেও আবার দুইভাগে ভাগ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সকল রাষ্ট্রেই একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান কর্মকর্তা থাকেন' যেমন, ইংলণ্ডের রাণী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি। ইনি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিভূ স্বরূপ। রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম ইহার নামেই পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীতিনির্ধারণ বা কার্য পরিচালনা ইনি স্বয়ং না করিতেও পারেন। ইংলণ্ডের রাণী বা ভারতের রাষ্ট্রপতি নামে রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা; কার্যতঃ উভয় রাষ্ট্রেই শাসন-পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শুধু নামে রাষ্ট্রপ্রধান নহেন, কার্যতঃ প্রধান শাসক। এক্ষেত্রে উভয়বিধ দায়িত্বের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। নাম-সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধানকে মূলতঃ আনুষ্ঠানিক ও আইনগত কার্য করিতে হয়। কিন্তু আইনসভায় যখন কোন দলেরই স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না, অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা যদি সাময়িকভাবে সুস্পষ্ট চিহ্নিত না হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রাধিনায়ককে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণের নিমিত্ত বাছাই করার ভিতর দিয়া গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব পালন করিতে হয়।

নামসর্বস্ব প্রধান শাসক

দুইটি ভিন্ন নীতির ভিত্তিতে বাস্তব শাসন-কর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে,—সংখ্যা এবং আইনসভার সহিত সম্পর্কের বিচার। সংখ্যার মানদণ্ডে বিচার করিলে শাসন-কর্তৃত্ব একজনের অথবা একাধিক ব্যক্তির একটি কমিটির উপরে ন্যস্ত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একক কর্মপরিচালক। একা বলিয়াই কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বভার অর্পণের জন্য ইহাকে সচিবগণ নিয়োগ করিতে হয়। এই সকল সচিব এক বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও রাষ্ট্রপতির উপদেশদাতা। এই সকল সচিবের মিলিত সংস্থা Cabinet বা মন্ত্রি-পরিষদ নামে পরিচিত হইলেও ইহারা বস্তুতঃ অধীনস্থ শাসনবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ

বাস্তব শাসন কর্তৃপক্ষ

একক দায়িত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি

কর্মচারীমাত্র। কিন্তু, তাহা হইলেও, অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত ইহাদের মূল পার্থক্য হইল ইহাদের দায়িত্ব রাজনৈতিক; রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বাধীনে নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ইহাদের উপর, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সমাপ্ত হইলে ইহাদেরও পদত্যাগ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির একক ক্ষমতার বিপরীত ব্যবস্থা হইল বহু শাসকের মিলিত সংস্থা (Plural Executive or Committee Executive)। ইহার উদাহরণ হইল মন্ত্রিপরিষদ এবং সুইজারল্যাণ্ডের অন্যান্য ব্যবস্থা, যাহা বহুত্ববাচক বা কলেজীয় কর্মপরিচালক সংস্থা (Plural or Collegiate Executive) নামে পরিচিত।

বহুত্ববাচক বা কমিটিগত শাসকমণ্ডলী

সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি শাসকমণ্ডলীর ভিতর হইতে তাহাদেরই অন্যতম হিসাবে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। পদটি প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক, আলঙ্কারিক ও সম্মানজ্ঞাপক। আইনসভার নির্দেশে এই সংস্থা মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কার্য-নির্বাহ করেন। আইনসভার উপর নেতৃত্বদানের দায় ইহাদের নাই। ইহাদের প্রভাব আইনসভা প্রত্যাখ্যান করিলে পদত্যাগ করিতেও হয় না। মন্ত্রিপরিষদও একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিগতভাবে কার্যের ভিত্তিতে গঠিত শাসন পরিচালনা সংস্থা। সুইজারল্যাণ্ডের ব্যবস্থার সহিত ইহার মূল পার্থক্য হইল আইন সভার সহিত সম্পর্ক ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের দিক হইতে। কারণ মন্ত্রীপরিষদ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল ও আইনসভার উপর নেতৃত্ব করিয়া থাকে। আবার মন্ত্রীমণ্ডলী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া চলে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সহিত কিন্তু আইনসভার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শাসনকর্তৃপক্ষ একক হইতে পারে, আবার একাধিকের সমষ্টিগত কমিটিও হইতে পারে; শাসনকর্তৃপক্ষের সহিত আইনসভার কোন আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না থাকিতে পারে, শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে পারে, আবার, আইনসভার কর্তৃত্বাধীনও হইতে পারে।

আইনসভার সহিত সম্পর্ক

প্রধান শাসকের মনোনয়ন পদ্ধতি (Mode of choice of the Chief Executive):

প্রধান শাসকের আসন ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় পূর্ণ করা হইয়া থাকে। পদ্ধতিগুলি হইল নিম্নরূপ:

(১) **উত্তরাধিকারের নীতি**: যে রাষ্ট্রে রাজ-শাসন প্রচলিত সেখানেই প্রধানতঃ এই নীতি প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ, প্রধান শাসক রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী

রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন। অতীতে অবশ্য রাজার নির্বাচনও অপরিচিত ছিল না এবং ইংলণ্ডেও রাজ-শাসনের পশ্চাতে এই নির্বাচনী নীতির আইনগত স্বীকৃতি রহিয়াছে।

(২) **জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন :** দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি রাষ্ট্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিতে এবং সুইজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ ক্যাণ্টন বা অঙ্গরাজ্যে এই পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে।

(৩) **পরোক্ষ নির্বাচন :** জনসাধারণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উপর আস্থা না রাখিতে পারার ফলেই পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, যেমন হইয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানেও রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির উদ্ভবের ফলে পরোক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা কার্যতঃ প্রায় প্রত্যেক নির্বাচনেই পরিণত হইয়াছে।

(৪) **আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন :** সুইজারল্যাণ্ডেও এ ব্যবস্থা প্রচলিত। ভারতীয় ইউনিয়নেও লোকসভা ও অঙ্গরাজ্যগুলির নিম্নকক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত লইয়া থাকে।

(৫) **ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনয়ন :** ক্যানাডার বা ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলির প্রধান শাসক (Governor) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনীত হন। ব্রিটিশ ডেমিনিয়নগুলির প্রধান শাসক (Governor-Geneıal) মনোনয়ন করেন ব্রিটিশ বা রানী (Monarch)। কিন্তু ডোমিনিয়ন-ব্যবস্থা বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌছিয়াছে, তাহাতে ইহা আর অধীনতামূলক নহে। কারণ, কার্যতঃ ডোমিনিয়ন মন্ত্রিসভার মনোনীত ব্যক্তিই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মনোনয়ন লাভ করেন।

রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দ (The Civil Service) : গণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিনির্ধারকগণ জনসমাজের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। কার্যকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে পর কার্যভার ত্যাগ করিয়া পুনরায় নির্বাচনের জন্য জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু কিছুকাল পর পর সমগ্র শাসন বিভাগ যদি কর্মত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে রাষ্ট্রে বারবার মহাবিপর্যয় ঘটা অনিবার্য হইত। সেইজন্য আইনানুযায়ী নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রহিয়াছে স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ। শাসনবিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষের সহিত ইহাদের মূল পার্থক্য নিম্নরূপ : ইহারা স্থায়ী কর্মচারী; আইনানুগ পদ্ধতি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইহারা আইনকে কার্যকরী করিয়া থাকেন। নীতি নির্ধারণ ইহারা করেন না; সুতরাং বারবার জনানুমোদনের

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও অধিনস্থ কর্মচারির পার্থক্য

জন্য নির্বাচনে দাঁড়াইতে হয় না। ইঁহাদের বৈশিষ্ট্য নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা ও স্থায়িত্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কর্মোদ্যম নির্দিষ্টকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নীতি নির্ধারণ ও কার্যপরিচালনা করেন; ইহারা কর্মসম্পাদন করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নির্বাচিত হইতে হয়; ইঁহারা কর্মে বিধিসঙ্গত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হন।

নিয়োগ নীতি ঃ (Principles of Appointment) :

ল্যাস্কি বলিতেছেন,—কর্মচারী নিয়োগের উপর শাসন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ যত কম থাকে, ততই মঙ্গল। কারণ, দলভিত্তিক শাসনকর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর যদি কর্মচারীদেব চাকুরী নির্ভর করে, তাহা হইলে দলীয় পক্ষপাতের ফলে অযোগ্য লোকের মনোনীত হইবার সম্ভাবনা। মন্ত্রিমহাশয়ও নিজস্ব কর্ম উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধিব অভিলাষে নিজ-সমর্থকের চাকুবী জুটাইবার চিন্তায় অধিক ব্যস্ত থাকিবেন। চাকরীর অস্থায়িত্বের ফলে গুণীলোক সরকারী কার্যভার পরিহার করিয়া চলিবে। দীর্ঘকালীন কার্যক্রমের ঐতিহ্য কিছুই গড়িয়া উঠিবে না।

নিরপেক্ষ নিয়োগ সংস্থাব দ্বারা কর্মী নিযোগ বাঞ্ছনীয

সুতরাং পদ-প্রার্থীদের ভিতর হইতে বাছাই করিবার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের আওতার বাহিবে স্বতন্ত্র ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংস্থার (Public Service Commission) উপর ন্যস্তকরা উচিত। এইরূপ নিয়মকানুনেব ভিত্তিতে বাছাই করা প্রয়োজন যাহাতে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। সাধাবণ মানুষ অন্যান্য পন্থায় যে বয়সেই অর্থোপার্জন সুরু করে, রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে সেই বয়সেই প্রবেশ করিবার সুযোগ থাকা উচিত। কার্যকাল ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত।

শাসন বিভাগীয় কার্যাবলী (Functions of Executive) : ডাঃ গার্নারের অনুসরণ করিয়া আমরা শাসনবিভাগীয় কার্যাবলীকে নিম্নরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি :—

১। **পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যাবলী বা কূটনৈতিক দায়িত্ব ঃ** সব রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রপ্রধানই রাষ্ট্রের প্রতিভূস্বরূপ ভিন্নরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখেন। তিনি নিজরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, অপর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে স্বীকার করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ ও চুক্তি সম্পাদন তাঁহার কাজ। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই চুক্তি বিধিসিদ্ধ হইতে গেলে উচ্চতর আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। অন্য অনেক দেশেই চুক্তিতে আইনসভার সম্মতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

কূটনৈতিক দায়িত্ব

২। **সামরিক কার্যাবলী ও দায়িত্ব ঃ** বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা

রক্ষার দায়িত্ব শাসনকর্তৃপক্ষের। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধানই সমগ্র সামরিক শক্তির স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনীর, চরম অধিকর্তা। যুদ্ধ ঘোষণা করার ভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস বা আইনসভার উপর ন্যস্ত, ইংলণ্ডে এ দায়িত্ব রাজার। সকল রাষ্ট্রেই যুদ্ধজয়ের নিমিত্ত সৈন্য বাহিনীর নিয়োগ, যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা, সৈন্যাধ্যক্ষের মনোনয়ন প্রভৃতি শাসনকর্তৃপক্ষের দায়িত্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত। যুদ্ধের সময়ে, এমন কি গুরুতর বিপদাশঙ্কায়, রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণের মৌলিক অধিকারসমূহ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারেন। যুদ্ধের নিয়মই হইল যে তাহা শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; বাস্তবিক পক্ষে গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতার সহিত একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য করা দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়।

সামরিক শাসন

৩। **আভ্যন্তরীণ শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী** (Internal Administration): রাষ্ট্রের প্রধান কার্যাবলী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে। যখন রাষ্ট্রের কার্য সম্পর্কে ধারণা ছিল যে রাষ্ট্র শুধু 'আইন ও শৃঙ্খলা' (Law and Order) বজায় রাখিবে, তখন স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের কার্য সীমাবদ্ধ ও সঙ্কুচিত ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে রাষ্ট্রেব কর্মধারা সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে, সুতরাং দেশের শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য রাষ্ট্রীয় কর্মধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং শাসন-বিভাগের দায়িত্ব এবং কর্মভারও বাড়িতেছে একই হারে। ইহার ফলে, শুধু, দপ্তর ফাইল ও কর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে তাহাই নহে, জনজীবনে শাসনবিভাগের প্রভাবও বাড়িতেছে। অবশ্য পূর্বে জনতার সহিত সংযোগ ঘটিত শুধু পুলিস-বিভাগ মারফত, এখন বহু প্রকারের মঙ্গলময় কার্যের মাধ্যমে জনসংযোগ ঘটিতেছে।

আভ্যন্তরীণ শাসন

৪। **আইন-সংক্রান্ত কার্যাবলী** (Legislative Function): আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা স্থগিত রাখা বা সভা ভাঙ্গিয়া দিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের। মন্ত্রিপরিষদীয় শাসন অথবা সুইজারল্যাণ্ডে শাসন-কর্তৃপক্ষ আইনসভার প্রস্তাব আনয়ন করেন, আয়ব্যয় সম্পর্কিত বরাদ্দ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, বিতর্কে যোগ দেন, প্রশ্নের উত্তর দেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বা ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি আইনসভা প্রণীত খসড়া আইন নাকচ (veto) করিতে পারেন; অবশ্য আইনসভা দৃঢ়সংকল্প হইলে সে বাধা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। উপরন্তু সর্বত্রই রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ হুকুমনামা (Ordinance) জারি করিবার অধিকার স্বীকৃত হয়। সর্বোপরি কার্যধারার ব্যাপ্তির ফলে (Delegated Legislation) পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে।

আইন প্রনয়ণ

অর্থাৎ আইনসভা সাধারণভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া শাসন বিভাগের উপর বিশদ নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার ছাড়িয়া দেয়। অবশ্য Ordinance বা Rule Making Power উভয়বিধ কার্যের উপরই আইনসভার সাধারণ নিয়ন্ত্রন থাকে।

৫। **বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী** (Judicial Powers) : শাসন বিভাগের প্রভাব হইতে বিচার বিভাগকে যত দূরে সরাইয়া রাখা যায় ততই মঙ্গল। শাসনবিভাগের ক্ষমতা প্রধানতঃ দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা বা শাস্তির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। অবশ্য শাসনবিভাগীয় কর্মচারীদের সম্পর্কে বিশেষ আইনে বিচারের ভার কোথাও কোথাও শাসনবিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে।

বিচার সম্পর্কিত কার্য

সাম্প্রতিক যুগে শাসন বিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধির এক বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রিপরিষদীয় শাসনে আইনসভার উপর মন্ত্রিপরিষদের প্রভাব ও নেতৃত্ব সুস্পষ্ট ও প্রকট। দলীয় শৃংখলার প্রাধান্যের ফলে মন্ত্রিপরিষদ আনীত প্রস্তাবই প্রধানতঃ আইনে পরিণত হয়, ব্যয়বরাদ্দও নির্ধারিত হয় মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা, আইনসভা সাধারণতঃ শাসন বিভাগের সমালোচনাতেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখে। দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা যতক্ষণ বজায় রহিয়াছে, ততক্ষণ মন্ত্রিপরিষদকে আইনসভা ভোটের জোরে বিতাড়িত করিতেছে, ইহা কল্পনাতীত। এমন কি ক্ষমতাবিভাজন নীতির ভিত্তিতে গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাষ্ট্রপতি বাণী পাঠাইয়া অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া, প্রস্তাব নাকচ করিবার ভয় দেখাইয়া বা জনমত জাগ্রত করিয়া, আইনসভাকে প্রভাবিত করিয়া থাকেন। এই প্রবণতার সমালোচনা হইলেও আমরা 'মিলের' কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি যে আইনসভার মত আলোচনা কক্ষ যে প্রধানতঃ নিজেকে সমালোচক, জনস্বার্থের তত্ত্বাবধায়ক ও জনমতের দর্পণের ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে তাহা অস্বাস্থ্যের সূচক নহে। বস্তুতঃ, আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ইহা অবশ্যম্ভাবী রূপ বলিয়া স্বীকার করাই সমীচীন।

শাসন বিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধি

অতিরিক্ত পাঠ্য

GARNER—Political Science and Government
LASKI—Grammar of Politics

নবম অধ্যায়
বিচার বিভাগ
(The Judiciary)

[আইনকে প্রয়োগ করিয়া দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তিমূলক রায়দান হইল বিচার বিভাগের মূল কার্য। এই বিচার সুনিশ্চিত, দ্রুত ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য রাষ্ট্রব্যাপী একই আইন একই বিচারপদ্ধতি হওয়া প্রয়োজন, বিনা বিচারে শাস্তি হইতে পারিবেনা, শাস্তির উদ্দেশ্য হইবে সমাজের নিরাপত্তা, প্রতিশোধ নহে ; এবং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ : (১) বিচার কার্য, (২) আইন প্রণয়নী দায়িত্ব, (৩) উপদেশ দান, (৪) নিরোধ সূচক নির্দেশদান (৫) শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা, (৬) শাসনবিভাগীয় বিভিন্ন কার্য।

বিচারবিভাগীয় সংগঠন নানারূপ হয় : সাধারণ আদালত : আপীল আদালত : যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ; অঙ্গরাজ্যের আদালত ; নিশ্চল আদালত ; ঘূর্ণমান আদালত ; সাধারণ আদালত ; বিশেষ আদালত প্রভৃতি।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে কতকগুলি বিশেষ ব্যবহারের উপর। নিয়োগ পদ্ধতি, কার্যকাল নির্ধারণ অপসারণ, অবসর গ্রহণ বেতন ভাগ নির্ণয় প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই এমনভাবে স্থিরীকৃত হইতে হইবে যাহাতে স্বাধীনতা খর্ব না হয়। সেজন্য শাসকমণ্ডলী কর্তৃক নিয়োগ সুব্যবহারকালীন স্থায়ী চাকুরী, আইনসভার বিশেষ আবেদন ক্ষমতা বা অপরাধের জন্য অপসারণ, যথাযোগ্য বেতন, ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা ইত্যাদি সুনিশ্চিত করিয়া পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন যাহাতে বিচারকের স্বাধীন কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয়।]

লর্ড ব্রাইস বলেন,—"কোন শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণের জন্য বিচার-ব্যবস্থার কার্যকারিতা অপেক্ষা যোগ্যতম মানদণ্ড আর কিছুই নাই।" (There is no better test of the excellence of a government than the efficiency of its judicial system) বস্তুতঃ বিচারবিভাগ রাষ্ট্রীয় আইন ও জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতার তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষাকর্তা।

ন্যায় বিচার রাষ্ট্রের উৎকর্ষের মান

সংঘাতময় সমাজে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, সংগঠনের বা শাসনব্যবস্থার, অনুরূপভাবে সংগঠনের সহিত সংগঠনের ও শাসনব্যবস্থার, দ্বন্দ্ব অনিবার্য। সে অবস্থায় রাষ্ট্রের যে ইচ্ছা আইনের মধ্যে রূপ পাইয়াছে, সেই নিরিখে প্রত্যেকের অধিকার ও অপরাধ স্থির করিবার এবং অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড নির্ধারণের ভার হইল বিচারবিভাগের। ন্যায় বিচারের যদি অভাব ঘটে, এমন কি ঐরূপ সন্দেহও যদি জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইতে থাকে, তাহা হইলে সে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং সে রাষ্ট্রের বিপর্যয়ও আসন্ন। "বিচারের বাতি নিভিয়া গেলে, সে

অন্ধকার অতি ভীষণ।" (If the lamp of justice goes out in darkness how great is that darkness!)

বিচার প্রকৃতই সন্তোষজনক ও আস্থাভাজন হইতে হইলে, তাহা হইতে হইবে নিশ্চিত, দ্রুত ও নিরপেক্ষ। নৈশ্চিত্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইতেছে এই কারণে যে বিচার যদি ব্যক্তিবিশেষের মর্জির উপর নির্ভর করে, যদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট আইন ধরিয়া না চলে, যদি অভিযোগকারীভেদে রায়ের পার্থক্য হয়, তাহা হইলে সে বিচারের ন্যায্যতার উপর কেহই নির্ভর করিতে পারিবে না, কাহারও অধিকারই নিরাপদ থাকিবে না। বিচার দ্রুত হওয়া প্রয়োজন, এইজন্যই যে অন্যায় ঘটিবার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, ন্যায়বিচারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হয় না। তৃতীয়তঃ, বিচারের ন্যায্যতার অপর নামই নিরপেক্ষতা। পক্ষপাতিত্বদুষ্ট বিচার, বিচারের প্রহসন মাত্র। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর কলহে, শক্তিশালী ও দুর্বলের সংঘাতে, বিচারককে নির্ভীক, নির্লোভ ও নিস্পৃহ হইয়া আইনের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, অধিকার বজায় রাখিতে হইবে, অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে হইবে।

বিচার হইবে নিশ্চিত দ্রুত ও নিরপেক্ষ

বিচার সম্পর্কিত মূলনীতি : উপরোক্ত উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিলে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করা অপরিহার্য :

সমগ্র রাষ্ট্রে একই বিচার পদ্ধতি প্রয়োজন

১। সমগ্র রাষ্ট্রে একই বিচার-পদ্ধতি এবং একই আইন বলবৎ থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে অধিকারের নিরাপত্তা অথবা দণ্ডদানের নৈশ্চিত্ত সম্পর্কে কোনরূপ সমতা বজায় রাখা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের সর্বত্রই অধিকার সমভাবে রক্ষিত হইবে এবং অপরাধের দণ্ডও সর্বত্র একই হইবে, এই নিশ্চয়তা না থাকিলে নাগরিক তাহার অধিকারের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারিবে না।

অপরাধ বিনা শাস্তি হইবে না

২। আইনগত অপরাধ না করিলে কোন শাস্তি হইতে পারিবে না ; শাস্তিও হইতে হইবে ঠিকমত আইনের প্রয়েগ মারফত।

দণ্ডের উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নহে

৩। প্রতিশোধগ্রহণ কখনও দণ্ডদানের উদ্দেশ্য হইবে না ; শাস্তির উদ্দেশ্য হইবে বর্তমানে ও ভবিষ্যতের জন্য সমাজের আত্মরক্ষা নিশ্চিত করা।

৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। বিচারকের পক্ষে

উৎকোচগ্রহণ অথবা যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই বিচারককে উৎকোচদানের প্রস্তাব দণ্ডণীয় হইবে। অনুরূপ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে বিচারককে ভয় প্রদর্শন অথবা তাহার উপর অন্য কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা। শাসনকর্তাদের পক্ষে কাহারও শাস্তি বা মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য বিচারপ্রসঙ্গে কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। বিচার চলিবে নিতান্তই আইন অনুযায়ী, কোন রাষ্ট্রনায়ক বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য নহে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য

বিচার বিভাগের কার্যাবলী : ১। স্বভাবতঃই বিচার বিভাগের প্রথম ও প্রধান কার্য হইল ন্যায় বিচার করা। এ জন্য বিচারককে তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে আনীত সাক্ষ্য ও প্রমাণের বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত ঘটনা নির্ধারণ করিতে হইবে। তাহার পর, সেই ঘটনা সম্পর্কে বর্তমান আইনের প্রয়োগ করিয়া রায় দিতে হইবে। ইহা হইতেই উদ্ভূত হয় আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা। কারণ সাধারণ ভাষায় (In general terms) আইন প্রণীত হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে সে আইনের তাৎপর্য বিচারককেই নির্ধারণ করিতে হইবে।

বিচার

২। যে সব ক্ষেত্রে আইনের ভাষা দ্ব্যর্থবোধক অথবা অনিশ্চিত, অথবা পরস্পরবিরোধী একাধিক আইনের অস্তিত্ব, রহিয়াছে কিংবা কোন নির্দিষ্ট আইন নাই, সে সকল ক্ষেত্রেও বিচারককেই নির্ধারণ করিতে হইবে প্রয়োগযোগ্য প্রকৃত আইন কি, সে আইনের অর্থ ও তাৎপর্যই বা কি? এমন কি, পরস্পরবিরোধী আইনের অস্তিত্ব থাকিলে তাঁহাকেই বলিতে হইবে এই বিশেষ ক্ষেত্রে কোন আইনের প্রয়োগ অনিবার্য আর যেখানে কোন আইনই নাই, সেইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষ মামলার নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে এবং ন্যায়, নীতি ও সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া বিচারককে রায় দিতে হয়। আর এই সূত্র হইতেই জন্মগ্রহণ করে বিচারক প্রণীত আইন (Judge-made laws)। বিচারক শুধু আইনের ব্যাখ্যাতা নহেন, আইন প্রণয়নও করেন ;

আইনের ভাষ্যে আইন প্রণয়ন

৩। কোন বিশেষ আইনের খসড়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান বিচার-কর্তৃপক্ষের মতামত আহ্বান করিতে পারেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা সর্বত্রই নাই। কিন্তু যেখানে ইহা বর্তমান, সেখানে বিচারকগণ পরোক্ষ আইন প্রনয়নে অংশগ্রহণ করিতেছেন।

উপদেশ দান

৪। ইহা ছাড়া আইনভঙ্গের সম্ভাবনা রোধ করিবার জন্য বিচারশালায় আবেদন করা যায় অনুরূপ ক্ষেত্রে আশঙ্কার সত্যতা সম্পর্কে বিচারক আশ্বস্ত বোধ করিলে 'নিষেধাজ্ঞা (Restraining Orders or Instructions) জারি করিতে পারেন। সে অবস্থায় আইনভঙ্গ যে হইবে না তাহা প্রমাণ করার দায়িত্ব পড়িবে অপর পক্ষের উপর।

নিরোধসূচক নির্দেশদান

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষার ভার বিচারবিভাগের উপর। ইহার ফলস্বরূপ আইনবিভাগের প্রণীত আইন ও শাসন বিভাগ সম্পাদিত কার্যকেও বিচার বিভাগ শাসনতন্ত্রবিরোধী ও সেজন্য বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে। ইহার তাৎপর্য পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কীয় আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা

৬। শাসন বিভাগীয় বিভিন্ন কর্তব্যও বিচার বিভাগকে সম্পাদন করিতে হয়। কেরাণী ও অধস্তন কর্মচারী নিয়োগ, 'লাইসেন্স' বা অনুমতি দান, বিশেষক্ষেত্রে তত্ত্বধায়ক (Guardian) বা ট্রাস্টী (Trustee) নিয়োগ, মৃতের 'উইলের' (Will) অনুমোদন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (Receiver) নিয়োগ, প্রভৃতি বহুবিধ কার্যের ভার বিচার বিভাগকে গ্রহণ করিতে হয়। বিদেশীকে নাগরিকত্ব প্রদান অথবা বিবাহ সম্পাদনও অনেক ক্ষেত্রে বিচার বিভাগেরই দায়িত্ব।

শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব

বিচারবিভাগীয় সংগঠন (Organisation of Judiciary): নিম্নতম হইতে উচ্চতম, একের পর এক ধাপে ধাপে সংগঠিত হইয়াছে বিচারকমণ্ডলী, নির্ধারিত হইয়াছে তাঁহাদের এক্তিয়ারভুক্ত কর্মতালিকা। ব্রিটিশ প্রভাবিত দেশে বিচারকেরা, আপীল মামলা না হইলে, স্বতন্ত্রভাবে মামলা বিচার করেন। ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে একাধিক বিচারপতি সমষ্টিগতভাবে বিচার করিয়া থাকেন। ফ্রান্সে সমষ্টিগত বিচারকমণ্ডলীর সংখ্যা তিন হইতে পঞ্চদশ পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার ফলে অবশ্য বিচারক সংখ্যা ও ব্যয়ের আয়তন বাড়িয়া যায়। ইঙ্গ-মার্কিন বিচার পদ্ধতিতে ঘূর্ণ্যমান বিচারকের (Judges go 'on circuit') ব্যবস্থা রহিয়াছে। অর্থাৎ, মামলাকারীদের সুবিধার্থে বিচারকগণই পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বিচার করেন। ফ্রান্স বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিচারকের আসন একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে। বিচার বিভাগীয় সংগঠনের অপর দিক হইল এক্তিয়ারের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ। যে বিচারশালায় নিম্নতর বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করা

যায় তাহাকে 'আপীল আদালত' (Court of Appeliate Jurisdiction) এবং যেখানে মামলার আদি পত্তন তাহাকে সাধারণ আদালত বলে (Court of Original Jurisdiction)। নিম্নতম বিচারালয়ের স্বভাবতঃই কোন 'আপীল' সংক্রান্ত এক্তিয়ার নাই ; সর্বোচ্চ আদালতে আদি বিচার না হইতেও পারে, কিন্তু তাহার প্রধান কার্য 'আপীলের' বিচার করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারসভার সংগঠন দ্বিবিধ,—(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও (২) অঙ্গরাজ্যের আদালত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের বিচার প্রথমোক্ত আদালত ও অঙ্গরাজ্যের আইনসংক্রান্ত বিচার অন্য আদালতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকল যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ ব্যবস্থা নাই। ভারতীয় ইউনিয়নে একটিই সম্পূর্ণাঙ্গ বিচার বিভাগ।

ইহা ছাডা প্রায় সকল রাষ্ট্রেই সাধারণ আদালতের পাশাপাশি বিশেষ ধরনের বিচার ব্যবস্থা থাকে। এই বিশেষ আদালতের শ্রেণীতে পড়ে শাসন বিভাগীয় বিচালয় (Administrative Court), শ্রম-বিরোধ নিষ্পত্তির সংক্রান্ত বিচারশালা,সামরিক বিচারালয় প্রভৃতি।

শাসন বিভাগীয় বিচারালয়, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে প্রচলিত ইহা সাধারণতঃ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রাপ্যের দাবি সংক্রান্ত মামলার বিচার করে। এই বিচার ব্যবস্থার সংগঠনই পৃথক। সাধারণ আইন হইতে ইহাদের আইনও ভিন্ন। ডাঃ গার্নারের মতে, ফ্রান্সে আদিতে শাসনবিভাগীয় কর্মচারীকে বিচার বিভাগের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ব্যবস্থা হইয়াছিল ; ক্রমে ইহা শাসন বিভাগের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হইতে জনসাধারণকে রক্ষার অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করা যায় ; বাহিরের আইনজ্ঞ প্রয়োজন হয় না ; মামলার ব্যয় অতি সামান্য ; বিচার অত্যন্ত দ্রুত। কিন্তু ইংলণ্ডে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা চলে না। যে সরকারী কর্মচারী দ্বারা অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সেই কর্মচারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা আনিতে পারে। ফল সব সময়ে আশানুরূপ হয় না।

ফরাসী বা জার্মান শাসন বিভাগীয় আদালত সম্পর্কে বহুবিধ সমালোচনা হইয়া থাকে ;—এখানে কর্মচারীদের বাঁচাইবার ব্যবস্থা হয় ; বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নহেন ; সরকারের নির্দেশানুযায়ী তাঁহারা রায় দিয়া থাকেন ; তাহা ছাডা এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট এবং একই আইনের দ্বারা বিচার হয় না ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ডাঃ গার্নারের মতে এ সমালোচনার প্রকৃত ভিত্তি নাই। কারণ, বাস্তবে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর বিশেষ সুবিধা আছে ; এবং অন্যত্র

যে সকল ক্ষেত্রে কোনো সুবিচার পাইবার সম্ভবনাই ছিল না, শাসন বিভাগীয় আদালতে সেই ধরণের মামলায় ক্ষতিপূরণ পাওয়া সম্ভব করিয়াছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের আশঙ্কাও অমূলক; কারণ বাস্তবে তাহা ঘটে না। সুতরাং এ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় দাবি মিটাইতেছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of Judiciary); বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর:

১। **বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি** (Appointment of Judges): বিচারকগণের বিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, মর্যাদাবোধসম্পন্ন ও স্বাধীনমতাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতি তিন প্রকার: (১) শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযোগ; (২) আইনসভা কর্তৃক মনোনয়ন ও (৩) জনসাধারণের দ্বার নির্বাচন। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচন পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যে এবং সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনে প্রচলিত আছে। ল্যাস্কির মতে এ পদ্ধতি নিকৃষ্ট।*

শাসন বিভাগের মনোনয়ন বাঞ্ছনীয়

জনপ্রিয়তার উপর বিচারকের কার্যকাল নির্ভর করিলে নিরপেক্ষ বিচার-প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত। পুনর্নির্বাচনে জয়লাভের আশায় বিচারক ন্যায় বিচারের পথ ত্যাগ করিয়া জনপ্রিয় রায় দিবার প্রচেষ্টা করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, বিচারকের প্রয়োজনীয় যে গুণগুলির কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, জনপ্রিয় ব্যক্তির তাহা না থাকিতেও পারে। ভোটদাতাদের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভিতরে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন প্রার্থীকে বাছিয়া বাহির করা সম্ভব নাও হইতে পারে। সাধারণ লোক রাজনৈতিক যোগসূত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে, অথবা ঢকানিনাদসহকারে প্রচারিত মামলার সহিত জড়িত নামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উপরন্তু, বিচারকের পদপ্রার্থী নির্বাচনের নিমিত্ত কোনরূপ কার্যসূচী রাখিতে পারেন। নির্বাচন যদি জীবৎকালের জন্য হয়, তবে হয়ত অনুপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হইয়া যাইবে; আবার দ্রুত পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকিলে সেইদিকে নজর রাখিয়া বিচারক এমন অনেক কিছুই করিতে পারেন যাহা তাহার আদৌ করা উচিত নয়। বিশেষতঃ দলীয় রাজনীতির অশুভ প্রভাব বিচারসভাকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করিতে পারে।

আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন সম্পর্কেও অনুরূপ আপত্তি উঠিয়া থাকে; কারণ এক্ষেত্রেও স্থানীয় স্বার্থ, দলীয় চাপ এবং কুচক্রের প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করিবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা।

* "...Of all methods of appointment, that of election by the people at large is without exception the worst—Laski. Grammar of Politics, P 545

সমালোচনা থাকিলেও তুলনামূলক বিচারে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগই বাঞ্ছনীয়। ল্যাস্কি অবশ্য এক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বলিয়াছেন যে নিয়োগ করা হইবে বিচারবিভাগীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে; তবে সেই প্রস্তাবে বিচারবিভাগের সর্ববিধ কার্যের প্রতিনিধিত্বমূলক বিচারকদের একটি কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন; ("...to make appointments on the recommendation of the Minister of Justice, with the consent of a standing committee of the judges, which would represent all sides of their work") *

২। **কার্যকাল নির্ধারণ** (The Judicial Tenure): আমেরিকার অঙ্গরাজ্য ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনে বিচারকদিগের কার্যকাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ইহা সাধারণতঃ ছয় হইতে নয় বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু কাম্য পদ্ধতি হইল বিচারকগণকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা, যাহাতে অক্ষমতা বা অপরাধের কারণ ব্যতীত তাঁহাদিগের অপসারণ সম্ভব না হয়।

স্থায়ী চাকুরীই কাম্য পদ্ধতি

৩। **বিচারকগণের অপসারণ** (Removal of Judges): অক্ষম বা দুর্নীতিপরায়ণ বিচারকের অপসারণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু অন্য বিষয় যাহাতে এ কার্যকে প্রভাবিত না করিতে পারে, সেজন্য আইনসভা কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ হইতে উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে রাজাকে অনুরোধ জানাইলে, কোন বিশেষ বিচারককে পদচ্যুত করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস কর্তৃক বিশেষ অভিযোগের বিচার ব্যবস্থা (impeachment) রহিয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নে বিশেষ পদ্ধতিতে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতির নিকট বিশেষ আবেদন করিতে হয়।

অক্ষমতা বা অপরাধের জন্য আইনবিভাগের আবেদনে অপসারণ

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে বিচারকগণের অবসর গ্রহণের উপযুক্ত বয়স হইল সপ্ততিতম বৎসর। অনেকের তাহার পরও কর্মক্ষমতা থাকে। তথাপি বয়স আরও বাড়িলে পূর্ববর্তী ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে।

৪। **বেতন ও ভাতা** (Salaries and Emoluments): বিচারকগণের উপার্জন সেই পর্যায়ের হওয়া উচিত যাহাতে শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞগণ এ দায়িত্ব গ্রহণ

GARNER—Political Science and Government

করিতে অস্বীকার না করেন, যাহাতে তাঁহাদের অভাববোধ অথবা ক্ষুদ্রতাবোধও মনে না জাগে। কার্যকালীন তাঁহাদের বেতন ও ভাতার পরিমাণ ও হার পরিবর্তিত করা উচিত নহে; কারণ, এ আশঙ্কা তাঁহাদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা বিঘ্নিত করিতে পারে।

পদমর্যাদা উপযুক্ত বেতন ও ভাতা

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম প্রয়োজনীয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অধ্যাপক ল্যাস্কি, প্রভৃতির সমালোচনা হইল যে, বিচারকগণ যে শিক্ষা পান তাহা সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব; যে বয়সে তাঁহারা বিচারক নিযুক্ত হন তাহা সাধারণতঃ রক্ষণশীলতার অনুকূল; তাঁহারা যে সামাজিক পরিবেশে চলাফেরা করিয়া থাকেন তাহাও সাধারণতঃ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজ। এই সামগ্রিক জীবন তাঁহাদের অভিজ্ঞতাকে সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ করে এবং এমন মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যাহাতে নূতন ধারণা বা মতবাদ গ্রহণ করা দুষ্কর। কিন্তু ইহার উপরেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিচারক শেষ পর্যন্ত আইনেরই প্রয়োগ করিতেছেন। রাষ্ট্রের যে উদ্দেশ্য আইনের মারফৎ প্রকাশিত হইতেছে বিচারক সেই উদ্দেশ্যরই প্রয়োগ কর্তা।

অতিরিক্ত পাঠ্য

GARNER—Political Science and Government
LASKI—Grammar of Politics

দশম অধ্যায়

বিকেন্দ্রীকরণ নীতি

(The Theory of Decentralisation)

উনবিংশ শতাব্দীর পুলিশরাষ্ট্র, যাহার কর্মপরিধি আইন শৃংখলা রক্ষার মধ্যেই প্রায় আবদ্ধ ছিল, বিংশ শতাব্দীতে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলে রাষ্ট্রের কর্তব্য জটিল ও বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে। সেই জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। বিকেন্দ্রীকরণ নীতিগত ভাবেও সমর্থনীয়, কারণ ইহা গণতন্ত্রসম্মত।

তিনপ্রকারের বিকেন্দ্রীকরণ আধুনিক রাষ্ট্রে দেখা যায়।

(১) আঞ্চলিক (Territorial) বিকেন্দ্রীকরণ, (২) কর্তব্যগত (Functional). বিকেন্দ্রীকরণ ও (৩) স্বায়ত্তশাসন (Local Self-Government), মূলক বিকেন্দ্রীকরণ এই তিন পদ্ধতিই সাফল্যমণ্ডিত হইযাছে।

রাষ্ট্রক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Doctrine of Decentralisation): আধুনিক যুগে রাষ্ট্র মানুষের জীবনব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যতীত রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় কার্য বেশি কিছু ছিল না। শিল্পায়নের দরুণ সমাজব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে রাষ্ট্র লোককল্যাণের তাগিদে এমন সকল কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল যাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও কল্পনাতীত ছিল। আজ রাষ্ট্র বলিতে কল্যাণকামী রাষ্ট্র অথবা Social Service State বা Welfare State বোঝায়। অর্থাৎ আধুনিক কালে রাষ্ট্র সাধারণভাবে সর্বোদয়ের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পুলিশ-রাষ্ট্র আজ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে

সেই অনুপাতে আজ রাষ্ট্রের ক্ষমতা অতি বিস্তৃত। শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষা নয়; অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রোগীর সেবা, শিশু ও মাতৃজাতির কল্যাণ-সাধন, দুঃস্থের সহায়তা প্রভৃতি সর্বপ্রকারের সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় আজ রাষ্ট্র লিপ্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র আজ যে সকল কর্তব্যের দায়িত্ব লইয়াছে তাহা প্রসারতায় বিপুল ও গুণগতভাবে অত্যন্ত জটিল। তদনুপাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিরাট আকারে দেখা দিয়াছে। এই ক্ষমতা রাষ্ট্র কীভাবে ব্যবহার করিবে তাহার উপর মানুষের কল্যাণ ও স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। যদি এই ক্ষমতা সুষ্ঠুনীতি অনুযায়ী ব্যবহৃত না হয় তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন ও গণতন্ত্র মিথ্যায়

আধুনিক-রাষ্ট্রের কর্মপরিধির বিপুল বিস্তার

পর্যবসিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব সুসম্পন্ন না হইলে শুধু যে রাষ্ট্রের অর্থনাশ হয় তাহা নয় সাধারণ মানুষের তাহাতে দুঃখ-কষ্টেরও সীমা থাকে না।

বিকেন্দ্রীকরণের নীতি

আধুনিক রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলি সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য যে নীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাকে বিকেন্দ্রীকরণ-নীতি বলে। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে এবং একই কেন্দ্র হইতে রাষ্ট্রের অসংখ্য রকমের কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা হইলে কোন কর্তব্যই সুপরিচালিত হইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্মের বিপুলতা ও বিরাটত্বের ভারে শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। রাষ্ট্র যদি বৃহৎ হয় তাহা হইলে এই বিপদ আরও ভয়ঙ্কর আকারে দেখা দিতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতেব ন্যায় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিতে যদি বিভিন্ন রাজ্য (state) না থাকিত, যদি এই রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারগুলিকেই শাসন ও অন্যান্য ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত, সন্দেহ নাই। কারণ একই কেন্দ্র হইতে একই সরকারের পক্ষে একটি বিরাট দেশের বিপুল, জটিল ও অসংখ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধান সম্ভব নহে। আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মপরিধির বিস্তারের দরুণ জটিলতা সৃষ্টির জন্য, অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের রাষ্ট্রের পক্ষেও কেন্দ্রীভুত ক্ষমতা ব্যবহার অসমীচীন ও বিপজ্জনক।

বিকেন্দ্রীকরণ নীতির তিনটি পদ্ধতি

রাষ্ট্রদার্শনিকেরা তিন শ্রেণীর বিকেন্দ্রীকরণ-নীতির কথা চিন্তা করিয়াছেন। (১) আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ (Territorial Decentralisation); (২) কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণ (Functional Decentralisation); (৩) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক বিকেন্দ্রীকরণ (Local Self-Government).

(১) আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ

(১) **আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণঃ** এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া এক একটি অঞ্চলে এক একটি সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আইনগত, শাসনগত ও বিচারগত ক্ষমতা ব্যবহার করেন। এই জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক সরকারের ব্যবস্থাপক সভা, মন্ত্রিমণ্ডলী ও বিচারালয়ের ব্যবস্থা থাকে। ভারত ইউনিয়ন সংবিধান মারফৎ এই নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকার গঠন করিয়াছেন। অর্থাৎ ভারত-রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হইয়া কতকগুলি দেওয়া হইয়াছে ইউনিয়ন সরকারকে আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্য-

সরকারগুলিই ক্ষমতার অধিকারী। এইরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের কর্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি বিভিন্নভাবে কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে। প্রতি দেশের শাসনপদ্ধতির ইতিহাস হইতে ইহা উদ্ভূত হয়।

(২) **কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণ**ঃ এই প্রকারের বিকেন্দ্রীকরণ কোন বিশেষ কর্তব্য অবলম্বন করিয়া ঘটিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বোর্ডটির উপর রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বৈদ্যুতীকরণের সমস্ত কর্তব্য ন্যস্ত রহিয়াছে। রাজ্য সরকারের যে এই বোর্ডের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই তাহা নহে। প্রয়োজন হইলে শেষ পর্যায়ে সে ক্ষমতার ব্যবহার সরকার করিতে পারেন। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে কার্যনির্বাহের জন্য একটি বিশেষ বোর্ডকে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যভার দেওয়া হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (Bord of Secondary Education) এমনি আর একটি মোটামুটিভাবে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রতি দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষ্ঠভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের হস্তে রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্পণ করিয়া থাকেন। শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে এইরূপ বিকেন্দ্রীকরণের নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্র ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরেও নির্দিষ্ট কার্যের ভার দিতে পারেন।

(২) কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণ

(৩) **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক বিকেন্দ্রীকরণ**ঃ এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের মধ্যে ছোট ছোট আয়তন লইয়া, শহর অঞ্চলে পৌর প্রতিষ্ঠান ও পল্লী-অঞ্চলের পঞ্চায়েতের হস্তে পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, আলোর ব্যবস্থা, আবর্জনার পরিষ্কার প্রভৃতি কাজের ভার দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষে এই সকল ছোটখাট কাজে হাত দেওয়া সময়াভাবে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় প্রতিনিধিরাই নিজেদের সহরের বা গ্রামের ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অভাব কিভাবে দূর করা যায় তাহা ভাল করিয়া বোঝেন। এইজন্য উল্লিখিত চাহিদাগুলি পূরণ করিবার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপর নির্ভর করাই সমীচীন। তৃতীয়তঃ, স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকেরা গণতান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করে এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হইবার সুযোগ পায়।

(৩) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-মূলক বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণের নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের উপর আধুনিক শাসনপদ্ধতির সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কল্যাণ রাষ্ট্রে এই নীতি প্রয়োগ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, কল্যাণ রাষ্ট্রে সরকারের কর্তব্য জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়াছে।

অতিরিক্ত পাঠ্য

Laski—H. J. Grammar of Politics

Laski—H. J. Introduction of Politics.

একাদশ অধ্যায়

নির্বাচক মণ্ডলী

(The Electorate*)

[আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বমূলক। সুতরাং মূল প্রশ্ন হইল: (১) নির্বাচনের অধিকার কাহারা পাইবে; (২) নির্বাচন পদ্ধতি কি প্রকারে হইবে, বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘুর নির্বাচনের কি ব্যবস্থা; এবং (৩) নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত কি প্রকারের সম্পর্ক থাকিবে।

গণতন্ত্রের যুক্তিই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের যুক্তি। ইহার বিরোধিতা মূলতঃ আসিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে যাহারা জনসাধারণের মতামত দিবার অধিকারে বিশ্বাস করে না। অপর দিকে আর বিভিন্ন দল ভোটাধিকার সঙ্কুচিত রাখিতে চাহেন। তাঁহারা সম্পত্তির মালিকানার প্রশ্ন তুলিয়া দরিদ্রকে, শিক্ষার প্রশ্ন তুলিয়া অশিক্ষিতকে ও সাংসারিক শান্তির প্রশ্নে নারীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। ইঁহারা বলিতে চাহেন ভোট অধিকারের বস্তু নহে, ইহা পবিত্র দায়িত্ব; সকলের এ দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা নাই। কিন্তু সম্পত্তির অভাব, অশিক্ষা বা নারীত্ব এ কোনটাই ভোটাধিকার বঞ্চনার পক্ষে যুক্তিসহ বক্তব্য উপস্থিত করিতে পারে না। আধুনিক জগতে গণতান্ত্রিকনীতির দিক হইতে, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য বহু আন্দোলন ও ত্যাগ স্বীকারের ইতিহাসও রহিয়াছে।

গণতন্ত্রকে সঙ্কুচিত করবার অপর কৌশল পরোক্ষ নির্বাচন। অর্থাৎ জনসাধারণ মূলতঃ প্রতিনিধিকে নির্বাচন করিতেছে না, নির্বাচকদের নির্বাচিত করিতেছে। প্রস্তাবকেরা এ কথাটা ভাবিয়া দেখেন না যে নির্বাচকদের নির্বাচনের মত বুদ্ধিমত্তা যদি জনতার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রার্থী-নির্বাচনের যোগ্যতাও তাহাদের আছে। উপরন্তু দলপ্রথার বিকাশে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকরী থাকে না।

গণতন্ত্রে যাহাতে সর্ববিধ মতই প্রতিনিধিত্ব পায় তাহার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রস্তাবিত হইয়াছে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি। কিন্তু অধিকাংশ প্রস্তাবই দুর্বলতা ও জটিলতাপূর্ণ। বিশেষতঃ ইহার ফল হয় আইনসভায় দলীয় কলহ ও দুর্বল সরকার গঠনে।

প্রতিনিধি নিজস্ব বিচারবুদ্ধিতে প্রতিনিধিত্ব করিবেন তাহা স্বীকৃত। কিন্তু তাঁহার উপর ভোটারদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রস্তাব অধিকাংশের সমর্থন পায় না। সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি এবং দলীয় প্রথার ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই নির্বাচনীযন্ত্রকে দোষমুক্ত করা যাইবে।]

আধুনিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার হইতে বাধ্য সে সম্পর্কে যুক্তিগুলি ১৭৮৯ সালের বিপ্লবী ফরাসী শাসনতন্ত্র প্রণয়নী সভা (French Constituent Assembly of 1789) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিগুলি হইল নিম্নরূপ :

আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বমূলক

১। বৃহৎ এলাকায় বিরাটসংখ্যক জনতাকে লইয়া যথাযথ আলোচনা সম্ভব নহে।

২। প্রত্যেকটি ব্যক্তির মতামত গ্রহণের প্রয়োজন হয় না, জনসাধারণের ভিতর হইতে বাছাই করা ব্যক্তিদের নির্দেশই যথেষ্ট।

৩। আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা বা অবকাশ সকলের নাই।

৪। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্যক্রম অনুষ্ঠিত না হইলে শুধুই হট্টগোল ও উত্তেজনা সৃষ্টি হইবে ;

৫। কর্মবিভাগের সুফল পাইতে হইলেও সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে শাসনভার তাঁহাদের প্রতিনিধিদের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়।*

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার যখন অপরিহার্য, তখন নির্ধারণ করা প্রয়োজন—(ক) প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার বা ভোটের অধিকার কাহারা পাইবে ; (খ) নির্বাচনের সহিত নির্বাচকের কিরূপ সম্পর্ক থাকিবে ; (গ) নির্বাচন পদ্ধতি কি প্রকারের হইবে ; এবং (ঘ) সংখ্যা-লঘুদের প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ বা সুবিধা কি।

প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কীয় মূল সমস্যাবলী

নির্বাচকমণ্ডলী বলিতে বুঝিব রাষ্ট্রান্তর্গত সেই জনসংখ্যা যাহাদের আইনসভা বা নির্বাচক সংস্থায় (Electoral College) ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আছে। গণতন্ত্র বলিতে যদি 'জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত, জনসাধারণের সরকারকে বোঝায়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই আইনসভা বা প্রধান শাসন নির্বাচনে সর্বসাধারণের ভোট থাকা উচিত। অবশ্য সদ্যোজাত শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত, একথা কেহ বলে না ; বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির জন্যও কেহ ভোটাধিকার দাবি করিতেছে না। ইহাদের বাদ দিলে প্রাপ্তবয়স্ক সকল মানুষেরই ভোটের অধিকার থাকা প্রয়োজন। স্বাভাবিক অধিকারের যুক্তিতে, রাষ্ট্রকল্যাণ ও জনস্বার্থের যুক্তিতে, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের যুক্তিতে বস্তুতঃ গণতন্ত্রসম্পর্কিত সমস্তযুক্তি হইতেই

গণতন্ত্রের যুক্তিই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের যুক্তি :

* Dr. Finer—The Theory and Practice of Modern Covernment. p. 120

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Universal Adult Franchise) অনিবার্য হইয়া উঠে।* মিল বলিয়াছেন, "যদি তাহাকে অর্থপ্রদান করিতে, যুদ্ধ করিতে, নিঃসংশয়ে মান্য করিতে বাধ্য হইতে হয়, তবে সে সম্বন্ধে কারণ জানিবার আইনসঙ্গত অধিকার তাহার থাকা উচিত; তাহার সম্মতি গ্রহণ ও মতামতের যথাযথ মূল্যদান করা উচিত। পূর্ণাঙ্গ সভ্য জাতিতে অন্ত্যজের স্থান থাকাউচিত নহে।" **

স্বাভাবিক অধিকার
জনতার সার্বভৌমত্ব, জন কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা
ব্যক্তিত্ব বিকাশের দাদি

কিন্তু লক্, রুশো মিল্ যাহাই বলুন না কেন, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি যতই সবল হউক না কেন, এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে এক শতাব্দীর উপর কাটিয়া গিয়াছে। কারণ রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাঁহারা আসীন ছিলেন তাঁহাদের পক্ষে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ক্ষতিজনক। একমাত্র হিংসাত্মক আন্দোলন বা তাহার আশঙ্কাই ইহাদের একচেটিয়া মনোবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভোটাধিকার বঞ্চিত জনতা যতদিন অসংগঠিত ছিল, এবং যতদিন অধিকার আদায়ের মূল্য দিতে তাহাদের প্রস্তুতির অভাব ছিল যতদিন অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। *** ইংলণ্ডে ১৮১৫ সালে জনতার রুদ্র আন্দোলন ও পরবর্তী অবস্থার ফলে পার্লামেণ্টে Reform Bill উত্থাপিত হয়। তারপর আসে ১৮৪৮ সালে চার্টিস্ট্ আন্দোলন (Chartist Movement)। বস্তুতঃ ১৮৬৭ সালের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের পরেই দরিদ্র মানুষের পার্লামেণ্টে প্রবেশপথ খুলিয়া যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ইহাদের প্রভাবে এবং মূল দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভোটাকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া প্রথমে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও বহুপরে ১৯২৮ সালে, বয়ঃপ্রাপ্তা নারী ভোটের অধিকার পায়। লিপ্‌সন একটি তালিকা করিয়া দেখাইয়াছেন ইংলণ্ডে ভোটাধিকার সংক্রান্ত আইন পরিবর্তনের সাথে সাথে কিভাবে ভোটাধিকারসম্পন্ন জনতার আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুকঠিন আন্দোলন ও ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড

---

* এই বইয়ের প্রথম খণ্ড, একাদশ অধ্যায় ও দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

** If he is compelled to pay, if he may be compelled to fight, if he is required implicitly to obey, he should legally he entitled to be told what for ; to have his consent asked, and his opinion counted at his worth. There ought to be no pariahs in full grown and civilised nation. J. S. Mill—Representative Government (World Classics Ed.)—p. 277

*** Over one hundred years of struggle were needed to secure this although there was a widespread consciousness of the justice of the universal

ভোটাধিকার সম্প্রসারণের আইন প্রণয়নের বৎসর	যে বিশেষ বৎসরে ভোটদাতা তালিকাভুক্ত হইয়াছে	জনসংখ্যার সহিত ভোটদাতার শতকরা আনুপাতিক হার
	১৮৩০	২০৭
১৮৩২	১৮৩৩	৪ ৪
	১৮৬৬	৫.৬
১৮৬৭	১৮৬৯	৮.৬
	১৮৮৩	৯.৯
১৮৮৪	১৮৮৬	১৬.৮
	১৯১০	১৭.৬
১৯১৮	১৯১৮	৪৫.৬
	১৯২৪	৪৮.৩
১৯২৮	১৯২৯	৬৩.৬
	১৯৫০	৬৯.০০ *

ফ্রান্সে বারবার বিপ্লবী আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হইয়াছে। জার্মানীতে ১৮৪৮সালের আন্দোলনের পর বিসমার্কের (Bismarck) কৌশলে ভোটাধিকার ব্যপ্তিকরণ সত্ত্বেও তাহা প্রুশিয়ায় সঙ্কুচিত থাকিয়া যায়, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিপ্লবী পরিস্থিতিই এ অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করে।

ফ্রান্স ও জার্মানীতে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাধিকার নির্ধারণের ভার ছিল অঙ্গরাজ্যগুলির উপর। সুতরাং ভোটাধিকারে পার্থক্য থাকিয়া যায়। ১৮৬৫ সালে শাসনতান্ত্রিক সংবিধানের মারফৎ দাসত্বপ্রথার অবসান করা হয়। ১৮৭০ সালে শাসনতন্ত্রের পঞ্চদশ সংশোধনী ঘোষণা করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কোন অঙ্গরাজ্যে কোন নাগরিকের ভোটাধিকার কুল, গাত্রবর্ণ বা প্রাক্তন দাস-অবস্থার জন্যে ("on account of race, colour or previous condition of servitute") সঙ্কুচিত

vote at the beginning of that time. But those in possession of political power realised that concessions would mean loss; only violence or the fear of violence could overcome this monopolistic attitude. This fear itself was ef small effect while the disenfranchised were unorganised—anb even when they were unwilling to act violently and the minority controlled the armed and disciplined forces—Dr. Finer, The Theory and practice of Modern Covernment, p. 221

* Laski Lipsob. The Great Issues of politics, p. 137.

করা যাইবে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সংশোধনীতে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করা হইল না যে সকল নিগ্রো বা ইণ্ডিয়ান ভোটাধিকার পাইবে। ফলে, কুল বা গাত্রবর্ণ না উল্লেখ করিয়া মাথা-গুণতি কর (Poll Tax) বা শিক্ষা-সম্পর্কীয় জটিল বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভোটাধিকার সঙ্কোচনের সুযোগ এখানে রহিয়াই গেল। ১৯১৯ সালে শাসনতন্ত্রের উনবিংশ সংশোধনীয় মারফৎ নারীদের অধিকার স্বীকৃত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

ভারতীয় ইউনিয়ন

স্বাধীনতার পর ভারতের ১৯৫০ সালে গৃহীত শাসনতন্ত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

গণতন্ত্রের বিরোধিগণ স্বভাবতঃই সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তাহাদের যুক্তি পূর্বেই আলোচিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, গণতন্ত্রের মূলনীতি গ্রহণ করিয়াও ভোটাধিকারের সঙ্কোচনের পক্ষে দুই ধরণের যুক্তি দেখানো হয়। বলা হয় যে, ভোটের অধিকার না থাকার ফলে যদি সে অংশের কোনক্রমেই ক্ষতি বা বঞ্চনার সম্ভাবনা না থাকে তবে তাহাদের ভোটের প্রয়োজন নাই। যেমন, মাতা, স্ত্রী, কন্যা, বা ভগিনীর ভোট না থাকিলেও, পরিবারস্থ পুরুষদের ভোটের দ্বারাই তাহাদের যথাযোগ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইতে পারে। অপর যুক্তি হইল, ভোট অধিকার মাত্র নয়; ইহা একটি গুরুদায়িত্ব। জাতির সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এ দায়িত্বের ব্যবহার করিতে হইবে; সুতরাং উপযুক্ত গুণ থাকিলেই ভোটের অধিকার পাওয়া যাইতে পারে। এ যুক্তির বাহকগণ ভোটাধিকারে যোগ্যতম তিনটী নিরিখ উপস্থিত করেন: (১) সম্পত্তির মালিকানা ও (২) কর প্রদান এবং (৩) উপযুক্ত শিক্ষা।

ভোটাধিকার সঙ্কোচনের পক্ষে যুক্তি

স্ত্রীজাতির ভোটের প্রয়োজন নাই

সম্পত্তির মালিকানা ও প্রদানের ভিত্তিতে* ভোটাধিকার নির্ধারিত করার পক্ষে যুক্তি হইল নিম্নরূপ:

সম্পত্তির মালিকানাও করপ্রদানের যুক্তি

আধুনিক আইনসভার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারণ, তথা কর নির্ধারণ। সুতরাং যাহারা কর প্রদান করে তাদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। নতুবা, দরিদ্র

* "Representation should be co-extensive with taxation, not stopping short of it, but also not going beyond it"—J. S. Mill—Representative Government (world classics Ed,) p. 279

ও অক্ষম জনতা অর্থের মূল্য বুঝিবে না, অপচয় করিবে, ঈর্ষান্বিত হইয়া ধনীদের উপর অত্যধিক করের বোঝা চাপাইবে; ইহার ফলে রাষ্ট্রে ধনোৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সকলের অমঙ্গল ঘটিবে। উপরন্তু সম্পত্তির মালিকানাই যথেষ্ট প্রমাণ যে -ইহারা পরিশ্রমী, বিচক্ষণ ও সঞ্চয়ী। সুতরাং এইরূপ চারিত্রিক গুণাবলী যাহার আছে ভোটের অধিকারও তাহাদেরই হওয়া উচিত।

আধুনিক মতবাদ স্বভাবতঃই এ যুক্তি অস্বীকার করে। সম্পত্তির মালিকানা মনুষ্যত্বের মানদণ্ড নহে। ধনসঞ্চয় অনেক সময়েই অসামাজিক, চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এমন কি, সমাজবিরোধী কার্যকলাপের ফল। বস্তুতঃ, দরিদ্র জনসাধারণকে ক্ষমতাব নাগালের বাহিরে রাখিয়া দিবাব জন্যই উপবোক্ত যুক্তি খাডা করা হইয়াছে। তাহা চাডা, বাস্তবক্ষেত্রে অন্ততঃ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কার্যে প্রয়োগ করাব ফলে, সমাজ ও রাষ্ট্র উচ্ছন্নে যায় নাই।

এ যুক্তিব অসাবতা

শিক্ষার অভাবকেও অনেকে ভোটের যোগ্যতা হারাইবার কারণ বলিয়া মনে করেন। আইনসভাব সদস্যগণকে নির্বাচন কবিতে গেলে যে বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও জাতীয় সমস্যা বুঝিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন; ইহাদের মতে অশিক্ষিত লোকের তাহা থাকিতে পারে না। নিজস্ব প্রকৃত স্বার্থ কি, তাহাই তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না; আবেগপূর্ণ বক্তৃতার মোহে ভুলিয়া তাহারা অযোগ্য লোককে নির্বাচন করিবে। মিলের মতে, যাহারা লিখিতে পড়িতে এবং সাধারণ অঙ্ক কষিতে পারে না তাহাদের কোনক্রমেই ভোটের অধিকার পাওয়া উচিত নহে।* অবশ্য ন্যায়ের বিচারে তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু কাহাকে 'শিক্ষিত' বলা যাইবে? আইনসভা হইতে এমন বহু জটিল আইন পাশ হইতেছে যে বিষয়ে প্রকৃত বিজ্ঞ মতামত জ্ঞাপন করা শুধু লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তি তো দূরের কথা দেশের শতকরা নব্বই জন লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে। বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকেও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে চূড়ান্ত অজ্ঞতার পরিচয় দিতে দেখা যায়। অপর দিকে অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে লিখিতে পড়িতে না জানা সত্ত্বেও, অশিক্ষিত, কৃষক, শ্রমজীবী, কারিকর, তাহাদের স্বভাবজাত জ্ঞান, বুদ্ধি

* "I regard it as wholly inadmissible that any person should participate in the suffrage, without being able to read, write, and, I will add, perform the common operations of arithmetic". J. S. Mill--Representative Covernment (world classics Ed.) p. 277—278

ও জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, সমাজ ও জাতির স্বার্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট ধীর স্থির বিচারক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকে। অশিক্ষা ব্যক্তিজীবনে দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা অশিক্ষিতের বুদ্ধি ও চরিত্রের দুর্বলতার পরিচায়ক নহে, দারিদ্র্যের সূচকমাত্র। যে বৈষম্যমূলক সমাজে সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, সেখানে অশিক্ষিতের ভোটাধিকার অস্বীকার করা এই সামাজিক অবস্থাকেই চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, কোন্ পর্যায়ের শিক্ষা যে রাজনৈতিক জ্ঞানের মানদণ্ড হইতে পারে সে বিষয়েও কেহ নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন নাই। সুতরাং অশিক্ষার অপরাধে ভোটাধিকার অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ভোটাধিকার যদি স্বীকৃত হইল তখন শেষ বাধা আসিল নারী সমাজ সম্পর্কে। বিভিন্ন যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইল যে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার থাকা উচিত নহে। যুক্তি গুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল:

ইহার বিপক্ষে যুক্তি

১। স্ত্রীলোককে ভোটের অধিকার দান করিলে, তাহার নারীত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে; পুরুষের সহিত পার্থক্যসূচক মূল গুণগুলি সে হারাইবে।

২। নারীত্বের বিশিষ্ট প্রকাশ হইল মাতৃত্বে; তাহার নির্দিষ্ট স্থান হইল গৃহাভ্যন্তরে। রাষ্ট্রনৈতিক সংঘাতকমূলক জীবন তাহার চরিত্রের সহিত অসামঞ্জস্য-পূর্ণ। যদি সে রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠে, তবে তাহার মাতৃত্বের দায়িত্বপালন ব্যাহত হইবে।

৩। পরিবারের সুখ-শান্তি নির্ভর করিতেছে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের উপর; সুতরাং নারীর ভোটাধিকার পারিবারিক সংহতি ও শান্তি বিঘ্নিত করিবে। কারণ, নির্বাচনের সময় পরিবার প্রার্থী সম্পর্কে একমত না হইতেও পারে; ফলে, বাহিরের কলহ গৃহে প্রবেশ করিবে।

৪। যদি স্ত্রীলোক পুরুষের অভিপ্রায় অনুসারে ভোট প্রদান করে, তবে একই ধরণের ভোট দ্বিগুণিত হইবে মাত্র; তাহার অধিক কোন লাভই হইবে না।

৫। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী দেশে নারীর ভোটাধিকার রাষ্ট্রক্ষমতায় জেসুইট (Jesuits) সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিস্তার করিবে। কারণ, যাজকের নির্দেশ স্ত্রীলোকগণ বাধ্যতামূলক বলিয়া মনে করে।

৬। স্ত্রীলোকগণ অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধে যোগদান করিতে অক্ষম বলিয়া তাহাদের ভোটের অধিকার পাওয়া উচিত নহে,—এইরূপ যুক্তিও উত্থাপিত হইয়াছে।

ন্যায় ও যুক্তির দিক হইতে উপরোক্ত বক্তব্যের সারবত্তা আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয় না।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের পক্ষে বক্তব্য নিম্নরূপ :

১। নারীও মানুষ; সুতরাং মানুষ হিসাবে স্ত্রীলোকের পুরুষের মতই সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত।

স্ত্রীলোকদের দাবির ন্যায্যতা

২। স্ত্রীলোকের শারীরিক দুর্বলতা ভোটাধিকার অস্বীকৃতির কোন কারণ হইতে পারে না। ভোটের তালিকায় নাম তুলিবার সময় পুরুষদের বল পরীক্ষা করা হয় না। বরং স্ত্রীলোকের নানাবিধ বিশেষ অসুবিধার জন্যই তাহাদের ভোটাধিকার থাকা উচিত; আইন-প্রণয়নে তাহাদের মতামত যাহাতে উপযুক্ত গুরুত্ব পায় তাহার নৈশ্চিত্যবিধান প্রয়োজন।

৩। আধুনিক যুগে স্ত্রীলোকগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ব্যাপারেই পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে সহযোগিতা প্রতিযোগিতা করিতেছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোন ভিত্তি থাকিতে পারে না।

৪। অনেকের মতে, স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারে পুরুষের স্বাভাবিক পুরুষতা, স্বার্থপরতা, আক্রমণমুখিতা ও শোষণপরায়ণতা সংযত ও শোধিত হইবে। সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর আইন-প্রণয়ন ত্বরান্বিত হইবে।

মিল বলিয়াছেন : নারীর ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ যুক্তি হইল যে তাহার দ্বারা পুরুষের ভোটেরই দ্বিত্বকরণ হইবে মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি? যদি তাহারা স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে, যথেষ্ট কল্যাণ ঘটিবে, যদি না করে ক্ষতি কিছু হইবে না। মানুষ হাঁটিতে না চাহিলেও পায়ের শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলিলে তাহার উপকারই হইবে।*

যুক্তির সংখ্যা আর না বাড়াইয়াও বলা যাইতে পারে যে বয়ঃপ্রাপ্ত নারীর

* 'The worst that is said is, that they would vote as mere dependents, at the vidding of their male relations. If it be so, let it be. If they think for themselves, great good will be done, and if they do not, no harm. It is benefit to human beings to take off their fetters, even if they do not, desire to walk. J. S, Mill—Representative Government (World classics Ed. p. 291-292

ভোটাধিকার বর্তমানে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। ফলে, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে নীতিগত বাধা আর কিছুই থাকে না। ল্যাস্কির একটি উদ্ধৃতি দিয়া এ আলোচনা সমাপ্ত করা যাইতে পারে: "সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি করিলে রাষ্ট্র সম্পর্কীয় আগ্রহ শুধু বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইবে। রাষ্ট্রনৈতিক যোগ্যতার সহিত সমার্থক করিবার মত বিদ্যার মান নির্ধারণের কোন কৌশল নির্ধারণ করা যায় নাই। সরকারী দান গ্রহণের অজুহাতে কাহাকেও ভোটাধিকারে বঞ্চিত করা বস্তুতঃ অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে অপরাধ বলিয়া চিহ্নিত করার নামান্তর। বিচারশালায় দণ্ডিত হইলে ভোট-অধিকারচ্যুত হওয়া বুঝিতে পারা যায়, যদি সামান্য কয়েকটি অপরাধের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ থাকে—উন্মত্ততা ও মানসিক বিকৃতির বিষয় অবশ্য স্বতন্ত্র। তবে সামাজিক অর্থে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটা যে সব ক্ষেত্রে অসম্ভব এই সহজ যুক্তিই ভোটাধিকার অস্বীকার করিবার কারণ।*

ভোটদানের পদ্ধতি: প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচন (Direct or Indirect Election): নির্বাচনপদ্ধতি সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণের ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই প্রার্থী নির্বাচিত হয়। পরোক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ ও প্রার্থীর মধ্যে একটি মধ্যবর্তী স্তর থাকে। অর্থাৎ, জনসারারণ ভোট দিয়া প্রার্থীকে নির্বাচন করিতেছে না, তাহাদের ভোটে নির্বাচিত হইতেছে একটি নির্বাচক সংস্থা (Electoral College); এই নির্বাচক সংস্থা ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত প্রার্থী নির্বাচিত হইতেছে। পরোক্ষ নির্বাচন প্রথার উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট: জনসাধারণ ও প্রার্থীর মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে; প্রার্থীর নির্বাচনে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ প্রভাব কমাইতে হইবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

* "Property as a basis for the ranchise merely limits the interests of the State to these of the owners of property. No technique is known whereby an educational qualification can be made synonymous with political fitness. Exclusion on the ground that a man has been in receipt of public relief is merely to stigmatise economic. misfortune as a crime. Exclusion on the ground of conviction by the courts is intelligible, if it is confined to a small range of offences...Lunacy and mental defect are, of course, different matters. in those cases exclusion is built on the simple ground that attainment of a best self is, in any sense implicit with social meaning, impossible."

Laski. A Grammar of politics. Pp. 311-312.

১। পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে সর্বপ্রথম যে যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইল সেই পুরাতন জনতার অযোগ্যতার কথা। জনসাধারণের বুদ্ধি বিবেচনা, শিক্ষা সামান্যই, তাহাদের সিদ্ধান্তের উপর আইনসভার সদস্য নির্বাচনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। সুতরাং তাহারা অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ অল্পসংখ্যক লোককে নির্বাচিত করুক, ইহারা বিজ্ঞতর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করিতে পারিবেন।

পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি

২। দ্বিতীয়তঃ, এ ব্যবস্থার ফলে দলীয় কলহ ও উত্তেজনা অনেক কম হয়। যেহেতু প্রকৃত প্রার্থীকে জনসাধারণ নির্বাচন করিতেছে না।

৩। ইহাতে ব্যয় ও সময় সংক্ষেপ হয় বলিয়াও দাবি করা হইয়া থাকে।

১। কিন্তু উপরোক্ত যুক্তি বিশেষ বিচারসহ নহে, কারণ জনসাধারণকে প্রকৃত প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে না দেওয়ার ফলে' তাহাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইল। ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে দাবি হইল ভোটের অধিকার ভিত্তি, সেই অধিকারে ভেজাল মিশাইয়া আসল উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করা হইল।

ইহারবিপক্ষে যুক্তি

২। গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র হইল সরকার জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবে। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় জনসাধারণের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করা হইল।

৩। জনসাধারণ যদি এতই অযোগ্য হয়, তবে তাহারা যে মধ্যবর্তী নির্বাচক সংস্থাকে বাছাই করিবে তাহারাও যে অনুরূপ অযোগ্য হইবে না তাহার ভরসা কি? আবার এই মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচনে উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তিদের খুঁজিয়া বাহির করিবার মত বুদ্ধি বিবেচনা যদি তাহাদের থাকে, তবে আসল প্রার্থীকে নিবাচন করিবার যোগ্যতাও তাহাদের নিশ্চয়ই রহিয়াছে।

৪। রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের ফলে পরোক্ষ নির্বাচনের প্রথা অবান্তর অনুষ্ঠানে পরিণত হইবার সম্ভবনা। কারণ দলগুলি 'নির্বাচক সংস্থা' নির্বাচনে পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতি আবদ্ধ দলীয় প্রার্থীদেরই জনসাধারণের সম্মুখে ভোট যুদ্ধে উপস্থিত করিবে! ফলে, ভোটাভুটি হইবে দলের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, নির্বাচক সংস্থায় যাহারা নির্বাচিত হইবে, তাহারা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী মোটেই ভোট প্রদান করিবে না; তাহাদের ভোট পড়িবে দলগত প্রার্থীর সপক্ষে। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত যেপ্রার্থী নির্বাচিত হইতেছে সে জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতেই জয়লাভ করিতেছে; জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক

দলীয় উত্তেজনার কোন অভাবই হইতেছে না; নির্বাচক সংস্থা নিজস্ব কোন বিচার-বিবেচনার পরিচয়ও দিতেছে না। শুধু নির্বাচন পদ্ধতিকে জটিল করিয়া তোলা ছাড়া ইহার আর কোনও উপকারিতা নাই।

৫। নির্বাচক সংস্থার সদস্যগণ যেহেতু অত্যন্ত সাময়িক ভাবে শুধু একজন বা কয়েকজনকে নির্বাচিত করিবার জন্য আসিয়াছে. সেজন্য তাহাদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান কম হওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু উৎকোচের বিষপ্রয়োগ অল্পসংখ্যক ব্যক্তির উপরেই সম্ভব; ব্যাপক জনসাধারণকে কেহ ঘুষের লোভে বশীভূত করিতে পারে না।

৬। ব্যয় ও সময় সংক্ষিপ্ত না হইয়া, আরও কালহরণ ও ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

৭। ইহার উপরে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলে সাধারণ মানুষের মনে যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা, আগ্রহ ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইবার সম্ভবনা থাকে, পরোক্ষ নির্বাচনে তাহা অপচিত হইতে বাধ্য।

উপরোক্ত কারণে নীতির দিক হইতে পরোক্ষ নির্বাচন সমর্থন করা চলে না।

নিবাচন পদ্ধতি: সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (Representation of Minorities):

সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতি হইল সমগ্র দেশকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্বাচনী এলাকায় (constituency) বিভক্ত করিয়া ফেলা, যাহাতে প্রত্যেকটি এলাকা লইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে। প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদিগের মধ্যে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পান তিনিই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ফলে, প্রতি এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আইনসভায় প্রাধান্য লাভ করে।

এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপাত্ত উঠিয়াছে! মিল্ বলেন, গণতন্ত্রের অর্থ হইল সর্বসাধারণের সরকার। স্বভাবতঃই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতেই এ সরকার পরিচালিত হইবে। কিন্তু ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহাতে দেশের সংখ্যালঘু দলেরাও যথোপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে।* এরূপ ঘটিলেই আইন-

* In a really equal democracy, every or any section would be represented not disproportionately, but proportionately.......Unless they are, there is not equal government, but a government of inequality and privilege...contrary to all just government, but above all contrary to the principle of democracy——J. S. Mill. Idid p. 248-249.

সভ্য রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মতের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিতে পারে নতুবা, আইনসভা বস্তুতঃ অসাম্য ও বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন গোষ্ঠীর প্রাধান্যের ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে। কারণ, পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা যদি প্রতিটি নির্বাচক মণ্ডলীতে সমান সংখ্যায় ভাগ হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে একটি প্রতিনিধিও পাঠাইতে পারিবে না। নচেৎ, পাঠাইলেও সমর্থনানুপাতে অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবে। আবার কয়েকটি সমান শক্তিশালী দলেব সংঘর্ষের ভিতর দিয়া আইন-সভার সম্পূর্ণ সংখ্যালঘু একদলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং সংখ্যালঘুরা যাহাতে শক্তি অনুপাতে নির্বাচিত হইতে পারে সে জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বেব প্রয়োজনীয়তা

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই ইউরোপে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড বেলজিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পবীক্ষা চলিতেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হ্বাইমার জার্মানী (Wein e. Germany) বোধ হয় ইহার সর্বপ্রধান উদাহরণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের চতুর্থ রিপাব্লিকও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কি তত্ত্বগত, কি কার্যকারিতা, উভয় দিক হইতেই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি অস্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

ইহার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান সমালোচনা হইতেছে যে ইহা মানুষের সঙ্কীর্ণ দলীয়, সাম্প্রদায়িক, মনোবৃত্তিকে বাড়াইয়া তোলে; দলাদলি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আইনসভা ভর্তি করে, ফলে পরিষদীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা দুর্বল হয়, তাহার কার্যকাল নিতান্তই অনিশ্চিত হইয়া উঠে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সমালোচনা

কার্যকারিতার দিক হইতেও নানা অসুবিধাঃ প্রথমতঃ নির্বাচনী এলাকার বৃহৎ ও দীর্ঘ প্রার্থীতালিকা অনিবার্য হইয়া উঠে। ফলে, ভোটদাতাগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা বাড়ে। ভোটদান ব্যবস্থাও জটিল, ব্যয়বহুল ও কালক্ষয়ী হয়। প্রার্থীদের উপর দলের কর্তৃত্ব দৃঢ়তর হয়। একই দলের প্রার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও কলহ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। অনেক সময়ে সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় ভোটাধিক্য ঘটিয়া যায়। উপরন্তু উপনির্বাচনের সুযোগ বন্ধ হইয়া যায়।

যাহা হউক, এ বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নাই। কতকগুলি দেশে, বিশেষ করিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে এ ব্যবস্থা সাফল্য

লাভ করিয়াছে। আবার অন্যত্র ইহার দোষগুলি অধিক প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১। এক হস্তান্তর যোগ্য ভোট দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation by Single Transferable Vote): এ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় উপাদান হইল নিম্নরূপ: প্রতি নির্বাচনী এলাকা একাধিক প্রার্থী নির্বাচন করিবে; নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় ভোটসংখ্যা (Quota) নির্ধারিত করিতে হইবে; নির্বাচনের একটি মাত্র ভোট থাকিবে; ভোটার ভোটদানের সময় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, প্রভৃতি হারে তাহার পছন্দ জ্ঞাপন করিবে; এবং ভোট হস্তান্তর করা যাইবে। এই ব্যবস্থায় প্রথমে সকল প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোট গুণিয়া দেখা হয়। যত ভোট পড়িয়াছে তাহাতে যতজন নির্বাচিত হইবে সেই সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া 'কোটা' নিধারণ করিতে হয়। ধরা যাক, তিনজন প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য ত্রিশ সহস্র ভোট প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষেত্রে দশ সহস্র ভোট পাইলেই একজন প্রার্থী জয়লাভ করিবে। প্রথমেই যদি কেহ দশ সহস্র ভোট পায় সে জয়লাভ করিল। অন্যদের ভোট গণনায় বিজেতা প্রার্থীর বাড়তি ভোটে দ্বিতীয় পছন্দে যাহার নাম ছিল তাহাদের পক্ষে এই বাড়তি ভোটগুলি যোগ হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি জয়লাভ করিলে, আবার তাহার বাড়তি ভোট অন্যদের মধ্যে বিতরিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করিবে। পক্ষান্তরে সর্বনিম্ন ভোট যে ব্যক্তি পাইয়াছে তাহাকে বাদ দিয়া তাহার দ্বিতীয় পছন্দের ভোটগুলিও গণিতে হইতে পারে। ইহার ফলে সংখ্যালঘুরা নিজস্ব শক্তিতে অথবা অন্যদের সাহায্যে 'কোটা' অনুযায়ী ভোটসংগ্রহ করিতে পারিলেই, নিজস্ব প্রতিনিধিপাঠাইবার যোগ্যতা অর্জন করিবে।

একহস্তান্তর যোগ্য ভোটের পদ্ধতি

এক হস্তান্তরযোগ্য ভোট প্রথায় স্বভাবতঃই আনুপাতিক প্রতিনিধিদের গুণাগুণ সবই দর্শায়। বিশেষ গুণ হইল যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মধ্যে একদিকে যেমন সর্বপ্রকার মতামতের উপস্থিতির ব্যবস্থা করে, অপরদিকে শুধুই দলীয় প্রতিনিধি নয়, ইহাতে ব্যক্তিরও নির্বাচিত হইবার কিছুটা সম্ভাবনা থাকে নির্বাচকমণ্ডলী দলীয় প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিবার সময় বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পছন্দ (Second or Third Preference) হিসাবে চিহ্নিত করিতে পারে। উপরন্তু, ইহাতে প্রার্থীর সহিত নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যক্তিগত যোগাযোগের

গুরুত্বও বাড়িয়া যায়। অপরদিকে ইহার বিশেষ দোষ হইল যে ভোটদান ও ভোটগণনা উভয়ই খুব জটিল। উপরন্তু বাতিকগ্রস্ত (cranks) লোকেরও নির্বাচিত হইবার সুযোগ থাকিয়া যায়।*

২। **তালিকা পদ্ধতি** (List System): এ পদ্ধতিতেই প্রত্যেকটি দলই প্রতিটি নির্বাচক এলাকাব জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করে ও ভোটার সেই বিভিন্ন বিকল্প তালিকার যে কোন একটিতে ভোট দেয়। পরে কোন্ তালিকার কত সমর্থক সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটি তালিকা হইতে সেই অনুপাতে প্রতিনিধিগণ আইন সভায় স্থান পান।

তালিকা পদ্ধতি

তালিকা পদ্ধতির বিশেষ গুণ হইতেছে যে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনের আঙ্কিক প্রতিচ্ছবি আইনসভায় দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু বর্তমান দুনিয়ায় দলপ্রথা অপরিহার্য, সেহেতু দলীয় প্রতিনিধিত্ব উপযুক্ত রূপ হওয়াই বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আবার বিপরীতপক্ষে এ ব্যবস্থায় দলপ্রথা অত্যধিক গুরুত্ব পায়; দলপ্রথার দোষগুলি প্রবল আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা। দলীয় সঙ্কীর্ণতা, দলীয় আনুগত্য, দলগত কলহ, দলের অভ্যন্তরে আমলাতান্ত্রিকতা, প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি প্রত্যক্ষ আনুগত্য অপেক্ষা দলের নেতৃবর্গের তোষণ করিবার মনোবৃত্তি প্রাধান্য পায়।

ফ্রান্সে, হ্বাইমার জার্মানীতে ও ইউরোপের অন্যত্রও এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনে আরও তিনটি ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে। সেগুলি হইল যথাক্রমে সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি (Limited Vote System) স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি (Cumulative Vote system) ও দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি (Second Ballot System)। ইহার প্রথমটিতে একটি এলাকা হইতে একাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হয়। তাহার মধ্যে নির্বাচকদের পুরা সংখ্যার ভোট থাকে না। ফলে সংখ্যাগুরুদের পক্ষে সবগুলি আসন জয় করিয়া লওয়া সম্ভব নহে। ধরা হউক, একটি নির্বাচকমণ্ডলী হইতে পাঁচজন নির্বাচিত হইবে। ভোটারদের এক্ষেত্রে চারটি করিয়া ভোট দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে সংখ্যাগুরু দল বড়জোর চারটি প্রতিনিধি পাইবে। পঞ্চমটি সংখ্যালঘু দলের পাইবার সম্ভাবনা।

এ ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা কিছুটা প্রতিনিধিত্ব অর্জন করিবে তাহা ঠিক; কিন্তু স্বভাবতঃই যথোপযুক্ত প্রতিফলন হওয়া সম্ভব নহে। উপরন্তু যদি একাধিক

* ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও বিধানপরিষদে কতকগুলি নির্বাচকমণ্ডলীতে এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

সংখ্যালঘু থাকে, তাহা হইলেও তো সকলে আসন পাইবে না। উপরন্তু সংখ্যাগুরু অধিক শক্তিশালী হইলে সংখ্যালঘু কোন আসন না পাইতেও পারে। বিপরীত ব্যবস্থা স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতিতে। ও ক্ষেত্রে যতগুলি আসন ততগুলিই ভোট কিন্তু যে কোন নির্বাচক ভোটগুলি বিভিন্ন লোককে ভাগ করিয়া না দিয়া একজনকেই দিতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘুর পক্ষে কিছু প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব। সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতির সমালোচনা অবশ্য এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে এ পদ্ধতি আর একটু উন্নত ধরণের। কারণ অনেকগুলি ক্ষুদ্র দলের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা এখানে সহজতর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইলিনোয়ায় (Ilino'a) ১৮৭০ সালে গৃহীত শাসনতন্ত্রে এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। পরবর্তী ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে সংখ্যালঘু দলগুলি মোটামুটি কিছুটা প্রতিনিধিত্ব লাভ করিত। তৃতীয় পদ্ধতিতে প্রথম ভোটগণনায় যদি কেহ পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারে, তবে সর্বনিম্ন ভোটপ্রাপ্তের নাম বাদ দিয়া দ্বিতীয়বার ভোটপ্রদান ও ভোট গণনা হয়। এইরূপে দ্বিতীয়বারে কোন একজন পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে। স্বাভাবতঃই এ পদ্ধতিতে সংখ্যালঘুরা সোজাসুজি নির্বাচিত হইতে পারে না। কিন্তু যেহেতু বিজয়ী প্রার্থীকে সমগ্র ভোটদাতার অর্ধেকের উপর ভোট পাইতে হইবে, সেইজন্য তাহাকে দ্বিতীয় ভোটের সময় বাতিল সংখ্যালঘু দলের সমর্থন পাইতে হয়। ফলে, সংখ্যালঘু সোজাসুজি যদি নাও জেতে, পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। কখনও বিশেষ মৈত্রীস্থাপন করিয়া এক আধটি আসন জিতিয়া যায়।

সংখ্যালঘু নির্বাচনের পক্ষে শেষোক্ত তিনটি পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকরী নহে। একহস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধতি জটিল হইলেও অধিক নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা।

ইহা ছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য, কখনও "সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী" (Communal Electorates), কখনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের (Reservations of seats) ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী চালু ছিল। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িকতার আগুন যে বিশেষরূপে প্রজ্জলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আসন সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি হইল যে ইহার দ্বারা বিভিন্ন দলই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী দাঁড় করায়। এইসব প্রার্থীদের মারফৎ দলগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকে। অথচ সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর বিশেষ কুফলও অনেকখানি এড়ানো যায়। বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে প্রার্থীরা প্রকৃতপক্ষে দলীয় থাকেন, দলের নির্দেশে চলেন। সম্প্রদায়ের তাঁহারা প্রকৃত প্রতিনিধি

কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। অপরদিকে কিছু লোককে সম্মানের আসন দিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রকৃত অভাব অভিযোগের সমস্যা হইতে লোকের দৃষ্টি সরাইয়া রাখিবার কৌশল বলিয়াও অনেকে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছেন।

নির্বাচকমণ্ডলীর গুণাবলী সম্পর্কে অধ্যাপক ল্যাসকির মতামত নিম্নরূপ :

নির্বাচকমণ্ডলীর গুণাবলী

"জনস্বার্থসম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আইনসভায় সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয়বিধ মতামতেরই স্থান পাওয়া উচিত। আইনসভাকে কার্যকরী হইতে গেলে, সমস্ত রকম মতামতেরই অঙ্কের সূক্ষ্ম হিসাবে প্রতিফলন প্রয়োজন নাই। কিন্তু সর্ববিধ গোষ্ঠীরই মত ঘোষণার সুযোগ দিতে হইবে, যদিও সরকারী কার্য নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিবার জন্য প্রধান চিন্তাধারাগুলিরই স্থান পাওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনী অঞ্চলগুলি আয়তনে যথেষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি হওয়া প্রয়োজন যাহাতে নির্বাচকগণ প্রার্থীদের প্রকৃতই জানিতে পারে এবং নির্বাচনোত্তর যুগে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে। তৃতীয়তঃ, দুইটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে জনমতের গতিধারা বুঝিবার সুযোগ থাকা চাই; বলা যায়, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় উপনির্বাচন পদ্ধতি সুন্দররূপেই এ সুযোগ করিয়া দেয়। চতুর্থতঃ, সংগঠনব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভোটদাতাগণ যথাসম্ভব শাসনব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকে। সরকার যে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী গঠিত হইয়াছে এবং কার্যকাল অতিক্রান্ত হইলে সরকার হিসাবেই পুনরায় তাহাদের বিচারের জন্য উপস্থিত হইবে, ইহা ভোটারদের অনুভব করা প্রয়োজন।"*

উপরোক্ত মূল নীতি হইতেই ল্যাসকি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নীতি অস্বীকার করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রার্থীকে নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী হইবার যে বাধ্যতামূলক নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাও অস্বীকার করেন; কারণ, তাঁহার মতে, ইহার ফলে, সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিক মনোবৃত্তি প্রাধান্য পায়। প্রার্থী সেই কেন্দ্রে পরাজিত হইলে, তাহার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ প্রায় অপরিহার্য হইয়া উঠে। রাষ্ট্রনৈতিক যোগ্যতাও বস্তুতঃ আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ হয় নাই। সুতরাং এ নীতির ফলে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আঞ্চলিক জনপ্রিয়তাই অধিক গুরুত্ব পাইতে থাকে।

অপর প্রশ্ন হইল, প্রার্থী 'ডেলিগেট' না 'রিপ্রেসেন্‌টেটিভ্' (Delegate or Representative) হইবে? বাংলায় বলা যাইতে পারে যে প্রার্থী কি নিছক

* Laski—Ibid P. 315

নির্বাচক মণ্ডলীর আদেশবাহক প্রতিনিধি হইবেন, না তাঁহার স্বতন্ত্র বিচারক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে? এ প্রশ্নের মূল উত্তর হইল যে প্রতিনিধি নিজ মতের দায়িত্ব লইয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিবেন। স্বভাবতই, কেহ এক দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই দল পাল্টাইয়া ফেলিবেন; ইহা ন্যায্যও নহে, স্বাভাবিকও নহে। কিন্তু আইনসভা নির্দিষ্ট কালের জন্য জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত নানাবিধ কার্যক্রমের ভার গ্রহণ করিবে। সমস্ত বিষয় নির্বাচনের সময় নির্বাচক-মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হয় নাই, উপস্থিত হওয়া সম্ভবও ছিল না। যদি বা হইত তাহা হইলেও একজনকে ভোট দিয়া সর্ববিষয়ে মতামত ঘোষণা করা নির্বাচক-দিগের পক্ষে সম্ভবও নহে। বস্তুতঃ, আইনসভা নিজ-দায়িত্বে কার্য পরিচালনা করে; ইহা একটি নিরবিচ্ছিন্ন গণভোটের মতামত নির্ধারণ করিবার স্থান নহে। আইনসভার সদস্য নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করিবার সুযোগ না পাইলে নেতৃত্ব অবান্তর ও অভিজ্ঞতা অর্থহীন হইয়া যায়। বার্কের (Burke) কথা স্মরণীয়: "আপনাদের প্রতিনিধি শুধু শ্রম দিয়াই আপনাদের সেবা করিবেন না, তাঁহার বিচারবুদ্ধি দিয়াও সেবা করিতে হইবে; আপনাদের মতের নিকট সে বিচারবুদ্ধি বলি দিলে, তিনি প্রকৃতপক্ষে আপনাদের সহিত বিশ্বাসভঙ্গই করিলেন। সরকার পরিচালনা যদি শুধু ইচ্ছারই ব্যাপার হইত, তাহা হইলে আপনাদের ইচ্ছাই নিঃসন্দেহে প্রধান। কিন্তু শাসন পরিচালনা ও আইন প্রণয়ন শুধু অভিপ্রায়ের ব্যাপার নহে, প্রয়োজন যুক্তি ও বিচার। কিন্তু যেখানে আলোচনার পূর্বেই সিদ্ধান্ত হইয়া যায়, একদল আলোচনা করেন ও অপরদল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, হয়ত বা তাহা করেন আলোচনাস্থান হইতে তিনশত মাইল দূরে বসিয়া, তাহা হইলে সেখানে কোন ধরণের যুক্তি কার্যকরী হয়?"*

'ডেলিগেট' না 'প্রতিনিধি'?

প্রতিনিধিত্বের পক্ষে যুক্তি

রাষ্ট্রনৈতিক দল গড়িয়া উঠিবার পরে অবশ্য এ প্রশ্নের সমাধান সহজ হইয়া গিয়াছে। কারণ, নির্বাচকেরা প্রধানতঃ দলীয় প্রার্থীকে নির্বাচন করে, দলের

* If government were a matter of will upon my side, yours without question, ought to be superior. But Government and legislation are metters of reason and judgment, and not of inclination; and what sort of reason is that in which the determination precedes the discussion, in which one set of men deliberate, and another decide; and where those who form the conclusion are perhaps three hundred miles distant from those who hear the arguments?'

—Dr. Finer—Idid p. 227

নির্ধারিত কর্মসূচীর মধ্যে, সে তাহার দায়িত্ব পালন করিবে এই আশায়। প্রতিনিধির স্বাতন্ত্র্য ও দলীয় শৃঙ্খলার চতুষ্কোণে বহু পরিমাণে সঙ্কুচিত।

প্রতিনিধির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ

তথাপি যদি নির্বাচিত প্রার্থীকে 'ডেলিগেট' না ভাবিয়া প্রতিনিধি বলিয়াই গ্রহণ করি, প্রশ্ন থাকিয়াই গেল যে দুই, চার বা পাঁচ বৎসরের জন্য দুইটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে প্রতিনিধির উপর প্রার্থীর কতখানি নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা অনেকে বলিয়াছেন,* ল্যাসকি সীমাবদ্ধ প্রত্যাহার-আজ্ঞার (Recall) প্রস্তাব করিয়াছেন; সোবিয়েত শাসনতন্ত্রে প্রত্যাহার-আজ্ঞা ও প্রতিনিধির নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট নিয়মিত ও বাধ্যতামূলকভাবে কার্য সম্পর্কে বর্ণনার (Reporting) দায়িত্ব নির্ধারিত রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বস্তুতঃ দলপ্রথার উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনসাধারণের ইচ্ছা, মতামত ও প্রভাব বিস্তৃত হয়। তথাপি, যথাসম্ভব, ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই অস্বীকার করা চলে না। কারণ নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত দলের ও প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মারফত আইনসভায় তাহার প্রভাব গিয়া পড়ে ও সাথে সাথে পরস্পরকেও প্রভাবিত করে। প্রতিনিধির কর্তব্যে অবহেলার প্রতিকার দলের সাহায্যে হইতে পারে; আবার দলীয় গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা প্রতিনিধির ব্যাপক জনসংযোগের মারফতে কিছু পরিমাণে সংশোধিত হইতে পারে।

(প্রতিনিধি ও নির্বাচকের সম্পর্ক)

দলপ্রথা ছাড়াও অধ্যাপক ল্যাসকি আরও তিনটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমতঃ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নানাবিধ সংঘ-সংস্থা সবসময়েই থাকিবে। রোমক হরফের প্রবর্তন, মদ্যপান নিরোধ, লোক সংস্কৃতির প্রসার, প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে অগণিত সংগঠন সমাজে প্রচলিত আছে ও থাকিবে। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধির উপর প্রভাব বিস্তার সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যসভা, কৃষক সংগঠন, মজদুর সংঘ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক প্রভৃতিদের বৃত্তিমূলক সংগঠন মারফৎও আইন সভার প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করা যায়।

(১। গণভোট
২। গণউদ্যোগ
৩। প্রত্যাহার আজ্ঞা
৪। নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট রিপোর্ট
৫। দলপ্রথার ব্যবহার
৬। বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থার মারফৎ
৭। বৃত্তিমূলক সংগঠনের মাধ্যমে)

* এই সূত্রে 'গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র' নামক অধ্যায় 'প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র' সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়তঃ ট্রাম, বাস বা ট্রেনের যাত্রী সংঘ, ভাড়াটিয়া সংঘ, ক্রেতাসংসদ, প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারী সংগঠনের (Consumers' Association) মাধ্যমও আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিকে উপস্থাপিত করা সম্ভব।

৮। ব্যবহারী সংগঠনের প্রচেষ্টায়।

অর্থাৎ, একথা ঠিকই, যে প্রতিনিধি একবার নির্বাচিত হইলে পর সে চার-পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত বোধ করিতে পারে। কিন্তু তাহাকে নিয়ন্ত্রণের উপায় মূলতঃ দ্বিবিধ,—(১) সাংবিধানিক ও (২) রাজনৈতিক আন্দোলনগত। সংবিধানের দিক হইতে সীমাবদ্ধ প্রত্যাহার আজ্ঞার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রতিনিধি কর্তৃক দলত্যাগের ক্ষেত্রে আইনসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া পুনর্নির্বাচন চাওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অবশ্য বিষয়টি জটিল। কারণ নতুন অবস্থায় যে সব বিষয় নির্বাচনের সময় উঠে নাই, এমন বিষয়ে মৌলিক মতভেদ হইলে কে যে প্রকৃত নীতিভ্রষ্ট তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়া সত্যমিথ্যার যাচাই করা চলে না। পার্টিনেতৃত্বের কাছেও সর্বদা সত্য ও নীতির চাবিকাঠি গচ্ছিত থাকে না।

দলত্যাগের ক্ষেত্রে:
১। প্রত্যাহার আজ্ঞা
২। পদত্যাগ ও পুনর্নির্বাচন

দ্বিতীয়তঃ আন্দোলনের পথই সাধারণভাবে আইনসভার প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃত ও নির্দিষ্ট পথ। এ আন্দোলন দলীয় প্রথার মাধ্যমে অথবা তাহার বাহিরেও হইতে পারে। এ সূত্রে অধ্যাপক ল্যাস্কির কথা পুণরায় স্মর্তব্য।

ল্যাসকি আনুপাতিক নির্বাচন সূত্রে বলিয়াছেন: নির্বাচনী যন্ত্রের সংশোধনের দ্বারাই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটিমোচন হওয়া সম্ভবপর নহে। মূলতঃ ত্রুটিগুলি নৈতিক জনতার যুক্তিবত্তার মান উন্নয়নের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংশোধনের, মারফত আমরা এই ত্রুটিমোচন করিতে সক্ষম হইব। জনমতের সূক্ষ্ম তারতম্যের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মারফত নহে।"* ল্যাসকির এ মত সাধারণভাবেই নির্বাচনী সমস্যার সম্পর্কে প্রযোজ্য।

* "It is not likely that the difficulties of the modern State are such as to be at all seriously remediable by reforms of electoral machinery. Mainly, these difficulties are moral in character. We shall meet them rather by the elevation of the popular standard of intelligence, and the reforms of the economic system, than by making men choose in proportion to the neatly-graded volume of opinion."

—Laski—Idid p. 31

বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (Functional Representation)

একটি এলাকা হইতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ, বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের (Territorial Representation) নীতির মূল সমালোচনা আসিয়াছে বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের (Functional or Occupational Representation) দৃষ্টিভঙ্গি হইতে। এই বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের দাবি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন গিল্ড্ সোশ্যালিষ্টরা এই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। গিল্ড্ সোশ্যা-লিষ্টদের মূল বক্তব্যই দাঁড়াইল যে আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের এক ভ্রান্ত নীতির উপর দাঁড়াইয়া আছে। কোন ব্যক্তিই অপর ব্যক্তির 'ইচ্ছার" (Will) প্রতিনিধি হইতে পারে না। প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব হইবে নির্দিষ্ট, বিশেষীকৃত, স্বার্থসম্পৃক্ত,—অনির্দিষ্ট, সাধারণ ও ব্যাপক নহে।

বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের দাবি

প্রতিনিধিত্বের যথার্থ নীতি

সুতরাং ব্যক্তির স্বার্থ শুধু একটি অঞ্চলের অধিবাসী হিসাবে রক্ষিত হয় না। অর্থনৈতিক বৃত্তির ভিতর তাহার আরও গভীরতর ও নিবিড়তর স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। শহরের বা গ্রামের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন ইচ্ছা, আগ্রহ, স্বার্থের মিশ্র প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নহে। বরং ডাক্তার ডাক্তার হিসাবে, শিক্ষক শিক্ষক হিসাবে, সূতাকল শ্রমিক সূতাকল শ্রমিকদিগের, রেলের কর্মচারী অনুরূপ কর্মচারীদের অনেক বেশী সার্থক প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। প্রতিনিধির মারফৎ একটি বৃত্তিগত বা অর্থনৈতিক গোষ্ঠির প্রকৃত স্বার্থের প্রতিফলন সম্ভব, যাহা পাঁচমিশালী বাসিন্দার প্রতিনিধি হিসাবে কখনই সম্ভব নহে।

ইচ্ছার নয়, স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব

ভিত্তি, অঞ্চল নয়, অর্থনৈতিক বৃত্তি

এদাবির পটভূমিকা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দেখা গেল সরকারী কর্মক্ষেত্রের অভাবনীয় প্রসার ঘটিয়াছে; কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সর্বস্তরের সরকারই নানাবিধ অর্থনৈতিক কাজকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং অর্থঘটিত ব্যাপারে নানাভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে, শাসনব্যবস্থা রীতিমত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। উপরন্তু নির্বাচনকেন্দ্রগুলি বড়ো হইয়া উঠায় বিশাল নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত নির্বাচিত প্রতিনিধির যোগসূত্রও ক্ষীণ হইয়া আসে। নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কারের দাবি ওঠা এ অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক। কিছু কিছু পরীক্ষাও সুরু হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্সেও জার্মানীতে হ্বাইমার সংবিধান অনুযায়ী অর্থনৈতিক কাউন্সিলগুলির

দাবির পটভূমিকা

(Economic Councils) উল্লেখ করা যায়। আয়ারের (Eire) শাসনতন্ত্র সিনেট নির্ব্বাচনে কিছুটা পেশাগত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে শিক্ষক নির্বাচনী কেন্দ্রের ভিতর দিয়াও প্রতিনিধিত্বের কিছুটা স্থান রহিয়াছে।

উদাহরণ ; ফ্রান্স, জার্মানী, আয়ার

কিন্তু বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের নীতি প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। সমালোচনার যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

সমালোচনা বাছাইয়ের অসুবিধা

ক। কোন্ বৃত্তিগুলিকে, স্বাতন্ত্র্য দিয়া প্রতিনিধিত্ব করিতে দেওয়া যাইবে তাহা বাছাই করাই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

খ। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বৃত্তিগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব কিরূপে নিরূপিত হইবে? অর্থাৎ বিভিন্ন বৃত্তিগুলির মধ্যে আসন সংখ্যা বণ্টিত হইবে কিভাবে?

গুরুত্ব নির্ণয়ের অসুবিধা

গ। মূল সমালোচনা হইল,—জাতীয় আইনসভা শুধু বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিদের লড়াইয়ের আখড়া নহে। প্রত্যেক প্রতিনিধিকেই জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সকল প্রশ্নের বিচার করিতে হইবে। সুতরাং বিভিন্ন দলভুক্ত প্রতিনিধিগণের উপর দলের মাধ্যমেই পেশাগত দাবি দাওয়ার প্রভাব বিস্তার বাঞ্ছনীয়। স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বে সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধই বাড়ে।

রাষ্ট্রীয় সংহতি বনাম বৃত্তির সংঘর্ষ

বস্তুতঃ বর্তমান এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ত্রুটী অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে সমাধান বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের মারফৎ আসিবেনা। বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের দাবির মূল যুক্তি তো দুইটি : (ক) শাসনযন্ত্রকে যেহেতু জটিল সমস্যাদির সমাধান করিতে হয়, সেজন্য শাসন-ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞর স্থান প্রয়োজন ; (খ) সাধারণের স্বার্থের নামে বহু আংশিক স্বার্থ লঙ্ঘিত ও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে ; সুতরাং তাহাদেরও প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। আসলে প্রয়োজন এমন ব্যবস্থা যাহাতে তাহাদের কণ্ঠস্বর চাপা দিয়া না রাখা হয় ; প্রয়োজন, শাসন পরিচালনায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ। ডাঃ ফাইনার বলিতেছেন :

প্রয়োজন
(ক) শাসন ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞের স্থান

সহস্র সহস্র ব্যক্তিগত, স্থানিক ও বৃত্তিমূলক স্বার্থ মিলাইয়া গঠিত বিশাল রাষ্ট্র পরিচালনা করা অবশ্যই খুবই অসুবিধার কাজ! কিন্তু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বৃত্তিগত দম্ভ ও স্বার্থপরতা বাড়াইলেই সমাধান মিলিবে না……সমাধান মিলিবে প্রথমপর্যায়ে সমাহার ও পরবর্তী

(খ) আংশিক স্বার্থের দাবি উপস্থাপনের সুযোগ

স্তরে বিকিরণ, আইন ও শাসনেরক্ষেত্রে, -এবং সর্বথা সর্ববিধ সংস্থা ও অঞ্চলের সহিত পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে।*

"The real difficulty, of course, is the management of a vast state which integrates thousands of different personal, local, and syndical interests. It is not soluble by disintegration and the consequent encouragement of guild conceit and selfishness .... But it is soluble by integration first, and then devolution—legislative and administrative—and always by consultation of the associations and localities." (Finer ; The Theory and Practice of Modern Government, P.545)

দ্বাদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল

(Party System)

[রাজনৈতিক মতের ভিত্তিতে নাগরিকগণের সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে দল বলে। ইহারা রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দখল করিয়া দলীয় মতানুযায়ী রাষ্ট্রের মঙ্গলসাধনে প্রয়াস পায়। একটি দল যদি ক্ষুদ্র হয় বা কোন স্থান বা শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে তাহাকে Political Group বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে।

রাজনৈতিক দল ব্যতীত বর্তমান গণতন্ত্র চলিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential) সরকার ও বিধানমণ্ডলী (Parliamentary) শাসিত সরকারে শাসন পরিচালনে দল অপরিহার্য।

অনেকে বলিয়াছেন যে দল গঠন স্বাভাবিক; মানুষের মনের গঠন অনুযায়ী দল গঠিত হয়। অনেকে দল গঠনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। অনগ্রসর দেশে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক কারণে দল গঠিত হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রে দলের নানা উপকারিতা রহিয়াছে। যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাহা হইতেছে যে আধুনিক গণতন্ত্রে সরকারের অর্থই দলীয় সরকার। দল জনমত গঠনে সহায়তা করে ও নাগরিকদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়। দলের ত্রুটি বিচ্যুতিও কম নহে। দলীয় স্বার্থসিদ্ধি, মিথ্যার আশ্রয়, হিংসা দ্বেষ প্রচার, কৃত্রিমতা প্রভৃতি দোষে দলীয় রাজনীতি দুষ্ট।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একদলীয় সরকার গঠিত হয়। একদলীয় সরকার স্থায়ী ও কর্মকুশল হয় কারণ তাহারা একতাবদ্ধ এবং বিধানসভার সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনের উপর আস্থা রাখিতে পারে। বহুদলীয় সরকার একতাবদ্ধ হইতে পারে না। মতের সংঘর্ষ সরকারের ভিতরে চলিতে থাকে; তাই বহুদলীয় সরকার স্থায়ী হয় না। একদলীয় ব্যবস্থা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রসম্মত। রাশিয়া এবং রাশিয়ার ন্যায় মার্কস-লেনিন নীতি প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক দেশে একদলীয় সরকার বর্তমান।]

রাষ্ট্রের নাগরিকগণের একটি লক্ষণীয় অংশ যদি দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে একমত হয় এবং সেই মতানুযায়ী দেশের মঙ্গলকল্পে শাসন পরিচালনার উদ্দেশ্যে, সংঘবদ্ধভাবে প্রচারকার্য চালাইয়া গণতান্ত্রিকভাবে শাসন ক্ষমতা অধিকার করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে সেই সংঘবদ্ধ নাগরিক সমূহকে রাজনৈতিক দল বলে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

উপরোক্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখা যায়।

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

(১) রাজনৈতিক দল নাগরিকগণের সমিতি বিশেষ।

(২) সাধারণ একটি সমিতির যেমন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে; রাজনৈতিক

দলেরও তেমনি একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনই সেই উদ্দেশ্য।

(৩) এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য প্রধানপ্রধান রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের সভ্যবৃন্দ একই মত পোষণ করেন। সমস্ত ছোট ছোট রাজনৈতিক বিষয়ে সকলের মতৈক্য না হইতে পারে। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মৌলিক নীতি সম্বন্ধে একমত না হইলে দল গঠন করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

(৪) রাজনৈতিক দল যদি নাগরিকগণের লক্ষণীয় অংশের সমর্থন লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে Party বা রাজনৈতিক দলের পর্যায়ে ফেলা যায় না। পাশ্চাত্যদেশে এই সূত্রে Group বা গোষ্ঠী কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি অল্প বা নগণ্য সংখ্যক নাগরিকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয় এবং প্রচারকার্য চালাইতে থাকে তবে তাহাকে Group বা গোষ্ঠি বলা হয়। ইহাদিগকে রাজনৈতিক দলেব সম্মান দেওয়া হয় না; কারণ এই সম্প্রদায়গুলির প্রভাব দেশের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে নাই। বাষ্ট্রের কোন স্থানীয় অংশ অথবা নাগরিক সাধারণেব কোন বিশেষ অংশের উপর তাহারা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে মাত্র। ভারত ইউনিয়নে এই কারণেই মাত্র পাঁচটি রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় দল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই পাঁচটি হইতেছে—কংগ্রেস, প্রজাসোস্যালিস্ট দল, কমিউনিস্ট দল, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দল। অন্যগুলি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ধারণা অনুযায়ী Group বা বাজনৈতিক সম্প্রদায় ব্যতীত কিছুই নহে। যখন কোন দল সমগ্র বাষ্ট্রেব রাজনীতির উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তখনই তাহাকে রাজনৈতিক দলের মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ রাষ্ট্রের বিধানসভার সকল অথবা অনেকগুলি নির্বাচন কেন্দ্রে তাহাদের দলের সমর্থক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় এবং সেই সকল কেন্দ্র হইতে তাহারা দলীয় প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে।

(৫) রাজনৈতিক দলগুলির কেবলমাত্র গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখল করিতে প্রয়াসী হইতে হইবে। যদি কোন দল বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয় অথবা নিয়মতান্ত্রিকতার পথ পরিত্যাগ করে, তবে তাহারা রাজনৈতিকদলের পর্যায় হইতে বিচ্যুত হয়। রাজনৈতিক দল ও নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

(৬) রাজনৈতিক দলগুলি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখল করিয়া সরকার গঠনে প্রস্তুত থাকিবে—ইহাও রাজনৈতিক দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য। যদি

কোন দল কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারের ধ্বংসের কথাই চিন্তা করে এবং যদি তাহারা সরকার গঠনে কোন ক্রমেই প্রস্তুত না থাকে তাহা হইলে আধুনিকগণতন্ত্র অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য অবস্থা অনুকূল হইলে সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করা রাজনৈতিক দলের কর্তব্য।

(৭) রাজনৈতিক দলগুলি নিরন্তর দেশের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিবে এবং নিজ নিজ মতামত জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবে ইহাই নিয়ম। যে রাজনৈতিক গোষ্ঠী কেবলমাত্র সাধারণ নির্বাচনের সময় সজাগ হয়, অন্যসময় কর্মহীন হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে তাহাকে রাজনৈতিক দল বলা চলে না দেশের সমস্যা সম্পর্কে অবিরাম চিন্তা, আলোচনা ও নীতি নির্ধারণ রাজনৈতিক দলের প্রাণস্বরূপ।

(৮) সংঘবদ্ধতা রাজনৈতিক দলের আর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট। কেন্দ্রীয় সংস্থা ব্যতীত সকল উল্লেখযোগ্য দলেরই রাষ্ট্রের সকল বা অনেক অংশে এবং সম্ভব হইলে প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে দলীয় সংগঠন থাকা বাঞ্ছনীয়। যে সকল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সংগঠন এই দিক দিয়া কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিতে পারে না তাহাদের রাজনৈতিক দলই বলা চলে না।।

রাজনৈতিক দল ও আধুনিক গণতন্ত্র (Political Parties and Modern Democracy)

আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের মূল্য অপরিসীম। রাজনৈতিক দল ব্যতীত বর্তমান গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। লাউয়েলের মতে "The conception of Government by the whole people in any large nation is, of course, a chimera for wherever the suffrage is wide, parties are certain to exist and the control must really be in the hands of the party that comprises a majority or a rough approximation to a majority of the people. "অর্থাৎ গণতন্ত্র সমগ্র নাগরিক মণ্ডলীর শাসন ; কিন্তু কার্যতঃ সকলের দ্বারা শাসন ক্ষমতা পরিচালনা অসম্ভব। যেখানে সকলেরই ভোট দানের অধিকার আছে, সেখানে দল গঠিত হইবেই ; এবং যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠের অথবা তাহার কাছাকাছি ভোট পাইবে সেই দলই সরকার পরিচালনা করিবে। এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং দলীয় শাসন ব্যবস্থা (Party Government) ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা (Democratic Government) আধুনিক রাজনীতি ক্ষেত্রে সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ম্যাকআইভার বলিতেছেন যে

দল ব্যতীত শাসননীতি গঠিত হইতে পারে না, কর্মপন্থা নির্দিষ্ট হইয়া উঠে না, সাধারণ নির্বাচন নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না।*

আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্র রাজনৈতিক দল ব্যতীত সম্ভব নয়

রাজনৈতিক দল ব্যতীত জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি প্রাণহীন হইয়া পড়ে, জনসাধারণ দেশের সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যায়। এমনকি রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হইতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় জীবনে বলিষ্ঠতা' আত্মনির্ভরতা, সতেজতা ও ক্রিয়াশীলতা আনিয়া গণতন্ত্রকে সজীব করিয়া তোলে। রাজনৈতিক দলগুলি জনমত সংহত করিয়া তদনুযায়ী গণতন্ত্র পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়।**

যদিও রাজনৈতিক দল ব্যতীত বর্তমান গণতন্ত্র পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাজনৈতিক দল কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানগত স্বীকৃতি লাভ করে নাই। জেনিংস তাহার "The British Constitution" পুস্তকে লিখিয়াছেন: "a realistic survey of the British Constitution to-day must begin and with parties discuss them at length in the middle" অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতির সমীক্ষণ করিতে হইলে রাজনৈতিক দল লইয়াই আরম্ভ ও শেষ করিতে হয়, এবং এই দুই-এর মাঝেও রাজনৈতিক দলের আলোচনাই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ব্রিটেনের সরকার দলীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতা পার্লামেণ্টে দল সংগঠন অপরিহার্য। এমনকি বিরোধীদল পর্যন্ত মহামান্যা রাণীর বিরোধীদল বলিয়া পরিচিত। কিন্তু বৃটিশ শাসন পদ্ধতিতে সরকারীভাবে দলগুলির এই প্রতিপত্তিও অপরিহার্যতা স্বীকৃত হয় নাই যদিও ষোড়শ শতাব্দীতে রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময় হইতেই দল গঠন শুরু হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সাত বৎসরের মধ্যেই দলীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আরম্ভ হইয়া যায়। ১৭৯১ সালে একটি দল টমাস জেফারসন ও অন্যদল জন এ্যাডামস্‌কে সমর্থন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলগুলি প্রথার মাধ্যমে সংবিধানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সংগঠিত দলের

* "There can be no unified statement of principle, no orderly evolution of policy no regular resort to the constitutional device of parliamentary election." MacIver; The Modern State p. 396.

** Their essential function and the true reason for their existence is bringing public opinion to focus and framing issues for a public verdict." Lowell-Public opinion and Popular Government, P. 70

প্রভাব সংবিধানে সন্নিবিষ্ট ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের দলীয় সংগঠনের মধ্য দিয়া কংগ্রেসকে প্রভাবিত করিবার সুযোগ পান কিন্তু সংবিধান মণ্ডলী (Constituent Assembly) ইচ্ছা করিয়াই কংগ্রেসকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উর্ধ্বে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল।

দল গঠনের কারণঃ রাজনৈতিক দল আধুনিক গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। যেখানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেই বিভিন্ন মতাবলম্বী নাগরিক-বর্গ রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু, মত-বিরোধের পশ্চাতে কি কি উপাদান কার্যকরী হইয়াছে তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রশ্নটি মৌলিক—মানুষের মত বিরোধ কেন হয়?

দল গঠনের মনোবিজ্ঞানী ব্যাখ্যা

পুরাতন পন্থী

মনোবিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে চার প্রকার মনোভাবাপন্ন মানুষ সব দেশেই দেখা যায়। এক শ্রেণীর মানুষ পুরাতনপন্থী। তাহারা অতীতের জীবনধারা, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকেই আদর্শ বলিয়া মনে করে। তাহাদের মতে অতীতের জীবন ব্যবস্থা পরিহার করার দরুনই মানুষের দুঃখ দুর্দশা শুরু হইয়াছে। এই শ্রেণীর নরনারীকে পুরাতনপন্থী অথবা প্রতিক্রিয়াশীল (reactionary) বলা হইয়া থাকে। আর এক প্রকারের মানুষ আছে যাহারা বর্তমানের রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতি-নীতি পরিত্যাগ করিতে নারাজ।

রক্ষণশীল

তাহারা বলেন যে বর্তমানের ব্যবস্থা হইতে বিচ্যুত হইলে মানুষ সুখী হইবে না। ইহাদিগকে রক্ষণশীল (Conservative) আখ্যা দেওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, অনেক নাগরিক বর্তমান রাষ্ট্র এবং সমাজবিধির পরিবর্তন কামনা করেন। তাহারা মনে করেন যে সংস্কারের মধ্য দিয়াই মানুষ সুখী রাষ্ট্র ও সমাজ সৃষ্টি করিতে পারিবে। বর্তমান

সংস্কারপন্থী

ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন তাহারা কামনা করেন না। বর্তমানের ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনয়ন করাই ইহাদের কাম্য। ইহাদিগকে সংস্কারপন্থী (Reformist বা Liberal) বলা বলে। চতুর্থতঃ, এমন ব্যক্তিও প্রতি রাষ্ট্রে আছেন যাহারা শুধু সংস্কার ও পরিবর্তনে সন্তুষ্ট নহে, তাহারা রাষ্ট্র ও সমাজের আমূল

আমূল সংস্কারপন্থী

পরিবর্তনকামী। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বর্তমান ভিত্তিকে তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তথাপি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তাহারা বিশ্বাসী। নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই সমাজ ও

রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার সম্ভব বলিয়া তাহারা মনে করেন। ইহাদিগকে আমূল সংস্কারপন্থী (Radical) বলা যাইতে পারে। পঞ্চমতঃ, এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাহারা বিপ্লব-মনোভাবাপন্ন। তাহার রাষ্ট্রে ও সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে চান বিপ্লবের মাধ্যমে। নিজ আদর্শ লাভ করিবার জন্য তাহারা নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিহার করিয়া বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করেন। ইঁহারা হইতেছেন বিপ্লববাদী (Revolutionary)।

বিপ্লববাদী

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে মনেব গঠন অনুযায়ী এইরূপ পাঁচ প্রকারের মানুষ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী তাহারা দল গঠন করে বা বিভিন্ন দলে যোগদান করে। উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর মানুষকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী পরিবর্তন ও সংস্কার পছন্দ করেন না। পুরাতনকে তাহারা আঁকডাইয়া থাকিতে চাহেন বা বর্তমান ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে উৎসুক। আর এক শ্রেণী নানা রকমের সংস্কারপন্থী। পুরাতন ও বর্তমান ব্যবস্থাকে তাহারা পরিবর্তন, আমূল সংস্কার বা ধ্বংস করিয়া নূতনের জয়ধ্বজা উডাইতে ব্যগ্র। মানসিক প্রবণতা হইতেই মতভেদ উপস্থিত হয়। সুতরাং রাজনৈতিক দল অতি স্বাভাবিক কারণেই গঠিত হইয়া থাকে।

মার্কস ও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে রাজনৈতিক দল অর্থনৈতিক কারণে উদ্ভূত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। প্রতি শ্রেণীর স্বার্থ অন্য শ্রেণীর স্বার্থ হইতে ভিন্ন। জমিদার, শিল্পপতি, কৃষক; মধ্যবিত্ত প্রভৃতির মধ্যে শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে। এই জন্যই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উত্থিত হইয়া আপনাপন স্বার্থসংরক্ষণে তৎপর হইয়া উঠে। দল গঠনের ইহাই মূলীভূত কারণ। শ্রেণীস্বার্থের কথা না তুলিয়াও স্বীকার করিতে বাধা নাই যে সমাজে অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা বর্তমান। ধনের বৈষম্য হেতু মতামতের বৈষম্যও দেখা দেয়। যে ব্যবস্থায় তাহাদের সম্পত্তি রক্ষিত হইবে ধনী ব্যক্তিগণ তাহাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হউক দেখিতে চান। তাহারা পুরাতন পন্থা ও রক্ষনশীলতা সেইজন্য পছন্দ করেন। ইহা স্বাভাবিক! আবার যাহারা দরিদ্র, তাহারা যে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন, আমূল সংস্কার অথবা বৈপ্লবিক পরিবর্তন কামনা করিবেন তাহাও স্বাভাবিক। সুতরাং অর্থনৈতিক কারণেই নাগরিকগণ বিভিন্ন দলভুক্ত হইয়া পড়েন। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাই রাজনৈতিক দল গঠনের প্রকৃত কারণ।

রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

অনেকে বলিয়াছেন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে মানুষের মনোভাব গঠিত হয়। নাগরিক যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহার বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে ও পরিণত বয়সে যে সকল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হইয়াছে, যে সকল সমিতি প্রভৃতির সে সভ্য, যে অর্থনৈতিক পরিবেশে সে জীবিকার্জন করিতেছে, যে সকল সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনা তাহার মনে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে প্রভৃতি সকল বিষয়গুলিই নাগরিকের মনোভাব গঠিত করে। নাগরিকগণের মনের কাঠামো এইভাবেই প্রস্তুত হইয়া যায়। নাগরিকগণ সম-মতাবলম্বী অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত মিলিত হইয়া দল গঠন করে এবং দেশের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পায়।

দল গঠনের উপর পরিবেশের প্রভাব—সমাজ বিজ্ঞানমূলক ব্যাখ্যা

অনগ্রসর দেশে ধর্মীয় কুসংস্কার ও ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রবল হইয়া দেখা দেয়। গণতন্ত্র যে সকল রাষ্ট্রে প্রসার লাভ করে নাই, সেই সকল রাষ্ট্রে এক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেক ধর্মের ভিত্তিতে দল গঠন করে। ভারতে হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দল ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। অনুন্নত জাতিগুলি দ্বারা গঠিত রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক দলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রাজনৈতিক দল গঠনে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক কারণ

উপসংহার: উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে উপরে উল্লিখিত সকল উপাদানগুলিরই দল গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রহিয়াছে। মনোবিজ্ঞানী, অর্থনৈতিক ও সমাজবিজ্ঞানী ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে সত্য নিহিত রহিয়াছে। আবার অনগ্রসর দেশে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবও যে দল গঠনে প্রভাব বিস্তার করে তাহাও অনেক পরিমাণে সত্য। আধুনিক কালে অর্থনৈতিক কারণ রাজনৈতিক দল গঠনে প্রবলতা লাভ করিয়াছে। এই জন্যই অর্থ নৈতিক স্বার্থের বৈষম্য ধনতান্ত্রিক দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী ও উপকারিতা: Functions and Usefulness of Political Parties): গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি ও তাহার সমাধানের পথ স্পষ্টভাবে নাগরিকদের দৃষ্টির সম্মুখে উত্থাপন করে। আধুনিক রাজনীতি অতিশয় জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক

সমস্যা আজকাল বিরাট আকারে দেখা দিয়াছে। ধনবৈষম্য সকল দেশে অল্প-বিস্তর শ্রেণী সংঘর্ষের রূপ ধারণ করিতেছে। জীবনমানের প্রশ্ন প্রবলভাবে সমাধান দাবি করিতেছে। এই সকল গুরুতর সমস্যাগুলি বহির্দেশীয় সম্পর্ক সংক্রান্ত সমস্যার সহিত মিলিত হইয়া আরও জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণ নাগরিক এই সমস্যা-সঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না। রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়।

(১) রাজনৈতিক দল দেশের সমস্যা ও তাহার সমাধানের ইঙ্গীত দেয়

সভা-সমিতি, আলোচনা, বৈঠক, পুস্তক, প্রচারপত্র, ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে দলগুলি জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে রাজনৈতিক দলগুলি নাগরিকগণের রাজনৈতিক শিক্ষায় সাহায্য করে বলিতে হইবে। দেশের সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে জ্ঞান সুনাগরিকতার ভিত্তি। রাজনৈতিক দল দেশে সুনাগরিকতা গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সহায়ক হইয়া উঠে।

(২) রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রচেতনা ও সুনাগরিকতা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই একাধিক দল আছে। প্রতিটি দল নাগরিকগণের দৃষ্টি ও সমর্থন লাভে উৎসুক হয়। কোন দল যদি মিথ্যা বা ছলনা দ্বারা নাগরিকদের ভুলাইয়া তাহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে তাহা হইলে অন্য দল সেই মিথ্যা ও ছলনা ধরাইয়া দিতে পারে। এই কারণে কোন দল সহজে ছল চাতুরী অবলম্বন করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ গণতন্ত্রে আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করিয়া থাকে। এই দল ক্ষমতায় আসীন হইলে অন্য দল অথবা দলগুলি আইন সভায় বিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সরকারী দলকে সমালোচনা করিতে থাকে। সরকারী দল যদি দলীয় স্বার্থ রক্ষাকল্পে স্বৈরাচারী শাসনের পথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে অন্য দলগুলি বাধা সৃষ্টি করে। এইরূপ সমালোচনার মাধ্যমে বিরোধীদলগুলি ক্ষমতাধিষ্ঠ দলকে ন্যায্য শাসনের পথে পরিচালিত করে।

(৩) রাজনৈতিক দলগুলি কোন একটি দলের স্বেচ্ছাচারিতা বা মিথ্যাচারে বাধা সৃষ্টি করে

রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণ নির্বাচনের সময় দলীয় প্রার্থীদিগকে মনোনীত করে। প্রার্থীগণ দলীয় নীতির ভিত্তিতে ভোটদাতাগণের নিকট সমর্থন প্রার্থনা করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা ভোটদাতাগণের পক্ষে সুবিধাজনক। যে দলের

প্রার্থীর সহিত ভোটদাতার মতৈক্য রহিয়াছে তাহাকে ভোটদাতা সমর্থন করে। যদি কোন দল না থাকিত, তাহা হইলে দলীয় প্রার্থীও থাকিত না। সেইরূপ অবস্থায় ভোটদাতার মনস্থির করা কঠিন হইত। দ্বিতীয়তঃ দলের মতামত একপ্রকার সুনির্দিষ্ট। কিন্তু নির্দলীয় ব্যক্তিগণ কখন, কি বিষয়ে, কি মত অবলম্বন করিবেন বলা সুকঠিন। ভোটদাতাগণ তাই নিশ্চিত চিত্তে নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমর্থন করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধা বোধ করেন। সুগঠিত রাজনৈতিক দল থাকিলে ভোটদাতাগণকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না। সাধারণ নির্বাচনের সময়ে দলগুলি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতামত সম্বলিত ইস্তাহার জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করে। এই সকল ইস্তাহার নির্বাচককে ভোটদান সম্বন্ধে আপন মনস্থির করিতে সাহায্য করে।

সাধারণ নির্বাচনের সময় দলগুলি ভোটদাতাদের কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করে

বিধানমণ্ডলী শাসিত (Parliamentary Government) শাসনব্যবস্থায় যে সরকার গঠিত হয় তাহা দলীয় সরকার। এই সরকারের স্বপক্ষে বিধান মণ্ডলীতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকে। এই কারণে সরকারগুলি সুশাসনের জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন তাহা সহজেই বিধিবদ্ধ করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দলীয় সংগঠনের জন্য সুশাসন সম্ভব হইতেছে।

আধুনিক গণতন্ত্রে সরকার বলিলেই দলীয় সরকারই বুঝায়

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসনযন্ত্রের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত; তাঁহার সহিত কংগ্রেসের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানমণ্ডলীর কোন যোগসূত্র নাই। ইহাতে অসুবিধা হইবার কথা। কারণ আইন ও শাসন সমতালে না চলিলে রাষ্ট্র সুপরিচালিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন করার ফলে এই সমতাল রক্ষিত না হইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়া এই অসুবিধা দূর করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি হয় রিপাবলিক্যান অথবা ডেমোক্রাটিক দলভুক্ত হইয়া থাকেন। এই দুইটি দলের যে সকল সদস্য কংগ্রেসে রহিয়াছেন তাহারা দলের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ আপন দলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আইন ও শাসন যাহাতে সমতালে চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করেন। এই ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দল সুশাসনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

রাজনৈতিক দলগুলির আরও একটি উপকারিতা আছে। গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাধিকারে বিশ্বাসী।

নির্বাচনে জয়লাভ করিলেই ক্ষমতা বিজয়ী দলের হস্তে চলিয়া আসে। সুতরাং দলগুলি বিপ্লবের পন্থা পরিহার করে। ইহার দ্বারা দেশের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠে। গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও সাফল্য এই বিশ্বাসের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। কারণ নিয়মতান্ত্রিকতা গণতন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ।

রাজনৈতিক দল দেশের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতাকে দৃঢ়করে, তাহাতে গণতন্ত্রও দৃঢ় হয়

রাজনৈতিক দলের ত্রুটি বিচ্যুতিঃ মনুষ্য সৃষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানই দোষশূন্য নহে। রাজনৈতিক দলগুলিরও ত্রুটি রহিয়াছে। (১) অনেক সময় দেখা যায় যে দলগুলি দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ হইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে। (২) সময়ে সময়ে রাজনৈতিক দল ন্যায়নীতির মর্যাদা পদদলিত করিয়া অসত্য ও মিথ্যাচারের আশ্রয় লয়। ক্ষুদ্র স্বার্থই বৃহৎ হইয়া উঠে; সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থলাভের জন্য দলগুলি নানা অন্যায় আচরণ আরম্ভ করে। ইহার ফলে দেশের নৈতিক মান ভূলুণ্ঠিত হয় এবং নৈতিক অবনতি ঘটিতে থাকে। (৩) বর্তমান গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে। বিরোধী দলে বহু যোগ্য ব্যক্তি থাকেন। তাহারা সরকারের মধ্যে স্থান পান না। ইহার ফলে দেশে যোগ্যতম সরকার গঠন সম্ভব হয় না। এই অবস্থা অনুমোদন যোগ্য নহে। (৪) দলীয় রাজনীতির ফলে দলভুক্ত সভ্যগণের ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়। নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য, অপমানিত করিয়া প্রতি সভ্যকে অনেক সময় দলের নীতি মানিয়া লইতে হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে এই অবস্থা নিন্দনীয়। (৫) রাজনৈতিক দলগুলি কৃত্রিমতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। নিরন্তর প্রচারের মধ্য দিয়াই দলগুলি বাঁচাইয়া রাখা হয়। সকল দলই ঢক্কানিনাদে ঘোষণা করিতে থাকে যে তাহারাই দেশকে আদর্শ লক্ষ্যে লইয়া যাইতে পারে, আর কেহ নহে। ইহার ভিতর যে কপটতা ও ভণ্ডামি আছে তাহা অনস্বীকার্য। (৬) অনেকে বলিয়াছেন যে রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতার লোভে দেশে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণার বন্যা বহাইয়া দিতেও দ্বিধা করেন না। তাহাতে দেশের দারুণ

(১) দলীয় স্বার্থ লাভের প্রচেষ্টা

(২) অসত্যের আশ্রয়

(৩) যোগ্যতার অপব্যয়

(৪) ব্যক্তিত্বের বিনাশ

(৫) কৃত্রিমতা

(৬) হিংসা বিদ্বেষের রাজত্ব সৃষ্টি

নৈতিক অবনতি ঘটে এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। (৭) আরও বলা হইয়াছে যে দলগুলি সাধারণ অজ্ঞ নাগরিকদের বিভ্রান্ত করে এবং তাহাদের ক্ষতি সাধন করিয়াও দলের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লাভ করিতে প্রয়াস পায়। দলীয় সুবিধালাভের জন্য জনসাধারণকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

(৭) অজ্ঞনাগরিকদের বিভ্রান্ত করে

উপসংহার: রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে মতামত বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া গঠিত করিতে হইবে। আধুনিক গণতন্ত্র দল ব্যতীত অচল হইয়া যাইবে। সেই কারণে গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজনৈতিক দল স্বীকার করিয়া লওয়া অপরিহার্য। তবে যাহাতে দলগুলি দোষমুক্ত হয় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নাগরিক সাধারণ যদি সচেতন থাকে, দেশে যদি দলীয় দোষত্রুটির নিরপেক্ষ সমালোচনা হইতে থাকে তাহা হইলে দলগুলি ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি এড়াইয়া চলিবার প্রয়াস পাইবে। জাগ্রত জনমতই দলগুলিকে পাপমুক্ত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (Two-Party System)

ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কার্যত: দুইটি করিয়া দল আছে। যুক্তরাষ্ট্রের দল দুইটি হইতেছে রিপাবলিক্যান্ (Republican) ও ডেমোক্র্যাটিক দল (Democratic)। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে কেবলমাত্র এই দুইটি দলেরই স্থান আছে। অন্য দুই একটি দল এতই নগণ্য যে তাহারা নাই বলিলেই চলে। ব্রিটেনেও কার্যত: দ্বিদলীয় প্রথাই এখন প্রচলিত হইয়াছে। রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে ব্রিটেনে দলের সূচনা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে দুইটি দল সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। ইহারা হইতেছে হুইগ্ ও টোরী দল। এই দুইটি দলই ঊনবিংশ শতাব্দীর কনজারভেটিভ্ ও লিবারল্ নামে পরিচিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে, প্রথমার্ধে, লিবারল্ দল ধীরে ধীরে অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সমাজ-তান্ত্রিক মতবাদ লইয়া শ্রমিকদলের (Labour Party) উত্থানই লিবারল্ দলের পতনের কারণ। ১৯০১ সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ৩০৬ জন লিবারল্ সদস্য ছিল। তাহারাই সরকার গঠন করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে লিবারল্ দলের সংখ্যা কমিতে থাকে। শ্রমিকদল শক্তিশালী হইতে আরম্ভ করে। কমিতে কমিতে ১৯৪৩ সালে লিবারল দলের পার্লামেন্টীয় সদস্য সংখ্যা ২০৩, ১৯৫৩ সালে ৬ এ ও ১৯৫৫ সালেও ৬ এ দাঁড়ায়। সুতরাং ব্রিটেনের রাজনীতিক্ষেত্রে এখন কার্যতঃ দুইটি দলই রহিয়াছে বলা যাইতে পারে।

ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে একটি দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে ও সরকার গঠন করে। অন্য দলটি বিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সমালোচনার মাধ্যমে সরকারী দলকে ক্ষমতার আসন হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করে। সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়া ব্রিটেনে হয় কনজারভেটিভ্ অথবা লেবার দল পার্লামেন্টে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করে।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একদলীয় সরকার গঠন

যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া রিপাবলিক্যান্ ও ডেমোক্র্যাটিক্ দলের রাজনৈতিক সংগ্রাম চলিতে থাকে। যে দল তাহাদের দলীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে তাহারই শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিবার সুযোগ পায়।

অনেক দেশে বহুদল বর্তমান। সেই সকল রাষ্ট্রে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে হইলে অনেকগুলি দলের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োজন হয়। কারণ মন্ত্রীমণ্ডলীর বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা অপরিহার্য। ফ্রান্সে ও জার্মানী প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় রাজ্যে বহুদল রহিয়াছে। এই সকল রাষ্ট্রে প্রতিটি মন্ত্রিসভাই সম্মিলিত (Coalition) মন্ত্রিসভা।

বহুদলীয় ব্যবস্থা ও বহুদলীয় সরকার

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য। বহুদলের নানা অসুবিধা দেখাইয়া এবং দ্বিদলীয় ব্যবস্থার নানা সুবিধার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় দেশের শাসনপদ্ধতি সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সুবিধা

প্রথমতঃ বলা হইয়া থাকে যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় নির্দিষ্টকালের জন্য স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি সরকারই বহুদলের সহযোগিতায় গঠন করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় প্রতিদল আপন আপন রাজনৈতিক মত ও স্বার্থের কথাই চিন্তা করে। মন্ত্রিসভার মধ্যে মত ও স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হয় এবং সরকার বেশীদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একটি মাত্র দল সরকার গঠন করে। তাহাদের মত এক, স্বার্থ এক। এই দ্বিবিধ একতা আছে বলিয়া সরকার একতাবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারে। সেইজন্য একদলীয় মন্ত্রিসভা নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়িত্বলাভ করে।

(১) সরকারের স্থায়িত্ব

(২) একতা

(২) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একদলীয় সরকার গঠিত হয়। এইরূপ সরকার নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ী ও একতাবদ্ধ হয় বলিয়া কর্মকুশলতা দেখাইবার সুযোগ পায়। বহুদলীয় সরকার স্থায়ী হয় না; তাই।

(৩) কর্মকুশলতা

(৩) বহুদলীয় সরকারভুক্ত মন্ত্রিগণ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান না। অভিজ্ঞতার অভাবে তাহারা কর্মদক্ষ হইয়া উঠিতেও পারেন না। বহুদলীয় সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে স্বাভাবিক মতভেদের জন্যও শাসনব্যবস্থায় তাহারা কুশলতার পরিচয় দিতে পারেন না।

(৪) সহজবোধ: সাধারণ নির্বাচনের সময় নাগরিকগণের সুবিধা

(৪) জনসাধারণ দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সহজে বুঝিতে পারে। সাধারণ নির্বাচনের সময় তাহাদিগকে মাত্র দুইটি দলের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হয়। বহুদল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে জনসাধারণ তাহাদের রাজনৈতিক কর্তব্য সহজে সম্পন্ন করিতে পারে না। বহুদলের দ্বন্দ্ব দেশের নাগরিকদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে পারে।

(৫) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একদলীয় সরকার অকৃতকার্য্য হইলে ব্যর্থতার দায়িত্ব সেই দলের উপর ফেলা যায়

(৫) বহুদলীয় সরকার যদি সুশাসনে অকৃতকার্য হয় তাহা হইলে কোন দলকে দায়ী করা চলে না। কিন্তু একদলীয় সরকার অকৃতকার্য হইলে নাগরিকগণ পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ঐ দলকে সমর্থন করিতে অস্বীকার করিতে পারে।

গণতন্ত্রে সরকার শেষ পর্যায়ে নাগরিকগণের নিকট দায়ী। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় এই দায়িত্ব সত্য হইয়া উঠিতে পারে। বহুদলীয় সরকারের অকৃতকার্যতার জন্য গণতান্ত্রিক দায়িত্ব কোন দলের উপরই চাপানো চলে না। এইরূপ অবস্থা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

(৬) একদলের সরকারের স্থায়িত্বের জন্য পরিকল্পনার সুবিধা

(৬) বহুদলীয় সরকারের স্থায়িত্বের অভাবে তাহাদের পক্ষে শুধু দীর্ঘমেয়াদী নহে, স্বল্প-মেয়াদী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করাও সম্ভব হইয়া উঠে না। কিন্তু দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একদলীয় সরকারকে এই অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয় না। কারণ একদলীয় সরকার নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ীভাবে ক্ষমতাধিষ্ঠ থাকিয়া পরিকল্পনায় লিপ্ত হইতে পারে।

বহুদলীয় ব্যবস্থা: যদিও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা শক্তিশালী যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি বহুদলীয় নীতির সপক্ষে কিছুই বলিবার নাই

এমন নহে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বহুদলীয় ব্যবস্থাকে যুক্তিদ্বারা সমর্থনও করিয়াছেন এবং সেই সকল যুক্তির যে একেবারেই মূল্য নাই, তাহাও নহে। অধ্যাপক রামসে ম্যুয়র তাহার How Britain is Governed ও The Future of Democracy পুস্তকদ্বয়ে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা দ্বারা ব্রিটেনে মন্ত্রীমণ্ডলীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও মর্যাদার হ্রাস হইয়াছে। ইহার ফলে ব্রিটেনে গণতন্ত্র বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। কারণ জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় পার্লামেন্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থার ফলে একদলীয় মন্ত্রীসভার আজ্ঞাবাহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(১) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় এক দলীয় মন্ত্রীসভার এক নায়কত্ব—বিধান মণ্ডলী একদলীয় মন্ত্রীসভার আজ্ঞাবাহী মাত্র হইয়া পড়ে, গণতন্ত্র বিনষ্ট হয়

দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্রে বিভিন্ন মতামত আইনসভায় প্রতিফলিত হওয়া সমীচীন। সেইজন্য দেশে বহুদল থাকাও বাঞ্ছনীয়। বহুদলের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের নাগরিক সাধারণ স্বাধীন চিন্তা করিয়া থাকেন এবং সেই রাজনৈতিক চিন্তানুযায়ী নিজেদের তাহারা সংঘবদ্ধ করিয়াছেন। বহুদল সচেতন গণতন্ত্রের সূচক।

(২) বহুদলীয় ব্যবস্থা সচেতন গণতন্ত্রের সূচক

তৃতীয়তঃ, কেবলমাত্র দুইটি দল থাকিলে ভোট দাতাগণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয় একটি বা অন্যটিকে সমর্থন করিতে হয়। বহুদল থাকিলে ভোটদাতাগণ আপন মতানুযায়ী দল বাছিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ বহুদল থাকিলে জনমতের উপযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রকাশ সম্ভব হইয়া উঠে। চতুর্থতঃ আধুনিকরাষ্ট্রে বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ বিদ্যমান। পার্লামেন্টে এই সমস্ত স্বার্থ সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বহুদলই বিশেষ উপযোগী। বহুদলের মধ্য দিয়াএই সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলগুলি আইন সভায় আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন। দ্বিদল ব্যবস্থায় সেই সুযোগ বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ।

(৩) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় অনেক সময় বাধ্য হইয়া হয় একটি বা অন্যটিকে ভোট দিতে হয়

(৪) বহুদল থাকিলে বিভিন্ন স্বার্থ বিধানসভায় প্রতিফলিত হইতে পারে

পঞ্চমতঃ, কেবলমাত্র দুইটি দল থাকিলে, প্রতিদলেই কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া উঠে। একটি দল যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাহারা আপন কায়েমী স্বার্থ আরও পাকা করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়। বহুদল থাকলে বহুদলীয় সরকার গঠিত হয়। একদলের মন্ত্রী যদি দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির

(৫) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থের উদ্ভব হয়

প্রয়াস পায়, তাহা হইলে অন্য সকল দলের মন্ত্রীবর্গ তাহাতে বাধা দিতে পারেন এইরূপে দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির পথ বন্ধ হইয়া যায়।

উপসংহার: বহুদলীয় প্রথার সপক্ষে যে সকল যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহা উপেক্ষণীয়। কিন্তু বিশুদ্ধ নীতির দিক হইতে বহুদলীয় সরকার সমর্থনীয় হইলেও কার্যক্ষেত্রে বহুদলীয় ব্যবস্থার অসুবিধা আছে। নির্দিষ্টকালের জন্য স্থায়ী, একই রাজনৈতিক মতাবলম্বী সরকার কর্মকুশলতার দিক হইতে যোগ্যতর হয় দেখা গিয়াছে। বহুদলীয় সরকার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হয়। তাই মোটের উপর দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ও একদলীয় সরকারই বাস্তব সুবিধার জন্য গ্রহণযোগ্য।

বাস্তব কারণে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য

দলের সংখ্যা যুক্তিতর্কের দ্বারা স্থির করিয়া তদনুযায়ী কার্য করা সম্ভব নহে। দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রে ও সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কোন কোন দেশে (যথা, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, জার্মানী) সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি হইতে বহুদল উত্থিত হইয়াছে। আবার কোথাও কোথাও সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এমন সমস্ত শক্তি কার্যকরী হয় যাহার ফলে কেবলমাত্র দুইটি দলই ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে থাকে।

সমাজ এবং দল গঠন ও রাষ্ট্র

একদলীয় ব্যবস্থা (Single Party System): একদলীয় ব্যবস্থানুসারে রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। অন্য সকল দল রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগের ফলে বিলুপ্ত হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর কমিউনিস্ট দল ছাড়া অন্য সকল দল বিনষ্ট করা হয়। একমাত্র কমিউনিস্ট দল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে। রাশিয়ার সংবিধানের ১২৬ ও ১৪১ ধারা অনুযায়ী কমিউনিস্ট দলকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে। ইটালীতে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্টদল ও জার্মানে হিটলারের নাৎসীদলও ঐ দুই দেশে যথাক্রমে সরকারী স্বীকৃতির মর্যাদা লাভ করে। অন্য সকল দলের বিনাশ সাধন এবং একটি দলকে স্বীকৃতি দান একদলীয় ব্যবস্থার মূল কথা।

রাশিয়া, ইটালী ও জার্মানীর একদলীয ব্যবস্থা

যাহারা একদলীয় ব্যবস্থার সমালোচক তাহারা বলিয়াছেন যে একদলীয় ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীন চিন্তার স্থান নাই। গণতন্ত্রে আপনাপন মতানুযায়ী দল গঠন করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করিবার স্বাধীনতা প্রতি নাগরিকেরই রহিয়াছে। একদলীয় ব্যবস্থায় ইহা অসম্ভব। সুতরাং একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্র

এক দলীয় ব্যবস্থার সমালোচনা

বিরোধী। ইহা একদলীয় স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত কিছুই নহে। একদলীয় ব্যবস্থায় সরকার-স্বীকৃত দলের সদস্যগণ রাষ্ট্রে ও সমাজে বিশিষ্ট পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী ; যাহারা দলবহির্ভূত তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। অর্থাৎ একদলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মূলনীতি—স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুইটিরই অপমৃত্যু ঘটে। স্বীকার করিতে হইবে যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও একদলীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিরোধী।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতা নাই

একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থকেরা এই সমালোচনার উত্তরে বলিয়া থাকেন যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। গণতন্ত্রের আদর্শ স্বাধীনতা ও সাম্য। ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্য জগতে শ্রেণী বৈষম্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। ধনিকশ্রেণীব প্রভুত্ব অপ্রতিহত হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা সাম্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীবিভেদের ফলে যাহারা দরিদ্র ও শোষিত মানুষ তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার নামে মাত্র পর্যবসিত হয়। এমনকি তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও ক্ষমতায় আসীন ধনিকশ্রেণীর হস্তে ক্রীডনকে পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় গণতন্ত্র মিথ্যা হইয়া যায়। অর্থাৎ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে দরিদ্র শোষিত শ্রেণীর স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার নাই। ইহা ধনিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বই কিছু নহে।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে শোষিত শ্রেণীব সাম্য ও স্বাধীনতাব অভাব

অর্থনৈতিক সাম্য-গণতন্ত্র স্বাধীনতার ভিত্তি

সত্যকার গণতন্ত্র স্থাপিত করিতে হইলে সর্বপ্রথম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। সোবিয়েত দেশে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি প্রস্তুত হইয়াছে। সোবিয়েতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখন ধীরে ধীরে সাম্যবাদ বা কমিউ-নিজমের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অগ্রগমন সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে সাম্যবাদে বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্ব প্রয়োজন। কমিউনিষ্টদল শ্রমিক কৃষকের মুখপাত্র হিসাবে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্যের পথে অর্থাৎ সাম্যবাদের (Communism) পথে রাষ্ট্রকে পরিচালিত করিতেছে।

এইদিকে সোবিয়েতের সাফল্য

-কমিউনিষ্টদল কমিউনিজম অথবা সাম্যবাদের চরম আদর্শ লাভের জন্ত অপরিহার্য

এই ক্ষেত্রে অন্যদল মানিয়া লওয়া সম্পূর্ণ অবান্তর। রাজনৈতিক দলগুলি শ্রেণী সমাজেই গঠিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দল প্রতিযোগী অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতীক। সোবিয়েত দেশে অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব নাই। কারণ সোবিয়েতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দলের আবশ্যকতা নাই। যেখানে সমস্ত জনগণের স্বার্থ অভিন্ন, সেখানে একটি দল থাকাই বাঞ্ছনীয়। সেই দল হইতেছে কমিউনিষ্ট দল, ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রেণীহীন ও দলহীন সমাজ গঠন। মার্কস্‌বাদীগণ

ধনতান্ত্রিক দেশে দলগুলি শ্রেণীস্বার্থবাহী

সোবিয়েত দেশে জনগনের স্বার্থ এক ও অভিন্ন তাই অন্যদলের আবশ্যকতা নাই

আরও বলেন যে কমিউনিষ্ট দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র বর্তমান। সেখানে সমালোচনার অধিকার প্রতিটি সভ্যেরই রহিয়াছে। এই অধিকার সাম্প্রতিক কালে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃতও হইয়াছে। সোবিয়েত বিরোধীগণ বলিয়া থাকেন যে রাশিয়াতে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগে সমস্ত বিরুদ্ধ-মত স্তব্ধ করা হয়। মার্কস্‌বাদীগণ ইহার উত্তরে মন্তব্য করিয়াছেন যে সোবিয়েত সমাজ-বিধ্বংসী কার্যকলাপ দৃঢ়তার সহিত দমন করা সোবিয়েত রাষ্ট্রের কর্তব্য, নতুবা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রবিধ্বংসী কার্যাবলী দৃঢ়তার সহিত বন্ধ করা হয়।

কমিউনিস্ট দলেব অভ্যন্তরে গণতন্ত্র

সোবিয়েত নীতি বিধ্বংসী মতামত রাশিয়াতে দমন করা হয়—পাশ্চাত্য গণতন্ত্রেও রাষ্ট্র-বিরোধী মত প্রকাশ আইন বিরুদ্ধ

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও আর্থিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সোবিয়েত গণতন্ত্রের দুইটি বিভিন্ন আদর্শ। প্রথম আদর্শটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজ মানিয়া লইতেছে, দ্বিতীয়টি শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কামনা করিতেছে। প্রথম আদর্শটির অনুসারে আর্থিক অসাম্য ও ধনী দরিদ্রের শ্রেণীভেদ গণতন্ত্রের পরিপন্থী নহে। দ্বিতীয় আদর্শটি আর্থিক সাম্যকেই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র সোবিয়েত আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এইরূপ অবস্থায় একের দলগত ব্যবস্থা অন্যের দলগত ব্যবস্থার সহিত তুলনীয় নয়।

উপসংহার

অতিরিক্ত পাঠ

BARKER, E.—Reflections on Government, Ch. X

FINER, H.—Theory and Practice of Modern Government, Ch. XIV, XV, XVI

MACIVER, R. M.—The Modern State, Ch. XIII

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জনমত

(Public Opinion)

[কোন রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণের সুগঠিত ও প্রচারিত মতকে জনমত বলা চলে। গণতন্ত্রে জনমত রাষ্ট্রের নীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে বলিয়া জনমতের মূল্য অপরিসীম। জনমত কিন্তু প্রায়শঃই পরস্পর বিরোধী মতসমূহের সমষ্টি। কারণ প্রতি রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেই মত-বিরোধের স্থান আছে। সরকারকে এই মতবিরোধের ভিতর হইতেই রাষ্ট্রের কল্যাণপন্থী অথচ সাধারণভাবে গণমণ্ডলীর মনঃপূত নীতি বাহির করিয়া লইতে হইবে। এই কর্তব্যটি তাই জটিলতাপূর্ণ।

কোন রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে গল্প গুজব, অসম্বন্ধ কথাবার্তার মাধ্যমে মত গঠিত হইতে থাকে, ক্রমে সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি, রাজনৈতিক দলগুলি, দেশের মনীষবর্গ ঐ মতগুলিকে যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে গঠিত করিয়া বিশিষ্টরূপ দান করেন। ইহাই জনমত হইয়া উঠে।

অনেকে বলিয়াছেন যে জনমতকে মত বলা যায় না কারণ অনেক সময়ই তথাকথিত জনমতের পশ্চাতে যুক্তি থাকে না। তাহারা আরও বলেন যে জনমত সত্য সত্য জনসাধারণের মত নহে। কারণ রাজনৈতিক দল ও স্বার্থানুসন্ধানী গোষ্ঠী প্রচারের মাধ্যমে তাহাদেরই মতকে জনমত বলিয়া চালাইয়া দেন। ইহা আংশিকভাবে সত্য, তবে অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট।

গণতন্ত্রে শাসনপদ্ধতি ও আইন প্রণয়ন জনমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাহা না হইলে গণতন্ত্র বৃথা হইয়া যায়। জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ।

জনমত প্রকাশের মাধ্যমগুলি হইতেছেঃ (১) সংবাদপত্র; (২) বক্তৃতামঞ্চ; (৩) চলচ্চিত্র (৪) বেতার; (৫) পুস্তক, প্রচারপত্র প্রভৃতি।]

জনমতের সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের কোন বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের ও নানা সূত্রে বিজ্ঞাপিত, ব্যক্তি বা সমষ্টির জনকল্যাণধর্মী বলিয়া প্রকাশিত যে সকল নির্দিষ্ট মতামত, লক্ষণীয় রূপে নাগরিকগণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে, তাহাকে জনমত বলে।

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে জনমতের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায়। (১) জনমত রাষ্ট্রের কোন কোন বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা বা সমস্যা সম্বন্ধে মন্তব্য। অধিকাংশ সময়ে এই মন্তব্যের মধ্য দিয়া সমস্যাটির সমাধানের উল্লেখ বা ইঙ্গিত থাকে। মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায় যে জনমত কোন একটি পরিস্থিতির সমালোচনা করিয়াছে মাত্র। বলা বাহুল্য এইরূপ বিশ্লেষণী মতপ্রকাশ হইতেও সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। (২) কোন একটি রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ে নানারূপ পরস্পর বিরোধী মতামত প্রকাশিত হইতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হেতু যে মতানৈক্য হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সাধারণতঃ স্বার্থের বিভিন্নতার দরুনই ঘটিয়া থাকে। (৩) মতামত প্রকাশিত হইবার নানা মাধ্যম আছে। সংবাদপত্র, বক্তৃতামঞ্চ, পুস্তক, প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র, রেডিও, আলোচনা বৈঠক, সংগঠন, সমিতি, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতির মারফৎ মতামত প্রকাশিত হয়। (৪) যে মতামত কোন রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকাশিত হয় তাহা ব্যক্তি-বিশেষের বা ব্যক্তি-সমষ্টির মত হইতে পারে। রাজনৈতিকদল বা কোন সংঘবদ্ধ সমিতি সাধারণতঃ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কখনও কখনও আপনার মত লোকসমাজে প্রচার করিয়া থাকেন। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষেরও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা কর্তব্য রহিয়াছে। সংবাদপত্র মারফৎ অনেক সময় অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তিগণেরও মতামত নাগরিকদের দৃষ্টিগোচর হয়। (৫) যে কোন মতকে জনমত বলা চলে না। জনমতের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কোন বিশেষ মত জনমতের পর্যায়ে উন্নীত হইতে হইলে তাহাকে সুস্পষ্ট ও অবিচলিত হইতে হইবে। আজ একরূপ, কাল অন্যরূপ—এইভাবে যদি কোন রাজনৈতিক বা সমিতির মত প্রকাশিত হয় তাহা হইলে জনমতের স্তরে সেই মত কিছুতেই পৌঁছুতে পারে না। (৬) রাজনৈতিক বিষয়ে যে কোন প্রকাশিত মত জনমতের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা লক্ষণীয়ভাবে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা আবশ্যক। রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ তাহা গ্রহণ করিবে এমন প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে বেশ কিছুসংখ্যক লোক, বিশেষতঃ সংঘবদ্ধ কোন নাতিক্ষুদ্র দল নাগরিকসংঘ বা সমিতি যদি তাহা গ্রহণ করে তবে সেই মতটি গণতান্ত্রিক সরকারকে নীতি নির্ধারণে সাহায্য করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ঐ প্রকাশিত মতটি জনমত বলিয়া অভিহিত করা যায়। যদি আইনের মাধ্যমে ঐ মত স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে জনমত অনুযায়ী আইন প্রণীত হইয়াছে। (৭) আদর্শের দিক হইতে জনমত লোক-কল্যাণ ধর্মী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বাস্তব জগতে এইরূপ গুণবিশিষ্ট মত প্রায়শঃই দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ক্ষুদ্র স্বার্থবোধই জনমতের ভিত্তি। (৮) যে মত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের নীতি নির্ধারণে সহায়ক হইয়া উঠে তাহাই জনমত। এই স্তরে উপনীত হইতে হইলে দেশের মধ্যে যে মত প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে উপরোক্ত কয়েকটি গুণবিশিষ্ট হওয়া অপরিহার্য।

জনমত ও অন্যান্য মতঃ সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জনমতের একটি

বিশিষ্ট চরিত্র আছে। ইহা দায়িত্বশীল ও নির্দিষ্ট; অসম্বদ্ধ, অস্পষ্ট মতামত নয়। এইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বীকৃত জনমত হইতে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে প্রকাশিত অন্যান্য মতের পার্থক্য মানিয়া লইতে হইবে। ঘরে বসিয়া বা রাস্তা ঘাটে ও বাজারে বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলোচনায় বিচ্ছিন্নভাবে যে মতামত কোন রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা প্রকাশ করি তাহা সকল সময় জনমতের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু ঐ মতগুলিই যখন সুষ্ঠুভাবে গঠিত হইয়া, নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে এবং সুসম্বদ্ধভাবে প্রকাশিত হইয়া নাগরিকগণের একটি প্রভাবশালী ও লক্ষণীয় অংশের সমর্থন পায় তখনই তাহা জনমতের পর্যায়ে স্থান পায়। তখন গনতান্ত্রিক সরকার সেই মতকে মর্যাদা দিতে বাধ্য হন এবং আইন-নীতি নির্ধারণে তাহা সরকারের প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সহায়ক হইয়া উঠে। আদর্শগতভাবে জনমত লোক-কল্যাণ ধর্মী কিন্তু অন্যান্য মতের সহিত লোক-কল্যাণের কোন সম্পর্ক নাই।

যে মতগুলি চিন্তার ভিত্তিতে সুগঠিত আকারে প্রকাশ পায় সেইগুলিকেই জনমত পর্যায়ে ফেলা চলে

জনমত গঠণের ধারা ও উৎস: যখন কোন রাজনৈতিক সমস্যা দেশের মধ্যে প্রথম আলোচিত হইতে থাকে তখন যে সকল মতামত প্রথম স্তরে প্রকাশিত হয় তাহাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় থাকে না। দেশপ্রেম, লোক-হিতৈষণা, অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার, পুরাতনের প্রতি প্রীতি প্রভৃতির সহিত নূতন কিছু করিবার বাসনা, আধুনিকতার মোহ, ক্ষুদ্র-বিদ্বেষ, হিংসা, ধর্মান্ধতা শ্রেণীবিদ্বেষ প্রভৃতি মিশিয়া নানা প্রকারের মতামতের সৃষ্টি হয়। গল্পগুজব, সামাজিক আলাপচারিতায় ইহার প্রথম অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহারই মধ্যে আবার দেখা যায় যে বিশিষ্ট চিন্তাশীলেরা বিষয়টিকে বুদ্ধিদ্বারা বিশ্লেষণ করিতেছেন। পরবর্তী স্তরে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও দলগুলি এবং অন্যান্য সংস্থা বিষয়টির আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। সংবাদ-পত্রগুলি সংবাদ পরিবেশন ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে মতামতগুলিকে সুসংহত ভাবে রূপ দিতে প্রয়াস পান। যে মতগুলি এতদিন এলোমেলো অসম্বদ্ধভাবে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছিল, তাহা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়া যুক্তি তর্কের ভিত্তিতে সুগঠিত হইয়া যায়। এইরূপে দায়িত্বহীন অনির্দিষ্ট মত সুসম্বদ্ধ হইয়া জনমতে পরিণত হয়। সুতরাং সাধারণ মানুষ, বিশিষ্ট চিন্তানায়ক, রাজনৈতিক দল, বেসরকারী সমাজ-কল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস হইতে জনমত উত্থিত হয় এবং ধীরে ধীরে কলেবর গ্রহণ করে।

জনমতের মনোবিজ্ঞানী ব্যাখ্যা

অসম্বদ্ধ কথাবার্তায় শুরু হইয়া জনমত ক্রমে সুগঠিত হইয়া উঠে

ব্রাইস বলিতেছিলেন যে, জনমত প্রথমস্তরে এলোমেলো, অসম্বদ্ধ ও আকার-বিহীন অবস্থায় দেখা দেয় এবং দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ জনমতের চেহারা বদলাইয়া যায়। ক্রমে মতগুলি ঘনীভূত হইয়া আকার ধারণ করিতে থাকে এবং পরিষ্কার হইয়া আসে এবং শেষ পর্যন্ত মতগুলি নির্দিষ্টতা ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তখন মতামত সমূহ লক্ষ্যণীয়ভাবে জনসমর্থনও লাভ করিতে থাকে। এই অবস্থায় মতগুলি জনমতের মর্যাদা পায় এবং শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।* বলা বাহুল্য জনমতের আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ঐক্য নাই। একটি বিষয়ের উপর বিভিন্ন রকমের পরস্পর বিরোধী জনমত প্রায়শঃই দেখা যায়। যেহেতু সকল মানুষের শিক্ষা দীক্ষা মনের গঠন ও স্বার্থ বিভিন্ন, সেই হেতু কোন বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিভিন্ন জনমত গঠিত হইয়া উঠিবে তাহা স্বাভাবিক।

জনমত প্রায়শঃ পরস্পর বিরোধী মতের সমষ্টি

জনমতের সমালোচনা : কেহ কেহ বলিয়াছেন যে তথাকথিত জনমতের বিশেষ মূল্য নাই। প্রথমতঃ, জনমত বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহাকে মত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। সত্যকার মতের কতকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ যে বিষয়ে মত গঠিত হইবে তাহার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ব্যাপক জ্ঞান মত গঠনের অপরিহার্য ভিত্তি। কিন্তু অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে তথাকথিত জনমতের অভিব্যক্তির সহিত সেই বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞানের কোনই সম্পর্ক নাই।

জনমত সত্য সত্য মতই নহে

দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়া থাকে যে কোন বিষয় সম্বন্ধে জনমত কল্যাণধর্মী ও যুক্তি-নির্ভরশীল হওয়া উচিত। কিন্তু তথাকথিত জনমত হিংসা-দ্বেষ, কুসংস্কার, ক্ষুদ্রস্বার্থ প্রভৃতির দ্বারাই প্রভাবিত ও গঠিত হয়। জনকল্যাণ ও যুক্তির সহিত জনমতের সম্পর্ক অতিশয় ক্ষীণ সেই জন্য জনমতকে মতের পর্যায়ে ফেলা উচিত নহে।

* It is confused, incoherent, amorphous varying from day to day and week to week. But in the midst of this diversity and confusion every question as it rises into importance is subject to a process of consolidation and clarification until there emerge and take definite shape, certain views each held and advocated in common by bodies of citizens. It is to the power exercised by any such view or set of views......that we refer when we talk of Public Opinion as approving or disapproving a certain doctrine or proposal and thereby becoming a guiding or ruling power—Bryce.

তৃতীয়তঃ বলা হইয়া থাকে যে জনমত জনসাধারণের বা জনতার মত নয়। সাধারণতঃ যাহাকে জনমত বলে তাহা অনেক সময় কোন দল অথবা দলীয় নেতা বা কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন সমাজপতি কিংবা অর্থশালী শ্রেণী বা ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থানুগ মত। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ আপন আপন স্বার্থে জনসাধারণের মত ও ধারণা সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রভাবিত করেন। সাধারণ অজ্ঞ নাগরিক মতলববাজ ব্যক্তিবর্গের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়া কতকগুলি ধরা-বাধা বুলি আওড়াইয়া তথাকথিত জনমত সৃষ্টি করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে Public Opinion বা জনমত, Public বা জনসাধারণের মত নয়। আবার ইহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে Opinion বা মতও বলা যায় না।

তাহা জনসাধারণের মতও নহে—প্রায়শঃ দলীয় মত

এই সমালোচনা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। আদর্শগতভাবে জনমত সকল সময় কল্যাণধর্মী নহে সত্য, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে জনমঙ্গল সাধনের ইচ্ছা বর্তমান রহিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই ইচ্ছানুযায়ী যে মতামত কিছুটা পরিমাণে গঠিত হয় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে আদর্শ লোকমঙ্গলপন্থী জনমত বিরল। ইহাও স্বীকার্য যে জনসাধারণের মতামত রাজনৈতিকদল, সংবাদপত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু জনমতের পশ্চাতে সাধারণ মানুষের নিজস্ব চিন্তা একেবারেই নাই, জনসাধারণ অভিসন্ধিবাজ নেতৃবর্গের হস্তে কেবলমাত্র ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে—এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। সুতরাং জনমতের মধ্যে জনসাধারণের ইচ্ছা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশিত হয় স্বীকার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ জ্ঞান স্বাধীন মতের ভিত্তি, ইহা মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু জনসাধারণের রাজনৈতিক বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই ইহা মনে করাও অযৌক্তিক। আধুনিক যুগে সংবাদপত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র, রাজনৈতিক দল, বক্তৃতামঞ্চ, প্রচারপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। সুতরাং জনমতের সহিত রাজনৈতিক জ্ঞানের সংশ্রবও উল্লেখযোগ্যভাবে বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং জনমত একেবারেই জনসাধারণের সত্যকার মত নহে, এবং মত বলিলে যাহা বুঝায় জনমতের মধ্যে তাহার কোন গুণাবলী নাই—এইরূপ মনে করা যুক্তিহীন। বাস্তব পৃথিবীতে আদর্শ সম্পূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব না হইতে পারে।

সমালোচনায় সত্য নিহিত আছে, তবে তাহা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট

কিন্তু বর্তমানে দোষ ত্রুটি পশ্চাতে ফেলিয়া আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়ার সদা সচেতন প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়াই আদর্শ নাগরিকতার বিকাশ সম্ভব হইবে।

জনমতের মূল্য—গণতন্ত্র ও জনমত (Value of public Opinion—Democracy and Public Opinion): জনমতের সহিত গণতন্ত্রের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। জনমতানুযায়ী শাসন ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্র বলা চলে। জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। যে গণতন্ত্রে জনমতের মর্যাদা রক্ষা করা হয় না বা যে শাসনতন্ত্র জনমত অনুসারে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে না, তাহাকে গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যায় না। আধুনিক গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক রুশো গণতন্ত্রে মানুষের সাধারণ কল্যাণ ইচ্ছার (General Will) প্রাধান্য কামনা করিয়াছিলেন। তাহার মতে সাধারণ কল্যাণ ইচ্ছাই রাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অধিকারী। বাস্তব ক্ষেত্রে নাগরিকগণের আদর্শগত নৈতিক কল্যাণ ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ নাই বলিলেই চলে। ত্রুটিপূর্ণ মনুষ্য সমাজে তাই জনমত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দৈনন্দিন পথপ্রদর্শকরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অন্যপক্ষে গণতন্ত্র না থাকিলে জনমতের কোন মূল্য নাই। স্বেচ্ছাতন্ত্রে বা একনায়কত্বে জনমত গঠিত বা প্রকাশিত হইবার সুযোগ নাই। জনমত গঠিত হইতে হইলে যে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া প্রয়োজন কেবলমাত্র গণতন্ত্রেই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ

গণতন্ত্র ও জনমত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। গণতন্ত্রের চরিত্র জনমতের উপব নির্ভর করে। যে রাষ্ট্রে জনমত সতর্ক ও সচেতন নহে, সেখানে জনমত গঠনের যন্ত্রগুলি সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠে নাই, সেই সব দেশ গনতান্ত্রিক হইলেও, সেখানে গণতন্ত্র সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় না। ব্রিটেনের গণতন্ত্রের উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে সুস্থ ও সদাজাগ্রত জনমতের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই দেশে জনমত গঠনের মাধ্যমগুলিও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইহারাই ব্রিটেনের গণতন্ত্রের ধারক ও বাহকরূপে আপনাপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে। শক্তিশালী ও মঙ্গলপন্থী জনমত গণতন্ত্রের প্রধান সহায়।

গণতন্ত্রে জনমতের ভূমিকা: জনমত কি ভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহায়ক হইয়া উঠিতে পারে তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, জনমতের মধ্যে দিয়া গণতান্ত্রিক বিধানমণ্ডলী ও শাসন বিভাগ জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আইন ও স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে। জনসাধারণের

শাসনপদ্ধতি ও আইন প্রণয়নের উপর জনমতের প্রভাব

কল্যাণের জন্য আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ ঘটে। সতর্ক ও জাগ্রত জনমত এই দিক হইতে গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি দেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে রক্ষণশীল ও গতানুগতিক পথে আবদ্ধ থাকিবার প্রবণতা দেখা যায়। গণতন্ত্রও এই প্রবণতার ঊর্ধ্বে নহে। জনমত গণতন্ত্রকে এই রক্ষণশীলতার কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারে। জনমতের চাপে গণতান্ত্রিক সরকার পুরাতনপন্থী নীতি পরিত্যাগ করিয়া প্রগতিমূলক পথে অগ্রসর হইতে পারে। গণতন্ত্রের ইতিহাসে বারংবার ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রিটেনে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের যুগান্তকারী যে রাষ্ট্রীয় সংস্কার আইন প্রণীত হইয়াছিল তাহা জনমতের চাপেই সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটেনের জনমত ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে সেই যুগে চরম রক্ষণশীলতার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রগতির পথে চলিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল। পাশ্চাত্যজগতের সকল দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জনমতের প্রভাবে গৃহীত হইয়াছে।

জনমত রাজনৈতিক সংস্কার ত্বরান্বিত করে

গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক জনমত নির্ণয়ের রীতি ঃ গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র ও বিধানমণ্ডলী জনমতের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া থাকে সত্য। কিন্তু এই কাজটি সুকঠিন ও জটিলতাপূর্ণ। তাহার কারণ এই যে জনমত কোন ঐক্যবদ্ধ মত নহে। জনমতের মধ্যে পরস্পরবিরোধী নানামতের সমাবেশ হইয়া থাকে। ইহার ভিতর গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র ও বিধানমণ্ডলীতে জনসাধারণের সত্যকার মতটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন পথে চলিলে জনসাধারণের মর্যাদা রক্ষা করা ও তাহাদের মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাই শাসন ও আইন বিভাগের বিচার্য বিষয়। সমগ্র জনমতের মধ্যে বহুমতের দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকায় এই দুই বিভাগের ও সাধারণভাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ হইয়া পড়ে। যে গণতান্ত্রিক সরকার সুষ্ঠু ও নিরুপদ্রবভাবে জটিলতার মধ্যেও উপযুক্ত পন্থা বাছিয়া লইতে পারেন, সেই সরকার ততই সফলতা অর্জন করিতে সমর্থ হন। সাধারণভাবে যে মতের পশ্চাতে মোটামুটিভাবে অধিকাংশের সমর্থন আছে বলিয়া মনে করা যাইতেছে সরকার সকল সময় সেই মতটিকে গ্রহণ করিবেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সমস্ত পারিপার্শিক ও সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনা করিয়া সরকারকে

গণতান্ত্রিক সরকার কি চাপে জনমতের সহিত শাসন পদ্ধতি ও আইন ব্যবস্থার যোগ সাধন করেন

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। জনকল্যাণ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক মঙ্গলই এই ক্ষেত্রে নিয়ামক। সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সরকারকে হয়তো বা দেশের মধ্যে প্রচারিত এমন মতটি গ্রহণ করিতে হইতে পারে, যাহার পশ্চাতে প্রচারের ঢক্কানিনাদ প্রবল নহে এবং সাধারণভাবে মনে হয় যে ঐ মতটি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পায় নাই। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র ও বিধানমণ্ডলী সাধারণতঃ যদি বুঝিতে পারেন যে কোন একটি মতের পশ্চাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন রহিয়াছে এবং মতটি কার্যে পরিণত করিলে দেশ মঙ্গলের পথেই অগ্রসর হইবে তাহা হইলে তাহাদের কর্তব্য সহজ হইয়া যায়।

গণতান্ত্রিক সরকার তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণে জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলির প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখেন। এই জন্য, এই মাধ্যমগুলির আলোচনা আবশ্যক।

জনমত প্রকাশের মাধ্যম (Media of expression of public opinion): আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে জনমত গঠন ও প্রকাশের খুব শক্তিশালী উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত মাধ্যমগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) সংবাদপত্র; (২) বক্তৃতামঞ্চ, (৩) চলচ্চিত্র; (৪) বেতার; (৫) পুস্তক, প্রচারপত্র, প্রচারলিপি, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি।

সংবাদপত্র

(১) সংবাদপত্র: জনমত গঠনের যত উপায় রহিয়াছে তাহার মধ্যে সংবাদপত্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্যদেশে আধুনিক সংবাদপত্রগুলির পাঠক সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। সেইজন্য ঐ সকল সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ পায়। দিনের পর দিন তাহারা সংবাদ পরিবেশন, সম্পাদকীয়, বিশেষ প্রবন্ধ প্রভৃতির ভিতর দিয়া জনমত গঠন করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পাঠকগোষ্ঠির পত্র ও বিবৃতি প্রভৃতি প্রকাশের সুবিধাদান করিয়া সংবাদপত্র জনসাধারণকে জনমত গঠন ও তাহা প্রকাশ ও প্রচারের সুবিধা দিয়া থাকে। পাশ্চাত্যদেশে প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং প্রধানতঃ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থলাভের জন্যই সেগুলি প্রচার কার্য চালাইয়া থাকে। সংবাদপত্র সম্পর্কে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশ সংবাদপত্র পুঁজিপতিদের সম্পত্তি; তাই সংবাদপত্রগুলি সেই সকল দেশে যেরূপভাবে সংবাদ পরিবেশন করে, যেরূপ সম্পাদকীয় এই

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা আবশ্যক

সকল পত্রে প্রকাশিত হয় তাহা সাধারণতঃ ধনিকতন্ত্রের অনুকূল। সমালোচকেরা বলেন যে, শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল সংবাদ এই সকল সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে অস্বীকার করে, অথবা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ পাশ্চাত্যদেশে অধিকাংশ সংবাদপত্র নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয় না। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্রের পক্ষে এইরূপ অবস্থা অনুমোদন যোগ্য নয়। এই জন্য সংবাদপত্রগুলির নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাহারাও যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারিবেন তাহাতে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

সংবাদপত্র ক্ষমতাসীন সরকারের সমালোচনা করিয়া, জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমে এবং দেশবিদেশের সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলি গুরুতর কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে। গণতন্ত্রে এই কয়টি কার্য অপরিহার্য। এই সকল কর্তব্য যে সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সমভাবে সম্পন্ন করিবে তাহা কল্পনা করা যায় না। এইজন্য সংবাদপত্রকে গণতন্ত্রের একটি অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। সংবাদপত্র ব্যতীত গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে ও গণতান্ত্রিক নিয়মানুসারে আপন কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। সংবাদপত্র যাহাতে উপযুক্তরূপে আপন গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করিতে পারে, সেই জন্য সংবাদপত্রকে গণতন্ত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বক্তৃতামঞ্চ

(২) **বক্তৃতামঞ্চ:** আধুনিক গণতন্ত্রে জনসভা, আলোচনাসভা, ধর্মসভা প্রভৃতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে জনমত গঠন ও প্রকাশের প্রচুর সুবিধা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দলগুলি শুধু সাধারণ নির্বাচনের সময়ে নহে, অন্য সময়েও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে সভাসমিতি করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে আপনাপন মতামত জনসমাজে প্রচার করিয়া থাকে। গণতন্ত্রে জনসভার স্বাধীনতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহার অভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের সমালোচনা অসম্ভব হইয়া উঠে, জনমত গঠনও করা যায় না।

বাকস্বাধীনতা জনমত গঠনের ভিত্তি

চলচ্চিত্র

(৩) **চলচ্চিত্র:** একদিক হইতে চলচ্চিত্রকে সংবাদপত্র হইতেও শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরাই কেবল সংবাদপত্র পাঠ করিতে পারে, কিন্তু নিরক্ষরেরাও চলচ্চিত্রের ছবি দেখিয়া জ্ঞানলাভ ও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে।

শিক্ষিত ও নিরক্ষর—সমগ্র জনসাধারণকে চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত করা সম্ভব। আধুনিক যুগে সরকার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাহাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালাইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা নাগরিকগণ রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে তথ্যাদি অবগত হইতে পারেন। এইজন্য চলচ্চিত্র সু-নাগরিকতার সহায়ক হইতে পারে।

বেতার

(৪) বেতার : আধুনিক যুগে বেতারের মারফৎ প্রচারকার্য চালান হইয়া থাকে। বেতারের সাহায্যে রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে জনমত গঠন ও প্রকাশ একটি সর্বদেশগ্রাহ্য পদ্ধতি। বলাবাহুল্য, যেখানে বেতার সরকারের করায়ত্ত সেখানে সরকার জনমত গঠনের জন্য ব্যাপকভাবে বেতার ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বে সরকারী দলের মতামত প্রচারের সুবিধা যে একেবারেই দেওয়া হয় না তাহা নহে। বেতারের সাহায্যে সর্বদেশে সমাজকল্যাণ সংস্কৃতিমূলক বিষয়ে জনমত গঠনের যে প্রচেষ্টা হয় তাহাও উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকাদি

(৪) পুস্তক, প্রচারপত্র, প্রাচীরলিপি, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি : জনমত পুস্তক, প্রচারপত্র, প্রাচীরলিপি, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমেও গঠিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতি দেশে রাজনৈতিক নীতি ও সমস্যা সম্পর্কে বহু পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে ; তাহার মধ্যে দিয়া বিশিষ্ট মতবাদ জনসাধারণের দৃষ্টির জন্য তুলিয়া ধরা হয়। আজকাল শুধু পুস্তক, প্রচার পত্র, প্রাচীরলিপি নয়, ব্যঙ্গচিত্রও জনমত প্রকাশের একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্রের ব্যঙ্গচিত্রাদি জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করে ; জনমত গঠনে ইহার ভূমিকা উপেক্ষার বস্তু নয়। বলা বাহুল্য যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ব্যতীত জনমত গঠন ও প্রকাশের এই মাধ্যমগুলি সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। গণতন্ত্রে তাই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা একটি মূল্যবান মৌলিক অধিকার বলিয়া গণ্য হয়।

LIPMANN : Public Opinion

DICEY : Law and Public Opinion in England

পরিশিষ্ট

সাম্যবাদের নূতন দিগন্ত : নয়া গণতন্ত্র (New Democracy) বা জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ববাদ (Peoples' Democratic Dictatorship)

সোভিয়েট বিপ্লব ও চীনবিপ্লব :

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চৈনিক জনগণের নেতা মাও ৎসে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের নূতন সাম্যবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নয়াচীনের জনতাভিত্তিক নয়া গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চীনের সাম্যবাদী রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজগঠন মার্কস্-লেনিন্ নির্দেশিত পথে অগ্রসর হইয়াছে। রুশবিপ্লবের ইতিহাস যে অনেক পরিমাণে মাও ৎসে-তুঙকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ১৯১৭ সালে রুশীয় বিপ্লব সংঘটিত না হইলে চৈনিক বিপ্লব অসম্ভব হইত। মাওৎ-সে-তুঙ বলিয়াছেন : "The Chinese were introduced to Marxism by the Russians. Before the October Revolution, the Chinese were not only unaware of Lenin and Stalin but did not even know Marx or Engels. The salvoes of the October Revolution brought to us Marxism-Leninism (On Peoples' Democratic Dictatorship" Foreign Language Press, Peking (1951), P. 7) অর্থাৎ চীন রাশিয়ার নিকট হইতেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষা করিয়াছে। সোভিয়েট বিপ্লব চীনের জনগণকে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে মাও-এর ধ্যানধারণা অনুযায়ী চীনে যে সমাজবাদী গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা সমাজচিন্তা ও কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে কতকগুলি নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। চীনের বাস্তব অবস্থার প্রভাবই এই নূতন পন্থার ইঙ্গিত করিয়াছে এবং মাও স্বদেশবাসীকে তদনুরূপ নেতৃত্ব দিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে চীনের সঙ্গে নানা কারণে রাশিয়ার মতান্তর শুধু যে দারুণ মনান্তরে পরিণত হইয়াছে তাহা নহে, পরস্পর পরস্পরকে সাম্রাজ্যবাদী (imperialist) অপবাদ দিয়া দোষারোপ করিতেছে। চীন রাশিয়াকে Revisionist বা শোধনবাদী আখ্যা দিয়াছে। রাশিয়া চীনকে Deviationist বা বিপথগামী বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। দুই পক্ষ হইতেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে অপরপক্ষের ক্ষমতা-মত্ততা ও ক্ষমতা-লোলুপতা গণতন্ত্র;

বিশ্বশান্তি ও সাম্যবাদ প্রসারের ঘোরতর পরিপন্থী। আমাদের পক্ষে এই বাদ-বিসংবাদ পরিত্যাগ করিয়া মাও-এর মূল নীতিগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করাই শ্রেয়।

(১) মাও ৎসে-তুঙ নানা ভাষণে বিভিন্নভাবে Socialist Realism বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বিপ্লবী সমাজগঠনের ক্ষেত্রে যে পন্থা অনুসৃত হইয়াছে তাহা মাও-এর একটি সংক্ষিপ্ত নীতির মধ্যে বিবৃত রহিয়াছে। 'ON METHODS OF LEADERSHIP' পুস্তিকায় তিনি বলিয়াছেন: "In all practical work of the Party, correct leadership can only be developed in the principle of 'from the masses, to the masses' অর্থাৎ সমাজ বিপ্লবের প্রেরণার উৎস চীনের জনগণের আশা আকাঙ্খা। জনগণের এই আকুতি পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করিয়া নীতিরূপে জনগণের হাতে সমাজ-বিপ্লবের হাতিয়ার স্বরূপ পৌছাইয়া দিতে হইবে। ইহাই নেতৃত্বের সত্যকার ভূমিকা।

(২) মাও যখন কমিউনিষ্টদলের সদস্যরূপে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন তখন চীন ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশ। নিপীড়িত কৃষক সমাজ ছিল সমগ্রজাতির সর্ব বৃহৎ অংশ। কৃষির ক্ষেত্রে একদিকে ছিল বিরাট, মাঝারি, ছোটখাট জমিদার শ্রেণী এবং ধনী কৃষক; অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও ক্ষুদ্র কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষককুল। মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকশ্রেণী ছিল প্রথমোক্ত জমিদার শ্রেণী কর্তৃক উপদ্রুত ও নিষ্পেষিত। শিল্পের ক্ষেত্রে চীন তখন আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক নাগপাশে বাঁধা ছিল। বিদেশী শিল্পপতি ও তৎকালিক চীনের প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনটাং সরকারের ছত্রছায়ায় এক শ্রেণীর তাঁবেদার চৈনিক শিল্পপতির উদ্ভব হয়। অন্য পক্ষে বিদেশী শিল্পগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনটাং সরকারের প্রভাবমুক্ত জাতীয়তা-বাদী (national) ও দেশভক্ত (patriotic) একদল শিল্প মালিকও তাহাদের নিজস্ব স্থান করিয়া লয়। এই শেষোক্ত শ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই বাস্তব রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় মাও ৎসে-তুঙের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা গড়িয়া উঠে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে মাও হইতেছেন চীনের লেনিন্।

(৩) কোন কোন বিপ্লবী চিন্তানায়ক কৃষকশ্রেণীকে সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে যে স্থান দিয়াছেন মাও কৃষকসমাজকে তদপেক্ষা অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দান করিয়াছেন। রাশিয়াতে বিপ্লবের পুরোভাগে ছিলেন প্রধানতঃ শ্রমিক শ্রেণী, স্থল ও নৌবাহিনী। কিন্তু চীনে কৃষকেরাই প্রধানতঃ মাও-এর সাথী হইয়া তাঁহার পাশে

আসিয়া দাঁড়ায়। তাহারাই মাও-এর নেতৃত্বে Long March এর (দীর্ঘ পদযাত্রা) সময় অসমসাহসিকতার পরিচয় দেয় এবং প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদ ও চৈনিক প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের ক্ষমতার অবসানের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। মাও ৎসে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের কৃষকশ্রেণী যে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে মাও বিপ্লবী মনোভাব সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন; তাই কৃষকেরা সমাজ বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য স্থান লইতে পারিয়াছে।

(৪) মাও মনে করেন যে সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে গ্রাম ও সহরের অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে সামাজিক সাম্য স্থাপন অত্যাবশ্যক। পুঁজিবাদী সমাজে সহরগুলি গ্রামকে চাপিয়া রাখে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে কৃষিনির্ভর গ্রামীন মানুষ ও শিল্পনির্ভর নগরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য গড়িয়া উঠে। সহরের মানুষের জীবনযাত্রার মান গ্রামের মানুষের জীবন যাত্রার মানের চেয়ে উচ্চতর হয়। এই পার্থক্য সাম্যবাদী সমাজে চলিতে পারে না। ইউরোপের কোন কোন সমাজবাদী রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল পরেও একদিকে সহরের শ্রমিক এবং অন্যদিকে গ্রামের কৃষকের মধ্যে আয়ের ও জীবন মানের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য সাম্যবাদের পরিপন্থী।

ইউরোপের ঐ সকল সাম্যবাদী দেশে কৃষক সমাজ সাম্যের ভিত্তিতে শ্রমিক সমাজের সহিত সুষ্ঠুভাবে integrated বা একীভূত হইতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, সেই সকল দেশসমূহ এই বিষয়ে খুবই সচেতন। নিঃসন্দেহে এই সমীকরণ খুবই কষ্টসাধ্য। চীনও এই একীকরণে পূর্ণ সফলতা অর্জন করিতে পারে নাই। সেই জন্য মাও চীনের বিপ্লবীদিগকে এই দিকে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

(৫) মাও people বা জনগণের এমন একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন যাহার মধ্যে নূতন উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৪৯ সালের ১লা জুলাই তারিখে চীনের কমিউনিষ্ট দলের অষ্টবিংশতি-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে মাও বলিয়াছিলেন: "Who are the 'people'? At the present stage in China, they are the working class, the peasantry, the petty bourgeoisie and the national bourgeoisie", অর্থাৎ জনগণ বলিতে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও জাতীয়তাবাদী শিল্পপতি গোষ্ঠীকেই বুঝায়। জমিদারশ্রেণী, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার মালিকশ্রেণী এবং প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি-বর্গ 'জনগণের' এই সংজ্ঞার বহির্ভূত। পূর্বোল্লেখিত ভাষণে তিনি আরও বলেন যে এই শেষোক্ত শ্রেণী

মত প্রকাশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। মাও আরও বলিয়াছেন যে "The right to vote is given only to the people, not to the reactionaries" অর্থাৎ জনগণের উপরোক্ত সংজ্ঞাভুক্ত মানুষই ভোটাধিকার পাইবে অন্য কেহ নহে।

(৬) মাও মধ্যবিত্ত ও জাতীয়তাবাদী শিল্পপতিগণকে নীতিগতভাবে মত প্রকাশের ক্ষমতা ও ভোটাধিকার দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই দুইটি শ্রেণীর মানুষ কখনও সমাজ বিপ্লবের পুরোভাগে থাকিয়া বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে না। In the era of imperialism, the petty bourgeoisie and the national bourgeoisie are not capable of leading any genuine revolution to victory" (on Peoples Democratic Dictatorship, Peking (1951)। জাতীয়তাবাদী শিল্পপতিগোষ্ঠী সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে তাহাদিগকে প্রশাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া অনুচিত ("the national bourgeoisie......should not occupy a major portion in the state administration")

কিন্তু চীনের ১৯৪৯ সালের সাধারণ পরিস্থিতি ও শিল্পে অনগ্রসরতা বিবেচনা করিয়া মাও ৎসে-তুঙ 'national bourgeoisie কে জনগণের সংজ্ঞায় স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "The national bourgeoisie is of great importance during the present stage". ঐ সালের ১লা জুলাই-এর ভাষণে চীনের নেতা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "Our current policy is to control capitalism not to eliminate it". অর্থাৎ আমরা আপাততঃ পুঁজিবাদের অবসান ঘটাইতে চাই না। পুঁজিবাদকে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে চাই।

তাহা হইলে কি মাও পুঁজিবাদের সহিত আপোষ করিতেছেন? নিশ্চয়ই তাহা নহে। জাতীয়তাবাদী শিল্প মালিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন: "When the time comes to realise socialism, that is to nationalise private enterprise, we shall carry the work of educating and remoulding them a step further. The people have a powerful state apparatus in their hands—there is no need to fear the rebellion by the national bourgeoisie (Selected Works, Peking, Vol. IV, p. 417—19 দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ যখন পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় আসিবে তখন সহজেই জাতীয়তাবাদীগণের ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাইবে। মালিকদের

বিদ্রোহের সুযোগ থাকিবে না, কারণ জনগণের সরকার তখন শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

(৭) চীনে বিপ্লবোত্তর যুগে ভূস্বামী প্রথা বাতিল হইবার পরেও ধনী চাষীশ্রেণীকে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই সাময়িক নীতি কৃষির বাস্তব অবস্থা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। ধনীচাষীদের স্বীকার করিয়া না লইলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাইত এবং দেশে খাদ্যাভাব ঘটিত। জনগণের স্বার্থেই উপরোক্ত নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু ধনী চাষীদের কড়া নজরে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথমতঃ কৃষক কল্যাণমূলক সমিতিগুলিতে ধনী চাষীদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ নূতন কোন জমি দখল বা ক্রয়ের ক্ষমতা হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা হইয়াছিল। ভূমিসংস্কারের পর এই শ্রেণীর ধনী চাষীদের নির্মূল করা সম্ভব হইয়াছে। উপরোক্ত সতর্কতা অবলম্বনের ফলে অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনী চাষীদের উৎখাত করিতে যে বেগ পাইতে হইয়াছে, চীন সরকারের সেই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

(৮) মাও ৎসে-তুঙ কর্তৃক 'Peoples' Democratic Dictatorship' অথবা জনগণের গণতান্ত্রিক এক নায়কত্বের ব্যাখ্যা চৈনিক সাম্যবাদের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। মাও, বলিতেছেন "Democracy is practised within the ranks of the people, who enjoy the rights of freedom of speech, assembly, association and so on. The right to vote only belongs to the people, not to the reactionaries. The combination of these two aspects, democracy for the people and dictatorship over the reactionaries 'is the peoples' democratic dictatorship" (Selected Works' Peking, Vol. IV, p 417—19)। অর্থাৎ জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের দুইটি হস্ত। একটি হস্ত প্রসন্ন ও কল্যাণময়, জনগণের কল্যাণকল্পে সদা প্রসারিত। অন্য আর একটি কঠোর ও অনমনীয়, সমাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সদা-সক্রিয়।

(৯) চৈনিক বিপ্লবের পর মাও ৎসে-তুঙের নেতৃত্বে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট দলীয় ব্যক্তিবর্গদ্বারা সরকার গঠিত হয় নাই। বিভিন্ন দলের এমনকি নির্দলীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেও গণপরিষদে ও সরকারের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে দেশগঠনের প্রথম যুগে নয়া চীনের নেতা মাও প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে Socialist Realism বা সমাজতান্ত্রিক

বাস্তবতা ও চীনের তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা করিয়াই মাও ৎসে-তুঙও চীনের কমিউনিষ্ট দল এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই স্থলে মনে রাখা প্রয়োজন যে বিপ্লবী গণপরিষদ ও সরকারকে চীনের কমিউনিষ্ট দলই প্রকৃত নেতৃত্ব দিয়াছে যদিও অন্যান্য দলীয় ও নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রশাসন ব্যবস্থায় স্থান দেওয়া হইয়াছিল।

(১০) প্রাক-বিপ্লব যুগে চীনের সার্বভৌমত্ব ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও জাপান আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার করিয়াছিলেন। চীনের জাতীয় মর্যাদা বার বার পদদলিত হইয়াছে। সাংহাই, ন্যানকিন, থিয়েনজিন প্রভৃতি চীনের সহরে শ্বেতকায়ের হস্তে চীনা নাগরিকদের নানা নৈতিক ও কায়িক অপমানের ঘটনা বিরল ছিল না। তাই মাও ৎসে-তুঙের রাষ্ট্র-চিন্তায় জাতীয় মর্য্যাদার বাণী সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। বিপ্লব সাফল্যলাভ কবিলে ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর চীনের গণপ্রতিনিধি সমাবেশে যে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন, তাহা চীনের বিপ্লবী নেতৃত্বের জাতীয় মর্যাদা ও গর্ববোধের পরিচায়ক। তিনি বলিয়াছেন যে চীন জাতি হিসাবে জাতীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ("the Chinese had stood up") এবং আর কখনও চীনকে জাতীয় অপমান সহ্য কবিতে হইবে না। ("never again be an insulted nation")। কিন্তু মাও-এর জাতীয়তাবাদ পরস্বাপহারী জাতীয়তাবাদ নহে।

(১১) মাও ৎসে-তুঙ অন্ধ জাতীয়তাবাদী নহেন। তিনি আন্তর্জাতিক সমাজবাদে বিশ্বাসী এবং সেই আদর্শ লাভের জন্য তিনি পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশেব সংগ্রামী জনগণকে সমর্থনে উৎসুক। মার্কসীয় আন্তর্জাতিকতা মাও মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছেন।

(১২) সাম্রাজ্যবাদের সহিত নিরবচ্ছিন্ন আপোষহীন সংগ্রাম কবা মাও-এব অন্যতম নীতি। তিনি বলিয়াছেন যে সমাজবাদী দেশগুলির পক্ষে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত কোন মীমাংসায় রত হওয়া সাম্যবাদী নীতি-বিরোধী। এই মতবাদ লইয়া সাম্যবাদী তাত্বিকগণের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ চলিয়াছে।

(১৩) প্রাক—বিপ্লব যুগে চীনের যে জীবনধারা ছিল, মাও ৎসে-তুঙের মতে তাহা রক্ষণশীল ও সামাজিক পরিবর্তন—বিরোধী। চীনের পুরাতন সামাজিক আচার পদ্ধতি প্রধানতঃ প্রাচীনকালের দার্শনিক কন্‌ফিউসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খৃঃ পূঃ) এর ভাবধারার অনুপন্থী। পিতৃপুরুষ, পরিবার, শিক্ষক, প্রতিবেশী ও সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সদ্‌ব্যবহার এই ভাবধারার মূলকথা। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাক্-বিপ্লবী চীনে বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন ধর্মনেতা লাওৎ-সির (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) দ্বারা প্রবর্তিত 'তাও'

ধর্মের প্রভাব ব্যাপক ছিল। এই দুইটি ধর্মই ঐহিকতা বিরোধী। ধর্মবিরোধী জড়বাদী মার্ক্সীয় নীতির সঙ্গে চীনের প্রাচীন ধর্মমতের অসামঞ্জস্যতাই অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। অন্যদিকে সামাজিক আচারের ক্ষেত্রে কন্‌ফিউসিয়াসের নীতি যদিও মোটামুটিভাবে প্রাচীন চীনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিবাদী ও মানবতাধর্মী, তথাপি নূতন সমাজ ব্যবস্থায় কন্‌ফিউসিয়াসের আনুগত্যের ধারাগুলি প্রগতি বিরোধী হইয়া দাড়াইল। সেইজন্য Thought Reform বা চিন্তা-বিপ্লবের মাধ্যমে মাও ৎসে-তুঙ চীনে বৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত আছেন। তিনি মনে করেন যে গণতান্ত্রিক ও শিল্পবিপ্লব সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইলে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা পরিহার করিয়া Thought Reform বা চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করিতে হইবে। তিনি বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবিদের চিন্তাধারায় বিপ্লব আনিতে উৎসুক। ইহাই Cultural Revolution বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূলসূত্র। "Thought Reform and specially thought reform of all categories of intellectuals, is one of the important conditions of the thorough-going democratic transformation and the progressive industrialisation of our country" (Ten-min Tih-pao, speech delivered on october 24, 1951)

(১৪) পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে মাও ৎসে-তুঙ বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার বিপ্লবী চিন্তাধারার একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় দিক। প্রাক্‌বিপ্লব যুগের সামন্ততান্ত্রিক আইন সমাজে পুরুষকেই প্রাধান্য দিয়াছিল। নারী ছিল পুরুষের অধীন। মাও চীনের চিরাচরিত এই আইনের পরিবর্তন সাধন করিয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাম্য স্থাপন করিয়াছেন। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষ ও নারীর সমাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

(১৫) মাও ৎসে-তুঙের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে নূতন নহে। তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে মাও সাম্যবাদী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মূলনীতির অতি প্রাঞ্জল ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কোন জাতির শিক্ষা পদ্ধতি একাধারে বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। মাও আরও বলিয়াছেন যে জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে যাহা যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত তাহাও শিক্ষানীতির মধ্যে বিধৃত হওয়া প্রয়োজন। তাঁহার মতে প্রগতিশীল সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পরিপন্থী সকল প্রকার ভ্রষ্টাদর্শ হইতে জাতীয় শিক্ষাকে মুক্ত রাখিতে হইবে।

(১৬) মার্কস ও লেনিনের ন্যায় মাও ৎসে-তুঙ সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন যে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা বলপ্রয়োগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে ও চলিতেছে, তাহা পরিবর্তন করিতে হইলে বল প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। মাও আরও মনে করেন যে অনগ্রসর সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক দেশ সমূহ কোন প্রকারেই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রে পৌছাইতে পারিবে না। তাঁহার মতে রক্তাক্ত বিপ্লবই সাম্যবাদী সমাজ গঠনের একমাত্র পথ।

(১৭) মাও ৎসে-তুঙ ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতায় (historical relativity) বিশ্বাসী। ঘটনা ও মতবাদ সবপ্রকারের পারিপার্শ্বিকতাব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা কর্তব্য। তাই ঐতিহাসিক পটভূমিকা পরিহার করিয়া কোন ঘটনা বা মতবাদ বিচার করা উচিত নহে। ক্রুশ্চভ প্রভৃতি ষ্ট্যালিনের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তখন মাও বলিয়াছিলেন যে ষ্ট্যালিনকে তৎকালীন ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে। তাহা হইলেই সত্যকার ন্যায় বিচার হইবে।

(১৮) চীনের ভূতপূর্ব নেতা ও কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিক লিউ শাও-চি বলিয়াছিলেন যে চীন যে পথে অগ্রসব হইয়াছে তাহাই এশিয়ার অনগ্রসব দেশগুলির পথ। তিনি আরও দাবী করিয়াছিলেন যে মাও ৎসে-তুঙের চিন্তার মৌলিকত্ব এই যে মাও মাক্‌সয়ী দর্শনকে এশিয়ার উপযোগী করিয়া পবিবেশন করিয়াছেন। "Mao Tse-tung's great accomplishment has been to change Marxism from a European to an Asiatic form……("Amerasia, XI by Anna Louise Strong, June, 1947, p. 161, An Interview with Liu shoa-chi) শ্রীমতী ষ্ট্রং-এর সহিত এই সাক্ষাৎকারে লিউ বলিয়াছিলেন, "China is a semi-feudal, semi-colonial country in which vast numbers of people live at the edge of starvation, tilling small bits of soil…In attempting the transition to a more industrialised economy China faces the pressures of advanced industrial lands…… There are similar conditions in other lands of South—East Asia. The courses chosen by China will influence them." ১৯৪৯ সালে নভেম্বর মাসে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হইলে World Federation of Trade Unions-এর পিকিং-এ অনুষ্ঠিত সভায় লিউ আবার বলেন: The way which has been followed by the Chinese people…is the way which should be followed

by the peoples of many colonial and semi-coloinal countries in their struggle for national independence and people's democracy"

আর একটি বিষয়ে মাও তীব্রভাবে তার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রকে পূর্ণ সার্বভৌমিকতার অধিকার দেওয়া কর্তব্য। এই নীতি লইয়াও চীনের তাত্ত্বিকগণ তীব্র বাদানুবাদে লিপ্ত হইয়াছেন।

মন্তব্য: যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল তাহার মধ্যে মাও ৎসে-তুঙের মূল নীতিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে মাত্র। দ্বিতীয়তঃ কেহই দাবি করিবে না যে এই নীতিসমূহ সমালোচনার উর্দ্ধে। কতকগুলি নীতি বিষয়ে মতান্তর হওয়া স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ বলা বাহুল্য যে চীনের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত নীতিগুলি কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। তথাপি নীতিগুলির মূলরূপ বদলায় নাই।

মাও ৎসে-তুঙের জীবন ও নীতি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অদূর ভবিষ্যতে আরও হইবে আশা করা যাইতে পারে।

প্রশ্নপত্রের সংকলন

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. To what extent is Politics a Science ? Give reasons for your answer.

2. Is Politics both an Art and Science ?

3. (a) "Politics is not an experimental science".

(b) "Politics (so for as it is a science) is an experimental science" (Bryce).

(c) "Politics is an observational and not experimental science" —Lowell Examine these statements.

4. Discuss the scope of Political Science.

5. Describe the different methods of study in Political science. Which of them do you consider to be the most desirable, and why ?

6. Define 'Political Science.' Are you prepared to regard Political science as science ? State your arguments.

7. Discuss the nature of Political Science as a science. and distinguish it from political Philosophy.

8. Write a short note on the methods of Political Science.

9. Discuss the different methods of study in political Science.

তৃতীয় অধ্যায়

1. Define Political Science and discuss the nature of its relationship with Economics and Sociology

2. Difine Political Science. Discuss the relationship of Political Science with History and Economics.

3. Discuss the relation of Political Science to History and Ethics.

4. (a) "Political Science without History is hollow and baseless". (Sulley) Discuss.

(b) 'Political Science without History has no root."

(c) "To have value, the study of Politics must be an effort to codify the results of experience in the history of states." (Laski)

(d) "A true Politics ..is above all a philosophy of history." (Laski).

(e) "You may have a Political theory which is a good theory without being rooted in historical study." (Barker).

Examine these statements and comment.

5. Define "Political Science' and discuss the nature of its relation to History and Sociology.

চতুর্থ অধ্যায়

1. How do you distinguish the state from other associations ?

2. Discuss the significance & meaning of "territory" as a constituent element of the state.
What are the exceptions to the principle of exclusive jurisdiction of a state over its own territory ?

পঞ্চম অধ্যায়

1. Discuss the practical importance of Social Contract Theory in actual development.

2. State the points of agreement & difference between Hobbes & Locke as expounders of the Social Contract Theory.

3. "Rousseau tries to combine the theories of Hobbes & Locke" Elucidate.

4. Explain how Rousseau in his theory of Social Contract seeks to combine the theories of Hobbes and Locke.

5. To what extent would it be true to state that the Social Contract Theory was the chief antidote to the Divine Right Theory ? Give reasons for your answer.

6. Comment on the statement "Will, not force, is the basis of the State,"

7. "The accepted theory of the origin of the state in modern Political Science is the Historical or Evolutionary theory." Discuss.

8. Discuss the Evolutionary Theory of the origin of the state.

9. State and examine the theory of the force as an explanation of the origin of the state. Do you discover any element of value in it ? Give your reasons fully.

10. Explain with reference to the views of Hobbes, Locke and Rousseau the Social Contract Theory regarding the origin of the state. What are the defects of this theory ?

11. State and evaluats the Social Contract Theory regarding the origin of the state.

ষষ্ঠ অধ্যায়

1. What do you mean by the right of self-determination ? Discuss in this connection the value and limitations of this doctrine.

2. What are the essential factors that tend to constitute a group of people into a nationality ? How does a nation come into being in a country of diverse nationalities ?

3. Discuss the merits and defects of Nationalism.

4. "Nationality is an essential element in the formation of states." Examine.

5. "Discuss the significance of nationality as a constituent of states." Examine.

What is Nationalism ? Discuss its influence as a political principle both on the progress of civilisations.

7. What is meant by Nationalism ? Is the idea of Nationalism compatible with the existence of an international order ?

8. Discuss the value and limitation of Nationalism as a Political Ideal.

9. What are the implications of the ideal of Nationalism ? How far do you agree with the view that this ideal is "necessarily wrong and obstructive to progress ?"

10. "Nationalism is a menace to civilization." Examine.

11. Discuss the problem of Nationalism Vs. Internationalism.

12. Discuss critically the theory contained in the following statement :

"One Nation, One State."

13. Explain the meaning of Nation, Nationality, and Nationalism. Is Nationality a satisfactory basis of modern states.

সপ্তম অধ্যায়

I. Discuss critically the Idealist Theory regarding the nature of the state

2. Discuss critically the Organic Organismic Theory regarding the nature of the State.

3. "The State is a living organism, not a lifeless instrument." Discuss the soundness of the view.

4. Examine the Marxist conception of the state.

5. How far do you agree with the view that the Idealist Theory of the state is in fact inimical to individual freedom ? Give resons for your answer.

অষ্টম অধ্যায়

1. Examine carefully the doctrine of Popular sovereignty. What are its limitations ?

2. What are the characteristics of Sovereignty ? When one speaks of 'limited' sovereignty, what limitations are meant ?

3. Distinguish between (i) Legal & Pol. sovereignty ; (ii) De Facto & De Jure sovereignties. Discuss the nature of sovereignty Define Sovereignty.

4. What do you understand by sovereignty ? Discuss the pluralistic criticism of the classical theory of sovereignty. (C.U. '54 ; '64)

5. Discuss the nature of sovereignty. In the light of your discussion, distinguish between legal & pol. Sovereignty (C.U. '56)

6. "The State is limited within ; it is also limited without." Examine this statement Discuss in this connection the essential attributes of sovereignty.

7. How far is the Sovereignty of a State limited by :—

(a) Constitutional law & (b) International law ?

8. Discuss the nature & purpose of the Pluralistic attack upon the traditional doctrine of State-Sovereignty.

9, Fxplain and Attempt a criticism of the Austinian theory of Sovereignty.

10. Define sovereignty. What are its attributes ?

11. Write an analytical essay on the attacks upon the Monistic Theory of sovereignty.

12 State and explain the Monistic theory of Sovereignty. On what grounds has it been attacked ?

13. Distinguish between the legal and political aspects of sovereignty with examples.

14. Distinguish between : (a) Popular sovereignty and Political sovereignty and. (b) De Jure and De Fact Or sovereignty

নবম অধ্যায়

1. (a) "Internationl law is only valid for a given state to the degree that it is prepared to accept its substance."

(b) "The world has become so interdependent that an unfettered will in any state is fatal to the peace of other states." (Laski)—How far do you agree with these two views ?

2. Discuss the different senses in.which the tarm 'Law' has been used.

Will your conception of law as a student of political philosophy be he same as that of a student of (i) Legal philosophy & (ii) Jurisprudence ?

3 International law is a law by courtsey, concession & grace'. Do you agree ?

4 Discuss the nature & sanction of Law. How far is it correct to use such expression, as the "Laws of Nature," 'The Laws of Morality' ; "International Law."

5. Differential positive laws from (i) Laws of Nature, (ii) Moral laws, (iii) Social laws, (iv) Religious laws. Give suitable illustrations.

6. "Law is the expression of the general will' of the community" —Discuss

7. Discuss the nature & sanction of Law. Can International Law be regarded as Law in the strict sense of the term ? Give reasons

8. Discuss the nature of law with special reference to its relation to morality.

9. Is it enough to say about law that it is the command of the Sovereign ?

10. Define Law and point out the distinction and relation between Law and Morality,

11. Define 'Law' and point out its different sources with their relative important.

একাদশ অধ্যায়

1. Distinguish between 'Civil' & Pol. rights. How are civil rights guaranted in (a) U.S.A. (b) England. (c) India

2. Explain carefully the right & duties of citizenship. State the more important fundamental rights which a citizen in a modern state enjoys. State the theory of Natural Rights & examine its validity

3. Rights can never be higher than the econmic structure of a society at a given time & the cultural development determind therby. Discuss Explain the concept of Liberty, What are the methods of safeguarding liberty ?

4. What is meant by the concept of Liberty ? "Sovereignty & Liberty are not contradictory terms." Examine.

5. What is the meaning of Liberty in Political Science ? What are the safeguards of liberty in a modern state ?

6. Analyse the Concepts of Natural Law and Natural Rights.

দ্বাদশ অধ্যায়

1. Discuss the various theories of the end & purpose of the state.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

1. Discuss the proper sphere of the state.

2. "A true theory of the State must at once be socialistic and individualistic." Discuss.

3. Do you think that any state should act on the principle that "the adult invidividual should not be treated as a child and that he should not be governed against his own will even for his own good" ? Give reasons for your answer.

4. Discuss the value and limitation of Individualism as a social political theory.

5. "The aims of the socialist and the individulist do not in the long run differ ; each aims at giving to the individual the maximum amount of liberty."—Examine this statement and discuss in this connection the factors that have led to the reactions from individualism.

6. How far do you agree with the Materialist conception of History as expound by Karl Marx ? Give reasons for your answer.

7. What is Socialism ? Examine the arguments usually put forward for and against it.

8. Discuss the theories of Individualism and Socialism regarding the functions of government. What in the modern trend in the matter ?

9. Socialism proposes to complete rather than oppose, 'the liberal democratic creed." Discuss the statement.

10. Stae and examine the doctrine of Individualism

"Neither Individualism nor socialism can explain fully the functious of the modern democratic state." Discuss.

প্রশ্নপত্রের সংকলন

প্রথম অধ্যায়

1. "Separation of powers is the secret of political freedom." Do you agree ?

2. "The accumulation of all powers—legislative, executive and judicial—in the same hands .. ..may justly be pronounced as the very definition of tyranny." (Madison)

Examine this view and discuss in this connection the value and limitations of the theory of Separation of Powers.

3. Examine the theory of Separation of Powers. How far has this theory been translated into practice in Great Britain ?

4. Discuss the theory of Separation of Powers. Do you things that it is essential to provide for Separation of powers in Indian Constitution ?

5. How far is it possible and desirable to carry out the principle of Separation of Powers in the Government Organization of the State ?

6. Discuss the value & limitations of the Doctrine of Separation of Powers.

7. Discuss the doctrine of Powers. How far has it been translated into practice in India, U.S.A. & U. K. ?

8. The theory of separation of Powers in its rigid form is neither desirable nor practicable. Discuss the statement. ('66)

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. "Living political constitutions must be Darwinian in structure and in pactice." Discuss.

2. Distinguish between rigid and flexible constitutions. Are the Constitutions of (a) the U. S. A. (b) Great Britain and (c) India, rigid or flexible ? Give reasons for your answer.

চতুর্থ অধ্যায়

1. Discuss the meaning of Democracy as an ideal.

2. What is the essence of Democracy as a form of government ? Estimate its value as an agency for the progress of mankind.

3. "The problem of Democracy is how to balance discipline with freedom, the good of the whole with the good of the part." Do you agree with this view ?

4. Discuss the aims and objects of totalitarian states. Show how they differ from democratic states.

5. Do you consider that direct democracy working through the initiative, the referendum and the recall can be used to supplement representative government ? Do you think that one must destroy the other ?

6. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Can democracy function is a one-party state ?

7. What conditions are required for the successful operation of a democracy. Indicate the merits and defects of such a form of government.

8. What are the cardinal features of democracy ? How far are they present in the U.S.A. and India ?

9. Distinguish Democracy from Dictatorship and point out the conditions essential to the success of Democracy.

10. Democracy is not complete without Socialism. Discuss.

11. Examine the importance of right to vote. What are the qualification of vote in a modern democracy.

12. Discuss the merits and defects of dictatorship.

13. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which of them would you prefer and why ?

পঞ্চমঅধ্যায়

1. How would yon distinguish the Presidential system of government from the cabinet system of Government. Illustrate your answer.

2. How far do you agree with the view that the cabinet system of Government ensures, as contrasted with the Presidential system, a more harmonious co-operation between the executive and legislative branches of the Government ? Give reasons for your answer.

3. Point out the characteristics of Parliamentary form of government. In what different ways does Parliament exercise control over the Cabinet in this form of government ?

4. Discuss the characteristics of Cabinet Government and the e sential canditions for its success ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

1 The difference between a federation and a confederation arises wholly from difference in respectof the location of sovereignty in the grouping. Examine the statement.

2. What are the conditions necessary for the formation of a Federal Union ?

3. State the nature of Federation & discuss its advantages and disadvantges.

4. Discuss the characteristics of a true Federal Union (a) from a Confederation, (b) from a Unitary State. Illustrate your answer. What are the conditions for the success of a Federal Union ? How far do they exist in India ?

5, Discuss the conditions of success of a federal form of government.

6. Explain the nature of a federal union and distinguish federal union from a unitary state.

7. Explain the chief features of federation and point out its merits and defects.

সপ্তম অধ্যায়

1. "In theory, indeed, it is difficult to see any case for a second chamber, as Siyes said, if it agrees with the first it is superfluous and if it disagrees is obnoxious," (Laski) Examine this statement.

How will you distinguish between a non-sovereign law making body from a sovereign law-making body ? Illustrate your answer.

3. Discuss the case for and against chamber system in the organisation of a federal legislature.

4. Bicameralism connot be justified by any argument. Do your agree ?

5. Examine the case for and against Bicameralism. Give illustrations.

6. Discuss the problem of bicameralism in connection with the constitution of the legislative organ of modern governments.

অষ্টম অধ্যায়

1. What are the political, administrative and legislative functions of the executive ?

What is Bicameralism ? Point not its merits and defects.

নবম অধ্যায়

1. How would you insure the independence of the judiciary in a State ? How far do you agree with the view of Laski that of all the methods of (judicial) appointment that of election by the people at large is without exception the worst ?" Give reasons for your answer.

2. Discuss the role and functions of judiciary in a modern State. How would you insure the independence of the judiciary in it ?

3. Discuss the principles of organisations of the Judiciary in modern states.

একাদশ অধ্যায়

1. Briefly describe the various methods that have been suggested for the representation of minorities in the legislature.

2. Distinguish between territorial representation and functional representations. Which of them would you recommend & why ?

3. Discuss critically the system of proportional representation as a method of minority representation

4. Discuss the case for minority representation and write an

analytical note on the different methods of minority representation in modern democracies.

5. What are the different methods by which the electorate can exercise control over their representatives in modern democracies ?

দ্বাদশ অধ্যায়

1. Discuss the role played by political parties in representative govt.

2. Party Govt—What safeguards should be provided in the constitution to mitigate its evils.

3. What are the merits and demerits of Party Govt ? Can any practical working alternative be suggested ?

4. Discuss the use, abuse & the true role of Party system in Democracy.

5. Define a political party.

6. Discuss the nature and functions of political parties. Are parties in dispensable in democracies ?

7. Would you like to have only one party, two parties or many parties in a country ? Give reasons for your answer.

8. Explain the meaning of multiple party system and examine its advantages and disadvant ages.

9. Discuss the problem of two party system Vs. multiple party system in democracy.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

1. Discuss the nature and importance of public opinion in popular government.